কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মানব জীবনের অপরিহার্য
বিষয়াবলীর উপর তিনশরও অধিক প্রশ্নের সমাধান সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে
ইসলামী আক্বীদার এক অনন্য সংকলন

কিতাবুল আক্বাঈদ

العقيدة الصحيحة من الكتاب و السنة

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব : মারকাজ জামে মসজিদ, মোহম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
সাবেক শাইখুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স
(মারকাজের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫
www.jumuarkhutba.wordpress.com

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মানব জীবনের অপরিহার্য
বিষয়াবলীর উপর তিনশরও অধিক প্রশ্নের সমাধান সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে
ইসলামী আক্বীদার এক অনন্য সংকলন

কিতাবুল আক্বাঈদ

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

সহযোগিতায়:
মুফতী মুহা: রহমতুল্লাহ

প্রকাশনায়:
আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১১ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ: আগষ্ট ২০১২ ইং

বি: দ্র:- কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতিত বিনা মূল্যে সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য ছাপাতে চাইলে প্রকাশনা কতৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

মূল্য : ৩০০ (তিনশত) টাকা মাত্র

Kitabul Aqaid
Shaikh Mufti Mohammad Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price : 300.00 tk. US.$ 6.00

হাদীয়া

❖ যারা সত্য গ্রহণে ও মিথ্যা বর্জনে আপোষহীন।

❖ যারা সত্য প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার মূলোৎপাটনের সংগ্রামে সদা তৎপর।

❖ যারা গভীর রজনীতে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মহান রবের দরবারে হিদায়েত এর জন্য আবেদনে মগ্ন।

❖ যারা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও পীরতন্ত্রের অন্ধ অনুসরনের বেড়াজালে আবদ্ধ।

❖ যারা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে বহু ইলাহ ও বহু রবের এবাদতে লিপ্ত।

❖ যারা নবীওয়ালা কাজের নামে জিহাদ বিমুখ দাওয়াতী কাজে জান-মাল ব্যায়ে ব্যাস্ত।

তাদের জন্য এই কিতাবটি একটি সামান্য হাদীয়া।

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة : ٥)

“আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে” (আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮:৫)

উপহার

আমার

শ্রদ্ধেয়/স্নেহের..

....

....

........কে ‘কিতাবুল আক্বাঈদ’ বইটি উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

....

....

....

সাক্ষর ও তারিখ

আপনার সংগ্রহে রাখার মত লেখকের অন্যান্য কিতাব

১) কিতাবুল ঈমান
২) কিতাবুত তাওহীদ
৩) কিতাবুল আক্বাঈদ
৪) কিতাবুস সাওম
৫) কিতাবুয যাকাত
৬) কিতাবুল হজ্জ
৭) তাওহীদের মূল শিক্ষা
৮) বাইআত ও সীরাতে মুস্তাকিম
৯) মরনের আগে ও পরে
১০) কিতাবুদ দুআ
১১) দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ

সংক্ষিপ্ত সূচী

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ للّٰه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَــىْ اٰلِــهِ وَاَصْــحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ وَبَعْدُ

মুসলিম জাতী আজ অনৈক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। দল-উপদল, ফেরকাবন্দী, মনগড়া তরিক্বা ইত্যাদি সহ নানাবিধ কারণে ইসলামের সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তারা। ইসলাম, মুসলিম, ইলাহ্, রব, ঈমান, ইহসান, কুফর, জুলম, নিফাক, ফিস্ক, রিদ্দাহ ও তাগুত সহ যাবতীয় মৌলিক পরিভাষাগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা করছে তারা। শির্ক-বিদ'আতের সয়লাবে হারিয়ে গেছে ইসলামের তাহজীব-তামাদ্দুন ও সঠিক পরিচয়। কবর পূজা, মাজার পূজা, পীর পূজা ইত্যাদি আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতকেও হার মানিয়েছে। ধর্মীয় আহ্বার, রুহবান ও পীর-মাশায়েখদেরকে গরীবনেওয়াজ, বান্দানেওয়াজ, 'আতাবখ্শ, গঞ্জেবখ্শ, গাউছ, কুতুব, আকতাব, কুতুবুল আকতাব, আবদাল ও গাউছুল আজম খেতাব দিয়ে ইলাহ ও রবের আসনে বসিয়েছে।

অপরদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে বহু ইলাহ্ ও বহু রবের ইবাদতের রাস্তা খোলা হয়েছে। মন্ত্রী-এমপি ও শাসকদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আইনদাতা-বিধানদাতা, আইন প্রণয়ন করা ও প্রয়োজনে আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করার ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে ফেরাউনের মত আল্লাহর আসনে বসিয়েছে। ইসলামের সঠিক শিক্ষার অবর্তমানে সৃষ্ট এই নরকীয় পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেতে হলে সকল প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র ত্যাগ করে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক পথে। হেরার আলোকোজ্জ্বল রাজপথে।

মুসলিম উম্মাহ্কে সেই কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবেই আমাদের এই সিরিজ প্রকাশনা। ইতিমধ্যেই "কিতাবুল ঈমান", "কিতাবুত তাওহীদ", "কিতাবুল আকাঈদ", "কিতাবুস সাওম", "কিতাবুয যাকাত", "কিতাবুল হজ্জ", "তাওহীদের মূল শিক্ষা", "বাই'আত ও সীরাতে মুস্তাক্বীম", "মরনের আগে ও পরে", "কিতাবুদ দু'আ" ও "দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ" নামে এগারটি কিতাব আমরা প্রকাশ করেছি। যেগুলো পাঠক সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এটি আমাদের "কিতাবুল আক্বাঈদে"র দ্বিতীয় সংস্ককরণ যা মুসলিম জীবনের তিনশরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর সম্বলিত। আশা করি এ কিতাবগুলো মুসলিম উম্মাহ্র পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। (ইনশাআল্লাহ)

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর (সুব:)। আমরা কেবল মাত্র তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের নফ্সের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল কর্মের ভুল-ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে গোমরাহ হতে দেন, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, কোন হক মা'বুদ নেই। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল।

আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُــوتُنَّ إِلَّــا وَأَنْــتُمْ مُــسْلِمُونَ [آل عمران/١٠٢)

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আল-ইমরান ৩:১০২)

আল্লাহ (সুব:) আরো ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَــثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَــامَ إِنَّ اللَّــهَ كَــانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء/١)

অর্থ: "হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা কর। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।" (সূরা নিসা ৪:১)

আল্লাহ (সুব:) আরো ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (الأحزاب/٧٠، ٧١)

অর্থ: "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (সূরা আহযাব ৩৩:৭০-৭১)

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

অর্থ: "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বানী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ (সা:) এর পথ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কৃত বিষয় (ইবাদত), প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বিষয় (ইবাদত) বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম"। (সুনানে নাসায়ী ১৫৭৭)

যে ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। তা হচ্ছে: **প্রথম শর্ত:** ঈমান। **দ্বিতীয় শর্ত:** ইখলাস। ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা এবং তার সাথে শির্ক না করা। **তৃতীয় শর্ত:** ইত্তিবাউস সুন্নাহ। রাসূল (সা:) যে শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরনে ইবাদাত করা। প্রথমটি সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة/٥]

অর্থ: "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত' করে তাঁরই জন্য দীনকে খালিস করে।" (সুরা বাইয়িনা ৯৮:৫)

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে কোন ইবাদতে শুধুমাত্র আল্লাহর (সুব:) নৈকট্য লাভের খালেস নিয়ত করতে হবে। নিয়তখাঁটি না হলে শির্ক হয়। আর শিরকযুক্ত ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

নিয়্যাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) পবিত্র হাদীসে ইরশাদ করেন:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

অর্থ: "ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।" (সহীহ মুসলিম ৫০৩৬; সহীহ বুখারী ১ নং হাদীস)

এ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সা:) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে খালেস নিয়্যাত ছাড়া কোন আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইখলাসের সাথে অল্প আমল করা বিদ'আতযুক্ত অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম। পক্ষান্তরে যত ইখলাসের সঙ্গেই ইবাদত করা হোক না কেন যদি 'ইত্তিবায়ে সুন্নাহ্' বা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরিকা অনুসরণ করা না হয় তাহলে সেটি হবে 'বিদ্আত'। ইবাদতের নামে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন-সুন্নাহর দলীল প্রমাণ ছাড়া নবআবিস্কৃত কোন ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। শিরকমুক্ত, তাওহীদদীপ্ত, সুন্নাহর কাঠামোয় সম্পাদিত আক্বিদা-বিশ্বাস, কথা ও কর্মই আল্লাহর কাছে ইবাদত রূপে স্বীকৃত।

ইবাদতের ভিতরের অবকাঠামো হবে তাওহীদের, বাহিরের কাঠামো হবে সুন্নাহর। অন্তরে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবেন আল্লাহ (সুব:)। আর সেই লক্ষ্যের দিকে চলতে হবে ঐ পথ ধরেই যে পথ 'تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ' রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, (সুরা ওয়াকেয়া ৫৬:৮০) 'نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ' রূহুল আমীন জিবরাইল (আ:) এর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে (সুরা শুআ'রা ২৬:১৯৩) এবং নাযিল হয়েছে 'عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ' রাসূল (সা:) এর অন্তরে যাতে তিনি লোকদের সতর্ক করতে পারেন। (সুরা শুআ'রা ২৬:১৯৪) অর্থাৎ সকল কাজ করতে হবে রাসূল (সা:) এর সুন্নাহ মোতাবেক।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা:) সহ সকল নবী-রাসূলগণের মূল দাওয়াত ছিল শিরকমুক্ত তাওহীদ এবং বিদ'আত মুক্ত আমল। আর এটিই ইসলামী আক্বিদার মূল ভিত্তি। অথচ এই তাওহীদ বিষয়ে অন্ধকারে রয়েছে আজকের উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ। মাটি পূজা, পাথর পূজা, গাছ পূজা, মাছ পূজা, জ্বীন-ফেরেশতা ও ওলী-আউলিয়া পূজা, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্র পূজা, কালী পূজা, প্রতিকৃতি পূজা, অগ্নীশিখা, মঙ্গল প্রদীপ, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন

ইত্যাদি পূজা, কবর-মাজার, দরগা, দূর্গা, পীর-ফকীর, গাউস, কুতুব, খাঁজা বাবা, গাঁজা বাবা, মাথায় জট ও গাঁয়ে চটধারী লেংটা বাবা, জুলফে দরাজ, গেছুঁ দরাজ, গরীব নেওয়ায, বান্দা নেওয়াজ, 'আতা বখ্শ, গঞ্জে বখ্শ পূজার অন্ধকার ও কুফুরি তন্ত্র-মন্ত্র, কুফুরী মতবাদপূর্ণ অন্ধকারসহ সকল অন্ধকার ও জুলুমাতে আচ্ছান্ন হয়ে আছে গোটা মুসলিম জাতি ।

যার জন্য আজকে পুরো দুনিয়া শিরক, কুফর, নিফাক, জাহিলিয়্যাতে ছেয়ে গেছে, যা অত্যন্ত দু:খজনক । মুসলিমদের প্রতি লাঞ্চনার অন্যতম কারণ হচ্ছে সঠিক আক্বীদাহ থেকে পথভ্রষ্টতা । উম্মাহর এই অবস্থা দেখে বহুদিন যাবত মনের মধ্যে একটি সংকল্প ছিল এমন একটি সংকলন করার, যেখানে তাওহীদ-ঈমান সহ ইসলামের মৌলিক প্রায় সকল বিষয়ের সমাধান থাকবে । শিরকের অন্ধকার থেকে তাওহীদের নূরের দিকে মানব জাতিকে বের করে আনার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ।

আমরা “কিতাবুল আক্বাঈদ” সংকলনে নবী-রাসূলরা যে আহ্বান নিয়ে এ যমীনে এসেছিলেন সে প্রকৃত আহ্বান তুলে ধরেছি, সে সব সত্যের অনুসন্ধানীদের জন্য যারা সিরাতুল মুস্তাক্বিম বা সঠিক পথের অনুসরণে সফলতা এবং মুক্তি লাভ করতে চান, যারা আল্লাহ ছাড়া যত বাতিল ইলাহ (মা'বুদ) আছে তাদের দাসত্বকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে চান । প্রশ্ন ও উত্তর আকারে এটি আমরা এমন এক চমৎকার ধারায় সংকলন করেছি যেন যে কেউ এটা অধ্যায়ন করলে তাওহীদ, ঈমান এবং ইসলাম সম্পর্কে সহজে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারে ।

এটি সংকলনের সময় আমরা কোন ব্যক্তি বা দলের অন্ধ অনুসরণ করিনি । কারণ একমাত্র আল্লাহর রাসূল (সা:) ছাড়া এ সৃষ্টি জগতে কারো অন্ধ অনুসরণ বৈধ নয় । আমাদের মানদন্ড হচ্ছে শুধু কুরআন এবং সুন্নাহ । আমরা এ সংকলনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিখ্যাত কিতাব গুলো থেকে কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে তাওহীদ-ঈমান এবং ইসলাম বিষয়ে প্রায় তিনশর অধিক প্রশ্নের সমাধান দিয়েছি, যা সমসাময়িক অনেক সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট হবে । ইনশাআল্লাহ! এই সংকলনের পেছনে কোন পার্থিব স্বার্থপরতা জড়িত নেই শুধু একথা ছাড়া:

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ (هود/٢٩)

অর্থ: “আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র জিম্মায় রয়েছে । ” (সুরা হুদ ১১:২৯)

এ সংকলনের পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য একটাই- মানবতার কল্যান । যেন মানুষেরা অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরে আসে ।

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ্ আপনাকে সত্য পথের দিশা দান করুন! এ সংকলনটি আপনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে পাঠ করুন, আমরা আশাবাদী আল্লাহ্ হয়তো আপনাকে এর মাধ্যমে হেদায়েত দান করবেন । কারণ আল্লাহ আপনাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টির অন্যান্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আপনি তো ভাল-মন্দ বুঝতে পারেন ।

আল্লাহর কাছে শুধু এই কামনা করি, তিনি যেন এই সংকলনটি শুধু তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করেন । তিনি এর দ্বারা উম্মাহকে বেনিফিট করুন, মানুষকে আলোর পথে নিয়ে আসুন । আরও কামনা করি তিনি যেন আমাকে ইসলামের উপর দৃঢ় রাখেন মৃত্যু পর্যন্ত, মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করেন এবং নেককারদের সাথে মিলিত করে দেন । এর মধ্যে ভাল যা কিছু আছে আল্লাহর তরফ থেকে, মন্দ কিছু থাকলে তা একান্তই আমার দূর্বলতার জন্য । সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার নিয়ামতে সমস্ত ভাল কাজ সংঘঠিত হয়ে থাকে ।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমাদের আরজ, বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে 'মুমিন মুমিনের আয়না' হিসাবে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব, ইনশাআল্লাহ!

লিখক

২রা' রামাদান ১৪৩৩ হিজরী

২১শে' জুলাই ২০১২ ঈসায়ী

আক্বিদার সংজ্ঞা
ও
মর্মকথা

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ
জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة : ٢٥٥ ، ٢٥٦]

অর্থ: " আলাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।"

সুরা বাকারা ২:২৫৫

প্রথম অধ্যায়: আক্বিদার সংজ্ঞা ও মর্মকথা

প্রশ্ন: আক্বাঈদ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: العقائـــد 'আক্বাঈদ' শব্দটি عَقِيْــدَةٌ 'আক্বিদাতুন' এর বহু বচন। আভিধানিক দিক থেকে 'আক্বীদাহ' শব্দটি عَقْدٌ 'আক্দুন' শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ বন্ধন, দৃঢ় করা, গিট, চুক্তি, বিশ্বাস, ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদি। এটি تَوْثِيْقٌ ، مِيْثَاقٌ তাওসীকুন, মিছাকুন (প্রতিশ্রুতি, অঙ্গিকার) এবং اِحْكَامٌ ইহকামুন (সুদৃঢ় করণ, নিখুত করণ) অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

পরিভাষায় আক্বীদাহ বলতে, সন্দেহাতীত প্রত্যয় এবং দৃঢ় বিশ্বাসকে বুঝায়।

ইসলামী আক্বীদাহ বলতে বুঝায়: কুরআন ও হাদীসে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত সকল তত্বমূলক বা কর্মমূলক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা:) যা কিছু নিয়ে এসেছেন বলে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত সে সব কিছুকে অন্তর দিয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। যেমন: তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, মালায়েকা, আসমানী কিতাবসমূহ, সকল রাসূল, কিয়ামত দিবস, তাকদীরের ভালো-মন্দ ইত্যাদি। মূলত: আক্বিদাই হচ্ছে যে কোন ধর্ম, যে কোন দল বা যে কোন মতবাদের মূল ভিত্তি। আক্বিদাহ ঠিক না থাকলে আমল যত সুন্দর হোক না কেন তার কোনই মূল্য নেই। ইসলামী আক্বিদার মৌলিক বিষয়গুলো এই কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এই কিতাবের নামকরণ করা হয়েছে 'কিতাবুল আক্বাঈদ'।

প্রশ্ন: মুসলিম হিসেবে আমাদের আক্বীদাহ কি?

উত্তর: মুসলিম হিসেবে আমাদের আক্বীদাহ হবে নিম্নরূপ:

▶ ঈমান হল মুখের দ্বারা ঘোষণা করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ করা এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। ঈমান আনুগত্যের কাজ দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবাধ্যতাজনিত কাজের মাধ্যমে হ্রাস পায় এবং এই অনুযায়ী ঈমানদারগণ বিভিন্ন ধাপে ধাপে বিভক্ত হন।

▶ গুনাহ এবং অবাধ্যতাজনিত কাজ দ্বারা ঈমান হ্রাস পায়, কিন্তু ঈমান ভঙ্গ হয় না। কিন্তু বড় অবিশ্বাস (কুফরে আকবার) ঈমানকে ভেঙ্গে দেয়।

▶ কুফর (অবিশ্বাস) দুই ধরনের: ১) বড় কুফর ২) ছোট কুফর। প্রথমটি যে কাউকে সম্পূর্নরূপে ইসলামের বহির্ভূত করে দেয় এবং কাফের (অবিশ্বাসী) হিসেবে চিহ্নিত করে। দ্বিতীয়টি হল অবাধ্যতামূলক কোন কাজ। যাকে সংকেত প্রদান ও ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে 'কুফুর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'বড় কুফর' ও 'ছোট কুফর' এর মতো একই ভাবে প্রযোজ্য শিরক, নিফাক, যুল্ম এবং ফিস্ক। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যেও বড়-ছোট আছে। বড়গুলো দ্বারা ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় আর ছোটগুলো দ্বারা হয় না।

▶ একজন মুসলিম আল্লাহ্র কোন হুকুমের অমান্য করলে কাফির (অবিশ্বাসী) হয়ে যায় না হোক তা সংখ্যায় বেশী বা কম। যদিও সে এই কাজের জন্য অনুশোচনা না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্তর দ্বারা সে কাজকে বৈধ মনে না করে। একজন ফাসেক, যে গুনাহ ও অসৎ কাজে লিপ্ত সে তার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও– এ অবস্থাতে তাকে কাফির বলা যায় না। যদিও সে তা চালিয়ে যায় এবং তার জন্য অনুশোচনা করে না ও এই অবস্থাতেই সে মারা যায়। তার তাকদীর আল্লাহ্র (সুব:) উপর কিয়ামতের দিন নির্ভর করবে। তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন অথবা জাহান্নামের আগুনে শাস্তিও দিতে পারেন এবং এক পর্যায়ে সেখান হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

▶ যখন ঈমান ও ইসলাম একত্রে উল্লেখ করা হয়, তখন ঈমান বলতে অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করাকে এবং ইসলাম বলতে কাজের দ্বারা সম্পাদন করাকে বুঝানো হয়। আর যখন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয় তখন উভয়টিই একটি অপরটির অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন এক কথায় দ্বীন ইসলামকে বুঝাবে। এ সম্পর্কে একটি আরবী বাক্য প্রসিদ্ধ আছে:

اَلْاِسْلَامُ وَ الْاِيْمَانُ اِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا وَاِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا

অর্থ: "ঈমান ইসলাম যখন ভিন্ন ভিন্ন হয় তখন এক হয় আর যখন এক হয় তখন ভিন্ন হয়।" অর্থাৎ যদি কোন বাক্যে ঈমান ও ইসলাম উভয় শব্দ উল্লেখ থাকে তখন ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হবে। আর যদি কোন বাক্যে শুধু ইসলাম অথবা শুধু ঈমান শব্দ উল্লেখ করা হয় তখন ঈমান বলতে শুধু অন্তরের বিশ্বাস নয় বরং ইসলাম অর্থাৎ আমলসহ বুঝাবে। আবার যদি কোন বাক্যে

শুধু ইসলাম শব্দ উল্লেখ থাকে তখন শুধু আমলকে নয় বরং ঈমান অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস সহ বুঝাবে।

▶ আমরা কাউকে কাফির হিসেবে গননা করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সম্পাদিত কাজটি পরিষ্কারভাবে 'কুফর' বোঝা যায় এবং অবিসম্বাদীত প্রমান তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যাতে করে এটা পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে প্রমানিত হয় যে, সে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বেচ্ছায় কাজটি সম্পাদন করেছে।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ (সুব:) সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, জীবন দানকারী ও জীবন গ্রহণকারী, পুনরুত্থানকারী, উত্তরাধিকারী, সমস্ত ভাল এবং ক্ষতি করার অধিকারী। আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ মানি না। কোন আহবার ও রুহবানকে আল্লাহর পরিবর্তে রব মানি না।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّه أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ (الأنعام/١٦٤)

অর্থ: "তুমি জিজ্ঞাস কর– আমি কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য রবের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তুর রব।" (সুরা আনআম ৬:১৬৪)

▶ তিনি মহিমান্বিত এবং সুউচ্চ, তাঁর কোন সাদৃশ্য, পুত্র, অংশীদার বা প্রতিযোগী নেই। যেমন তিনি ঘোষণা করেছেন:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থ: "বল: তিনিই আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাস)

তার সৃষ্টির মধ্যে কোন কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তার সৃষ্টির কোন কিছুর মত নন। তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্তকাল বিদ্যমান রয়েছেন তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর জাতি (সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট) ও ফে'লী (কর্মমূলক) সিফাতসমূহ সহ। তাঁর জাতি বা সত্তাগত সিফাত সমূহ হায়াত (জীবন), কুদরত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সামা (শ্রবণ), বাছার (দর্শন), ইরাদা (ইচ্ছা) আর তার ফে'লী বা কর্মবাচক সিফাত সমূহের মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টিকরা, রিযিক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা, তৈরী করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত বা বিশেষণ। তিনি তাঁর

গুনাবলী ও নামসমূহ সহ অনাদি-অনন্তরূপে বিদ্যমান। তাঁর নাম ও বিশেষনের মধ্যে কোন নতুনত্ব বা পরিবর্তণ ঘটেনি। তাঁর সকল বিশেষনই মাখলূকদের বা সৃষ্ট প্রাণীদের বিশেষনের বিপরীত বা ব্যতিক্রম। তিনি জানেন তবে তার জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন তবে তার ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। তিনি দেখেন তবে তার দেখা আমাদের দেখার মত নয়। তিনি কথা বলেন তবে তার কথা আমাদের কথার মত নয়। তিনি শুনেন তবে তার শুনা আমাদের শুনার মত নয়।

▶ একমাত্র মহান আল্লাহ্ই ইবাদতের যোগ্য এবং আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, তাঁর বান্দাদের সমস্ত কিছু তাঁর কাছেই সমর্পন করতে হবে। ভয়, আশা, স্মরণ, আবেদন, ভালবাসা ও আত্মসমর্পন, সাহায্য ও আরোগ্য, অনুরোধ, নির্ভরতা, উৎসর্গ, সিজদা এবং ইবাদতের অন্যান্য সকল উপায় তার কাছেই সমর্পণ করতে হবে।

▶ আমরা গাছপালা, পাথর বা কবরের কাছে দয়া ভিক্ষা করি না। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র কাছে তাঁর নামের গুনাবলী ব্যবহার করে, আমাদের সম্পাদিত ভালো কাজ বা জীবিত কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মাধ্যমে সাহায্য চাই। আমরা কবরের চারদিকে মৃতদের নিকট হতে দয়ার আশায় হেটে বেড়াই না, আর না জিন বা মৃত ভালো লোকদের কাছে সাহায্যের জন্য বলি। না আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সিজদা করি। যে কেউই এর যে কোন একটি কাজ সম্পাদন করে, সে সুস্পষ্ট শিরক-এ-আকবার (বড় শিরকে) লিপ্ত হয়।

▶ আমরা আল্লাহ্র পার্শ্বে অন্য কোন ইলাহ্ স্থাপন করি না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন বিধানের কাছে বিচার চাই না, কারণ আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা। সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনিই বিচার করেন, আদেশ দেন, নিষেধ করেন, রায় দেন এবং আইন প্রণয়ন করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী এবং সর্বজান্তা।

▶ যে কেউই আল্লাহ্র আইনের উপর আইন প্রণয়ন করে এবং তাঁর আইন অন্য কারও আইন দ্বারা পরিবর্তন করে সে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যায়। এরকম ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র অংশীদার এবং বিচারকার্যে সমান হিসেবে দাঁড় করায়, এর ফলে সে ইসলামের বাইরে চলে যায়। যদি এই

ব্যক্তি কোন শাসক হয় তবে তার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করতে হবে এবং তাকে পদচ্যুত করতে হবে।

▶ আমরা কোন রকম উপেক্ষা, অর্থ বদলানো বা কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বোঝানো ব্যতীতই আল্লাহ্র সকল নাম ও গুনাবলী যা তিনি কোরআনে বা তাঁর রাসূল (সা:)-এর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন তা সমর্থন করি। আমরা আল্লাহ্র গুনাবলীর মতো কোন জ্ঞানের দাবীও করিনা। কারণ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى/١١]

অর্থ: "কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"(সুরা-শুরা ৩২:১১)

আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে, তাঁর গুনাবলীতে বা তার কোন কাজে সদৃশ কেউ নেই।

▶ আমরা আল্লাহ্র ঐ সমস্ত গুনাবলী সমর্থন করি যা তিনি তাঁর নিজের জন্য ঘোষনা দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা:) স্বীকার করেছেন, যথা: তাঁর ইয়াদুন (হাত) আছে, অজহুন (মুখমন্ডল) আছে, নাফসুন (সত্তা) আছে ইত্যাদি। সবই তার বিশেষন কোনরূপ স্বরূপ, কিরূপ, প্রকৃতি বা কিভাবে তা নির্ণয় ব্যতিরেকে। আমরা এ কথা বলি না, তাঁর হাত অর্থ তাঁর ক্ষমতা বা তাঁর নেয়ামত। এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ বাতিল করে দেয়া। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারিয়্যা ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের রীতিনীতি।

▶ আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহন আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন। আরশের প্রতি তার কোনরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং আরশের উপর স্থীরতা ব্যতিরেকে, তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষক। তিনি যদি আরশের মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে বিশ্ব সৃষ্টি করতে ও পরিচালনা করতে পারতেন না। বরং তিনি মাখলুকের মত পরমুখাপেক্ষী হয়ে যেতেন। আর যদি তার আরশের উপর উপবেশন করার বা স্থীর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে তাহলে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন। কাজেই আল্লাহ এসকল বিষয় থেকে পবিত্র ও অনেক অনেক উর্দ্ধে। এ বিষয়ে ইমাম মালেক (র:) কে আল্লাহর আরশের উপর সমাসীন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি খুবই সুন্দর কথা বলেছেন: "সমাসীন হওয়ার বিষয়টি

জানা, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজানা, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদআত এবং বিশ্বাস করা জরুরী।" সুতরাং আমরাও বলি যেভাবে আমাদের রব বলেছেন: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى "দয়াময় (আল্লাহ্) আরশে সমাসীন।" (সুরা ত্বাহা ২০:৫)

▶ আল্লাহ্ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং যখন ও যেভাবে ইচ্ছা করেন। কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আনন্দিত হন, হাসেন, ভালবাসেন, ঘৃণা করেন, সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং ক্রোধান্বিত হন (যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন)। তাঁর কর্মে তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির সদৃশ নন এবং কিভাবে এসব কর্ম সম্পাদিত হয় তা সব মাখলুকের অজানা।

▶ কুরআন হল আল্লাহ্র তরফ থেকে নাযিলকৃত সত্য কিতাব। যাকে সৃষ্ট বলা যায় না এবং যা কোন দিক দিয়েই মানব জাতির কথোপকথনের সদৃশ নয়। এটি আল্লাহর কালাম যা তাঁর দ্বারা এমনভাবে কথিত যার কোনকিছুই আমাদের জ্ঞাত নয়।

▶ আমরা মালায়েকা (ফেরেশতা), নবী এবং রাসূলদের বিশ্বাস করি।

▶ আমরা রাসূলদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করি এবং ঈমান আনায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। তিনি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, সর্বশেষ নবী এবং সকল ধার্মিক ব্যক্তির নেতা।

▶ আমরা বিশ্বাস করি, সজাগ অবস্থায় এবং সশরীরে মক্কার আল-হারাম মসজিদ হতে তাকে আল-আক্সা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জান্নাত হতে যতটা উচুতে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন ততটা উপরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

▶ আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতীক্ষিত মাহদী (সত্যানুসারী ইমাম) এই পৃথিবীতে শেষ জামানায় রাসূল (সা:) এর উম্মাতের ভেতর হতেই আসবেন।

▶ আমরা কিয়ামতের আলামত বিশ্বাস করি। আদ-দাজ্জাল (মিথ্যা মসীহ) এর আর্বিভাব। চতুর্থ আসমান হতে মরিয়াম পুত্র ঈসা (আ:) এর অবতরন। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, পৃথিবী হতে 'দাব্বাতুল আরদ' বা অদ্ভুত জন্তুর আর্বিভাব এবং কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য আলামত।

▶ আমরা বিশ্বাস করি কবরে দুই ফেরেশতা মুনকার এবং নাকীর কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রত্যেককে তার রব, তার দ্বীন ও এবং তার নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

▶ আমরা মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি, আমরা শেষ বিচারের দিন, আমলনামা পাঠ, মানদন্ড (যার উপর সম্পাদিত কাজ পরিমাপ করা হবে), আস-সীরাত (জাহান্নামের আগুনের উপর স্থাপিত পুল) এবং শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করি।

▶ আমরা পাপীদের জন্য কবরের আজাবে বিশ্বাস করি। আল্লাহ্ আমাদের তা হতে রক্ষা করুন। কবর, হয় জান্নাতের একটি সবুজ বাগান নতুবা জাহান্নামের আগুনের একটি গর্ত সরূপ এবং প্রতিটি বান্দা তাই পায় যার সে উপযুক্ত।

▶ আমরা বিশ্বাস করি সেই সুপারিশের যা রাসূল (সা:) কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের জন্য সংরক্ষণ করেছেন।

▶ আমরা হাউজে কাওসারে বিশ্বাস করি যা আল্লাহ্ (সুব:) রাসূল (সা:) কে সম্মান সরূপ কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন, তাঁর উম্মতের পিপাসা মিটানোর জন্য।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই সত্য। এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কখনও তা অদৃশ্য হবে না।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে সকল জান্নাতবাসী কোন প্রকার পরিবেষ্টন ছাড়া এবং খালি চোখেই তাদের রবের সরাসরি সাক্ষাত পাবে। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন: **(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [القيامة/٢٢،٢٣** "সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সুরা-কিয়ামত ৭৫:২২-২৩)

▶ আমরা আল-ক্বাদার (আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত রায়) এর ভালো ও মন্দে বিশ্বাস করি এবং বলি: **(قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ [النساء/٧٨** "------ তুমি বল: সমস্তই আল্লাহ্‌র নিকট হতে----- ।" (সূরা নিসা ৪:৭৮)

ভালো এবং মন্দ উভয়ই আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত রায়। পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়।

▶ আমরা বিশ্বাস করি মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর দাসদের অবিশ্বাসকারী বা অবাধ্য হতে আদেশ দেন না। এবং তিনি এরকম ব্যক্তিদের উপর সন্তুষ্ট নন। ইরশাদ হচ্ছে: **وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ** "তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না।" (সূরা যুমার ৩৯:৭) এবং যদি তিনি নাস্তিকদের জন্য নাস্তিকতা নির্ধারন করে দেন, তিনিই শুধুমাত্র এর কারণ জানেন: আল্লাহ্‌র তরফ হতে ন্যায় বিচার, বান্দার নিজের আত্মার বিরুদ্ধে কৃত পাপকর্ম এবং তার পূর্বে সম্পাদিত পাপের শাস্তি হিসেবে এটি হতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا [النساء/٧٩)

অর্থ: "তোমার নিকট যে কোন কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ্‌র তরফ হতে এবং তোমার উপর যে অকল্যাণ নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হাতে হয়ে থাকে-- ।" (সুরা নিসা ৪:৭৯) এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তাই হবে এবং যা ইচ্ছা করেন না তা হবে না। এবং আল্লাহ্ তার কোন বান্দার প্রতি কখনো অন্যায় করেন না। ইরশাদ হচ্ছে: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ [النساء/٤٠** "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না----- ।"(সুরা নিসা ৪:৪০)

▶ আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কার্যাদি সৃষ্টি করে থাকেন: **(وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات/٩٦** "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা আমল কর তাও।" (সুরা সাফ্‌ফাত ৩৭:৯৩) এবং বান্দারা নিজেদের কাজ সম্পাদন করে থাকে বাস্তবে, রূপক অর্থে নয়।

▶ আমরা রাসূল (সা:) এর সাহাবাদের ভালোবাসি, আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তারা সকল উম্মাতের শ্রেষ্ঠ উম্মাত। আমরা তাদের জ্ঞানকে স্মরণ করি, তাদের শ্রদ্ধা করি এবং তাদের সাথে মিত্রতা পোষণ করি। আমরা সেসব জিনিষ হতে বিরত থাকি যেসবে তাঁরা অমত পোষণ করেছেন। তাদের প্রতি ভালোবাসা ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান (উৎকৃষ্ট ব্যবহার) এর অংশ। তাদের ঘৃণা করা হল মুনাফেকী এবং অবিশ্বাস।

▶ আমরা সমর্থন করি আবু বকর সিদ্দিক (রা:) কে প্রথম খলিফা হিসেবে, সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট হবার জন্য। এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব এরপর উসমান বিন আফ্‌ফান এবং এরপর আলী বিন আবী তালিবকে (আল্লাহ্‌ তাদের প্রত্যেকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন)। তাঁরা হলেন সত্যের অনুসারী খলিফা এবং ন্যায়পরায়ণ নেতৃবৃন্দ যাদের সম্পর্কে রাসূল (সা:) বলেন: "তোমাদের অবশ্যই আমার সুন্নাতের এবং সত্যের অনুসারী খলীফাগনের সুন্নাত অনুসরন করতে হবে, এটি শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাক।" (আবু দাউদ এবং তিরমিযী- আবু নাযিহ আল-'ইরবাদ বিন সারিয়াহ বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ)

▶ আস-সালাফ-এর উলামাগণ (এই উম্মাতের প্রথম প্রজন্ম এবং যারা তাদের পদানুসরণ করেন) সর্বোত্তম উপায়ে কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে যারা খারাপ কথা বলেন তারা অবশ্যই সঠিক পথে নেই।

(ইমাম তাহাবী রচিত আল আক্বিদাতুত তাহাবিয়্যাহ; শায়খ মাকদিসী রচিত হাযিহী আক্বিদাতুনা ও অন্যান্য আক্বিদার কিতাব হতে সংগৃহীত)

সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কর্তব্য

প্রশ্ন: আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় কি বলেছিলেন?

উত্তর: মানবজাতিকে (অর্থাৎ সর্বপ্রথম মানব আদম ও তাঁর স্ত্রীকে) এ দুনিয়ায় পাঠানোর সময় আদম (আ:) একটু চিন্তায় পরে গেলেন। কেননা যে ইবলিস তাকে এবং তার স্ত্রীকে প্রতারিত করেছে সেও তাদের সঙ্গে দুনিয়ায় অবতারিত হচ্ছে। তার পর আরও ভয়াবহ বিষয় হলো আদম সন্তানদের বয়স হবে ৬০, ৭০ কিংবা ১০০ বছর, পক্ষান্তরে ইবলিসের বয়স হবে কিয়ামত পর্যন্ত। যখনই আদমের সন্তানগণ ইবলিসের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সম্পর্কে সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তারপরই মরে যাবে। অপর দিকে ইবলিস তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিবে। কোন একটি কৌশল কাজে না লাগলে অন্য কৌশলে চেষ্টা করবে। এভাবে কোন আদম সন্তানই তাঁর চক্রান্ত থেকে রক্ষা পাবে না। এ কারণে আদম (আ:) ভীষণভাবে চিন্তায় পরে গেলেন। তখন আল্লাহ (সুব:) আদম (আ:) কে এবং তার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে যা বলেছিলেন তা নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ: "আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অত:পর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত হবে।" (সুরা বাকারা ২:৩৮)

আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মানবজাতির নিকট পাঠাবেন হিদায়াত, আর যারা সে হিদায়াতের অনুসরন করবে তাদের কোন চিন্তা থাকবে না বরং তারা সফলকামদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

প্রশ্ন: আল্লাহ (সুব:) কি সেই প্রতিশ্রুত হেদায়াতনামা পাঠিয়েছেন?

উত্তর: হ্যাঁ! অবশ্যই পাঠিয়েছেন। আর তা হলো 'আল কুরআনুল কারীম'। এ কারণেই পবিত্র কুরআনের শুরুতে বলা হয়েছে।

{ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة : ٢]

অর্থ: "এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।" (সুরা বাকারা ২:২)

প্রশ্ন: আমাদের কি এমনি এমনি কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে?

উত্তর: না! আল্লাহ্‌ (সুব:) এমনি এমনিই কোন উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদেরকে সৃষ্টি করেননি, বরং আমাদের সৃষ্টির পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌ (সুব:) বলেন:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

অর্থ: "তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?" (সুরা মু'মিনুন ২৩:১১৫)

প্রশ্ন: আল্লাহ (সুব:) আমাদের কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) আমাদেরকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত ও দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ (সুব:) বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ: “আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য” । (সুরা যারিয়াত ৫১:৫৬)

আয়াতের لِيَعْبُدُون (লি'য়াবুদু-ন) এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন ‘লিয়ুওয়াহ্হিদুন’ অর্থাৎ আমার (আল্লাহর) একত্বকে মেনে নেয়ার জন্যই আমি তাদের সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তাওহীদকে মেনে নিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এককভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই আল্লাহ (সুবः) মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।

মানুষ ও জ্বীন জাতির বিভ্রান্ত অংশটি ব্যাতিত সৃষ্টিলোকে কোথাও তাওহীদ ও একত্ববাদ ছাড়া শিরক, পৌত্বলীকতা ও অংশিবাদের কোনই অস্তিত্ত নেই। সর্বত্রই চলছে এক সত্য মাবুদের ইবাদত, দাসত্ব ও আনুগত্য। আল্লাহ (সুবः) বলেনঃ

{ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم :٩٣]

অর্থ: “আকাশ মন্ডলি ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দারূপে।” (সুরা মারইয়াম ৯৩)

জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষই একত্ববাদী। প্রত্যেকেই তার হৃদয়ের গভীরে মহান স্রষ্টার পরিচয় ও ভালবাসা বহন করে। একজন তাওহীদ বাদী শিল্পী বলেন:

আল্লাহ আমার রব, এই রবই আমার সব
দমে দমে, তনু মনে তারই অনুভব

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانه أَوْ يُنَصِّرَانه أَوْ يُمَجِّسَانه كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ }

অর্থ: “প্রতিটি শিশুই আল্লাহর পরিচয়, একত্ববাদ ও ভালবাসার উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায় অথবা খৃষ্টান বানায় অথবা অগ্নীপূজক বানায়। যেমনিভাবে একটি পশু একটি পরিপূর্ণ বাচ্চা প্রসব করে, যার মধ্যে কোন দোষ ও অপূর্ণতা থাকে না। তোমরা কি

সেগুলোর মধ্যে কোন কান কাটা নবজাত বাচ্চা দেখেছো? অতপর রাসূলুল্লাহ (সা:) কোরানের আয়াতটি আবৃত্তি করেন: { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ অর্থ: “এটাই (একত্ববাদী দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা) আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তণ নেই। এটাই সরল দ্বীন।” (সুরা রূম ৩০:৩০) (সহীহ বুখারী ৪৭৭৫; সহীহ মুসলিম ৬৯২৬; মুসনাদে আহমদ ১২৪৯৯)

প্রকৃত অর্থে একটি শিশু শাবক নিখুঁত ও পরিপূর্ণ দুটো কান সহ সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু মানুষ কান কেটে তাকে বিশ্রী ও ত্রুটি যুক্ত করে ফেলে। এভাবে একটি মানব শিশু আল্লাহর পরিচয়, ভালবাসা ও একত্ববাদী চেতনা নিয়ে জন্ম লাভ করার পর পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব ও পীর-ফকীর কর্তৃক বিভ্রান্ত হয়ে শিরক, অংশীবাদ ও অগ্নীপূজায় লিপ্ত হয় এবং কান কাটা পশু শাবকের মতই অসুন্দর, বিকৃত ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে সে হারিয়ে ফেলে মহান স্রষ্টার প্রকৃত পরিচয়।

স্বভাবগত ভাবেই প্রতিটি মানুষ একত্ববাদী চেতনাসহ আল্লাহর ইবাদত করার মনোবৃত্তি নিয়েই দুনিয়ায় আগমন করে। ইবাদত ও দাসত্বতার প্রকৃতিগত বিষয়ে সে কোন না কোন সত্ত্বার দাসত্ব করবেই। এজন্যই একমাত্র মাবুদের পরিচয় হারিয়ে ফেললে শত-সহস্র কৃত্রিম অসত্য মাবুদের ইবাদত করে সে তার প্রকৃতিগত দাসত্ব-প্রবৃত্তির উপশম করতে প্রয়াস পায়। সে নিজ হাতেই বানিয়ে নেয় নিজের মাবুদ। এ পথহারা মানুষকে প্রকৃত সত্য মাবুদের দিশা দেওয়ার জন্যই যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন নবী ও রাসূলগণ। তারা স্মরণ করিয়ে দেন সেই পরম প্রিয় জনের পরিচয়। যার স্মরণ ব্যতিত মানব হৃদয় কোন কিছুতেই শান্তি পেতে পারে না। আল্লাহ (সুবः) বলেন:

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد :٢٨]

অর্থ: “যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয় (তারাই প্রকৃত মুমিন)। জেনে রাখ! আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” (সুরা র'দ ১৩:২৮)

যিকির বা স্মরণ শব্দটি তখনই ব্যবহৃত হয় যখন পূর্ব পরিচিত কোন জিনিষ ভূলে যাওয়ার পর পূনরায় হৃদয়ে আলোচিত হয়। যার সাথে আগে পরিচয় ছিল না তার আলোচনাকে কোন ভাষাতেই যিকির বা স্মরণ বলা হয় না। এজন্যই আল্লাহ (সুব:) তার আলোচনাকে অর্থাৎ কুরআনকে ذِكْرٌ (যিকির) (সুরা হিজর ১৫:৯), تَـــذْكِرَةٌ (তাযকেরা) (সূরা আবাসা ৮০:১১), ذِكْـــرَي (যিকরা) (সূরা আনআম ৬:৯০) তথা স্মরণিকা নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা:) কে নাম দিয়েছেন مُـــذَكِّرٌ (মুযাক্কির) (সূরা গাশিয়া ৮৮:২১) তথা স্মরণদাতা, যিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত, সুন্দর উদ্ভিদ জগৎ এসব কিছুকেও কুরআনে যিকরা বা স্মরণিকা বলা হয়েছে। এসবই হৃদয়ের কাছে পূর্ব পরিচিত দয়াময় স্রষ্টা আল্লাহ (সুব:) কে স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহর সৃষ্ট মহা বিশ্ব এবং বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র কণিকা থেকে শুরু করে সুবিশাল গ্যালাক্সি সবই এক স্রষ্টা ও শিল্পীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য ও সুস্পষ্ট প্রমান বহন করে। কিন্তু সেই স্রষ্টা কে? তার নাম কি? কিইবা তার পরিচয়? তিনি কি একক সত্তা? এসবতো আর আকাশ মাটি ও সৃষ্টিজগত আমাদেরকে জানাতে পারে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِـــي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ

অর্থ: "হুযাইফা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, নিশ্চয়্ই আমানত তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান, তার পরিচয়, তাওহীদ ও ভালবাসা মানুষের মর্মমূলে বা অন্তরের মনিকোঠায় নাযিল হয়েছে। তারপর তারা তা জানতে পেরেছে কুরআন থেকে। অত:পর জানতে পেরেছে সুন্নাহ থেকে।" (সহীহ বুখারী ৬৪৯৭; সহীহ মুসলিম ৩৮৪)

বস্তুত: আল্লাহর সাথে সৃষ্টিগত, স্বভাবগত, হৃদয়গত এই পূর্ব পরিচয়টি না থাকলে কুরআন, সুন্নাহ ও সৃষ্টিকুল কোন কিছু দিয়েই সেই মহান শিল্পী রাব্বুল আলামিনের একক সত্ত্বার সুনিপূণ পরিচয় পাওয়া যেত না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: "যে চিরন্তন সত্যটি মানুষ দলীল প্রমান দিয়ে জানতে চায় তার সম্পর্কে হৃদয়ে পূর্ব অনুভূতি ও পরিচয় থাকার ফলেই সে তাকে অথবা তার কিছু অবস্থা জানতে দলীলে অন্বেষণ করে। কিন্তু হৃদয়

যাকে পূর্ব থেকে অনুভবই করতে পারে না তাকে জানার স্পৃহা কিছুতেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না।" (কিতাবুত তাওহীদ লি ইবনে তাইমিয়া)

মহান স্রষ্টা ও সুনিপূণ শিল্পী আল্লাহর সাথে মানব হৃদয়ের এই গভীর পরিচিতি মহাকালের অতীত কোন ক্ষনে তাদের থেকে নেয়া তার রূবুবিয়্যাতের সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি কুরআন-সুন্নাহ ও সৃষ্টি জগতের অকাট্য দলীল দ্বারা তার পরিচয় একত্ববাদ ও ভালবাসার স্মৃতিচারন সবই এক দূর্লঙ্ঘ্য পরমপরায় শক্তভাবে গাঁথা। প্রথম পরিচয়টি না থাকলে পরবর্তী পরিচয়গুলো হতো নিষ্ফল। পরবর্তী পরিচয় গুলো প্রথম পরিচয়ের সর্মথন, নবায়ন ও স্মৃতিচারন মাত্র।

মায়ের কোলে থেকে থেকে শিশু যখন তার মাকে ভালভাবে চিনে নেয় তখন আড়ালে থেকে মা তার শিশুকে ডাকলে পূর্ব পরিচয়ের ফলেই অনায়াসে শিশু বুঝে নেয় এই যে আমার মা। পূর্ব পরিচয়টি না থাকলে শিশুটি কিছুতেই বুঝতো না এই আওয়াজ তার মায়ের। প্রতিটি মানবের হৃদয় মূলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের অতীত এমনই এক পরিচয়, প্রীতি ও একত্বের তুলনাহীন বন্ধন রয়েছে তার দয়াময় স্রষ্টার সাথে যে, প্রকৃতিগতভাবে হৃদয় আর কাউকে ভালবাসে না। কম্পাসের কাঁটার মতই সে সর্বদা একমুখী।

সুরা রা'দের ২৮তম আয়াতের অলৌকিক শব্দ বিন্যাস দ্বারা বুঝা যায় মানবাত্মাকে আল্লাহ ব্যতীত আর যে দিকেই নেয়া হোক না কেন সে সেখানে থেকে দিক পরিবর্তণ করবেই। আয়াতটির শব্দ বিন্যাস নিম্নরূপ: ذِكْرُ اللهِ আল্লাহর স্মরণ, تَطْمَئِنُّ স্থীর হয়ে যায়, اَلْقُلُــوْبُ সদা বিচরণশীল, পার্শ্ব পরিবর্তণকারী অন্তর। অর্থাৎ মানবাত্মা আল্লাহর প্রণয়, প্রীতি ও স্মরণ না পেলে অস্থিরতা হেতু পার্শ্ব পরিবর্তণ করতে থাকে। আর যখনই প্রণয়, প্রীতি হেতু স্মরণরূপ শারাবান ত্বাহুর পেয়ে যায় তখনই সে অস্থিরতা ও দিক পরিবর্তণ ত্যাগ করে মুতমাইন ও সুস্থির হয়ে যায়।

শিশুকালে পৃথিবীর পরিবেশজনিত কারণে অন্তর বাঁধা থাকে মায়ের সাথে, কৈশর ও যৌবনের প্রথম পর্বে বাঁধা থাকে খেলার সঙ্গিদের সাথে, পরিণত বয়সে বাঁধা থাকে জীবন সঙ্গীর সাথে, পৌঢ়কালে বাঁধা থাকে সন্তান-সন্ততির সাথে, বৃদ্ধ বয়সে বাঁধা থাকে নাতী-নাতনীর সাথে। একের পর এক এভাবেই এক সময়ের প্রীতিভাজন কে ত্যাগ করে আরেক প্রীতি

ভাজনের দিকে দিক পরিবর্তণ করতে থাকে। তার পর আসে জীবনের অন্তিম শায়াহ্ন বা একাকী শয্যায় পরে থাকার পর্ব। যেখানে কবির ভাষায়:

নয়ন ভরিয়া আছে আঁখি জল, মুছাবার কেহ নাই
হৃদয় ভরিয়া কথার কাকুলি শোনাবার কেহ নাই

তারপর এই অসহায়ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে পৃথিবীর সব প্রীয়জনকে চিরদিনের জন্য চিরবিদায় দেয়ার মাধ্যমে। তখন কেহই আর জীবনের সঙ্গী হয়ে সাথে যায় না। অতএব মানবাত্মাকে তার পরমাত্মীয় চিরস্থায়ী বন্ধু মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে বেঁধে দেওয়াই হচ্ছে অসহায়ত্ব, একাকিত্ব, চির সঙ্গীহিনতা ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার উপায়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে:

{فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [يوسف :١٠١]

অর্থ: "আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আপনি আমার পরম বন্ধু ইহকালের ও পরকালের।" (সুরা ইউসুফ ১২:১০১)

এভাবেই একমাত্র পরম আত্মীয়, চিরস্থায়ী বন্ধু, মহান আল্লাহ (সুব:) কে চিনে তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জণ পূর্বক জান্নাত লাভ করা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার মহা সাফল্য অর্জন করাই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: ইবাদাতের সংজ্ঞা কি?

উত্তর: ইবাদতের আভিধানিক অর্থ: অনুগত হওয়া, নত হওয়া, অনুসরণ করা। পারিভাষিক অর্থ: ঐ সকল কাজ যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও খুশি হন। প্রকাশ্যে করা হোক কিংবা গোপনে, কথায় কিংবা কাজে। অন্যভাবে বলতে গেলে ইবাদত হচ্ছে ঐ বিশ্বাস, অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের কর্ম যা আল্লাহ্ (সুব:) ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। ইহা ছাড়া কোন কিছু সম্পাদন করা বা বর্জন করা যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করায় তাও ইবাদাত। অর্থাৎ ইবাদত মানে হলো: غَايَةُ الذُّلِّ بِغَايَـــةِ الْحُـــبِّ 'ভালবাসা ও বিনয়ের চূড়ান্ত পর্যায়। যেখানে পৌঁছে বান্দা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য প্রতিযোগী, তার করুণা প্রত্যাশী ও তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ (لزمر : ٩)

অর্থ: "যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে...।" (সুরা যুমার ৩৯:৯)

ইবাদাত বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে।

১. আন্তরিক ইবাদাত: যেমন- ঈমানের ছয়টি রুক্ন, ভয়, আশা, ভরসা, আগ্রহ ও ভীতি ইত্যাদি।

২. প্রকাশ্য ইবাদাত: যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ।

প্রশ্ন: কিভাবে একটি কাজ ইবাদতে পরিণত হয়?

উত্তর: যদি দু'টি বিষয় উপস্থিত থাকে তবেই কোন কাজ ইবাদতে পরিণত হয়:

প্রথম: আল্লাহকে পূর্ণ ভালবাসা। যে ভিত্তির উপর ইসলামের ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো আল্লাহর মুহাব্বত। যে ইবাদতে আল্লাহর মুহাব্বত নেই সেই ইবাদতের যেন অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ الـــسَّبِيلِ وَالـــسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ...

অর্থ: "আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য.......আর তারাই হলো মুত্তাকী। (সুরা বাকারা ২:১৭৭)

আল্লাহকে ভালবাসার পথ হচ্ছে তাঁর রাসুলের অনুসরণ করা। যে কোন ইবাদত রাসুল (সা:) এর অনুসরনে করা। এজন্য আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّـــهُ غَفُـــورٌ رَحِيمٌ [آل عمران/٣١)

অর্থ: "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। যাতে আল্লাহ ও তোমাদেরকে ভালবাসেন।" (সুরা আল ইমরান ৩:৩১)

দ্বিতীয়: আল্লাহর নিকট পূর্ণ বিনয়-নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ করা, আশা ও ভয়ের সাথে ইবাদত করা, পূর্ণ বশ্যতা, বিনয়-নম্রতা, আশা-আকাঙ্খা ও

ভয়-ভীতির সাথে পূর্ণ ভালবাসাকে ইবাদত বলা হয়। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [الأعراف/٥٥)

অর্থ: "তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা-অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সুরা আ'রাফ ৭:৫৫) আল্লাহ (সুব:) আরো বলেন:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থ: "যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (সুরা কাহাফ ১৮:১১০) অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (المؤمنون: ٥٧ – ٦١)

অর্থ: "নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করেনা। এবং যারা যা দান করবার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে যে তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারাই দ্রুত কল্যাণ অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী।" (সুরা মু'মিন ২৩:৫৭-৫৯)

প্রশ্ন: ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কয়টি শর্ত ও কি কি?

উত্তর: ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। তা হচ্ছে-

প্রথম শর্ত: ঈমান।

দ্বিতীয় শর্ত: ইখলাস। ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা এবং তার সাথে শির্ক না করা।

তৃতীয় শর্ত: ইত্তিবাউস সুন্নাহ। রাসূল (সা:) যে শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরনে ইবাদত করা।

প্রথম শর্ত: ঈমান ব্যতিত কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। একারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমানকে শর্ত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل : ٩٧)

অর্থ: "যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।" (সুরা নহল ১৬:৯৭)

অপর আয়াতে ঈমান বিহীন আমল বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة : ٥)

অর্থ: "আর যে ঈমান আনার পর কুফরী করবে, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (সুরা মায়েদা ৫:৫) আরেকটি আয়াতে ঈমান বিহীন আমলকে মরুভূমির মরীচিকা ও প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

অর্থ: "যারা কাফের, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সমতুল্য, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। কিন্তু সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অত:পর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের আমলসমূহ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।" (সুরা নূর ২৪:৩৯-৪০)

দ্বিতীয় শর্ত: সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা ও গাইরুল্লাহ থেকে নিয়তকে পবিত্র করে ইবাদতটুকু শুধু আল্লাহকে নিবেদন করা এবং তারই সামনে বিনয় প্রকাশ করা। যাতে সমস্ত ইবাদত আল্লাহরই জন্য সাব্যস্ত হয়ে যায়। তার সাথে কোন শরীক না থাকে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الزمر/٢)

অর্থ: "অতএব আল্লাহর 'ইবাদাত কর তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।" (সুরা যুমার ৩৯:২)

তিনি আরো বলেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (البينة/٥)

অর্থ: "আর তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে (শির্‌কমুক্ত থেকে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে।" (সূরা বাইয়্যেনাহ ৯৮:৫)

তৃতীয় শর্ত: ইত্তিবাউস সুন্নাহ। রাসূল (সা:) যে, শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরনে ইবাদত করা।

এর অর্থ নবী (সা:) যে কাজ যে ভাবে করেছেন সে কাজ সেই নিয়মে করা, কোন প্রকার কম বেশী না করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরিকা বাদ দিয়ে অন্য কারো তরিকায় না করা। কেননা আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّـــهُ غَفُــورٌ رَحِيمٌ (آل عمران/٣١)

অর্থ: বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন, আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (সুরা আল ইমরান ৩:৩১)

আল্লাহ (সুব:) আরো বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر/٧)

অর্থ: "আর রাসূলুল্লাহ (সা:) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাক। (সুরা হাশর ৫৯:৭)

নবী করীম (সা:) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ: "আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, কেউ যদি এমন কাজ করে যা আমাদের এই দ্বীনে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যান হবে।" (সহীহ বুখারী ২৬৯৭)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

অর্থ: "আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে অস্বীকার করবে। সাহাবায়ে কিরামগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! কে অস্বীকার করে? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, যে আমার (তরিকার) অনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার (তরিকার) অনুগত্য না করে অবাধ্য হবে সেই অস্বীকারকারী।" (সহীহ বুখারী ৭২৮০)

প্রশ্ন: ইবাদতে ইহসান কি?

উত্তর: ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন, এরূপ না হলে অন্তত এরূপ মনে করা যে তিনি আপনাকে দেখছেন।

উমার বিন খাত্তাব (রা:) থেকে বর্নিত হাদীসে জিবরাঈলে বলা হয়েছে: ....এরপর আগন্তুক বললেন: আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। উত্তরে নবী (সা:) বললেন: যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি "আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ" একথা মনে মনে চিন্তা করবে, আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন একথা মনে মনে ভাববে।" (সহীহ মুসলিম ১০২; সহীহ বুখারী ৫০; সুনানে আবু দাউদ ৪৬৯৭)

প্রশ্ন: আল্লাহর নির্দেশিত ইবাদতের প্রকার সমূহ কি কি?

উত্তর: ইবাদতের প্রকার সমূহ যা আল্লাহ (সুব:) নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে:

(ক) اَلْاِسْــلَامُ (আল ইসলাম) আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা (পঞ্চওবেনা সহ)।

(খ) اَلْاِيْمَانُ (আল ঈমান) বিশ্বাস স্থাপন করা (ছয় রুকন সহ)।

(গ) اَلْاِحْــسَانُ (আল ইহসান) নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপকার সাধন করা।

(ঘ) اَلدُّعَاءُ (আদ দু'আ) প্রার্থনা, আহবান করা।

(ঙ) اَلْخَوْفُ (আল খাওফ) আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা।

(চ) اَلرَّجَاءُ (আর রাজা) আল্লাহর পুরষ্কারের আশা করা।

(ছ) اَلتَّوَكُّــلُ (আত তাওয়াক্কুল) আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া ও ভরসা করা।

(জ) اَلرَّغْبَةُ (আর রাগ্‌বাহ) অনুরাগ, আগ্রহ।

(ঝ) اَلرَّهْبَةُ (আর রাহ্‌বাহ) ভয়-ভীতি।

(ঙ) اَلْخُشُوْعُ (আল খূশূ) বিনয়-নম্রতা।

(ট) اَلْخَشْيَةُ (আল খাশিয়াহ) অমংগলের আশংকা।

(ঠ) اَلْاِنَابَــةُ (আল ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা।

(ড) اَلْاِسْتِعَانَةُ (আল ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা।

(ঢ) اَلْاِسْتِعَاذَةُ (আল ইস্তেআযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা।

(ণ) اَلْاِسْــتِغَاثَةُ (আল ইস্তেগাসাহ) নিরুপায় ব্যক্তির বিপদ উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা।

(ত) اَلذَّبْحُ (আয যাবাহ) আত্মত্যাগ বা কুরবানী করা।

(থ) اَلنَّذْرُ (আন্‌ নযর) মান্নত করা।

এগুলি এবং অন্যান্য যে পদ্ধতি সমূহের আদেশ ও নির্দেশ আল্লাহ (সুব:) দিয়েছেন সবকিছুই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে, ফলত: কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোন একটি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য সম্পাদনা করে তবে সে মুশরিক ও কাফের রূপে পরিগণিত হবে।

উপরোক্ত ইবাদতগুলোর দলীল-প্রমানসহ বিস্তারিত বর্ণনা:

اَلْاِسْلَامُ (আল ইসলাম): হাদীসে জিবরাঈলে ইরশাদ হয়েছে:

الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُــؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

অর্থ: "ইসলাম হচ্ছে: ১) "সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ (ইলাহ) নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল। ২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ৩) যাকাত প্রদান করা। ৪) রমযানমাসে সিয়াম পালন করা এবং ৫) হজ্জ; পথের সম্বল হলে আল্লাহর ঘর (কাবা শরীফ) যিয়ারত করা।

اَلْاِيْمَــانُ (আল ঈমান) বিশ্বাস স্থাপন করা: হাদীসে জিবরাঈলে ইরশাদ হয়েছে:

الإِيمَانِ. قَالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَــدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

অর্থ: "ঈমান হচ্ছে: আল্লাহ, ফিরিশতাকুল, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।"

اَلْاِحْــسَانُ (আল ইহসান) নিষ্ঠার সাথে কাজ করা: হাদীসে জিবরাঈলে ইরশাদ হয়েছে:

الإِحْسَانِ. قَالَ « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

অর্থ: "যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি "আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ" আর যদি নাও দেখ তাহলে মনে করবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।"

اَلدُّعَاءُ (আদ দু'আ) :কেবলমাত্র তাঁর নিকটেই চাইতে হবে, অন্যের কাছে নয়। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَــادَتِي سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (مومن/٦٠)

অর্থ: "আর তোমাদের রব বলেন: তোমরা সকলে আমাকেই একক ভাবে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব, যারা অহমিকার বশে আমার বন্দেগী করা অস্বীকার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।" (সুরা মু'মিন ৪০:৬০)

اَلْخَوْفُ (আল খাওফ) ভয়: এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران/١٧٥)

অর্থ: "অত:পর তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন বা বিশ্বাসী হয়ে থাক।" (সুরা আল ইমরান ৩:১৭৫)

اَلرَّجَاءُ (আর রাজা) আশা: এর দলীল হিসেবে কুরআনের ঘোষণা:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থ: "অতএব যে ব্যক্তি রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্খা করে, সে যেন সৎ কর্মগুলো নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতে থাকে। আর নিজ রবের ইবাদতে অপর কাউকে শরীক না করে।" (সুরা কাহাফ ৫০:১১০)

اَلتَّوَكُّلُ (আত তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা : এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষণা: فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর কর, যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষে মু'মিন হও।" (সুরা মায়িদাহ ৫:২৩) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران : ١٥٩)

অর্থ: "অত:পর যখন সংকল্প করবেন তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সুরা আল ইমরান ৩:১৫৭) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার জন্য তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।" (সুরা তালাক ৬৫:৩)

اَلرَّغْبَةُ (আর রাগ্‌বাহ) আগ্রহ ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয়:

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই এরা সৎকর্মে ত্বরিত ও সদা তৎপর ছিল। আর আশা ও ভয় সহকারে আমাকে আহবান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয়-নম্র।" (সুরা আম্বিয়া ২১:৯০)

اَلْخَشْيَةُ (আল খাশিয়াহ) অমঙ্গলের আশংকা:

এ ব্যাপারে কুরআন থেকে প্রমাণ:

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [البقرة/١٥٠)

অর্থ: "কখনই তাদের ভয় করবেনা, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল। যাতে করে তোমাদের প্রতি আমার নে'য়ামত সর্বতোভাবে পূর্ণ করে দিতে পারি, আর যাতে তোমরা (লক্ষ্যে পৌঁছার) সঠিকপথে পরিচালিত হতে পার।" (সুরা বাকারা ২:১৫০)

اَلْاِنَابَةُ (আল ইনাবাহ) নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনা:

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

অর্থ: "আর তোমরা সকলে স্বীয় রবের পানে ফিরে এসো তোমাদের উপর আযাব সমাগত হবার পূর্বেই এবং তাঁর নিকট পরিপূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ কর, কেননা (আযাব আসার) পর তোমরা আর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (সুরা যুমার ৩৯:৫৪)

اَلْاِسْتِعَانَةُ (আল ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা:

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة : ٤٥]

অর্থ: "আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।" (সূরা বাকারা ২:৪৫) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (غافر: ٦٠)

অর্থ: "আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশত: আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সুরা মুমিন/গাফের ২৩:৬০)

যেহেতু আল্লাহ (সুব:) তার কাছে সাহায্য প্রার্থণা করতে বলেছেন এ কারণেই আমরা প্রতি সালাতের প্রতি রাকাআতে সূরায়ে ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থণা করি: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة/٥) "(হে আমাদের রব) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সুরা আল-ফাতেহা ১:৫)

হাদীসে বলা হয়েছে: وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ "যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্র ভাবে) চাইবে।" (সুনানে তিরমিজি ২৫১৬; মুসনাদে আহমদ ২৬৬৯)

<u>**اَلْاِسْتِعَاذَةُ (আল ইস্তেআযা) আশ্রয় কামনা করা:**</u>

এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা হয়েছে:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ(٢) "বল, আমি বিশ্বমানবের প্রতিপালকের নিকট ও মানব মন্ডলীর অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সুরা নাস ১১৪:১,২)

<u>**اَلْاِسْتِغَاثَةُ (আল ইস্তেগাসাহ) বিপন্ন ব্যক্তির আশ্রয় কামনা:**</u>

এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণা:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

অর্থ: "আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা (বিপন্ন অবস্থায় ছিলে) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে, তখন তিনিই তোমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন (উহা কবুল করলেন)।" (সুরা আনফাল ৮:৯)

<u>**اَلذَّبْحُ (আয যাবাহ) আত্মত্যাগ ও কুরবাণী:**</u>

এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الأنعام/١٦٢، ١٦٣)

অর্থ: "হে রাসূল! বলে দাও: আমার সালাত (নামায), আমার কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মরণ উৎসর্গকৃত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য, তাঁর কোনই শরীক নেই এবং আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি আর মুসলিমদের (আত্মসমর্পনকারীদের) মধ্যে আমিই প্রথম (অগ্রণী)। (সুরা আন'আম ৬:১৬২-১৬৩)

<u>**اَلنَّذْرُ (আন্ নযর) মান্নত:**</u> পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (الإنسان/٧)

অর্থ: "তারা অংগীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে চলে, যেদিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী ।" (সুরা দাহার/ইনসান ৭৬:৭)

প্রশ্ন: আল্লাহর ইবাদত কিভাবে করতে হবে?

উত্তর: আল্লাহর ইবাদত করতে হবে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ত্বরীকা অনুযায়ী। এ সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣)

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।" (সুরা মুহাম্মদ ৪৭:৩৩)

আল্লাহর আনুগত্য না করলে হবে শির্ক, আর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আনুগত্য না করলে হবে বিদ'আত। শির্ক ও বিদ'আতযুক্ত ইবাদত আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন: ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি আল্লাহর হক্ব (অধিকার) কি?

উত্তর: ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি আল্লাহর হক্ব বা অধিকার হচ্ছে কোন প্রকার শিরক না করে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا مُعَاذُ أَتَدْرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ». قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَلاَ يُشْرَكَ بِــهِ شَىْءٌ

অর্থ: "মুআজ বিন জাবাল (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে বললেন, হে মুআজ! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর পাওনা কি হক্ রয়েছে? মুআজ (রা:) উত্তর দিলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্ব (অধিকার) হচ্ছে তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না।" (সহীহ মুসলিম ১৫৪)

প্রশ্ন: প্রত্যেক মানুষের উপর কোন চারটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা ফরজ?

উত্তর: যে চারটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা প্রতিটি মানুষের উপর ফরজ তা হলো নিম্নরূপ:

(এক) اَلْعِلْــمُ জ্ঞান: এমন জ্ঞান যার সাহায্যে দলীল প্রমাণ সহ আল্লাহ, তাঁর নবী এবং দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন: **{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}** "তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৯) এ আয়াতে প্রথমেই জানতে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে 'বাসীরাহ' অর্জণ করতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف : ١٠٨]

অর্থ: "বল, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও।" (সুরা ইউসূফ ১২:১০৮)

(দুই) اَلْعَمَلُ ঐ জ্ঞানের বাস্তব রুপায়ণ।

(তিন) اَلدَّعْوَةُ তার দিকে (মানুষকে) আহবান করা।

(চার) اَلــصَّبْرُ এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ করা। উপরোক্ত কথার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থ: "আবহমান কালের শপথ! সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু (শুধুমাত্র তারা ছাড়া) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজগুলি সম্পাদন করেছে, আর যারা পরস্পরকে সত্য-নিষ্ঠা ও ধৈর্য ধারণের (নিরন্তর) উপদেশ দিয়ে থাকে।" (সুরা আসর ১০৩)

প্রশ্ন: কোন তিনটি মৌলনীতি সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের জানা ওয়াজিব?

উত্তর: বিষয় তিনটি হল:

১) مَــنْ رَبُّــكَ তোমার রব কে? প্রত্যেক মানুষকে তার রব (প্রতিপালক) সম্পর্কে জানা।

২) وَمَا دِيْنُكَ তোমার দ্বীন কি? তাঁর দ্বীন বা জীবন বিধান সম্পর্কে জানা।

৩) وَمَــنْ نَبِيُّــكَ তোমার নবী কে? তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে জানা। (সালাসাতুল উসুল ওয়া আদিল্লাতুহা)

প্রশ্ন: বান্দার প্রতি সর্বপ্রথম ওয়াজিব কি?

উত্তর: আদম সন্তানের ওপর আল্লাহ (সুব:) সর্বপ্রথম যে কাজটি ফরজ করেছেন তা হচ্ছে, ত্বাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: "আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে এ মর্মে রাসুল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর ত্বাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।" (সূরা নাহল ১৬:৩৬)

এ আয়াতে বর্ণিত দুটি কাজ যে করবে সে মূলত: আল্লাহর শক্ত রজ্জুকে ধারণ করলো যা তাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবে। মাঝপথে ছিড়ে যাবে না। এ প্রসঙ্গে অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة/٢٥٦)

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়"। (সূরা বাকারা ২:২৫৬)

প্রশ্ন: মানুষ মূলতঃ কয় ভাগে বিভক্ত? তাদের মাঝে শত্রুতার শুরু হয় কিভাবে?

উত্তর: মানুষ মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত। মু'মিন ও কাফির। আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ

অর্থ: "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফের এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মু'মিন।" (সুরা তাগাবুন ৬৪:২)

মু'মিন ও কাফিরের এই পৃথকীকরণের মাধ্যমেই তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেন:

إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا [النساء/١٠١)

অর্থ: "নিশ্চয়ই কাফেরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সুরা নিসা ৪:১০১)

আল্লাহ (সুবঃ) আরো বলেন:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

অর্থ: "আমি এভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম অপরাধীদের মধ্য থেকে।" (সুরা ফুরকান ২৫:৩১)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ

অর্থ: "আমি অবশ্যই সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম এই আদেশসহ: 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর'। কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো।" (সুরা নামল ২৭:৪৫)

ইসলাম

ইসলাম, মুসলিম ও আরকানে ইসলাম

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ
জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থ: "তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর : তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎ পথ পেতে পার।"

সূরা আল ইমরান ৩:১০৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইসলাম

প্রশ্নঃ 'ইসলাম' কি?

উত্তরঃ 'ইসলাম' একটি আরবী শব্দ। ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পন করা। ইসলাম মানে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিজেকে সঁপে দেয়া এবং পরিপূর্ণ তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়া, সকল প্রকার শির্ক ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা। ইসলামিক পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ঐ দ্বীনের নাম, যা মুহাম্মদ (সাঃ) মাধ্যমে পূর্নতা লাভ করেছে ।

মূলতঃ 'ইসলাম' শব্দটি 'ইসতিসলাম' অর্থে ব্যবহার হয়। যার অর্থ, আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পন করা, আত্মসমর্পনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা এবং রাসুল (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরন করা এবং শিরক থেকে পবিত্র হওয়া এবং যারা শির্ক করে তাদের থেকে মুক্ত হওয়া। (আদ দুরারুস সানিয়্যাহ ১/১২৯)

প্রশ্নঃ মুসলিম কে?

উত্তরঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দ্বীনে হক্ব ও পরিপূর্ন দ্বীন হচ্ছে 'ইসলাম'। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণ করার মাধ্যমে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়, আত্মসমর্পণ করে, আনুগত্য করে, এককভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করে, সমস্ত শিরক থেকে মুক্ত হয়, শিরকের লোকদের থেকে মুক্ত হয় এবং তার জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মেনে নেয় সেই মুসলিম।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'সুতরাং ইসলাম মানে- একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পন করা, তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে নয়। শুধু তাঁরই ইবাদত করা, কাউকে তাঁর শরীক না করে। তাঁর প্রতি নিজেকে পূর্ণ সঁপে দেয়া, তাঁর কাছেই আশা করা এবং তাঁকেই একমাত্র ভয় করা। তাঁকেই ভালবাসা যথার্থ এবং পরিপূর্ণ ভালবাসা, সৃষ্টির কাউকেই এমন ভাল না বাসা। সুতরাং যে অপছন্দ করে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে সে মুসলিম নয় এবং যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে বা আল্লাহর ইবাদত করার পাশাপাশি অন্যের ইবাদত করে সেও মুসলিম নয়।" (কিতাবুন নুবুওয়্যাত ১২৭)

প্রশ্নঃ ইসলাম অর্থ শান্তি কেন করা হয়ে থাকে?

উত্তরঃ 'ইসলাম' অর্থ শান্তি এ কথা কোন নির্ভরযোগ্য অভিধানে নেই। অনেক মুসলিমগন অজ্ঞতার ভিত্তিতে ইসলাম মানে শান্তি করে থাকে। আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারাঃ জিহাদ এবং বাতিলের সাথে ইসলামের অনিবার্য দ্বন্দ ও সংঘাতকে এড়ানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের অর্থ শান্তি করে থাকে। অথচ 'হানসভে' নামে একজন খ্রিষ্টান তার বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধান A Dictionary of Mordern Written Arabic এ 'ইসলাম' অর্থ করেছেনঃ Submission, resignation to the will of God. "ইসলাম মানে হচ্ছেঃ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা ও সমর্পণ করা।"

তবে এটা সত্য যে, ইসলাম পরিপূর্নভাবে বাস্তবায়ন হলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সে হিসাবে এক কথায় বলা যায়, ইসলাম অর্থ হলোঃ এক আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রশ্নঃ 'ইসলাম পরিপূর্ন দ্বীন' তার প্রমান কি?

উত্তরঃ ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ন একটি দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। তার প্রমান হচ্ছে আল্লাহর বানীঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ন করলাম। আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্নতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সুরা মায়িদাহ ৫:৩)

প্রশ্নঃ 'ইসলামই একমাত্র গ্রহনযোগ্য দ্বীন, অন্য কোন দ্বীন গ্রহনযোগ্য নয়' তার প্রমান কি?

উত্তরঃ ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র দ্বীন। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য নয়। এর প্রমান হল পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেনঃ إِنَّ الدِّينَ عِنْـــدَ اللَّـــهِ الْإِسْـــلَامُ "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হল ইসলাম।" (সুরা আল ইমরান ৩:১৯)

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থঃ "কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তা কখনো গ্রহনযোগ্য হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (সুরা আল ইমরান ৩:৮৫)

প্রশ্নঃ ইসলামের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নির্দেশ কি?

উত্তরঃ ইসলামের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে ইসলামকে নিজের পরিপূর্ন দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহন করা, পরিপূর্নভাবে ইসলামে দাখিল (প্রবেশ করা) হওয়া, অনুসরন করা ও মানা। ইসলামের কিছু মানা কিছু বর্জন করা চলবে না এবং আমরণ ইসলামের উপর টিকে থাকা। এ ব্যাপারে আল্লাহ (সুবঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً "হে ঈমানদারগন! তোমরা পরিপূর্নভাবে ইসালামে প্রবেশ কর।" (সুরা বাক্বারাহ ২:২০৮) আল্লাহ (সুবঃ) আরো বলেনঃ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "তোমরা মুসলিম থাকাকালীন অবস্থা ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।"(সুরা আল ইমরান ৩:১০২)

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি ইসলামের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ মানবে না তাদের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি ইসলামের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে সে কাফির, তার পরিনতি ভয়াবহ, দুনিয়াতে তার জন্য রয়েছে লাঞ্চনা এবং আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌছে

দেয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।" (সুরা বাকারা ২:৮৫)

আল্লাহ (সুবঃ) আরো বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

অর্থঃ "যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, প্রকৃত কাফের। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফের আমি তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।" (সূরা নিসা ৪:১৫০-১৫১)

প্রশ্নঃ ইসলাম গ্রহণ না করে নেক আমল করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি?

উত্তরঃ না! মোটেই না!! ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া পরকালে মুক্তির কোন উপায় নাই। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ [النور : ٣٩ ، ٤٠]

অর্থঃ "যারা কাফের, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সমতুল্য, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। কিন্তু সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অত:পর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের আমলসমূহ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের

উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।" (সুরা নূর ২৪:৩৯-৪০)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল মরিচিকা এবং সাগরের অন্ধকার মানুষের যেমন কোন উপকারে আসে না। তেমনি কাফেরদের আমলও তাদের কোন উপকারে আসবে না।

ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে না এর জ্বলন্ত প্রমাণ আবু তালেব। আল্লাহর রাসূল (সা:) এর আপন চাচা। আলী (রা:) এর আব্বাজান। যিনি সারা জীবন রাসূল (সা:) কে ভাতিজা হিসাবে দেখা-শুনা করেছেন, সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন। এমনকি তিন বৎসর পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করার কারণে জাহান্নামী হলেন। আল্লাহর রাসূল (সা:) তার মৃত্যুর পরেও তার জন্য দোয়া করতে লাগলেন। যার ফলে আল্লাহ (সুব:) আয়াত নাযিল করে দিলেন:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة : ١١٣]

অর্থ: "নবী ও মুমিনের উচিত নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করবে, যদিও তারা তাদের আত্নীয় হোক না কেন। একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা নিশ্চিত জাহান্নামী।" (সূরা তাওবা ৯:১১৩)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ না করার কারনে তার সারা জীবনের সত্য কাজ গুলো ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।

পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতিত কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়টি হাদীস শরীফে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه، أَتَى النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ، فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – فَغَضِبَ، فَقَالَ: "أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِى.

অর্থ: "জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর (রা:) আহলে কিতাবদের কিতাবের কিছু অংশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকটে আসলেন এবং তা পাঠ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা:) রাগান্বিত হলেন। বললেন, হে ওমর! তোমরা কি ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মতো বিভ্রান্তির মধ্যে আছ? ঐ স্বত্তার কসম! যার হাতে আমার জান, নিশ্চয়ই আমি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার একটি দ্বীন নিয়ে এসেছি। ঐ স্বত্তার কসম! যার হাতে আমার জান, যদি মূসা (আ:) জীবিত থাকতেন তাহলে তারও আমার অনুসরণ করা ব্যতিত কোন উপায় থাকতো না।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৭২; মুসনাদে আহমদ ১৫১৯৫; ইমাম আলবানী রা. তার 'ইরওয়াউল গালীল' নামক কিতাবে লিখেন এই হাদীসটি যদিও দূর্বল কিন্তু এর অনেক সমার্থবোধক হাদীস থাকার কারণে এটা গ্রহণ করা যেতে পারে)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ . فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ أَمَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِى لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِى لاَتَّبَعَنِى » .

অর্থ: "জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট একখন্ড লিখিত তাওরাত নিয়ে আসলেন। অত:পর বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা তাওরাতের থেকে লিখিত একখন্ড বাণী। রাসূলুল্লাহ (সা:) চুপ করে থাকলেন। ওমর (রা:) তা পড়তে আরম্ভ করলেন, তার পড়া শুনে রাসূলূল্লাহ (সা:) এর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগল।

আবু বকর (রা) বললেন: হে ওমর! তুমি যদি মরে যেতে! তুমি কি রাসুলুল্লাহ (সা:) এর চেহারার অবস্থা দেখতে পাচ্ছনা? ওমর (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেন: আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনি আরো বললেন: আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ (সা:) কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন! যদি তোমরা মুসা (আ:) কে পেতে অতপর: তার অনুসরণ করতে ও আমাকে পরিত্যাগ করতে, তাহলে তোমরা সঠিক পথ বা দ্বীন থেকে দুরে চলে যেতে (পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে)। যেনে রাখ! যদি মুসা (আ:) ও জীবিত থাকত এবং আমাকে পেত; তবে আমারই অনুসরণ করতো।"(সুনানে দারমী ৪৪৩; মেশকাতুল মাছাবীহ ১৯৪; হাদীসটি হাসান পর্যায়ের)

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করার কোন বিকল্প নেই।

প্রশ্ন: ইসলামের মূল উৎস কি?

উত্তর: ইসলামের মূল উৎস দু'টি। কুরআন ও রাসুল (সা:) এর সুন্নাহ। এ ব্যাপারে রাসুল (সা:) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« إِنِّى قَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا مَا أَخَذْتُمْ بِهِمَا أَوْ عَمِلْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِى ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন; আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা এদুটোকে শক্তভাবে ধারণ করবে অথবা বলেছেন এদুটোর উপর আমল করবে ততক্ষন পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব, আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ।" (সুনানে বায়হাকী ২০৮৩৪)

প্রশ্ন: ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ».

এক: এ বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

দুই: সালাত কায়েম করা।

তিন: যাকাত আদায় করা।

চার: আল্লাহর ঘরে হজ্জ্ব আদায় করা।

পাঁচ: রমাদানে সিয়াম পালন করা। (সহীহ মুসলিম ১২২; সহীহ বুখারী ৪৫১৩; সুনানে তিরমিজি ২৬০৯)

প্রশ্ন: হাদীসে জিবরাইল কি? সেখানে ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

উত্তর: হাদীসে জিবরাইল হলো, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর জীবনের শেষ দিকে ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে একটি প্যাকেজ আকারে পেশ করার জন্য জিবরাইল (আ:) এক অপরিচিত আগন্তুকের ন্যায় এসে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে কিছু প্রশ্ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) তার উত্তর দেন। উক্ত হাদীসটি হাদীসে জিবরাইল নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ণ হাদীসটি নিম্নে পেশ করা হলো:

حَدَّثَنِى أَبِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِى عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ

الآخرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ». قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ». قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ « مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ». قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ « أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِى الْبُنْيَانِ ». قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِى « يَا عُمَرُ أَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ ». قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

অর্থ: "ওমর বিন খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "একদা আমরা নবী (সা:) এর নিকট বসেছিলাম এমতাবস্থায় সেখানে মিশমিশে কালকেশ ও ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত একজন ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল। ভ্রমণের কোন নিদর্শনই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিলনা, অথচ আমরা কেউ তাকে চিনতে পারছিলামনা। অত:পর তিনি নবী (সা:) এর সম্মুখে বসলেন। তার হাঁটু রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাটুর সাথে মিলিয়ে দিলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন। এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করুন, নবী (সা:) বললেন: ১) "সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ (ইলাহ) নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) তাঁর রাসূল। ২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ৩) যাকাত প্রদান করা। ৪) রামাদান মাসে সিয়াম পালন করা এবং ৫) হজ্জ; পথের সম্বল হলে আল্লাহর ঘর (কাবা শরীফ) যিয়ারত করা। আগন্তুক বললেন: আপনি ঠিক বলেছেন। তিনি (আগন্তুক) নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আবার নিজেই তার সত্যায়ন করছেন এতে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। অত:পর তিনি বললেন: আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী (সা:) বললেন: (তা হলো এই যে) আল্লাহ, মালায়েকা, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আগন্তুক বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। এরপর আগন্তুক বললেন: আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে নবী (সা:) বললেন: যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি "আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ" একথা মনে মনে চিন্তা করবে, আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন একথা মনে মনে ভাববে। অত:পর আগন্তুক বললেন: "আমাকে

কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী (সা:) বললেন: এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা অধিক জানে না। এরপর আগন্তুক কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ জানতে চাইলে, নবী (সা:) উত্তরে বললেন: যখন দাসী স্বীয় মনিবের জন্ম দেবে, নগ্নদেহ ও নগ্ন পদ বিশিষ্ট ও জীর্ণ শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগলের রাখালরা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগীত করবে, তখন কিয়ামতের আগমন ঘটবে"। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন: 'আগন্তুক পরক্ষণেই প্রস্থান করলেন, এরপর আমরা কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ থাকলাম। অত:পর নবী (সা:) বললেন, উনি হচ্ছেন জিবরাইল (আ:)। তিনি তোমাদের কাছে তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।" (সহীহ মুসলিম ১০২; সহীহ বুখারী ৫০; সুনানে আবু দাউদ ৪৬৯৭)

প্রশ্ন: কতক্ষন পর্যন্ত একজন ব্যক্তি তার জান-মালের নিরাপত্তা পাবে।

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) বলেন,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة/٥]

অর্থ: "অত:পর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা তাওবাহ ৯:৫) তিনি আরও বলেন,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [التوبة/١١]

অর্থ: "অবশ্য তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্যে সবিস্তারে র্বণনা করে থাকি।" (সুরা তাওবাহ ৯:১১)

রাসুল (সা:) বলেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

অর্থ: "ইবন ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন "আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার যতক্ষন পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) হলেন আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। অত:পর যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে তাহলে তা ভিন্ন। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ (সুব:) এর নিকট।"(বুখারী হা:-২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম হা: ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ তিরমিযী হা:৩৩৪১,নাসাঈ হা:২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১–৩০৯৫, আবু দাউদ হা:-১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮ ইবন মাযাহ হা: ৭১,৭২,৩৯২৭–৩৯২৯)

প্রথম খলিফা আবু বকর (রা:) বনু হানিফা গেত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন যখন তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে, যদিও তারা কালেমায়ে শাহাদাহ উচ্চারণ করত, সালাত আদায় করতো এবং ইসলামের অন্যান্য হুকুম মানত।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (র:) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, কুফ্ফারদেরকে হত্যা করার জন্য, তাদেরকে রেইড দেয়ার জন্য, তাঁদের জন্য প্রত্যেক ঘাটিতে ওঁৎ পেতে থাকার জন্য যতক্ষন না তারা শিরক থেকে তাওবাহ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে। সকল সালফে সালেহীনগণ এবং সকল মাযহাবের ইমামগন এবং ফুকাহাদের এই ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে। (ফাতওয়া আল আইম্মাহ আল নাজদিয়্যাহ ২/৪৭২)

সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে একজন ব্যক্তি ততক্ষন পর্যন্ত তার জান মালের নিরাপত্তা পাবে না যতক্ষন না সে কালিমাতুশ শাহাদাহ উচ্চারন করবে এবং এর দাবী অনুযায়ী কাজ করবে। যেমন এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, সমস্ত শিরক থেকে মুক্ত থাকবে, সব বাতিল মা'বুদ তথা ত্বাগুতদের ও তার অনুসারী মুশরিকদের সাথে বারাআহ ঘোষনা করবে,

তাদের সাথে শত্রুতা করবে, ঘৃনা করবে, তাদেরকে তাকফীর করবে ইত্যাদিসহ এই সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় মেনে নিবে ও সেই অনুযায়ী কাজ করবে), সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত আদায় করবে। আর যদি এগুলো না করে তাহলে তাদের সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: ٤)

অর্থ: ইবরাহীম (আ:) ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর ইবাদত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; আর শুরু হল আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। (সুরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

আরকানুল ইসলাম

প্রশ্ন: ইসলামের কয়টি রুকন ও কি কি?

উত্তর: ইসলামের রুকন পাঁচটি। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ».

এক: এ বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

দুই: সালাত কায়েম করা।

তিন: যাকাত আদায় করা।

চার: আল্লাহর ঘরে হজ্ব আদায় করা।

পাঁচ: রমাদানে সিয়াম পালন করা। (সহীহ মুসলিম ১২২; সহীহ বুখারী ৪৫১৩; সুনানে তিরমিজি ২৬০৯)

ইসলামের প্রথম রুকন: শাহাদাতাইন

প্রশ্ন: শাহাদাতাইন কাকে বলে?

উত্তর: ইসলামের প্রথম রুকন হচ্ছে দু'টি বিষয়ের স্বাক্ষ্য দান।

প্রথম বিষয়: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই"। অর্থাৎ এর হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক অর্থ জেনে, দৃঢ় বিশ্বাস, ইখলাস, সততা, ভালবাসা, পূর্ণ আনুগত্য ও কবুল সহকারে এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযুক্ত কোন সত্য মাবুদ নেই। এই সাক্ষ্য আল্লাহ (সুব:) নিজে দিয়েছেন, সকল মালায়েকার দিয়েছেন এবং সমস্ত জ্ঞানীরা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران : ١٨)

অর্থ: "আল্লাহ্ স্বাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন হক্ ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানবান লোকেরা সততা ও ইনসাফের সাথে এ স্বাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহা পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞানী ছাড়া কেহই ইলাহ হতে পারে না।" (সুরা আল ইমরান ৩:১৮) এই সাক্ষ্যকে পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে:

{قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} [الأنعام : ١٩)

অর্থ: "বল, 'সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় বস্তু কী?' বল, 'আল্লাহ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে। আর এ কুরআন আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌঁছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি। তোমরাই কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে রয়েছে অন্যান্য উপাস্য? বল, 'আমি সাক্ষ্য দেই না'। বল, 'তিনি কেবল এক ইলাহ আর তোমরা যা শরীক কর আমি নিশ্চয় তা থেকে মুক্ত'।" (সুরা আন'আম ৬:১৯)

দ্বিতীয় বিষয়: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ "মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল"। অর্থাৎ পূর্ণ আনুগত্য, সত্যায়ন, আদেশ-নিষেধ মেনে

নেয়া ও শরিয়াহ অনুসারে ইবাদত করার মানসিকতা নিয়ে এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। শুধু মৌখিকভাবে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা মুনাফিকরাও নিজেদেরকে মুসলিম জাহির করার জন্য এই সাক্ষ্য দিত। আল্লাহ (সুব:) রাসূলুল্লাহ (সা:) কে সে ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। সুরায়ে মুনাফিকূনের শুরুতে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

যেহেতু এখানে দুটি বিষয়ে স্বাক্ষ্য প্রদান করতে হয় এই জন্য একে 'শাহাদাতাইন' বলা হয়।

প্রশ্ন: ইসলামে শাহাদাতাইনের অবস্থান কি?

উত্তর: এটি হচ্ছে ইসলামের প্রথম এবং মূল ভিত্তি। একজন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষন না সে এই দু'টি বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে। আল্লাহ (সুব:) বলেন: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [النور/٦٢ অর্থ: "প্রকৃত ঈমানদার তারাই, যারা আল্লাহর (এককত্বে) এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনে।" (সুরা নূর ২৪:৬২) রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: আমি আদিষ্ট হয়েছি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) তাঁর রাসুল, সালাত প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত আদায় করে। যদি তারা এগুলো করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপত্তা পাবে, বৈধ আইন ব্যতীত, এবং তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট।" (সহীহ বুখারী ৩৯২; সহীহ মুসলিম ১৩৮)

প্রশ্ন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদানের অর্থ কি?

উত্তর: এই কালিমা জেনে-শুনে ইহা মুখে উচ্চারণ করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে এর দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী আমল করা। এর অর্থ না

জেনে এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল না করে শুধু মুখে পাঠ করলে সকলের ঐক্যমতে এই কালিমা কোন উপকারে আসবে না বরং তার বিরূদ্ধে হুজ্জত হবে (তার ক্ষতির কারণ হবে)।

আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হলো: এক আল্লাহ (সুব:) ছাড়া প্রকৃত পক্ষে কোন সত্য ইলাহ নেই। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কারোরই ইবাদত পাবার যোগ্যতা নেই । তাঁর ইবাদত এবং রাজত্বে কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [الحج: ٦٢]

অর্থ: "এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ই সত্য। আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহ্ই সবার উচ্চে, মহান।" (সুরা হাজ্জ ২২:৬২)

এ কালেমার দু'টি দিক রয়েছে نَفِــيْ নাফি বা অস্বীকৃতি জানানো, اِثْبَــاتٌ ইছবাত বা স্বীকৃতি জানানো।

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর উপাসনা অস্বীকার করা এবং যে কোন ইবাদত শুধুমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা, যার কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ [البقرة/١٦٣]

অর্থ: "তোমাদের ইলাহ্-উপাস্য হলেন এক ও অদ্বিতীয়, আর সে মহান করুনাময় দয়ালু ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ-উপাস্য নেই।" (সুরা বাকারা ২:১৬৩)

প্রশ্ন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর স্বাক্ষ্য দানের দাবী কি?

উত্তর: لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ র দাবী বলতে এই কালেমার প্রতি ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় দাবী ও করণীয় হুকুম আহকাম পালন করা এবং ঈমানের বিপরীতে যাবতীয় বিশ্বাস ও কর্ম বর্জন করাকে বুঝায়। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজ এ কালেমার দাবী সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ। আসুন আমরা জেনে নেই এ কালেমার অত্যাবশ্যকীয় দাবীসমূহ কি কি:

১। যাবতীয় ইবাদত স্রেফ আল্লাহর জন্য খালেস করা।

আল্লাহ (সুব:) বলেন: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّـــاهُ "তোমার রবের চুড়ান্ত ফায়সালা যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে---।" (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:২৩)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة/٥]

অর্থ: "আর তাদেরকে ইহা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করে।" (সুরা বাইয়্যেনাহ ৯৮:৫)

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থ: "আমি তোমার পূর্বে যত রাসূল পাঠিয়েছি তাদের সকলকে এই অহী দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই সুতরাং আমারই ইবাদত কর।" (সুরা আম্বিয়া ২১:২৫)

২। যাবতীয় শির্ক এবং ত্বাগুতকে বর্জন করা।

উক্ত আহ্বানই ছিল সমস্ত নবী-রাসুলদের আহ্বান। আর এটাই কালেমার চূড়ান্ত দাবী। শির্ক এবং ত্বাগুতকে বর্জন করতে না পারলে ঈমানের দাবী কোন অবস্থাতেই আদায় হবে না বরং কালেমা পাঠকারীকে মুশরিক এবং কাফের হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে, যার পরিণাম হিসেবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যেতে হবে। সমস্ত নবী-রাসূলদের আহ্বান সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

অর্থ: "আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছেই এ মর্মে রাসুল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাগুত থেকে নিরাপদ দূরে থাকবে।" (সূরা নাহল ১৬:৩৬)

শিরক থেকে সতর্ক করে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الزمر/٦٥)

অর্থ: "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" (সুরা যুমার ৩৯:৬৫)

শিরক মুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (النساء/٣٦)

অর্থ: "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক্ করবে না।" (সুরা নিসা ৪:৩৬)

৩। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশকে সকল কিছুর উর্দ্ধে অগ্রাধিকার দেয়া।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [الحجرات/١)

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রনী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।" (সুরা হুজরাত ৪৯:১)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا [الأحزاب/٣٦)

অর্থ: "কোন মু'মিন ও মু'মিন নারীর এ অধিকার নেই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, সে বিষয়ে নিজেদের কোন ইখতিয়ার পেশ করবে, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়।" (সুরা আহযাব ৩৩:৩৬)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء/٦٥)

অর্থ: "অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অত:পর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন

রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" (সুরা নিসা ৪:৬৫)

অতএব আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশকে সকল কিছুর উর্দ্ধে স্থান দেয়া এ কালেমার দাবী, কেউ যদি এ দাবী পূরণ না করে তবে কস্মিনকালেও সে মুসলিম হতে পারবে না।

৪। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দলের অন্ধ অনুসরণ না করা।

বিনা দলীলে (কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে) কারো কোন কথা মানাকে অন্ধ অনুসরণ বলে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

অর্থ: "তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য আউলিয়াদের অনুসরণ করো না।" (সূরা আরাফ ৭:৩)

কোরআন সুন্নাহর বাইরে কারো কথা মানা বা অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের চাইতে তাকে বেশী প্রাধান্য দেয়া, যা সুস্পষ্ট কুফরী। এরূপ ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না।

৫। কালিমার দাবীর বিপরীত অবস্থানকারীর সাথে কোনরূপ সম্পর্ক না রাখা।

কালেমার স্বাক্ষ্যদানকারী মুসলিম কখনো কোন কাফির-মুশরিকের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারবে না। কারণ যারা কাফের-মুশরিক তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের শত্রু। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রু কখনো কোন ঈমানদারের বন্ধু হতে পার না। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ [المجادلة/٢٢)

অর্থ: "যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরূদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।" (সুরা মুজাদালা ৫৮:২২)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (١٤٤ [النساء/١٤٤،)

অর্থ: "হে ঈমানদারগন! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমান দিতে চাও?" (সুরা নিসা ৪:১৪৪)

প্রশ্ন: 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কথার সাক্ষ্যদানের অর্থ কি?

উত্তর: 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কথার সাক্ষ্যদানের অর্থ হচ্ছে: সত্যিকারভাবে অন্তর থেকে পরিপূর্ন বিশ্বাস সহকারে এই কথা বলা যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা। মানুষ এবং জ্বীন সহ সকল সৃষ্টির জন্য তিনি রাসুল। আল্লাহ (সুব:) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَـى اللَّـهِ بِإِذْنِـهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا [الأحزاب/٤٥-٤٦)

অর্থ: "হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।" (সুরা আহযাব ৩৩:৪৫-৪৬)

সুতরাং, 'মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর রাসূল' এ সাক্ষ্য দানের অর্থ হলো: রাসূলুল্লাহ (সা:) যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং যেগুলি সম্পর্কে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকা। আর একমাত্র তিনি যেভাবে দেখিয়েছেন সেভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা।

মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য বাস্তবায়ন হবে ঈমান ও পূর্ণ ইয়াকীন দ্বারা। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল, যাকে তিনি সকল মানব ও জ্বীন জাতীর নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি শেষ নবী ও রাসূল। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী বান্দা। তার মাঝে উলূহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট নেই। তিনি আল্লাহ নন। আল্লাহর কোন অংশ বা অবতার নন। এবং তার অনুসরণ করা, তার আদেশ নিষেধের সম্মান করা। কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে তার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ

(সুব:) বলেন: **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَـيْكُمْ جَمِيعًـا** অর্থ: "হে নবী আপনি বলে দিন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।" (সুরা আ'রাফ ৭:১৫৮) তিনি আরো বলেন:

{ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب : ٤٠]

অর্থ: "মুহাম্মাদ (সা:) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নাবী। (সুরা আহ্‌যাব ৩৩:৪০)

প্রশ্ন: 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদান কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে?

উত্তর: 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' উক্ত সাক্ষ্য নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথমত: তার (সা:) রিসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া ও অন্তরে তার বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয়ত: এর উচ্চারণ করা ও মুখের দ্বারা প্রকাশ্য ভাবে এর স্বীকৃতি দেওয়া।

তৃতীয়ত: যে সত্য তিনি নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করা এবং যে বাতিল বিষয় সমূহ নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَـدُونَ [الأعراف/١٥٨)

অর্থ: "সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান এনেছেন। আর তোমরা তার (রাসূলুল্লাহ সা. এর) অনুসরণ কর যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে পার।" (সুরা আ'রাফ ৭:১৫৮)

চতুর্থত: রাসূলুল্লাহ (সা:) যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা।

পঞ্চমত: জান, মাল, ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা ও সকল মানুষের ভালবাসার চাইতে তাঁকে (সা:) অধিক ভালবাসা। কারণ তিনি আল্লাহর রাসূল আর তাকে ভালবাসাই হলো আল্লাহর ভালবাসার অন্তর্ভূক্ত। আর তার প্রকৃত

মুহাব্বত হল তার আদেশ সমূহের আনুগত্য করা, তার নিষেধ সমূহ হতে বিরত থাকা, তাকে সাহায্য করা এবং তার সাথে বন্ধুত্ব রাখা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران/٣١)

অর্থ: "বল: তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।" (সুরা আল-ইমরান ৩:৩১) রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْه مِنْ وَالِده وَوَلَده

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না যতক্ষন আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ের থেকে অধিকতর প্রিয় না হবো। (সহীহ বুখারী ১৩)

ষষ্ঠত: তাঁর সুন্নাতের প্রতি আমল করা। তাঁর কথাকে সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেওয়া, নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করা। তার শরী'আত মোতাবেক বিধান পরিচালনা করা এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء/٦٥)

অর্থ: "কিন্ত না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অত:পর তোমার সিদ্ধান্ত সমন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" (সুরা নিসা ৪:৬৫)

দ্বিতীয় রুকন: الصلاة **'আস সালাত' (নামাজ)**

প্রশ্ন: সালাত কাকে বলে? কত ওয়াক্ত সালাত ফরয এবং ইকামাতে সালাত বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: শাব্দিক অর্থ: সালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ 'দু'আ'।

وإنما سمي الفعل المخصوص بها لاشتماله على الدعاء .

এই অর্থ হিসাবে নির্দিষ্ট ইবাদতকে সালাত এই জন্য বলা হয় যেহেতু তার মধ্যেও দু'আ রয়েছে।

وقيل : أصل صلى حرك الصلوين لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده

সালাত শব্দের আরেকটি অর্থ, নিতম্বের দুই পাশের হাড্ডি নাড়াচাড়া করানো। এই অর্থে সালাতকে সালাত এই কারণে বলা হয় যেহেতু সালাতের মধ্যেও রুকুতে ও সিজদায় নিতম্ব হেলানো হয়। (তাফসীরে বায়যাবী ১/২০)

পারিভাষিক অর্থ: ইহা এমন এক ইবাদাত যা বিশেষ কিছু কথা ও কর্মকে শামিল করে। আল্লাহু আকবার দ্বারা শুরু হয়, আস্‌সালামু আলাইকুম দ্বারা শেষ হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয। তা হলো: ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ঈশা। এই ব্যাপারে সকল মুসলিমদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইকামাতে সালাত: ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিপূর্ণভাবে দৈহিক ও আর্থিক সকল শর্ত পূরণ করে সালাত কায়েম করা। যাতে সকল সুন্নাহ, মুস্তাহাব, ওয়াজীব ও ফরজ সমূহ সহকারে সর্বাঙ্গীনভাবে, পরিপূর্ণভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সমাজে বিরাজমান থাকে।

প্রশ্ন: সালাত ফরযের দালীল কি?

উত্তর: সালাত ফরয এটা প্রমাণিত হয়েছে অনেক দলীল দ্বারা। নিম্নে তার কিছু বর্ণনা করা হল: আল্লাহ (সুব:) বলেন: **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا** অর্থ: "নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" (সুরা নিসা ৪:১০৩)

ইব্‌নে আব্বাস (রা:) এর হাদীস: রাসূলুল্লাহ (সা:) মুআয ইবনে জাবাল (রা:) কে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে বললেন:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ...

অর্থ: "যে, তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-) আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানের দিকে আহ্বান কর। যদি তারা এই দাও'আত গ্রহণ করে তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ (সুব:) তোমাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন... ।" (সহীহ বুখারী ১৩৫৯; সহীহ মুসলিম ১৩০)

সকল মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার উপর একমত হয়েছেন। আর ইহা ইসলামের রুকন সমূহের অন্যতম একটি রুকন।

প্রশ্ন: কাদের উপর সালাত ফরয?

উত্তর: প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানী মুসলিম ব্যক্তির উপর সালাত ফরয। চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। কাফিরের উপর সালাত ফরয নয়। আর বাচ্চাদের উপরও ফরয নয়। কারণ সে মুকাল্লাফ-প্রাপ্ত বয়স্ক নয়। পাগলের উপরও ফরয নয়। ঋতু ও নিফাস গ্রস্থ মহিলাদের উপরও ফরয নয়। কারণ শরী'আত তাদের হতে সালাতের বিধান তুলে নিয়েছে, কেননা তারা এ অবস্থায় নাপাক আর সালাতের জন্য পাক হওয়া শর্ত।

বাচ্চা সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার বয়স যখন সাত বছর হবে তখন তার অভিভাবকের উপর তাকে সালাত এর আদেশ দেওয়া আবশ্যক। আর যখন তার বয়স দশ বছর হবে তখন সালাত আদায় না করলে তার অভিভাবকের উপর তাকে প্রহার করা আবশ্যক।

প্রশ্ন: সালাত বা নামায ত্যাগ কারীর বিধান কি?

উত্তর: সালাত ত্যাগ করাকে হাদীসে মুমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ

অর্থ: "জাবির (রা) হতে বর্নিত, তিনি বলেন আমি রাসুলকে (সা:) বলতে শুনেছি, 'মুসলিম ব্যক্তি ও মুশরিক ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা।" (সহীহ মুসলিম ২৫৬)

এ হাদীস অনুযায়ী বুঝা যায় ইচ্ছাপূর্বক সালাত ত্যাগকারী মুমিন থাকে না বরং কাফের হয়ে যায়। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা:) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমাদের এবং তাদের মাঝে নিরাপত্তার অঙ্গিকার হচ্ছে 'সালাত'। সুতরাং যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করলো সে কাফের হয়ে গেল।" (সুনানে তিরমিজি ২৬২১; সুনানে নাসায়ী; সুনানে ইবনে মাজাহ ১০৭৯; মুসনাদে আহমদ ২২৯৩৭) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

অর্থ: "আবু দারদা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ সা.) আমাকে অসিয়াত করেছেন যে, তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করা হয় অথবা আগুনে পোড়ানো হয়, ইচ্ছাকৃত কোন ফরজ সালাত ত্যাগ করবে না কেননা যে ইচ্ছাকৃত কোন ফরজ সালাত ত্যাগ করলো তার থেকে আল্লাহর দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৩৪; মুসতাদরাকে হাকেম ৬৮৩০)

এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামদের কিছু আসার:

আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مُنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ

অর্থ: “রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাহাবীগণ সালাত ব্যতিত অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফুরী মনে করতো না।” (সুনানে তিরমিজি ২৬২২; মুসতাদরাকে হাকেম ১২)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.):

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلا دِينَ لَهُ

অর্থ: “তিনি বলেন: যে সালাত আদায় করলো না তার কোন দ্বীন নেই।” (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩০৩৯৭; মু‘জামে তাবরানী ৮৯৪১; বায়হাকী ফী শুআবিল ঈমান ৪৩)

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.):

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ حَظَّ فِى الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ

অর্থ: “যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করলো ইসলামে তার কোন অংশ নেই।” (সুনানে বায়হাকী ৬৭৩৪)

বুঝা গেল সালাতের বিষয়টি অন্যান্য আমলের মতো নয়। অন্য যে কোন আমল যদি ফরজ হওয়াকে স্বীকার করে এবং ত্যাগ করাকে হালাল বা বৈধ মনে করে না করে বরং অলসতাবশত: শয়তানের ধোঁকায় পরে ইচ্ছাকৃত ভাবেও ত্যাগ করে তাহলেও কাফের হবে না। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদা। কিন্তু সালাতের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কোন ব্যক্তি যদি সালাত ফরজ হওয়ার বিধানকে স্বীকার করা সত্ত্বেও অলসতা বশত: বা শয়তানের ধোঁকায় পরে ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করে তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে। উপরোক্ত সহীহ হাদীসগুলো থেকে তা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হলো। এ সম্পর্কে আরো কিছু হাদীস রয়েছে যা সনদের দিক থেকে তেমন শক্তিশালী না হলেও উপরোক্ত সহীহ হাদীসগুলোর সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ جِهَاراً

অর্থ: “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ছেড়ে দিল সে প্রকাশ্য কুফরী করলো।” (মু‘জামে তাবরানী ৩৪৩, আলবানী (র:) হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ

অর্থ: “আলী (রা:) বলেন: যে ব্যক্তি সালাত আদায় করলো না সে কাফের।” (সুনানে বায়হাকী ৬৭৩৪, ইমাম আলবানী (র:) বলেন হাদীসটি যয়িফ ও মাওকুফ)

প্রশ্ন: সালাতের শর্ত সমূহ কি কি?

উত্তর: সালাতের শর্ত সমূহ হচ্ছে:

১। ইসলাম-মুসলিম হওয়া। ২। জ্ঞানবান হওয়া (পাগল বা অচেতন না হওয়া)। ৩। বালেগ হওয়া (শিশু ও বাচ্চা না হওয়া)। ৪। সালাতের সময় উপস্থিত হওয়া। ৫। নিয়্যাত করা। ৬। ক্বিব্‌লামুখী হওয়া। ৭। সতর ঢাকা, পুরুষের সতর নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলার সম্পূর্ণ শরীরই সালাতের মধ্যে সতর, তার মুখ ও হাতের তালুদ্বয় ছাড়া। ৮। মুসল্লির কাপড়, শরীর ও সালাত পড়ার স্থান পাক-পবিত্র হওয়া। ৯। হাদাসে আকবার থেকে গোছলের মাধ্যমে ও হাদাসে আসগার থেকে অজু করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া।

প্রশ্ন: সালাতের সময় কি কি?

উত্তর: সালাতের সময় নিম্নরূপ:

(১) যোহর সালাতের সময়: সূর্য ঢলে যাওয়া হতে-অর্থাৎ মধ্য আকাশ হতে সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়া হতে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত (হানাফীদের মতে দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত)।

(২) আসর সালাতের সময়: যোহর সালাতের সময় চলে যাওয়া হতে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত। এটা হল আসর সালাতের উত্তম সময়। বিশেষ প্রয়োজনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সালাত আদায় করা যাবে (হানাফীদের মতে প্রত্যেক বস্তর ছায়া তার দ্বিগুন হওয়া থেকে শুরু করে সূর্যের রং পরিবর্তণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত)।

(৩) মাগরিব সালাতের সময়: সূর্য ডুবা হতে নিয়ে পশ্চিমাকাশের লাল আভা দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত। আর তা হল ঐ লালচে ভাব যা পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবার পর প্রকাশিত হয় (হানাফীদের মতে লালের পরের সাদা রং থাকা পর্যন্ত)।

(৪) এশার সালাতের সময়: মাগরিবের সালাতের সময় চলে যাওয়া হতে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত উত্তম সময়। তবে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যাবে।

(৫) ফজর সালাতের সময়: সুব্হে সাদেক বা ফজরে সানী প্রকাশ হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

প্রশ্ন: সালাতের নিষিদ্ধ সময় সমূহ কখন?

উত্তর: উক্ববা বিন আমির (রা:) এর হাদীস, তিনি বলেন:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُولُ ثَلاَثُ سَاعَات كَانَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّىَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

অর্থ: "রাসূল (সা:) আমাদেরকে তিন সময়ে সালাত পড়তে ও আমাদের মৃত্যু ব্যক্তিদেরকে দাফন করতে নিষেধ করতেন। (১) সূর্য স্পষ্ট ভাবে উদিত হওয়ার সময় হতে নিয়ে তা (উর্ধে উঠা) পর্যন্ত। (২) ঠিক দুপুরে সূর্য উঁচু হওয়া হতে নিয়ে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। (৩) সূর্য অস্তমুখী হওয়া থেকে নিয়ে তা ডুবা পর্যন্ত।" (সহীহ মুসলিম ১৯৬৬; মুসনাদে আহমদ ১৭৩৭৭)

প্রশ্ন: ফরয সালাতের রাকা'আতের সংখ্যা কত ও কি কি?

উত্তর: ফরয সালাতের রাকা'আতের সংখ্যা সর্বমোট সতের রাকা'আত। নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হল:

১) যোহর: চার রাকা'আত; ২) আসর: চার রাকা'আত; ৩) মাগরিব: তিন রাকা'আত; ৪) এশা: চার রাকা'আত; ৫) ফজর: দু' রাকা'আত।

প্রশ্ন: জামা'আতে সালাত আদায় করার বিধান কি?

উত্তর: মসজিদে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া মুসলিম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছওয়াব অর্জন করতে পারবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন; একা সালাত পড়ার চাইতে জামা'আতে সালাত পড়ার ছাওয়াব পচিশ গুণ বেশী।" (সহীহ মুসলিম ১৫০৪)

প্রশ্ন: বিদ'আতী ইমাম হলে তার পিছনে সালাত পড়ার ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: বিদআতী ইমামের পিছনে সালাত আদায় হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে মাসআলাটি উল্লেখ করা হলো:

الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة غير صحيحة ، وذلك كمن يستغيث بغير الله ، أو يدعو غيره ، أو يذبح لغير الله ، أو يعتقد نقصان القرآن ، أو يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو يغلو في علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت ، ويدعوهم من دون الله ، أو يسب الصحابة رضي الله عنهم.

অর্থ: "বিদআতী ব্যক্তি যদি আক্বিদাগতভাবে ঈমান বিনষ্টকারী বিদআতের সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে তার পিছনে সালাত জায়েজ হবে না। যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে বিপদ-আপদে সাহায্য প্রার্থণা করে অথবা গাইরুল্লাহকে ডাকে অথবা গাইরুল্লাহর নামে পশু যবাই করে অথবা কুরআন বিকৃতি বা অসম্পূর্ণ হওয়ার আক্বিদা পোষণ করে অথবা উম্মূল মুমিনীন আয়শা (রা:) কে দোষারোপ করে অথবা আলী (রা:) বা অন্যকোন আহলে বাইতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকে ডাকে অথবা সাহাবায়ে কিরামদেরকে গালী-গালাজ করে। এদের কারো পিছনে সালাত সহী হবে না।" (ফাতওয়া আল লাজনাতুদ দায়েমাহ ৩২/২৯১)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র:) বলেন:

وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل فاذا لم تجد اماما غيره كالجمعة التى لا تقام الا بمكان واحد وكالعيدين وكصلوات الحج خلف امام

الموسم فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة وانما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يـــرى الجمعـــة والجماعة،اذا لم يكن فى القرية الا مسجد واحد فصلاته فى الجماعة خلف الفـــاجر خير من صلاته فى بيته منفردا لئلا يفضى الى ترك الجماعة مطلقا وأما اذا أمكنه أن يصلى خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب لكن ان صلى خلفـــه ففـــى صلاته نزاع بين العلماء ومذهب الشافعى وأبى حنيفة تصح صلاته وأمـــا مالـــك وأحمد ففى مذهبهما نزاع وتفصيل وهذا انما هو فى البدعة التى يعلم أنهـــا تخـــالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم فاما مسائل الدين التى يتنازع فيها كثير من الناس فى هذه البلاد مثل مسألة الحرف والصوت ونحوها فقد يكـــون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس فاما اذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذى فيه النزاع والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصـــحبه وسلم

অর্থ: "বিদআতী ইমামের পিছনে সালাতের ব্যাপারে মতানৈক্য ও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। যদি ঐ বিদআতী ইমাম ব্যতিত অন্যকোন ইমাম না পাওয়া যায় তাহলে যে সকল সালাত নির্দিষ্ট স্থানে একবার অনুষ্ঠিত হয় যেমন, জুমুআর সালাত, ঈদের সালাত, হজ্জ মওসূমে হজ্জের সালাতসমূহ যা ভিন্নভাবে জামাত করার সুযোগ থাকে না। সে সকল অবস্থায় নেককার ও বদকার সকলের পিছনেই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মতিক্রমে সালাত আদায় করা জায়েজ হবে। তবে বিদআতী যদি রাফেজিদের মত অক্বিদাগত হয় যাদের কাছে জুমুআ ও জামাআতের কোন গুরুত্ব নেই।

কোন গ্রামে যদি বিদআতী মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন মসজিদ না থাকে তাহলে একাকী ঘরে সালাত পড়ার চাইতে বেদআতী ব্যক্তির পিছনে জামাতে পড়া ভাল যাতে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণভাবে জামাত ত্যাগ করার অভ্যাসের দিকে না নিয়ে যায়। আর যদি বিদআতী ইমাম ছাড়া অন্য

ঈমামের পিছনে সালাত পড়ার সুযোগ থাকে সে ক্ষেত্রে নি:সন্দেহে বিদআত মুক্ত ঈমামের পিছনে সালাত আদায় করা উত্তম। এতদসত্তেও যদি বিদআতী ঈমামের পিছনে সালাত আদায় করে থাকে তাহলে তা নিয়ে ওলামাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের ইমামদের মতানুযায়ী তার সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মালেক (র:) এবং আহমদ (র:) এর মাযহাব মতে বিষয়টিতে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন শুদ্ধ হবে আবার কেউ কেউ বলেন শুদ্ধ হবে না। এই মতবিরোধ ও বিশ্লেষণের বিষয়টি যদি ইমাম আক্বিদাগত বিদআতী হয় তাহলে। যেমন: রাফেযী, জাহমিয়া ইত্যাদি (কেউ বলেছেন: এ অবস্থায় ঘরে বসে একাকী পড়া থেকে জামাআতে পড়া উত্তম। আবার কেউ বলেছেন, আক্বিদা গত বিদআতীর পিছলে সালাত আদায় করা থেকে এক পড়াই উত্তম)।

আর যে সকল মাসআলাতে বেশীর ভাগ লোকেরাই মতবিরোধ করেছে যেমন: অক্ষরের উচ্চারণ বা আওয়াজ নিয়ে মতবিরোধ। এ ক্ষেত্রে উভয়ই বিদআতী হওয়ার সম্ভবনা আছে। উভয় জনই মূর্খ এবং তাবীল কারী হতে পারে। এক্ষেত্রে একজনকে ছেড়ে আরেক জনের পিছনে সালাত পড়ার কোন সুযোগ নেই কেননা হতে পারে দুজনেই বিদআতী। তবে যদি সুন্নাহ বিজয়ী এবং প্রতিষ্ঠিত হয় আর সেক্ষেত্রে কোন একজন লোক বিরোধিতা করে তাহলে এই হক্কের বিরোধিতাকারী বেদআতী ইমামে পিছনে সালাত আদায় হবে কিনা সেটা নিয়েই এই মতবিরোধ। কেউ বলেছেন: এ অবস্থায় ঘরে বসে একাকী পড়া থেকে জামাআতে পড়া উত্তম। আবার কেউ বলেছেন, আক্বিদা গত বিদআতীর পিছলে সালাত আদায় করা থেকে এক পড়াই উত্তম।" (মাজমূউল ফাতাওয়া লি ইবনে তাইমিয়া ২৩/৩৫৬)

অপর একটি ফাতওয়াতে বলা হয়েছে:

اختلف العلماء في حكم الصّلاة خلف المبتدع . فذهب الحنفيّة ، والشّافعيّة ، وهو رأي للمالكيّة إلى جواز الصّلاة خلف المبتدع مع الكراهة ما لم يكفر ببدعته ، فإن كفر ببدعته فلا تجوز الصّلاة خلفه . واستدلّوا لذلك بأدلّة منها : قوله صـــلى الله عليه وسلم « صَلُّوا خلْفَ مَنْ قال لا إلهَ إلاّ اللّه » وقوله ً: « صَلُّوا خلفَ كلِّ بَرٍّ وفاجرٍ وما روي من أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلّي مع الخوارج وغيرهم

زمن عبد اللّه بن الزّبير وهم يقتتلون ، فقيل له : أتصلّي مع هؤلاء ومع هــؤلاء ، وبعضهم يقتل بعضاً ؟ فقال :" من قال حيّ على الصّلاة أجبته ، ومن قال : حــيّ على الفلاح أجبته . ومن قال : حيّ على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت : لا ولأنّ المبتدع المذكور تصحّ صلاته ، فصحّ الائتمام به كغــيره وذهــب المالكيّــة والحنابلة إلى أنّ من صلّى خلف المبتدع الّذي يعلن بدعته ويدعو إليها أعاد صلاته ندباً ، وأمّا من صلّى خلف مبتدعٍ يستتر ببدعته فلا إعادة عليه واستدلّوا بقولــه صلى الله عليه وسلم : « لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً ، ولا فــاجرٌ مؤمنــاً إلاّ أن يَقْهَــرَه بسلطانٍ ، أو يخافَ سوطَه أو سيفه ولاية المبتدع

অর্থ: "বিদআতীর পিছনে সালাতের ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের রায় অনুযায়ী বিদআতী ব্যক্তি যদি ঈমান বিধবংসী আক্বিদাগত বিদআতী না হয় তাহলে তার পিছনে মাকরুহের সাথে সালাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি আক্বিদাগতভাবে ঈমান বিধবংসী আক্বিদা পোষণকারী বিদআতী হয় তাহলে তার পিছনে সালাত আদায় জায়েজ হবে না। তারা দলীল হিসাবে দুটো হাদীস পেশ করেন। এক: **صَلُّوا خلْفَ مَنْ قال لا إِلهَ إلاّ اللّــه** অর্থ: যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে তার পিছনে তোমরা সালাত আদায় কর। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: **صَلُّوا خلفَ كلِّ بَــرٍّ وفــاجرٍ** অর্থ: তোমরা প্রত্যেক নেককার এবং বদকারের পিছনে সালাত আদায় কর। এ ব্যাপারে তারা আরো একটি দলীল পেশ করে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) খাওয়ারেজদের পিছনেও সালাত আদায় করতেন যখন আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরের সময় তারা পরস্পরে যুদ্ধ ও মারামারি করছিলো। ইবনে ওমরকে প্রশ্ন করা হলো: আপনি এদের সঙ্গে সালাত আদায় করেন অথচ এরা তো একে অপরকে হত্যা করছে। ইবনে ওমর (রা:) বললেন, যে ব্যক্তি 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' (সালাতের দিকে দ্রুত এসো) বলবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। যে ব্যক্তি 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' (কল্যানের দিকে দ্রুত এস) বলবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। আর যে ব্যক্তি 'হাইয়া আলা কাতলি আখীকা মুসলিম ওয়া আখযি মালিহী' (তোমার মুসলিম ভাইকে

হত্যা করতে এবং তার মাল লুট করতে আস) আমি তার ডাকে সাড়া দিব না। তাছাড়া বেদআতী ব্যক্তির নিজের সালাত যেহেতু বিশুদ্ধ হয় তাই তার পিছনে ইকতিদাকারী অন্যের সালাতও বিশুদ্ধ হবে। তবে মালেকী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণের মত হলো: যে বিদআতী নিজের বিদআতকে প্রকাশ্যে করে এবং এদিকে অন্যকে আহবান করে এরকম বিদআতীর পিছনে সালাত আদায় করে থাকলে তা পূণরায় আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব। আর যে বিদআতী গোপনে বিদআত করে তার পিছনে সালাত আদায় করলে সে সালাত পূনর্বার আদায় করার প্রয়োজন নেই। তারা এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন: "কোন মেয়ে লোক পুরুষের ইমামতি করবে না, কোন ফাজের (পাপী) মুমিনের ইমামতি করবে না, তবে যদি নিজ ক্ষমতা বলে জোড় করে ইমাম বনে যায় অথবা তার বেত্রাঘাত ও তরবারির ভয় করে কেউ তার পিছনে সালাত আদায় করে তাহলে তা ভিন্ন বিষয়।" (মাউসূআতুল ফিকহীল কুয়েতী ৯/৩১)

উপরোক্ত ফাতওয়া সমূহ থেকে বুঝা গেল, কোন অবস্থাতেই জামাআত ত্যাগ করে একাকী ঘরে সালাত আদায় করা উচিত নয়। কেননা এতে ধিরে ধিরে জামাত ত্যাগ করা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। তবে ইমাম যদি আক্বিদাগতভাবে বিদআতী না হয় এবং প্রকাশ্যে বিদআত না করে তাহলে তার পিছনেই সালাত আদায় করবে। আর যদি আক্বিদাগত বিদআতী হয় এবং তা প্রকাশ্যে করে সেক্ষেত্রে বিদআত মুক্ত ইমাম পাওয়া গেলে তার পিছনে সালাত আদায় করবে। আর যদি বিদআত মুক্ত ইমাম না পাওয়া যায় তাহলে ওয়াক্তিয়া সালাতের ক্ষেত্রে নিজেরা আলাদভাবে জামাত করে সালাত আদায় করে নিবে। আর যে সকল সালাত ভিন্নভাবে জামাত করা যায় না। যেমন: জুমুআর সালাত, ঈদের সালাত ইত্যাদি সেক্ষেত্রে বিদআতমুক্ত ইমাম না পাওয়া গেলে বিদআতির পিছনেই সালাত আদায় করবে। তবে সর্তকতার জন্য আবার নিজের ওয়াক্তিয়া সালাত আদায় করে নিবে। এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীসটি দিয়ে দলীল পেশ করা যেতে পারে:

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ »

অর্থ: "আবু যর (রা:) থেকে বর্ণিত, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন; হে আবু যর! নিশ্চয় আমার পরে আমীর ওমারা আসবে যারা সালাতকে মেরে ফেলবে (নির্দিষ্ট সময় হতে দেরি করে ফেলবে)। তখন তুমি সময়মত সালাত আদায় করে নাও। অত:পর যদি তাদের সাথে সময়ের মধ্যে আবার পর তাহলে এটা তোমার জন্য নফল হবে নতুবা তুমি তোমার সালাতকে রক্ষা করলে। (সহীহ মুসলিম ১৪৯৮; সুনানে তিরমিজি ১৭৬; সুনানে আবু দাউদ ৪৩১) এই হাদীসে দেখা গেল রাসূলুল্লাহ (সা:) প্রথমে নিজের সালাত হেফাজত করণার্থে একাকী পড়তে বললেন। পরবর্তীতে আবার জামাআতের সাথে আদায় করতে বললেন। অবশ্য এই হাদীসে যে শাসকদের কথা বলা হয়েছে তারা আক্বীদাগতভাবে বিদআতী ছিল না। বরং আমলগতভাবে গাফিল ছিল। তাই তাদের পিছনে পূনর্বার সালাত আদায় করলে সেটিকে নফল বলা হয়েছে। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা আক্বিদাগত বিদআ'তী। তাই এটি নফল না হয়ে বরং ব্যায়াম হতে পারে।

ইসলামের তৃতীয় রুকন: যাকাত

ইসলামের তৃতীয় রুকন যাকাত। এটি হচ্ছে ইসলামের অর্থনৈতিক ইবাদত। যার দ্বারা একজন মুসলিম কার্পণ্যের ব্যাধি থেকে পবিত্রতা লাভ করে এবং আল্লাহর ভালবাসাকে সম্পদের ভালবাসা থেকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। এবং দারিদ্র ও নি:স্বদের প্রতি নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়। যাকাত বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের লিখিত 'কিতাবুয যাকাত' পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল।

প্রশ্ন: যাকাতের সংজ্ঞা কি?

উত্তর: যাকাতের শাব্দিক অর্থ: বৃদ্ধি পাওয়া, বেশী হওয়া। কখনো প্রশংসা, পবিত্র করন ও সংশোধন এর অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মালের যে অংশটি ইবাদত আকারে বের করে নির্দিষ্ট খাতে ব্যায় করা হয় তাকেও যাকাত বলে। কারণ এর দ্বারা বরকতের মাধ্যমে মাল বৃদ্ধি পায় ও ক্ষমার মাধ্যমে ব্যক্তিকে পবিত্র করা হয়।

যাকাতের পারিভাষিক অর্থ: নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত মালের থেকে অত্যাবশকীয় হক্ব বের করা।

প্রশ্ন: ইসলামে যাকাতের স্থান কি?

উত্তর: যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। কুরআনে বহু স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের আলোচনা হয়েছে। যেমন-আল্লাহ (সুব:) বলেন: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الـرَّاكِعِينَ [البقــرة/٤٣** অর্থ: তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর। (সুরা বাক্বারা ২:৪৩) তিনি আরো বলেন:

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة/٥)

অর্থ: "(তারা আদিষ্ট হয়েছিল) সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। (সুরা বায়্যিনাহ ৯৮:৫)

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ ». فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ. صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ.

অর্থাৎ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, তম্মধ্যে যাকাত আদায় করা অন্যতম একটি স্তম্ভ। (সহীহ মুসলিম ১২০; সহীহ বুখারী ৮)

প্রশ্ন: যাকাতের বিধান কি?

উত্তর: প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি শর্তানুযায়ী নিসাব পরিমান মালের মালিক হলে তার উপর যাকাত ফরয। এমনকি বাচ্চা ও পাগলদের পক্ষ হতে তাদের অভিভাবক তাদের মালের যাকাত আদায় করবেন। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃত ভাবে এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বখীলতা ও অলসতা করে যাকাত দিবেনা এর জন্য তাকে ফাসেক ও কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত বলে গণ্য করা হবে। আর তার যদি এ অবস্থায় মৃত্যু হয় তবে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকবে।

প্রশ্ন: যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর: যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে: ১। ইসলাম ২। স্বাধীন ৩। নিসাবের মালিক হওয়া ৪। মালের পূর্ণ মালিক হওয়া ৫। এক বছর অতিবাহিত হওয়া। এক বছর অতিবাহিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন মালেই যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে জমি হতে উৎপন্ন ফসল ও ফল মূল ছাড়া।

প্রশ্ন: যাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি? তার নিসাব ও যাকাতের পরিমান ইত্যাদি বর্ণনা করুন?

উত্তর: পাঁচ শ্রেণীর মালে যাকাত ফরজ হয়।

প্রথম: সোনা, রূপার ও অনুরূপভাবে তার স্থলাভিষিক্ত প্রচলিত কাগজের মুদ্রার উপর যাকাত ফরজ। আর তাতে যাকাতের পরিমাণ হলো ربع العشر (রুবু'ল উ'শর) চল্লিশ ভাগের একভাগ। আর রুবু'ল উ'শরের পরিমাণ হলো শতকরা আড়াই ভাগ। এক বছর অতিবাহিত ও নিসাব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। সোনার নিসাবের পরিমাণ হলো বিশ মিছকাল। আর এক মিছকালের ওজন (৪.২৫) গ্রাম। অতএব সোনার নিসাব হলো (৮৫) গ্রাম বা ৭.৫ তোলা। রূপার নিসাবের পরিমাণ হলো দু'শত দিরহাম। আর এক দিরহামের পরিমাণ হলো (২.৯৭৫)। সুতরাং রূপার নিসাব হলো (৫৯৫) গ্রাম বা ৫২.৫ তোলা। বর্তমান কাগজের মুদ্রার নিসাবের পরিমাণ হলো: তার মূল্য পঁচাশি (৮৫) গ্রাম সোনার অথবা পাঁচশত পঁচানব্বই (৫৯৫) গ্রাম রূপার সমান হতে হবে। এই পরিমান মালের মালিক হওয়ার পর এক বছর অতিক্রম করলে যাকাত ফরজ হবে।

দ্বিতীয়: চতুস্পদ জন্তু- আর তা হলো, উট, গরু, ছাগল। আর এগুলোতে যাকাত ফরজ হবে যখন সায়েমা হবে। সায়েমা ঐ সকল পশু যা বছরের অধিকাংশ দিনগুলো মাঠে বিচরণ করে বেরায় এবং প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে লালিত-পালিত হয়। যখন নিসাব পূর্ণ হবে এবং এর উপর এক বছর অতিবাহিত হবে তখন যাকাত ওয়াজিব হবে।

গৃহপালিত পশুর যাকাতের তালিকা। শুধু গরু ও ছাগলের:

গরু/মহিষের সংখ্যা	ধার্যকৃত যাকাতের পরিমাণ
১ থেকে ২৯ পর্যন্ত	যাকাত প্রদেয় হয় না
৩০ থেকে ৩৯ পর্যন্ত	১টি ১ বছর বয়সের ষাড়
৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত	১টি ২ বছর বয়সের গাভী
৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত	২টি ১ বছর বয়সের ষাড় বা গাভী
৭০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত	১টি ২ বছর বয়সের গাভী এবং ১টি ১ বছর বয়সের ষাড়
৮০ থেকে ৮৯ পর্যন্ত	২টি ২ বছর বয়সের গাভী
৯০ থেকে ৯৯ পর্যন্ত	৩টি ১ বছর বয়সের গাভী
১০০ থেকে ১০৯ পর্যন্ত	১টি ২ বছর বয়সের গাভী এবং ২টি ১ বছর বয়সের ষাড়
১১০ থেকে ১১৯ পর্যন্ত	২টি ২ বছর বয়সের বয়সের ষাড় গাভী এবং ১টি ১ বছর বয়সের ষাড়
১২০ থেকে ১২৯ পর্যন্ত	৩টি ২ বছর বয়সের গাভী এবং ৪টি ১ বছর বয়সের ষাড়

অর্থাৎ যদি গরু বা মহিষের সংখ্যা ৭৯টির উপর হয় তাহলে প্রতি ৩০টিতে একবছরের একটি বাছুর, আর প্রতি ৪০টিতে একবছরের একটি বক্না দিতে হবে।

শ্রেণী	নিসাবের পরিমাণ (হতে – পর্যন্ত)	নির্ধারিত পরিমাণ
ছাগল	৪০----------১২০	একটি ছাগল দিতে হবে।
	১২১---------২০০	দু'টি ছাগল দিতে হবে।
	২০১---------৩০০	তিনটি ছাগল দিতে হবে।

আর যদি ছাগলের সংখ্যা ৩০০ শত এর বেশী হয় তাহলে প্রতি ১০০ শতে একটি ছাগল দিতে হবে।

তিন: ফসল ও ফলাফল

অধিকাংশ আলেমদের মতে উৎপাদিত ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবে নিসাব পূর্ণ হলে। আর তাদের নিকট তার নিসাব হল পাঁচ ওয়াসাক। আর এক ওয়াসাক সমান ষাট সা'। সুতরাং নিসাবের পরিমাণ হলো তিনশত সা'। আর ভাল গমের দ্বারা নিসাবের পরিমাণ হবে ছয়শত বায়ান্ন কিলো ও আটশত গ্রাম। ফসল ও ফলের যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য একবছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। ফসল কাটার দিন তা আদায় করতে হবে।

যে সকল ফসল বিনা পরিশ্রমে সার, পানি সরবরাহ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তাতে যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হলো দশ ভাগের এক ভাগ, আর যে সকল ফসল পরিশ্রমের দ্বারা সার, পানি সরবরাহ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তাতে নির্ধারিত পরিমাণ হলো: বিশ ভাগের এক ভাগ।

চার: ব্যবসা সামগ্রী

মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসার জন্য যে মাল প্রস্তুত করেছে তাকে ব্যবসা সামগ্রী বলে। তা যে কোন শ্রেণীর মাল হোক না কেন। যাকাতের সাধারণ সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। নিসাব পূর্ণ হলে তাতে যাকাত ফরজ হবে। ব্যবসা সামগ্রীর মূল্য সোনা ও রূপার নিসাবের সমান হওয়া গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত বের করার সময়ে বাজার মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে। পূর্ণ মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত বের করা ফরজ হবে। ব্যবসার লভ্যাংশ তার আসল মালের সাথে মিলাবে, যদি নিসাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার যাকাত দানে নতুন বছরের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আর যদি লভ্যাংশ ছাড়া আসল মালে নিসাব পূর্ণ না হয় তাহলে নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় হতে বছর শুরু/গণ্য হবে।

পাঁচ: খনিজ সম্পদ ও রিকায বা মাটিতে পুঁতে রাখা মাল

(ক) খনিজ সম্পদ:

খনিজ সম্পদ ঐ সকল বস্তু যা জমি হতে নির্গত হয়, তথায় জন্ম নেয় যা জমির মূল্যবান উৎপন্ন নয় এবং উদ্ভিদও নয়। যেমন সোনা-রূপা, লৌহ, তামা, ইয়াকুত পাথর ও পেট্রোল ইত্যাদি। আর তাতে যাকাত ফরজ। অধিকাংশ আলেমদের নিকট খনিজ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য

নিসাব পূর্ণ হওয়া শর্ত। আর খনিজ সম্পদে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সোনা-রূপার যাকাতের পরিমাণের উপর ক্বিয়াস বা তুলনা করে নিসাব পূর্ণ করা হবে। তাতে এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। তা যখন সংগ্রহ হবে তখনই তাতে যাকাত ফরজ হবে।

(খ) রিকায-মাটিতে পুঁতে রাখা ধনসম্পদ:

জাহিলি যুগের মাটির গর্ভে-গচ্ছিত সম্পদ, অথবা পূর্ববর্তী কাফির সম্প্রদায়ের সম্পদ তার উপর বা তার কিছুর উপর কুফুরের নির্দশন হয় যেমন তাদের নাম, তাদের রাজাদের নাম, তাদের ছবি, তাদের পৃষ্ঠদেশ ও শুধু তাদের প্রতিমার বক্ষদেশ থাকে (তা হলেও তা রিকায হবে)। আর যদি তার উপর বা তার কিছুর উপর মুসলিমদের নিদর্শন থাকে, যেমন নবী (সা:) নাম বা মুসলিমদের খলীফাদের কারও নাম বা কুরআন কারীমের আয়াত। তা হলে তা (লুক্বতা) পথে পড়ে থাকা বস্তু হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি তাতে কোন নির্দশন না থাকে, যেমন পাত্র, স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সাজ-সজ্জা, স্বর্ণের বিস্কুট তা হলেও তা লুক্বতা হবে, আর তা প্রচার করার আগ পর্যন্ত কেহই তার মালিক হবে না। কারণ তা হল মুসলিম ব্যক্তির মাল, আর তা হতে তার মালিকানা নষ্ট হয়ে যায় নাই। আর রিকাযে (মাটি গর্ভে গচ্ছিত রাখা সম্পদে) এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ফরজ।

অধিকাংশ আলেমদের নিকট রিকায, কম হোক বা বেশী হোক তাতে যাকাত ফরজ হবে। তাদের নিকট তা বন্টনের খাত হল ফাই (যুদ্ধ বিহিন অমুসলিম শত্রুর সম্পদ যা মুসলিমরা অর্জন করে) বন্টনের খাত। যে ব্যক্তি তা পাবে সে বাকী রিকাযের মালিক হবে, এতে আলেমদের কোন মতনৈক্য নেই। কারণ ওমর (রা:) অবশিষ্ট রিকায তার প্রাপককে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন: যাকাত বন্টনের খাত সমূহ কি কি?

উত্তর: আট শ্রেণীর লোক যাকাত পাওয়ার হক্বদার। নিম্নে তাদের তালিকা প্রদত্ত হলো:

প্রথমত: الفقراء (ফকির) গরীব সম্প্রদায়

ক) যারা অভাবে আছে এবং নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে পারে না তারাই গরিব। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে গরীব তারাই যাদের কোন সহায়-সম্পত্তি নেই এবং জীবিকা অর্জনের মতো উপায়-অবলম্বন নেই।

হানাফীপন্থী আলেমদের মতে, যে পরিমাণ অর্থ থাকলে যাকাত ধার্য হতে পারে তার চেয়ে কম পরিমাণ অর্থের মালিকদের গরীব বলে। মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর দিক থেকে গরীবদের অবস্থা অভাবীদের (মিসকীনদের) চেয়ে খারাপ। যাহোক, কোন কোন চিন্তাবিদ বিপরীত ধারণা পোষণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ফকীর এবং মিসকীনদের মধ্যে এরূপ পার্থক্য নির্দেশের কোন বাস্তব কার্যকারিতা নেই। কারণ ফকীর এবং মিসকীন উভয় ধরণের লোকই যাকাত পাওয়ার যোগ্য।

খ) ফকীরদের যাকাত বাবদ যে অর্থ প্রদান করা হবে তা তাদের এক বছরের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মিটানোর উপযোগী হওয়া উচিত। যে সময়ে এবং যে এলাকায় যাকাত প্রদান করা হচ্ছে সে সময় এবং সে এলাকার প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী মৌলিক প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে।

গ) আইন অথবা আলেমদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাকাত পাওয়ার যোগ্য ফকীরদের কোন লালনকারী না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর ফকীরদের নামের শেষে কুয়েতি যাকাত হাউজের (অনুচ্ছেদ ৪) যাকাত বিতরণ নিয়মাবলিতে প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে উল্লেখিত তালিকা অনুযায়ী নিম্নোক্তরা যুক্ত হবে: এতিম, পরিত্যাক্ত শিশুদের নিয়ে গঠিত শিশুসদন, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত, অসুস্থ ও পঙ্গু ব্যক্তি, খুব কম আয়ের লোক, ছাত্র, বেকার, জেলবন্দী ও যুদ্ধবন্দীদের পরিবার।

তাদেরকে পূর্ণ বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ যাকাত দেওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: اَلْمَسَاكِيْنُ মিসকীন: অধিকাংশ আলেমদের মতে মিসকীন বলতে তাদের বুঝায় যাদের আয় মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। তবে আবূ হানিফা (র:) যাদের কোন আয় নেই তাদেরকে মিসকীন বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যাকাতের ব্যাপারে মিসকীন লোকেরা ফকীরদের সম পর্যায়ভুক্ত। হানাফী ও মালেকী মতের আলেমরা মনে করেন, যাকাতের দিক থেকে অভাবীরা (মিসকীন) গরিবদের (ফকির) চেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। অবশ্য হাম্বলী এবং শা'ফী মতের আলেমরা ফকীরদের যাকাত পাওয়ার অধিক যোগ্য বলে মনে করেন।

তৃতীয়ত: اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا যাকাত আদায়কারী: আর তারা হলেন, ঐ সমস্ত কর্মচারী যারা যাকাত দাতাদের নিকট হতে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং নেতার আদেশে তার হক্বদারের নিকট বিতরণ করেন। তাদেরকে তাদের কর্মের পারিশ্রমিক হিসাবে যাকাত ফান্ড থেকে প্রদান করা হবে।

চতুর্থত: اَلْمُؤَلَّفَاتُ قُلُوْبُهُمْ যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য হবে: আর তারা দু' শ্রেণীর লোক: কাফির এবং মুসলিম।

অত:পর কাফিরকে যাকাত দেওয়া হবে যখন তার ইসলাম গ্রহণ করার প্রত্যাশা করা যাবে ইত্যাদি।

আর মুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া হবে তার ইসলাম গ্রহণকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বা তারমত আরও একজনের ইসলাম গ্রহণের আশায়। এরকম অন্য আরো কারণে।

পঞ্চমত: فِيْ الرِّقَابِ দাস মুক্ত: আর তারা হলেন ঐ সমস্ত মুকাতিব দাস যাদের কাছে তাদের মালিকের সাথে কৃত চুক্তি পরিশোধের পয়সা নাই। তাই মুকাতিব দাসকে যাকাত হতে যে পরিমাণ প্রদান করলে সে দাসত্ব হতে মুক্তি পেতে সামর্থ্যবান হবে সে পরিমাণ প্রদান করা হবে।

ষষ্ঠতম: اَلْغَارِمِيْنَ ঋণগ্রস্তদেরকে: আর তারা দু' ভাগে বিভক্ত: নিজেদের জন্য ঋণগ্রস্ত এবং অন্যের কারণে ঋণগ্রস্ত।

নিজের জন্য ঋণগ্রস্ত: সে ঐ ব্যক্তি যে নিজের অভাবের কারণে ঋণ করেছে আর তা পরিশোধে সে সামর্থ্যবান নয়। তাই যাকাত হতে তাকে যে পরিমাণ দিলে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।

অন্যের কারণে ঋণগ্রস্ত: সে ঐ ব্যক্তি যে পরস্পরের মাঝে সংশোধন-ফায়সালা করার জন্য ঋণী হয়েছে। তাই সে ঋণী হলে যাকাত হতে যে পরিমাণ দিলে সে ব্যাপারে তার সহযোগিতা হবে, সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।

সপ্তমত: فِيْ سَبِيْلِ اللهِ যারা আল্লাহর রাস্তায় রয়েছেন তাদেরকে: এর দ্বারা মুল উদ্দেশ্য হলো: যারা জিহাদে রয়েছেন। সুতরাং যে সকল মুজাহিদদের বেতন বাইতুল মালের পক্ষ হতে নির্ধারিত নেই তাদেরকে যাকাত প্রদান করা হবে।

অষ্টমতঃ ابْنُ السَّبِيْلِ **মুসাফিরঃ** সে ঐ মুসাফির যার সব কিছু রাস্তায় শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে তার দেশে পৌঁছার মত খরচ নেই। সুতরাং যাকাত হতে যে পরিমাণ তাকে দিলে সে তার দেশে পৌঁছতে পারবে সে পরিমাণ যাকাত তাকে প্রদান করা হবে। আল্লাহ (সুবঃ) এই শ্রেণীগুলো পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেনঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ "বস্তুতঃ সাদ্‌কা ফকীরদের, মিসকীনদের, তা আদায়কারীদের, যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য হবে তাদের, দাস মুক্তির, ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ও মুসাফিরদের জন্য। আল্লাহর কর্তৃক ফরয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সুরা তাওবাহ ৯:৬০)

প্রশ্নঃ যাকাতুল ফিত্বর কি এবং কেন?

উত্তরঃ সিয়াম সাধনাকারীদেরকে অনর্থক কথা-কাজ, সহবাস ও তার আনুসাংগিক কর্ম হতে পবিত্র করার জন্য যাকাতুল ফিত্বর চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও মিসকীনদের খাদ্য হিসাবে ও তাদেরকে ঈদের দিন মানুষের কাছে চাওয়া হতে মুক্ত রাখার জন্য চালু করা হয়েছে।

(ক) যাকাতুল ফিত্বর এর হুকুম-বিধানঃ প্রত্যেক মুসলিম নারী, পুরুষ, ছোট, বড়, স্বাধীন ও কৃতদাসের উপর যাকাতুল ফিত্বর আদায় করা ওয়াজিব। ঈদের রাতে এবং ঈদের দিন যদি সে নিজের ও তার পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতিরিক্ত সম্পদের মালিক হয়, তবে তাকে যাকাতুল ফিত্বর দিতে হবে। যাকাতুল ফিত্বর নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। যেমনঃ স্ত্রী ও সন্তানাদি। আর যদি তাদের নিজস্ব সম্পদ থাকে তাহলে তাদের সম্পদ থেকে যাকাতুল ফিত্বর আদায় করতে হবে। পেটের বাচ্চার পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিত্বর দেয়া ওয়াজিব না। তবে যদি কোন ব্যাক্তি আদায় করে দেয় তাহলে নফল সাদাকা হিসাবে আদায় হবে।

হানাফী ওলামাদের মতে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা তার মূল্য যার নিকটে

থাকবে তার উপর যাকাত ও সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। তবে যাকাত এবং সাদাকাতুল ফিতরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাকাতের জন্য উল্লেখিত নেসাব পরিমান মাল বা তার মূল্যের উপর বছর অতিক্রম হওয়া আবশ্যকীয়। কিন্তু সাদাকাতুল ফিতরের জন্য বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়। শুধু ঐ মুহূর্তে (ঈদের দিন 'সুবহে সাদিকের' সময়) নেসাব পরিমাণ মাল বা তার মূল্য হলেই সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। (ফতওয়ায়ে কাজী খান, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৪)

(খ) ফিৎরার পরিমাণঃ শহরের প্রধান খাদ্য যেমন-গম, যব, খেজুর, কিসমিস-মুনাক্কা, পনির, চাল ও ভুট্টা হতে যাকাতুল ফিতরের নির্ধারিত পরিমাণ হল এক সা'। আর এক সা' প্রায় দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম এর সমান। আর অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট ফিৎরার মূল্য বের করা জায়েয নয়। কারণ ইহা রাসূল (সাঃ) যা আদেশ দিয়েছেন তার বিপরীত এবং সাহাবাদের আমলের পরিপন্থী।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সাদাকায়ে ফিতরের পরিমান হলো জব বা জবের আটা হলে এক সা' প্রদান করবে। এক সা' সমান তিন কেজি ২৬৪ গ্রাম (হানাফী মাযহাব মতে 'সা'য়ের হিসাব অনুযায়ী)। আর গম বা তার ময়দা হলে অর্ধ সা' (দেড় কেজি ১৩২ গ্রাম তথা পৌনে দুই সের)।

(গ) ফিৎরা আদায় করার সময়ঃ ফিৎরা আদায় করার দুইটি সময় রয়েছেঃ (ক) জায়েয সময়ঃ আর তা হলো, ঈদের একদিন বা দু' দিন আগে আদায় করা। (খ) উত্তম সময়ঃ আর তা হলো, ঈদের দিনের ফজর উদিত হওয়া হতে ঈদের সালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত। কেউ যদি তা ঈদের সালাতের পরে আদায় করে তবে তা সাধারণ সাদ্‌কা (দান) হিসাবে গণ্য হবে। আর সে এই বিলম্বের কারণে গুনাহগার হবে।

(ঙ) যাকাতুল ফিত্বর বিতরণের খাতঃ যাকাতুল ফিত্বর ফকীর ও মিসকীন এর জন্য বিতরণ করা হয়। কারণ অন্যদের চাইতে এরাই এর অধিক হক্বদার।

যাকাত ও ফিতরা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের 'কিতাবুয যাকাত' ও 'কিতবুস সাওম' বই দুটি পড়তে পারেন।

ইসলামের চতুর্থ রুক্নঃ রামাদানের সিয়াম সাধনা

ইসলামের চতুর্থ রুকন সিয়াম। তার মাধ্যমে একজন মুসলিম কামনা-বাসনা ও কু-প্রবৃত্তির বিরূদ্ধে আত্মিক ও ঈমানি প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে এবং নিজ আত্মাকে পাশবিক শক্তির তুলনায় শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়। সিয়াম নামক ঢাল ব্যাবহার করে পাপাচার সমূহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। তাছাড় রোগ-ব্যাধির বিরূদ্ধেও সিয়াম এক মহা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা দেহের বিষক্রিয়া, স্থুলতা, কৌশিক রোগ, মানসিক ব্যধি প্রতিরোধ করে। সিয়াম বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের লিখিত 'কিতাবুস সাওম' পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

প্রশ্নঃ সিয়ামের সংজ্ঞা কি?

উত্তরঃ সিয়ামের শাব্দিক অর্থ: বিরত থাকা।

পারিভাষিক অর্থ: ফজরে সানী বা সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম ভঙ্গের সকল প্রকার কারণ যথা: খানা-পিনা, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি হতে বিরত থাকা।

প্রশ্নঃ রামাদান মাসের সিয়াম সাধনের বিধান কি?

উত্তরঃ রামাদানের সিয়াম ইসলামের রুক্ন সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি রুক্ন ও তার মহান স্তম্ভ। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পারো। (সুরা বাক্বারাহ ২:১৮৩)

হিজরী সনের দ্বিতীয় বর্ষে মুসলিম উম্মার উপর রামাযানের সিয়াম সাধন ফরয হয়েছে।

প্রশ্নঃ সিয়াম ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ কি কি?

উত্তরঃ প্রত্যেক বালেগ, প্রাপ্ত বয়স্ক, আকেল, জ্ঞানবান, সহীহ-সুস্থ, মুকীম, মুসলিম ব্যক্তির উপর সিয়াম ফরয হওয়ার উপর সকল আলেমগণ একমত

হয়েছেন। হায়েয ও নিফাসরত মহিলাদের উপর সিয়াম সাধন ফরয নয়। তবে পরবর্তীতে কাজা করতে হবে।

প্রশ্নঃ সিয়াম সাধনের আদাব সমূহ কি কি?

উত্তরঃ (ক) গিবাত করা, চুগোলখোরী করা এবং এ দু'টি ছাড়াও অন্যান্য কর্ম যা আল্লাহ হারাম করেছেন তা থেকে সিয়াম সাধনকারীর বিরত থাকা। তাই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর অপরিহার্য যে, সে তার যবানকে সকল হারাম কথাবার্তা হতে ও অন্যদের চরিত্রতে আঘাত হানা হতে বিরত রাখবে।

(খ) সিয়াম সাধনকারী সাহ্‌রী খাওয়া ছাড়বেনা। কারণ ইহা তাকে তার সিয়াম সাধনে সহযোগীতা করে। (গ) নিশ্চিতভাবে সূর্য ডুবার সাথে সাথেই ইফতার করা। (ঘ) রুত্বাব (অধাপাকা খেজুর) বা খেজুর দিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করবে, কারণ ইহা সুন্নাত। (ঙ) কুরআন পাঠ, আল্লাহর (সুবঃ) যিকির, তার প্রশংসা, তার শুকরিয়া, দান, দয়া, নফল ইবাদাত ও অন্যান্য সৎকাজ বেশী বেশী করা।

প্রশ্নঃ সিয়াম বিনষ্ট কারী বিষয় সমূহ কি কি?

উত্তরঃ ১) দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা। ২) রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা। ৩) চুমু, সহবাস বা হস্ত মৈথুনে বীর্য বের করা। ৪) পাকস্থলীতে বিদ্যমান বস্তু মুখ দিয়ে বের করে ইচ্ছা কৃত বমি করা। ৫) হায়েয ও নিফাস দেখা দিলে।

প্রশ্নঃ সিয়ামের সাধারণ বিধান সমূহ কি কি?

উত্তরঃ ১) চাঁদ দেখার মাধ্যমে রামাদান মাসের সিয়াম সাধন ফরয প্রমাণিত হবে। চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন ন্যায় পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষীই যথেষ্ট। সারা দুনিয়ার কোন এক প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলেই গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। এজন্য আলাদা আলাদাভাবে চাঁদ দেখা কমিটি তৈরী করার কোন প্রয়োজন নেই। সারা দুনিয়ার মুসলিম জাতি যেভাবে জুমুআর সালাত একই দিনে স্থানীয় সময়মত আদায় করে ঠিক তেমনিভাবে গোটা বিশ্বের মুসলিম জাতি

রামাদানের নতুন চাঁদ দেখে একই দিনে স্থানীয় সময় অনুযায়ী সিয়াম শুরু করবে। আবার গোটা পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে ঈদের চাঁদ দেখা গেলে গোটা পৃথিবীর মানুষ একই দিনে একই তারিখে স্থানীয় সময়ানুযায়ী ঈদ পালন করবে। চাঁদ বিষয়ক বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের 'কিতাবুস সাওম' এর শেষাংশ পড়ার জন্য অনুরোধ করা গেল।

২) প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে যে ব্যক্তি রামাদান মাস পাবে তার উপর সে মাসের দিন গুলো চাই তা ছোট হোক বা বড় হোক সিয়াম সাধন করা ফরয হবে।

৩) রামাদান মাসে সিয়াম সাধন কারীর জন্য রাতেই সিয়ামের নিয়াত করা আবশ্যক।

৪) ওজরযুক্ত ব্যক্তি যেমন অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তি, হায়েয বা নিফাসরত মহিলা, গর্ভধারিণী মহিলা, বাচ্চাকে দুধপানকারীনি মহিলা ছাড়া কারো জন্য রামাদান মাসের সিয়াম সাধন ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়। অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে, যদি সিয়াম সাধন তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর হয়। এদের মধ্যে যারা পরবর্তীতে কাযা করতে পারবে তারা কাযা করবে আর যারা কাজা করতে অক্ষম তারা 'ফিদইয়া' দিবে। 'ফিদইয়া' হচ্ছে একজন মিসকিনের একদিনের খাবার।

৫) সফর বা ভ্রমণ হল সিয়াম সাধন ছেড়ে দেওয়ার গ্রহণযোগ্য কারণ সমূহের একটি কারণ। অবশ্য পরে কাযা করতে হবে।

'সিয়াম' বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের লিখিত 'কিতাবুস সাওম' পড়ুন।

পঞ্চম রুকন: হজ্জ

ইসলামের পঞ্চম রুকন 'বায়তুল্লাহর হজ্জ' পালন করা। যা একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের এক বিরাট আমলী রূপ। যা তার নাফস থেকে আল্লাহর বিরোধিতার শেকড় সমূহ উপড়ে ফেলে এবং একত্ববাদী প্রেরণায় তাকে উজ্জিবিত করে। কাবার তাওয়াফ তাকে এ প্রশিক্ষন দেয় যে, পুরো জীবন কাবার রবের ইবাদতকে কেন্দ্র করেই আবর্তীত হবে। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষনায় দেখা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ কাবার চারপাশে যেভাবে তাওয়াফ করে মহা বিশ্বের ছোট-বড় সবকিছু একে অপরকে কেন্দ্র করে সেভাবেই তাওয়াফরত রয়েছে। পরমানু নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রোন। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে মাসে একবার তাওয়াফ করছে চন্দ্র। আর সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী তাওয়াফ করছে বছরে একবার। গ্যালাক্সির কালো গহবরকে কেন্দ্র করে সূর্য তাওয়াফ করছে সময়ের এক বিরাট পরিসরে। এভাবেই আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ সহকারে তাওয়াফরত রয়েছে গোটা মহাবিশ্ব। হজ্জ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের লিখিত 'কিতাবুল হজ্জ' পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল।

প্রশ্ন: হজ্জের সংজ্ঞা কি?

উত্তর: **اَلْحَجُّ فِي اللُّغَةِ** হজ্জের শাব্দিক অর্থ: اَلْقَصْدُ (আল কাসদু) ইচ্ছা করা। আরবী ভাষায় বলা হয়: حَجَّ إِلَيْنَا فُلَانٌ অমুকে আমাদের নিকট হজ্জ করেছে। অর্থাৎ সে আমাদের নিকট আসার ইচ্ছা করেছে ও আমাদের নিকট এসেছে।

وَفِي الشَّرْعِ ইসলামের পরিভাষায় হজ্জ অর্থ: নির্ধারিত শর্তসহ নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদাত করার জন্য মক্কায় গমণের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে।

প্রশ্ন: হজ্জের হুকুম কি?

উত্তর: সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর তার জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যাপারে উম্মাত ঐক্যমত পোষণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَلِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران/٩٧]

অর্থ: "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্যকর্তব্য। কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ বিশ্ব-জগতের থেকে অ-মুখাপেক্ষী। (সুরা আল-ইমরান ৩:৯৭)

রাসূলুল্লাহ (সা:) বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা:) আমাদের নিকট খুতবা দিলেন এবং বললেন, হে মানব জাতি! আল্লাহ তোমাদের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ কর। (সহীহ মুসলিম ৩৩২১; মুসনাদে আহমদ ১০৬০৭; সুনানে বায়হাকী ৮৮৭৭)

প্রশ্ন: হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত কি কি?

উত্তর: হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. (**اَلْمُسْلِمُ**) মুসলিম হওয়া।

২. (**اَلْعَاقِلُ**) সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, অর্থাৎ পাগল না হওয়া।

৩. (**اَلْبَالِغُ**) বালেগ হওয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৪. (**اَلْحُرُّ**) স্বাধীন হওয়া অর্থাৎ গোলাম না হওয়া।

৫. (**اَلْاِسْتِطَاعَةُ**) হজ্জ করার মত দৈহিক ও আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা। অর্থাৎ সফরকালীন সময়ের জন্য আপন পরিবার-পরিজনের আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা রেখে মক্কা মুকার্‌রমা পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হওয়া এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা।

৬. (**اَلْمَحْرَمُ لِلنِّسَاءِ**) মহিলাদের জন্য সঙ্গে মাহ্‌রাম থাকা।

প্রশ্ন: হজ্জ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: হজ্জ তিন প্রকার। (১) **اَلْاِفْرَادُ** হজ্জে ইফরাদ (২) **اَلْقِرَانُ** হজ্জে কিরান (৩) **اَلتَّمَتُّعُ** হজ্জে তামাত্তো।

এই তিন প্রকার হজ্জ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(১) হজ্জে ইফরাদ: হজ্জের মাস সমূহে (শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জের প্রথম অর্ধমাস) মীকাত থেকে শুধুমাত্র হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাকে "হজ্জে ইফরাদ" বলা হয়। এতে কোন ওমরাহ্ পালন করা হয় না। এবং এই প্রকার হজ্জের পর দমে শোকর বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজীব নয় বরং মুস্তাহাব। হজ্জে ইফরাদ পালনকারী ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার সময় মুখে **لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ بِحَجٍّ** (লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা বিহাজ্জিন) পাঠ করবে।

(২) হজ্জে কিরান: হজ্জের মাসসমূহে মিকাত থেকে ওমরাহ ও হজ্জ উভয়টির জন্য একসাথে ইহরাম বেঁধে উভয়টি আদায় করাকে "হজ্জে কিরান" বলা হয়।

হানাফী ওলামাদের মতে এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো মিকাত থেকে হজ্জ এবং ওমরাহ উভয়টির জন্য ইহরাম বেঁধে প্রথমে ওমরাহ পালন করে ইহরাম না খুলে ঐ ইহরামেই হজ্জ সম্পাদন করা। এ নিয়মে, ওমরার তাওয়াফ এবং সায়ী করার পর হজ্জের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ ইহরাম পরিহিত অবস্থায় থাকতে হবে। মাথার চুল মুণ্ডানো বা কাটানো যাবে না; বরং হজ্জের শেষ পর্যায়ে হজ্জের কুরবানীর পর মাথা মুণ্ডাতে হবে। অর্থাৎ ওমরাহ আদায়ের পর যদি হজ্জ শুরু হতে আরও ২/১ দিন বা ২/১ সপ্তাহ বাকী থাকে, তবে ঐ ইহরাম অবস্থাতেই থাকতে হবে এবং হজ্জের কুরবানী আদায়ের পর ইহরাম খুলতে হবে।

তবে জুমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে "হজ্জে কিরান" পালনকারী ব্যক্তি তাওয়াফ এবং সায়ী একবার করবে। এবং এটাই হজ্জ এবং ওমরাহ উভয়টার জন্য যথেষ্ট হবে। এই প্রকার হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি ইহরাম

বাঁধার সময় মুখে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ (লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা বিহাজ্জাতিন ওয়া ওমরাতিন) উচ্চারণ করবে।

“হজ্জে কিরান” আদায়কারী ব্যক্তির জন্য সকলের ঐক্যমতে দমে শোকর বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজীব।

(৩) হজ্জে তামাত্তো: হজ্জের মাসসমূহে মীকাত থেকে ওমরাহর জন্য ইহরাম বেঁধে প্রথমে ওমরাহ পালন করে ইহরাম খুলে ফেলা, অত:পর হজ্জের জন্য পুনরায় ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করাকে “হজ্জে তামাত্তো” বলে। সুতরাং “হজ্জে তামাত্তো” পালনকারী ব্যক্তি ওমরাহ পালন শেষে ইহরাম খুলে সাধারণ সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করবেন। ৮ই যিলহজ্জ মিনা যাওয়ার প্রাক্কালে হজ্জের নিয়্যতে পুনরায় ইহরাম বাঁধবেন। এই জন্য এই নিয়মে ‘ইহরাম’ দীর্ঘায়িত হয় না। হাজী সাহেবদের জন্য এই নিয়ম সহজ ও অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক। তাই অধিকাংশ হাজী সাহেবগণ ‘তামাত্তো হজ্জ’ করে থাকেন। তাছাড়া মহিলাদের জন্য ‘হজ্জে তামাত্তো’ আদায় করাটাই অধিক সমীচীন। তামাত্তো হজ্জে ‘দমে শোকর’ বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজীব।

প্রশ্ন: হজ্জের আর্‌কান বা রুক্‌ন সমূহ কি কি?

উত্তর: হজ্জের রুকন চারটি: (হানাফীদের মতে তিনটি)

(১) ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ মনে মনে হজ্জের নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করা।

(২) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জ দ্বিপ্রহরে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে ১০ই জিলহজ্জ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় এক মুহুর্তের জন্য হলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

(৩) ‘তাওয়াফে যিয়ারত’ করা অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জ ভোর থেকে ১২ই জিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাইতুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করা।

(৪) হানাফীগণ ব্যতিত অন্যান্য ইমামদের মতে সাফা-মারওয়া সায়ী করা হজ্জের চতুর্থ রুকন। হানাফীদের মতে এটি ওয়াজিব।

প্রশ্ন: হজ্জের ওয়াজিব সমূহ কি কি?

উত্তর: হজ্জের সর্বমোট ওয়াজিব সাতটি: (হানাফী আলেমদের মতে ছয়টি) (১) মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা। (২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। (৩) মুয্‌দালিফায় রাত্রি যাপন। (৪) আইয়্যামে তাশ্‌রীকের (১১, ১২ ও ১৩ই- যুলহাজ্জাহর) রাত্রি গুলোতে মিনায় রাত্রি যাপন করা (এটি হানাফী আলেমদের মতে সুন্নাত)। (৫) জামারাত গুলোতে কঙ্কর মারা। (৬) মাথার চুল মুন্ডানো বা ছোট করা। (৭) তাওয়াফুল বি‘দা করা।

প্রশ্ন: হজ্জের সুন্নত সমূহ কি কি?

উত্তর: হজ্জের সুন্নত সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) মীকাতের বাইরে থেকে আগমনকারীদের জন্য ‘তাওয়াফে কুদূম’ করা।

(২) তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করা।

(৩) যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সেই তাওয়াফে রমল[১] এবং ইযতিবা করা[২]।

(৪) সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে যে দু'টো সবুজ স্তম্ভ আছে তার মধ্যবর্তী স্থান দৌড়ে অতিক্রম করা; তবে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(৫) মক্কায় ৭ তারিখে, আরাফাতে ৯ তারিখে এবং মিনায় ১১ তারিখে ইমামের খুতবা শোনা।

(৬) ৮ তারিখ ফজরের পর মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হওয়া, যেন মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া যায়।

(৭) ৮ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় কাটানো।

(৮) সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওয়ানা হওয়া।

(৯) উকুফে আরাফার জন্য গোসল করা।

(১০) আরাফাত থেকে ফেরার সময় মুযদালিফায় রাতে অবস্থান করা।

(১১) সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনায় রওয়ানা হওয়া।

---

[১] প্রথম তিন চক্করে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বীরদর্পে চলা।

[২] চাঁদরের মাঝখান ডান বগলের নিচে রেখে দুই পার্শ্ব বাম কাধের উপর রেখে দেওয়া। এবং ডান কাঁধ খালি করে দেওয়া হবে।

(১২) ১০ এবং ১১ তারিখের রাত মিনায় কাটানো এবং ১৩ তারিখেও মিনায় থাকলে ১২ তারিখ দিবাগত রাতও সেখানে কাটানো। (হানাফী মাযহাব মতে সুন্নত অন্যান্য ইমামদের মতে ওয়াজিব)।

প্রশ্ন: কি কি কারণে হজ্জ ভেঙ্গে যায় এবং কি কি কারনে কাফফারা ওয়াজিব হয়?

উত্তর: হজ্জ ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ এবং যেসব কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

* কেউ যদি হজ্জের কোন রোকন ত্যাগ করে তবে তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে।

* কংকর ছোঁড়া পরিত্যাগ করলে 'দম' (কাফফার) দিতে হবে।

* হজ্জের যে কাজগুলো তারতীব বা ক্রমানুসারে করতে হয় সেগুলো তারতীব অনুসারে না করলে হানাফী মাযহাব মতে 'দম' দিতে হবে। অন্যান্য ইমামদের মতে আগে-পরে করলে কোন অসুবিধা নেই।

* সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের ময়দান থেকে বের হলে 'দম' দিতে হবে। কোন ওযর ব্যতীত মুযদালিফায় উকুফ বা অবস্থান না করলে 'দম' দিতে হবে।

* নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মাথা মুন্ডালে বা চুল ছাঁটলে 'দম' দিতে হবে।

* ওযর ব্যতীত সুগন্ধি ব্যবহার করলে 'দম' দিতে হবে। ওযরবশত: ব্যবহার করলে 'দম' অর্থাৎ পশু কুরবানী বা তিনটি সাওম বা ৬ জন মিসকীনকে সাদাকায়ে ফিতরের পরিমাণ গম বা তার মূল্য প্রদান- এই তিনটির যে কোন একটি করতে হবে।

* সেলাই করা কাপড় যদি একদিন একরাত অর্থাৎ পুরো একদিন পরিধানে থাকে তবে 'দম' আর এর কম পরিমান সময় হলে সাদাকায়ে ফিতরের পরিমান গম বা তার মূল্য আদায় করতে হবে।

* স্বীয় স্ত্রীকে যৌন কামনাসহ চুমু খেলে কিংবা আলিঙ্গন করলে 'দম' দিতে হবে।

* পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢেকে যায় এমন জুতো এক রাতসহ একদিন পরিধান করে থাকলে 'দম' আর এর কম পরিধানে থাকলে সাদাকাহ দিতে হবে।

প্রশ্ন: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ কি কি?

উত্তর: ইহরাম অবস্থায় শরিয়ত যে সমস্ত কাজ নিষেধ করেছে তা দুই প্রকার।

(১) এমন কাজ যা হজ্জ ভেঙ্গে দেয়। (২) এমন কাজ যা হজ্জ ভেঙ্গে দেয় না তবে নিষিদ্ধ।

প্রথম প্রকারের কাজ:

স্ত্রী সহবাস করা। কোন ব্যক্তি যদি ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার হজ্জ ভেঙ্গে যাবে। তবে সে হজ্জের বাকি কাজগুলো যথারীতি আদায় করে যাবে এবং পরবর্তী বছর কাজা করবে।

দ্বিতীয় প্রকারের কাজ:

১. পুরুষ ব্যক্তি সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। যেমন: জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি, জুব্বা, মোজা ইত্যাদি। তবে যদি কোন ব্যক্তি সেলাই বিহীন কাপড় সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে সে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করতে পারবে। 'ফিদইয়া'[৩] ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি জুতা না পায় তাহলে সে মোজা পায়ের টাখনু পর্যন্ত কেটে ব্যবহার করতে পারবে।

২. ইহরাম অবস্থায় পুরুষ ব্যক্তি মাথা ঢাকা। যেমন: টুপি বা পাগড়ী পরিধান করা।

৩. ইহরাম অবস্থায় মহিলারা মুখে নেকাব পরিধান করা। তবে পর্দার জন্য মাথার উপর থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দিতে পারবে। মুখে জড়াবে না।

৪. ইহরাম অবস্থায় পুরুষ বা মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৫. ইহরামের নিয়ত করার পর মাথার বা শরীরের কোন স্থানের চুল বা পশম মুণ্ডানো বা কেঁটে ফেলা। যদি ইচ্ছাকৃত বা ভূলে মুণ্ডিয়ে ফেলে বা কেঁটে ফেলে তাহলে 'ফিদইয়া" দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, যদি অসুস্থতা বা

---

[৩] সাদাকায়ে ফিতির পরিমান গম বা তার মূল্য। অর্থাৎ আড়াই কেজি গম বা গমের মূল্য।

অন্য কোন ওজরের কারণে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলতে হয় তাহলে মুণ্ডিয়ে ফেলা জায়েজ হবে তবে ‘ফিদইয়া’ দিতে হবে। যদি মাথা চুলকানোর কারণে চুল পরে যায় তাহলে কোন সমস্যা নেই।

৬. ইহরাম অবস্থায় নখ কাঁটা।

৭. স্ত্রীকে যৌন কামনাসহ চুমু খেলে কিংবা আলিঙ্গন করলে ফিদইয়া দিতে হবে।

৮. হানাফীগণ ব্যতিত অন্যান্য ইমামদের মতে ইহরাম অবস্থায় বিবাহের পয়গাম দেয়া বা বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

৯. কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া বা ঝগড়া-বিবাদ করা।

১০. ইচ্ছাকৃত বন্য পশুপাখি শিকার করা বা কাউকে শিকার করতে যে কোনভাবে সাহায্য করা।

যদি কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বন্য পশুপাখি হত্যা করে ফেলে তাহলে কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা তিনভাবে দেওয়া যায়:

প্রথমত: যেই বন্যপশু হত্যা করেছে যদি তার সাদৃশ কোন গৃহপালিত পশু পাওয়া যায় তাহলে তা কুরবানী করবে এবং মিসকীনদের মাঝে তা বণ্টন করে দিবে। এখানে দামের দিক থেকে সমান হওয়া শর্ত নয় বরং আকার আকৃতির দিক থেকে সমান হওয়া শর্ত।

দ্বিতীয়ত: যেই বন্যপশু হত্যা করেছে তার সাদৃশ গৃহপালিত কোন পশুর দাম নির্ধারণ করে তার মাধ্যমে খাদ্য ক্রয় করে মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। প্রত্যেক মিসকীনদেরকে এক মুদ (৫১০ গ্রাম) পরিমান দিবে।

তৃতীয়ত: পশু যবাই বা মিসকীনদের খাবার খাওয়ানোর পরিবর্তে সিয়ামের (রোজার) মাধ্যমেও কাফফারা আদায় করা যাবে। এই ক্ষেত্রে প্রতি মুদ (৫১০ গ্রাম) খাদ্যের বিনিময়ে একটি করে সাওম রাখবে। অর্থাৎ যেই বন্য পশু হত্যা করেছে তার সাদৃশ কোন হালাল পশুর দাম নির্ধারণ করবে। এরপর এই দামের মাধ্যমে কতটুকু পরিমান খাদ্য ক্রয় করা যায় তা নির্ধারণ করবে। যেই পরিমান খাদ্য ক্রয় করা যায় পুরা পরিমানকে গ্রামের হিসাব ধরে ৫১০ দিয়ে ভাগ দিবে এবং ভাগফল যা হবে সেই কয়েকটি সাওম (রোজা) রাখবে।

প্রশ্ন: ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ করা জায়েজ?

উত্তর: ইহরাম অবস্থায় যেই সমস্ত কাজ করা জায়েজ সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. গোসল করা (কোন কারণ ছাড়াই)। চাদর এবং লুঙ্গি পরিবর্তণ করা।

২. মাথা আঁচড়ানো। যদিও চুল পড়ে যাওয়ার আশংকা হয়।

৩. মাথা বা শরীর চুলকানো।

৪. শিঙ্গা লাগনো। যদিও শিঙ্গা লাগানোর স্থানের চুল কামিয়ে ফেলার দরকার পরে।

৫. কোন প্রয়োজনের কারণে সুগন্ধি গ্রহণ করা বা ধোঁয়া নাকে নেয়া।

৬. নখ ভেঙ্গে গেলে তা ফেলে দেয়া।

৭. পুরুষরা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা।

৮. মহিলারা মাথার উপর থেকে কাপড় ছেড়ে দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা।

৯. মহিলারা যেই রঙ্গের ইচ্ছা সেই রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে পারবে।

১০. মহিলারা পায়জামা এবং মোজা পরিধান করা।

১১. মহিলারা ইচ্ছা করলে অলংকার পরিধান করতে পারবে।

১২. মহিলারা ইচ্ছা করলে মেহেদী বা অন্য কোন জিনিষ দ্বারা খেজাব করতে পারবে।

১৩. প্রয়োজনের কারণে চোখে সুরমা লাগাতে পারবে। বিনা প্রয়োজনে নয়।

১৪. তাবু, গাড়ি বা অন্য কোন কিছুর আড়ালে অবস্থান নিয়ে রোদ থেকে বাঁচা।

১৫. ইহরামের লুঙ্গি বাধাঁর জন্য বেল্ট ব্যবহার করা। আংটি, ঘড়ি বা চশমা ব্যবহার করা।

হজ্জ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের লিখিত ‘কিতাবুল হজ্জ’ পড়ার জন্য অনুরোধ রইল।

ঈমান

ঈমানের পরিচয়, আরাকানুল ঈমান ও ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ ইত্যাদি

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُـؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّـهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُـونَ (النحل : ٩٧)

অর্থ: "যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব ।"

সুরা নহল ১৬:৯৭

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَـا هُـمْ بِمُؤْمِنِينَ (البقرة : ٨)

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয় ।"

সুরা বাক্বারা ২:৮

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ঈমান

প্রশ্নঃ ঈমান কি?

উত্তরঃ ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ (اَلتَّــصْدِيْقُ) বিশ্বাস স্থাপন করা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (يوسف : ١٧)

অর্থঃ "আর আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী হই।" (সুরা ইউসুফ ১২:১৭)

ইসলামের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন বলে প্রমাণিত যথাঃ আল্লাহ, নাবী-রাসুলগন, আখিরাত, ফিরিশতাগন ইত্যাদি সহ সকল মৌলিক বিষয়ে তিনটি কাজের সমন্বয় করা। (ক) تَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ 'তাছদীক বিল জিনান' বা আন্তরিকভাবে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। (খ) اِقْــرَارٌ بِاللِّــسَانِ 'ইক্বরার বিল লিসান' বা মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া। (গ) عَمَلٌ بِالْاَرْكَــانِ 'আমাল বিল আরকান' বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজে বাস্তবায়ন করা।

প্রশ্নঃ মুমিন কে?

উত্তরঃ ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আর ইমান অর্থ পূর্ণ আস্থা সহকারে বিশ্বাস স্থাপন। এই বিশ্বাস ও আত্ম সমর্পণের মাধ্যমে যে মহান ব্যক্তি অদৃশ্য আল্লাহর সমস্ত বিধান বিনা সংকোচে মেনে নেয় এবং তারই নির্দেশ মতো তা পালন করে চলে তাকেই বলা হয় মুমিন এবং তারই অপর নাম মুসলিম। যার প্রশংসায় পবিত্র কুরআন পঞ্চমুখ। প্রকৃত মু'মিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [الحجرات/١٥]

অর্থঃ "তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।" (সুরা হুজরাত ৪৯:১৫) অর্থাৎ ইবাদতের ভিতরের

কাঠামো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তাওহীদ নামক পরশমনি দিয়ে গঠন করে বাহিরের কাঠামো মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সুন্নাহ নামক খাঁটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যাওয়াই হলো মুমিনের কাজ। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

{صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً } [البقرة : ١٣٨)

অর্থঃ "(বল,) আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর?" (সুরা বাকারা ২:১৩৮)

প্রশ্নঃ ঈমান কি বাড়ে কমে?

উত্তরঃ হ্যাঁ! ঈমানের কম-বৃদ্ধি রয়েছে। আল্লাহর আনুগত্যের কথা ও কাজে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্যতার কথা ও কাজে ঈমান কমে যায়। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُــمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

অর্থঃ "মু'মিনতো তারাই, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের প্রতি ভরসা পোষণ করে।" (সুরা আনফাল ৮:২-৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّــا الَّــذِينَ آمَنُــوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَــرَضٌ فَــزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (التوبة : ١٢٤ ، ١٢٥)

অর্থঃ "আর যখনই কোন সুরা নাযিল করা হয়, তখন তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ বলে, 'এটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল'? অতএব যারা মুমিন, নিশ্চয় তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এটি তাদের অপবিত্রতার সাথে অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে এবং তারা মারা যায় কাফির অবস্থায়।" (সুরা তাওবা ৯:১২৪-১২৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًـــا وَقَـــالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران : ١٧٣]

অর্থ: "যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, 'নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর'। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক'!" (সুরা আল ইমরান ৩:১৭৩)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَـــةً لِلَّـــذِينَ كَفَـــرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَـــابَ الَّـــذِينَ أُوتُـــوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ} [المدثر : ٣١]

অর্থ: "আর আমি মালায়েকাদেরকে জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছি। আর কাফিরদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ আমি তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছি। যাতে কিতাবপ্রাপ্তরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে; আর মুমিনদের ঈমান বেড়ে যায় এবং কিতাবপ্রাপ্তরা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে।" (সুরা মুদ্দাসির ৭৪:৩১)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ (الفتح : ٤)

অর্থ: "তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছিলেন যেন তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায়।" (সুরা ফাতাহ ৪৮:৪)

এ সকল আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, ঈমান বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে বিভিন্ন বদ আমলের কারণে ঈমান কমে যায়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَـــا كَـــانُوا يَكْـــذِبُونَ } [البقرة : ١٠]

অর্থ: "তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অত:পর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ তারা মিথ্যা বলত।" (সুরা বাকারা ২:১০)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُـــوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্নিত, নবী (সা:) বলেন: ব্যাভিচারী পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়না, চোর পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় চুরি করেনা এবং মদ্যপায়ী পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় মদ পান করেনা (অর্থাৎ উক্ত সময়ে তাদের ঈমান অপূর্ণ ও দুর্বল হয়ে যায়)। (সহীহ বুখারী ৬৮১০; সহীহ মুসলিম ২১১)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, বিভিন্ন আমল ও পরিস্থিতির কারণে ঈমান কখনো কখনো কমে যায়।

প্রশ্ন: ঈমানের আরাকান বা মৌলিক বিষয় কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ঈমানের আরাকান বা মৌলিক বিষয় ছয়টি:

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান,
২। মালায়েকদের প্রতি ঈমান,
৩। আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান,
৪। রাসুলগনের প্রতি ঈমান,
৫। পরকালের প্রতি ঈমান,
৬। তাকদীর বা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান।

হাদীসে জিবরাঈলে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ...مَا الإِيمَانُ قَـــالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّه وَمَلاَئِكَته وَكِتَابِه وَلِقَائِه وَرُسُلِه وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّه »

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জিবরাঈল (আ:) প্রশ্ন করলেন....ঈমান কি? রাসূলুল্লাহ (সা:) উত্তর দিলেন: আল্লাহ, তাঁর মালায়েকগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, পরকালে আল্লাহর সাক্ষাত এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা। আর বিশ্বাস করা আখেরাত এবং তাকদিরের সকল বিষয়ের প্রতি।" (সহীহ মুসলিম ১০৮; সুনানে আবু দাউদ ৪৬৯৭; সুনানে নাসায়ী ৫০০৬; মুসনাদে আহমদ ৩৭৪)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

অর্থ: বরং প্রকৃত পক্ষে সৎকাজ হল, যে ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফিরিশ্‌তাদের উপর এবং সমস্ত নবী রাসূলগণের উপর। (সুরা বাকারা ২:১৭৭) তিনি আরো বলেন:

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

অর্থ: সবাই বিশ্বাস রাখে, আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালায়েকার প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি এবং তাঁর নবীদের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। (সুরা বাকারা ২:১৮৫)

উপরোক্ত হাদীস ও আয়াতসমূহ দ্বারা ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো জানা গেল।

প্রশ্ন: ঈমানের শাখা কয়টি, এর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বনিম্ন শাখা কি?

উত্তর: এ বিষয়ে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ »

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, ঈমানের সত্তরের বা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা আর সর্বনিম্ন হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো। লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।" (সহীহ মুসলিম ১৬২; সুনানে আবু দাউদ ৪৬৭৮; সুনানে নাসায়ী ৫০২০)

প্রশ্ন: প্রকৃতপক্ষে কালিমা কয়টি, একে কি বলা হয়? আল্লাহ এই কালিমাকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

উত্তর: প্রকৃতপক্ষে ঈমানের কালিমা একটি। আর তা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া ইবাদত যোগ্য কোন ইলাহ নেই)। একে কালিমা তাইয়্যেবা বা কালিমাতুত 'তাওহীদ' বলে। আল্লাহ (সুব:) এই কালিমাকে একটি উৎকৃষ্ট গাছের সাথে তুলনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ – تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

অর্থ: "তুমি কি জাননা আল্লাহ কি ধরনের উদাহরণ পেশ করেছেন? কালিমা তাইয়্যেবা বা পবিত্র কালিমা একটি উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায়, যার মূল খুবই দৃঢ় আর শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বাকাশের দিকে প্রসারিত। সে তার রবের নির্দেশে অহরহ ফলদান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহন করতে পারে।" (সুরা ইবরাহীম ১৪:২৪-২৫)

উল্লেখ্য যে, মুসলিম সমাজে প্রচলিত কালিমায়ে তামজীদ, রাদ্দে কুফর এসবের অস্তিত্ব কুরআন হাদীসে কোথাও নেই।

প্রশ্ন: কে ঈমানের স্বাদ লাভ করে?

উত্তর: প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি ঈমানের মজা ও স্বাদ লাভ করে। সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এর স্বাদকে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

অর্থ: "আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে সে ঈমানের স্বাদ ও মজা পাবে। **এক:** আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:) তার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে প্রিয় হবে। **দুই:** সে কাউকে ভালবাসবে তো শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে। **তিন:** আল্লাহ তাকে কুফর থেকে মুক্তি দেয়ার পর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এতটাই অপছন্দ করবে যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" (সহীহ বুখারী ১৬; সহীহ মুসলিম ১৭৪; তিরমিজি ২৬২৪)

তিনি (সা:) আরও বলেন:

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً

অর্থ: "আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ (সা:) কে রাসুল হিসেবে স্বীকার করে ও মেনে সন্তুষ্ট হয় সে ঈমানের স্বাদ ও মজা আস্বাদন করে।" (সহীহ মুসলিম ১৬০; সুনানে তিরমিজি ২৬২৩)

প্রশ্ন: ঈমানের আলামত কি?

উত্তর: একজন ঈমানদারকে যখন ভাল কাজ আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ তার কাছে খারাপ মনে হয় তখন সে বুঝবে তার ঈমান আছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ (مسند أحمد)

অর্থ: "আবু উমামা (রা:) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসুল (সা:) কে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কি অর্থাৎ ঈমানের আলামত কি? উত্তরে রাসুল (সা:) বললেন, তোমার ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দিলে আর খারাপ কাজ তোমার কাছে খারাপ লাগলে তুমি মু'মিন।" (মুসনাদে আহমাদ ২২১৬৬)

প্রশ্ন: কামেল ঈমানের আলামত কি?

উত্তর: কামেল ঈমানের আলামত পাঁচটি। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذ عَنْ أَبِيه عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَعْطَى لِلَّه تَعَالَى وَمَنَعَ لِلَّه تَعَالَى وَأَحَبَّ لِلَّه تَعَالَى وَأَبْغَضَ لِلَّه تَعَالَى وَأَنْكَحَ لِلَّه تَعَالَى فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ

অর্থ: "মুআজ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই দান করা থেকে বিরত থাকে, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসে আবার আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বিবাহ করে সে তার ঈমানকে কামেল বা পরিপূর্ণ করলো।" (সুনানে তিরমিজি ২৫২১; মুসনাদে আহমদ ১৫৬১৭)

প্রথম আলামত: مَنْ أَعْطَى لِلَّه যে কোন ব্যয় করার সময় শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়ত করা। ব্যক্তিগত খরচ, পরিবারের খরচ, অন্যান্য দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিয়ত করা। কোন প্রকার সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করার লৌকিকতা অথবা দান করে খোঁটা দেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকা।

দ্বিতীয় আলামত: وَمَنَعَ لِلَّه কোন জায়গায় খরচ করার থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিরত থাকা। যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ (সুব:) ব্যায় করতে নিষেধ করেছেন সেসব ক্ষেত্রে ব্যায় না করা। এবং অপচয় করা থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় আলামত: وَأَحَبَّ لِلَّه আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে অথবা কাউকে আল্লাহ ওয়ালা মনে করে অথবা আল্লাহ (সুব:) ভালবাসতে নির্দেশ করেছেন বিধায় কাউকে ভালবাসা।

চতুর্থ আলামত: وَأَبْغَضَ لِلَّه কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ঘৃণা করা। হিন্দা এবং ওয়াহশী এর ঘটনাই এর জলন্ত প্রমান। ওয়াহশী রাসূলুল্লাহ (সা:) এর চাচা হামযাকে হত্যা করেছিলো হিন্দার নির্দেশে। আর হিন্দা তার কলিজা বের করে চিবিয়েছিলো। অথচ ইসলাম গ্রহনের পরে তাদের নামের সাথে যুক্ত হলো "রাযিআল্লাহু তায়ালা আনহু"।

পঞ্চম আলামত: وَأَنْكَحَ لِلَّه আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বিবাহ করে বা বিবাহ দেয়া। নেক সন্তান লাভের আশায়, হারাম কাজ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাহ পালনার্থে বিবাহ করা।

আরকানুল ঈমান اركان الايمان

প্রশ্ন: ঈমানের রুকন কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ঈমানের রুকন ৬ টি।

এক: আল্লাহর নাম ও গুনাবলী সহকারে আল্লাহর উপর ঈমান আনা।

দুই: মালায়েকা বা ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা।

তিন: আল্লাহর কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা।

চার: রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা।

পাঁচ: আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনা।

ছয়: ভাল-মন্দ তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা।

প্রথম রুকন: আল্লাহর প্রতি ঈমান

প্রশ্ন: আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে কি বোঝায়? আল্লাহর প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তর: "আল্লাহর নাম ও গুনাবলী সহকারে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা" এর মর্মকথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য, সত্যিকার মা'বুদ, বস্তু নিচয়ের তিনি স্রষ্টা অধিপতি, সকল পরিপূর্ণ গুনে পরমভাবে গুনান্বিত। তিনি সকল উত্তম গুনে গুনান্বিত, সকল দোষ-ক্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে তিনি পূর্ণ অবহিত। অনুগতকে প্রতিফল ও অবাধ্যকে শাস্তি প্রদানে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

প্রথমত: এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ বিশ্ব জগতের একজন রব রয়েছেন। যিনি স্বীয় সৃষ্টি, রাজত্ব, পরিচালনা ও কর্ম ব্যাবস্থাপনায় এক ও একক। যিনি রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, ক্ষমতাশীল এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনকারী । তিনি একাই যা ইচ্ছা তাই করেন এবং যা চান তার হুকুম করেন। তাঁরই হাতে আসমান জমিনের রাজত্ব। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল ও জ্ঞাত রয়েছেন। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কর্ম সমূহে কোন শরীক নেই। তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস।

দ্বিতীয়ত: এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ (সুব:) তাঁর সুন্দর নাম সমূহ ও পুত-পবিত্র পূর্ণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। আর এই আকীদাহ-বিশ্বাস দু'টি বড় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

প্রথম মূলনীতি: নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সুন্দর নাম ও মহান গুণ রয়েছে, যা পরিপূর্ণ গুনাবলীর প্রমাণ করে, তাতে কোন প্রকারের অপরিপূর্ণতা ও ক্রুটি নেই। সৃষ্টিজীবের কোন কিছুই তার মত ও তার অংশীদার হতে পারেনা।

দ্বিতীয় মূলনীতি: নিশ্চয় আল্লাহ (সুব:) সকল দোষ ও ক্রুটি হতে সম্পুর্ণভাবে পুত-পবিত্র। যেমন: নিদ্রা, অপারগতা, মূর্খতা ও জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি।

আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত: (১) সংযোজন ও বিয়োজন ব্যতীত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যে সকল সুন্দর নাম সমূহ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত রয়েছে সেগুলোর উপর ঈমান আনা। (২) আল্লাহ্ নিজেই নিজের নাম রেখেছেন। সৃষ্টি জীবের কেউ তার নাম রাখে নাই। তিনি নিজেই এই সকল নাম দ্বারা স্বীয় প্রশংসা করেছেন। ইহা সৃজিত নতুন নয়। এই কথার উপর ঈমান আনা। (৩) আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ এমন পরিপূর্ণ অর্থবোধক যাতে কোন প্রকারের কোন ক্রুটি নেই। তাই এ নাম সমূহের প্রতি ঈমান আনা যেমন ওয়াজিব, তেমনি এর অর্থের উপর ঈমান আনাও ওয়াজিব। (৪) এ সমস্ত নামের অর্থ অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা না করে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব। (৫) প্রতিটি নাম হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান, ফলাফল ও এর প্রভাবের প্রতি ঈমান আনা।

তৃতীয়ত: এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ই (সুব:) একমাত্র সত্যিকার ইলাহ বা মা'বুদ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদাত পাওয়ার অধিকার রাখেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ, ইবাদতে তাঁর কোন শরীক নেই। ইহাই তাওহীদে উলুহীয়্যাহ্।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহ:) তাঁর "আক্বীদাহ আত তাহাভীয়াতে" আল্লাহর প্রতি ঈমানকে এভাবে উপস্থাপন করেন: ১। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এক, যাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। ২। তাঁর মত কিছুই নেই। (কেউ তাঁর সমতুল্য নয়)। ৩। কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। ৪। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। ৫। তিনি অনাদি, যার কোন আদি নেই। তিনি অনন্ত, যার কোন অন্ত নেই। ৬। তাঁর ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। ৭। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। ৮। কোন কাল্পনিকের কল্পনা তাঁর ধারে কাছে পৌঁছে না (তাকে আয়ত্ব করতে পারে না) এবং ইন্দ্রিয় জ্ঞান তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। ৯। সৃষ্ট বস্তু তাঁর মত হতে পারে না। নিদ্রার দরকার নেই এমনকি তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করে না। ১১। তিনি এমন সৃষ্টিকর্তা যার সৃষ্টিতে কোন সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন না এবং

তিনি অক্লান্ত রিযিক দাতা। ১২। তিনি নির্ভয়ে প্রাণ সংহারকারী এবং নির্বিবাদে পুনরুত্থানকারী। ১৩। সৃষ্টির বহু পূর্বেই তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিলেন, আর সৃষ্টির কারণে তাঁর নতুন কোন গুণের সংযোজন ঘটেনি এবং তিনি তাঁর গুণাবলীসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত থাকবেন। ১৪। সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম "খালেক" (সৃষ্টিকর্তা) হয়নি। অথবা বিশ্ব জাহান সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম "বারী" (উদ্ভাবক) হয়নি (বরং তিনি অনাদি কাল থেকেই এই গুনে গুনান্বিত)। ১৫। প্রতিপাল্যের (মাখলুকের) অবর্তমানেও তিনি ছিলেন 'রব' বা প্রতিপালক, আর মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন 'খালেক' বা সৃষ্টিকর্তা। ১৬। মৃতকে জীবন দান করার ফলে তাঁকে 'জীবনদানকারী' বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কোন বস্তুকে জীবন দান করার পূর্বেও তিনি এই নামের (জীবন দানকারী) অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সৃজন ছাড়াই 'সৃষ্টিকর্তা' নামের অধিকারী ছিলেন। ১৭। এটা এই জন্য যে, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অনুগ্রহ ভিখারী। সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ, তিনি কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। তাঁর মত কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" ১৮। তিনি স্বীয় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। ১৯। তাদের (সৃষ্ট বস্তুর) জন্য সব কিছুরই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। ২০। তাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন। ২১। সৃষ্ট জীবের সৃষ্টির পূর্বে কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। জীব জগতের সৃষ্টির পূর্বেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। ২২। এবং তিনি তাদের স্বীয় আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্যচরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ২৩। সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এবং একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা কার্যকর হয়, এবং (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া) বান্দার কোন ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। অতএব তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না। ২৪। আল্লাহ (সুব:) যাকে ইচ্ছা হিদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ, পক্ষান্তরে যে পথভ্রষ্ট হতে চায় তাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে অপমানিত ও বিপদগ্রস্ত করেন। এটা তাঁর ন্যায় বিচার। ২৫। সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে থাকে তাঁর ইচ্ছায় ও তাঁর অনুগ্রহে এবং

সুবিচারের মাধ্যমে। ২৬। তিনি কারও প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ হওয়ার উর্ধ্বে। ২৭। তাঁর সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন নেই। কেউই তাঁর নির্দেশ বাতিল করার নেই এবং তাঁর নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই।

প্রশ্ন: মানুষ আল্লাহর (সুব:) পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরুপনে অক্ষম বিষয়টির প্রমান কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّـــاتٌ بِيَمِينِهِ [الزمر/٦٧)

অর্থ: "আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের উর্ধ্বে।" (সুরা জুমার ৩৯:৬৭) এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, মানুষ তাঁকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে অক্ষম। তারপর তিনি তাঁর অসীম শক্তি ও মর্যাদার সামান্য কিছু বর্ননা পেশ করলেন। সৃষ্টির সবকিছুই তাঁর নখদর্পে। হাদীস শরীফে বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِـــينَ عَلَـــى إِصْـــبَعٍ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْـــبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّـــه –صـــلى الله عليـــه وسلم– تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন ইহুদী পন্ডিত রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট এসে বললো, 'হে মুহাম্মদ, আমরা (তাওরাত কিতাবে) দেখতে পাই যে, আল্লাহ (সুব:) সমস্ত আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে এক আঙ্গুলে, পাহাড়-পর্বত ও বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি ও কাদা-মাটিকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। এরপর সেগুলোকে হেলাবেন

আর বলবেন, “আমিই সম্রাট! আমিই সম্রাট ।” রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কথার সমর্থনে ইয়াহুদীর কথায় আশ্চর্য হয়ে হেসে দিলেন । অতপর তিনি “আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি । অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে । তিনি পবিত্র, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে ।” এ আয়াতটুকু পড়লেন । (সহীহ বুখারী ৪৮১১; সহীহ মুসলিম ৭২২৩)

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসে আছে,

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَطْوِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِى الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ».

অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ (সুব:) সমস্ত আকাশমন্ডলীকে ভাঁজ করবেন । অত:পর সেগুলোকে ডান হাতের মুঠোর ভিতরে নিবেন । তারপর বলবেন, “আমি হচ্ছি রাজাধিরাজ । (দুনিয়ার) অত্যাচারীরা কোথায়? (দুনিয়ার) অংহকারীরা কোথায়? এরপর সাত তবক যমীনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতের মুঠোতে নিবেন । তারপর বলবেন, “আমি হচ্ছি রাজাধিরাজ । (দুনিয়ার) অত্যাচারীরা কোথায়? (দুনিয়ার) অংহকারীরা কোথায়? (সহীহ মুসলিম ৭২২৮)

ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাত তবক আসমান ও যমীন আল্লাহ (সুব:) হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে একটি সরিষার দানার মত । ইবনে যায়েদ বলেন, “আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রাসূল (সা:) ইরশাদ করেছেন, “কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের (মুদ্রার) মত ।” তিনি বলেন, ‘আবু যর রা. বলেছেন, ‘আমি রাসূল (সা:) কে এ কথা বলতে শুনেছি, “আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূপৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মত ।”

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ " بَيْن سَمَاء الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسمِائَة عَام ، وَبَيْن كُلّ سَمَاء خَمْسمِائَة عَام ، وَبَيْن السَّمَاء السَّابِعَة وَالْكُرْسِيّ خَمْسمِائَة عَام ، وَبَيْن الْكُرْسِيّ وَبَيْن الْمَاء خَمْسمِائَة عَام ، وَالْكُرْسِيّ فَوْق الْمَاء . وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ فَوْق الْكُرْسِيّ وَيَعْلَم مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ "

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আসমানের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ’ বছরের পথ । আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের । এমনিভাবে সপ্তমাকাশের ও কুরসীর মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ । একই ভাবে কুরসী এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের । আরশ হচ্ছে পানির উপরে । আর আল্লাহ (সুব:) সমাসীন রয়েছেন আরশের উপর । তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই । (তাহযীবু সুনানে আবী দাউদ ২/৩৮৯)

প্রশ্ন: আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: আল্লাহর নাম হচ্ছে সেগুলো, যা দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ (সুব:) কে বুঝায় এবং সেসব পরিপূর্ন গুনাবলীও তাঁর নামের অন্তর্ভূক্ত যা তাঁর রয়েছে যেমন: আল ক্বাদীর (সর্বশক্তিমান), আল ‘আলীম (সর্বজ্ঞাতা), আল হাকীম (প্রজ্ঞাময়), আস-সামী‘ (সর্বশ্রোতা), আল বাছীর (সর্বদ্রষ্টা) । এই নামগুলো স্বয়ং আল্লাহকে বুঝায় এবং যেসব পরিপূর্ন গুনাবলী তাঁর মধ্যে আছে সেগুলোকে বুঝায়, যেমন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শোনা, দেখা । সুতরাং নাম দ্বারা দু’টি জিনিস বুঝায়, আর গুনাবলী দ্বারা একটি জিনিস বুঝায় । এটা বলা যেতে পারে যে, নামের মধ্যে গুনাবলীও অন্তর্ভূক্ত এবং গুনাবলী দ্বারা তাঁর নামের দিকে ইঙ্গিত করে তথা পরোক্ষ ভাবে নামকে বুঝায় ।

শায়খ আলী আব্দুল ক্বাদির আল সাকাফ বলেন, যা দ্বারা নাম ও গুনাবলীকে পার্থক্য করা যায় তা হচ্ছে:

১ । নাম থেকে গুনাবলী বের করা যায় কিন্তু গুনাবলী থেকে নাম বের করা যায় না । যেমন আল্লাহর নাম: আর-রহিম (সবচেয়ে দয়ালু), আল ক্বাদীর (সর্বশক্তিমান), আল ‘আযীম (সর্ব মহান) থেকে তাঁর গুনাবলী রহমাহ (দয়া), কুদরাহ (শক্তি), ‘আযমাহ (মহানত্ব) পাওয়া যায় । কিন্তু তাঁর

গুনাবলী ইচ্ছা, আসা, কৌশল করা এগুলো থেকে আমরা “ইচ্ছাকারী”, “আগমনকারী”, “মাকির বা কৌশলকারী” এসব নাম বের করতে পারি না।

তাঁর নামসমূহ বর্ননামূলক, যেমন ইবনুল কাইয়্যিম তার “al-Nooniyyah’’ কিতাবে বলেন, আল্লাহর কার্যাবলী থেকে তাঁর নাম বের করা যায় না। তিনি ভালবাসেন, ঘৃনা করেন, রাগান্বিত হন কিন্তু এ থেকে তাকে “ভালবাসাকারী” , “ঘৃনাকারী” , “রাগকারী” নামে ডাকা যাবে না। তবে তাঁর কার্যাবলী থেকে গুনাবলী বের করা যায়। সুতরাং এটা প্রমানিত যে, তাঁর এই গুনাবলী রয়েছে যে তিনি ভালবাসেন, ঘৃনা করেন, রাগান্বিত হন ইত্যাদি এটা থেকে বলা যায় যে, তাঁর গুনাবলীর বৈশিষ্ট্য অনেক প্রশ্বস্ত তাঁর নামের বৈশিষ্ট্য থেকে। (আল মাদারিয়ুস সালেকীন ৩/৪১৫)

২। নাম এবং গুনাবলী উভয়ই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং শপথের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় কিন্তু পার্থক্য হয় তখন যখন মানুষকে আল্লাহর দাস বলে নামকরন এবং দোয়ার ক্ষেত্রে। সুতরাং আমরা নামের ক্ষেত্রে বলতে পারি আবদুর রহিম (সর্বাধিক দয়াশীলের বান্দা), আবদুল ক্বাদীর (সর্বশক্তিমানের বান্দা) কিন্তু আমরা গুনাবলীর ক্ষেত্রে বলতে পারি না আবদুর রহমাহ (দয়ার বান্দা) বা আবদুল কুদরাহ (শক্তির বান্দা)। অনুরূপভাবে আমরা আল্লাহর নাম দ্বারা তাঁর কাছে দোয়া করতে পারি, যেমন ইয়া রাহীমু! তুমি আমাকে দয়া কর, ইয়া গাফূরু! আমাকে ক্ষমা কর কিন্তু তাঁর গুনাবলীর ক্ষেত্রে আমরা এভাবে বলতে পারি না, ইয়া আল্লাহর দয়া! তুমি আমাকে দয়া কর, ইয়া আল্লাহর ক্ষমা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সুতরাং দয়া আল্লাহ নয় বরং আল্লাহর একটি গুন... । (Sifaat Allaah ‘azza wa jall al-Waaridah fi’l-Kitaab wa’l-Sunnah, p. 17)

প্রশ্ন: কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বর্ণিত আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) নিজেই তার সুন্দর সুন্দর নাম রেখেছেন। যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত নাম ছাড়া নিজেদের তৈরী করা মনগড়া কোন নামে আল্লাহ (সুব:) কে ডাকা যাবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف : ١٨٠)

অর্থ: “আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।” (সুরা আরাফ ৭:১৮০)

আমাদের সমাজে অনেকেই আল্লাহকে ‘খোদা’ নামে নামকরণ করে থাকে। এমনকি ‘আল্লাহ হাফেজ’ না বলে ‘খোদা হাফেজ’ বলার প্রচলন বেশী। অথচ আল্লাহ (সুব:) বলেন,

{فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [يوسف : ٦٤)

অর্থ: “আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।” (সুরা ইউসূফ ১২:৬৪) তাই আল্লাহ (সুব:) কে কুরআন ও সুন্নাহ বিবর্জিত ‘খোদা’ বা অন্য কোন নামে না ডেকে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত নামে ডাকাই তাওহীদবাদী মুমিনের কাজ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা:) ইরশাদ করেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহর (সুব:) ৯৯ টি নাম রয়েছে, এক কম একশত নাম। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (সহীহ বুখারী ২৭৩৬; সহীহ মুসলিম ৬৯৮৬; সুনানে তিরমিজি ৩৫০৬)

আগ্রহী মুমিনদের জানার সুবিধার্থে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنَي আল্লাহর (সুব:) ৯৯ টি সুন্দরতম নাম:

কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর (সুব:) নামসমূহ:

১। اَللهُ - আল্লাহ ২। اَلْاَلَـــهُ - যিনি একমাত্র ইবাদাত যোগ্য। ৩। اَلْحَـــيُّ- চিরঞ্জীব। ৪। اَلْقَيُّـــوْمُ- সর্বদা রক্ষণাবেক্ষনকারী। ৫। اَلــرَّبُّ রব। ৬।

اَلرَّحْمٰنُ- যিনি পরম করুনাময় । ৭ । اَلرَّحِيْمُ- অসীম দয়ালু । ৮ । اَلْمَلِكُ- মালিক, অধিপতি, রাজাধিরাজ ৯ । اَلْقُدُّوْسُ- অতি পবিত্র । ১০ । اَلسَّلَامُ- যিনি সব ত্রুটি থেকে মুক্ত, নিখুত । ১১ । اَلْمُؤْمِنُ- পূর্ন বিশ্বস্ত এবং নিরাপত্তাদাতা । ১২ । اَلْمُهَيْمِنُ-সর্বদা পর্যবেক্ষক, স্বাক্ষী । ১৩ । اَلْجَبَّارُ-মহা প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত, সমুন্নত । ১৪ । اَلْمُتَكَبِّرُ- সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত । ১৫ । اَلْخَالِقُ- সৃষ্টিকর্তা । ১৬ । اَلْبَارِئُ -উদ্ভাবক, উদ্ভাবনকারী । ১৭ । اَلْمُتَصَوِّرُ- আকৃতিদাতা, রূপদাতা । ১৮ اَلْعَزِيْزُ মহা সম্মানিত । ১৯ । اَلْحَكِيْمُ- প্রজ্ঞাময়, মহাবিজ্ঞ । ২০ । اَلْاَوَّلُ- তিনিই প্রথম, যার পূর্বে কোন কিছু নেই । ২১ । اَلْاٰخِرُ- তিনিই শেষ । ২২ । اَلظَّاهِرُ- সবচেয়ে উচু, সর্বোন্নত । ২৩ । اَلْبَاطِنُ- সবচেয়ে নিকটে । ২৪ । اَلْعَلِيْمُ -সর্বজ্ঞানী । ২৫ । اَلْغَفُوْرُ - পরম ক্ষমাশীল । ২৬ । اَلْوَدُوْدُ - অতিশয় প্রেমময়, পরম স্নেহশীল । ২৭ । اَلْمَجِيْدُ - পরিপূর্ন সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী । ২৮ । اَلرَّزَّاقُ- রিযিকদাতা, জীবিকাদাতা । ২৯ । اَلْقَوِيُّ - অসীম শক্তিশালী, মহা ক্ষমতাবান । ৩০ । اَلْمَتِيْنُ - প্রবল পরাক্রান্ত । ৩১ । اَلْحَافِظُ - রক্ষাকর্তা, শ্রেষ্ঠ রক্ষক । ৩২ । اَلْحَفِيْظُ - হিফাযতকারী । ৩৩ । اَلْعَالِمُ - সর্বজ্ঞানী । ৩৪ । اَلْكَبِيْرُ - সর্ব মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ । ৩৫ । اَلْمُتَعَالِيْ - সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান, সমুন্নত এবং সর্বোচ্চ । ৩৬ । اَلْمَلِيْكُ - সার্বভৌমত্বের অধিকারী । ৩৭ । اَلصَّمَدُ - اَلْمُقْتَدِرُ - সর্ব শক্তিমান । ৩৮ । اَلْاَحَدُ - এক এবং একমাত্র । ৩৯ । স্বয়ংসম্পূর্ন, অমুখাপেক্ষী । ৪০ । اَلْوَاحِدُ - এক এবং অদ্বিতীয় । ৪১ । اَلْقَهَّارُ - অপ্রতিরোধ্য, প্রতাপশালী । ৪২ । اَلْوَلِيُّ - অভিভাবক, সাহায্যকারী । ৪৩ । اَلْحَمِيْدُ - প্রশংসিত । ৪৪ । اَلْمَوْلَيْ - অভিভাবক ও সাহায্যকারী । ৪৫ । اَلنَّصِيْرُ - সাহায্যকারী । ৪৬ । اَلرَّقِيْبُ - তত্ত্বাবধায়ক । ৪৭ । اَلشَّهِيْدُ - সর্ব বিষয়ে স্বাক্ষী । ৪৮ । اَلسَّمِيْعُ - সর্বশ্রোতা । ৪৯ । اَلْبَصِيْرُ - সর্বদ্রষ্টা । ৫০ ।

اَلْحَقُّ - যিনি সত্য । ৫১ । اَلْمُبِيْنُ - সুস্পষ্ট । ৫২ । اَللَّطِيْفُ - সুক্ষদর্শী ও দয়ালু । ৫৩ । اَلْخَبِيْرُ - যিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ন সচেতন । ৫৪ । اَلْقَرِيْبُ - নিকটবর্তী । ৫৫ । اَلْمُجِيْبُ - সাড়াদানকারী । ৫৬ । اَلْكَرِيْمُ -সবচেয়ে বেশী উদার, মহৎ, দানশীল । ৫৭ । اَلْاَكْرَمُ - অতি উদার, অতি মহান, মহানুভব । ৫৮ । اَلْعَلِيُّ - সমুন্নত, সর্বশ্রেষ্ঠ । ৫৯ । اَلْعَظِيْمُ - সবচেয়ে মহান, মহীয়ান । ৬০ । اَلْحَسِيْبُ - যিনি যথেষ্ট, হিসাবগ্রহনকারী । ৬১ । اَلْوَكِيْلُ - সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসকারী, কর্মবিধায়ক, যার উপরে ভরসা করা হয় । ৬২ । اَلشَّكُوْرُ - যিনি সবচেয়ে প্রস্তুত গুনোপলব্দি করতে এবং প্রচুর বিনিময় দানে, অতিশয় গুনগ্রাহী । ৬৩ । اَلْحَلِيْمُ -সর্বাধিক সহিঞ্চু, পরম সহনশীল । ৬৪ । اَلشَّاكِرُ - সর্বদা গুনগ্রাহী এবং পুরষ্কারদাতা । ৬৫ । اَلْوَهَّابُ - পরমদাতা, মহান দানশীল । ৬৬ । اَلْقَاهِرُ - অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য । ৬৭ । اَلْغَفَّارُ - অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যিনি বারবার ক্ষমা করেন । ৬৮ । اَلْبَرُّ - অত্যন্ত সদাশয় এবং দয়াশীল, কৃপাময় । ৬৯ । اَلتَّوَّابُ - তাওবাহ কবুলকারী । ৭০ । اَلْفَتَّاحُ - উত্তম ফায়সালাকারী, সূচনাকারী । ৭১ । اَلرَّئُوْفُ - অত্যন্ত দয়ার্দ্র । ৭২ । اَلْمُقِيْتُ - যিনি সর্বদা সব কিছু করতে সক্ষম, সব কিছুর ব্যাপারে স্বাক্ষী, সর্বশক্তিমান ব্যবস্থাপক । ৭৩ । اَلْوَاسِعُ - সৃষ্টির প্রয়োজন পূরনে যিনি যথেষ্ট, প্রাচুর্যময় । ৭৪ । اَلْوَارِثُ - চুড়ান্ত এবং স্থায়ী মালিকানার অধিকারী, প্রকৃত উত্তরাধীকারী । ৭৫ । اَلْاَعْلَيْ - সর্বোচ্চ, সুমহান । ৭৬ । اَلْمُحِيْطُ - পরিবেষ্টনকারী । ৭৭ । اَلنَّاصِرُ আন্ নাছির, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী । ৭৮ । اَلْخَفِيُّ - অত্যন্ত দয়াবান । ৭৯ । اَلْخَلَّاقُ - মহাস্রষ্টা । ৮০ । اَلْعَفُوُّ - পাপমোচনকারী, ক্ষমাকারী । ৮১ । اَلْغَنِيُّ - স্বয়ং সম্পূর্ন যিনি সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত, অভাবমুক্ত, সম্পদশালী । ৮২ । اَلْقَادِرُ - যিনি পূর্ন সক্ষম । ৮৩ । اَلْقَدِيْرُ - সর্বশক্তিমান ।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর (সুব:) নামসমূহ:

৮৪। اَلْمُقَدِّمُ - যিনি প্রথম, অগ্রবর্তীকারী। ৮৫। اَلْمُؤَخِّرُ - যিনি শেষ, পশ্চাদবর্তীকারী। ৮৬। اَلْحَكَمُ - শ্রেষ্ঠ বিচারক। ৮৭। اَلْقَابِضُ - রিযিক্ব সংযতকারী। ৮৮। اَلْبَاسِطُ - রিযিক্ব সম্প্রসারনকারী, প্রচুর রিযিক্ব মঞ্জুরকারী। ৮৯। اَلرَّفِيْقُ - দয়াশীল এবং মার্জিত (kind and lenient) ৯০। اَلْمُعْطِيْ - সুমহান দাতা। ৯১। اَلْمَنَّانُ - মহাউপকারী, যিনি দানশীলতায় বদান্য ও উদার। ৯২। اَلسُّبُّوْحُ - সম্মানিত ও পরিপূর্ন, গৌরবময় ও মহিমান্বিত। ৯৩। اَلشَّافِيْ - আরোগ্যদাতা, রোগমুক্তিকারী। ৯৪। اَلْجَمِيْلُ - সুন্দরতম (Graceful, Beautiful)। ৯৫। اَلْحَيُّ - মর্যাদাময় লজ্জাশীলতার অধিকারী। ৯৬। اَلْجَوَادُ - মহানুভব,উদার। ৯৭। اَلطَّيِّبُ - উত্তম, পবিত্র। ৯৮। اَلسَّيِّدُ - প্রভু, মালিক। ৯৯। اَلْوِتْرُ - যিনি এক। (The One)

প্রশ্ন: আল্লাহ (সুব:) কোথায়?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) আসমানের উপরে আরশে সমাসীন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى "তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন।" (সুরা-ত্বাহা ২০:৫) হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جَارِيَةٌ لِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً. فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقُلْتُ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ : « ائْتِنِى بِهَا ». قَالَ : فَجِئْتُ بِهَا قَالَ : « أَيْنَ اللَّهُ ». قَالَتْ : فِى السَّمَاءِ. قَالَ : « مَنْ أَنَا ». قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ : « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ».

অর্থ: "মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী বলেন: আমি বললাম। হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি বাঁদি আছে আমি তাকে একটি থাপ্পর

মেরেছি। রাসূলুল্লাহ (সা:) আমার এই কাজটিকে বড় অন্যায় হিসাবে দেখলেন। আমি বললাম তাহলে আমি তাকে স্বাধীন করে দেই। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে (দাসীকে) জিজ্ঞাস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে উত্তর দিল, আল্লাহ (সুব:) আকাশে। রাসূলুল্লাহ (সা:) মেয়েটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সে উত্তর দিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তাকে মুক্তি দাও, কারণ নিশ্চয়ই সে একজন সত্যিকার মুমিন। (সহীহ মুসলিম ১২২৭; সুনানে আবু দাউদ ৯৩১; মুসনাদে আহমদ ১৭৯৪৫) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ১৮০ পৃষ্ঠায় করা হয়েছে।

প্রশ্ন: কুরআন-সুন্নাহতে যে এসেছে 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' তার মানে কি?

উত্তর: এর মানে এই নয় যে, তিনি সত্ত্বাগতভাবে আমাদের সাথে আছেন, বরং তিনি আরশে সমাসীন যেমনভাবে তাঁর মর্যাদার সাথে মানায়। তিনি সব দেখেন এবং সব শুনেন। তিনি আমাদের সাথে আছেন শুনা, দেখা, জ্ঞান, কর্তৃত্বের মাধ্যমে। তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে আছেন তাদের সাহায্য করা, বিজয় দেয়া, বিপদে উদ্ধার করা, সাফল্য দেয়ার মাধ্যমে। যেমন: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا}

অর্থ: "যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞানতো সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।" (সুরা ত্বালাক ৬৫:১২)

এ আয়াতে বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে যে, আল্লাহ (সুব:) তাঁর ইলম ও জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। এ অর্থেই হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي

لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

অর্থ: "আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: আল্লাহ (সুব:) বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা ফরজ কাজসমূহ থেকে বেশী প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে।

সে যদি আমার কাছে কোন কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয় তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা সংকোচ মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপসন্দ করি।" (সহীহ বুখারী ৬৫০২)

এ হাদীসের প্রথমাংশে আল্লাহ (সুব:) বলেন, আমি তার হাত হয়ে যাই...। এর মাধ্যমে পীর-সূফী তথা ভন্ড লোকেরা 'ওয়াহদাতুল অজূদ' বা আল্লাহর সাথে বান্দা একাকার হয়ে যাওয়া দলীল পেশ করে থাকে। অথচ তারা হাদীসের শেষাংসের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে, "সে যদি আমার কাছে কোন কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয় তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই"। বুঝা গেল, প্রথমাংশে বর্ণিত হাত-পা, চোখ-কান হয়ে যাওয়া বলতে সার্বক্ষণিক দেখা-শুনা ও সাহায্য-সহযোগীতা করাকে বুঝানো হয়েছে। এ অর্থেই পবিত্র কুরআনে আরো বহু আয়াত রয়েছে যাতে বলা হয়েছে: আল্লাহ (সুব:) স্বীয় বান্দার সাথে আছেন।

নিম্নে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হলো:

প্রথম আয়াত:

{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الحديد : ٤)

অর্থ: "আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সুরা হাদীদ ৫৭:৪)

দ্বিতীয় আয়াত:

{إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة : ٤٠)

অর্থ: "সে তার সঙ্গীকে বলল, 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'।" (সুরা তাওবা ৯:৪০)

তৃতীয় আয়াত:

{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة : ١١٥)

অর্থ: "আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা। নিশ্চয় আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারা ২:১১৫)

চতুর্থ আয়াত:

{وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} [المائدة : ١٢)

অর্থ: "আল্লাহ বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেব। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ।" (সূরা মায়েদা ৫:১২)

পঞ্চম আয়াত:

{قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه : ٤٦)

অর্থ: "তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি'।" (সূরা ত্বাহা ২০:৪৬)

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহর صِـــفَةُ الْمَعِيَّـــةِ ‘সিফাতুল মায়িয়াহ’ বা সাথিত্বগুনটি প্রকাশ পেয়েছে। এটি দুপ্রকার:

ক. اَلْمَعِيَّـــةُ الْعَامَّـــةُ বা সাধারণ সাথিত্ব। এটি সকল সৃষ্টিকেই শামিল করে। কেননা আল্লাহ (সুব:) তাঁর জ্ঞান, শক্তি, পরাক্রম ও বেষ্টনির ক্ষেত্রে সকল কিছুর সাথেই রয়েছেন। অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও বেষ্টনির বাইরে নেই। কোন কিছুই তাঁর থেকে অদৃশ্য হতে পারে না।

খ. اَلْمَعِيَّـــةُ الْخَاصَّـــةُ বা বিশেষ সাথিত্ব। যা নির্দিষ্ট রয়েছে তাঁর রাসূল ও সৎকর্মশীল বন্ধুগণের জন্য। এ সাথিত্বের অর্থ হলো তিনি তাদের সাহায্য-সহযোগীতা, ভালবাসা ও তাওফীক দিয়ে থাকেন। প্রয়োজন মূহুর্তে ইলহামের মাধ্যমে তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনে মুমিন, মুত্তাকী, মুজাহিদীন, ধৈর্যশীল ও সৎকর্মশীলদের জন্যে আল্লাহর সাথিত্বের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) হিজরতের সময় সাওর গুহায় আশ্রয় নেয়ার পর গুহামুখে কাফেরদের আগমনে আবু বকর (রা:) বিচলিত দেখে বলেছিলেন:

{ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا } [التوبة : ٤٠]

অর্থ: “তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন’।” (সুরা তাওবা ৯:৪০)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: আরবী ভাষায় مَعَ (মা‘আ) শব্দটি দুটো বস্তুর সম্মিলন ও সংমিশ্রণকে বুঝায় না। অর্থাৎ গায়ে গায়ে লেগে থাকা এ শব্দটির অর্থ নয়। বরং তাঁর জ্ঞান বেষ্টনির সাহায্যে তাওফীক ইত্যাদির আওতায় থাকাকেই সাথে হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সমস্ত সালাফে-সালেহীন এ ব্যাপারে একমত।

মূলত: এ জাতীয় বাক্যগুলো সাহায্য-সহানুভূতি করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন প্রধানমন্ত্রী কাউকে বললো, যাও! অমুক কাজটা তুমি করো আমি তোমার সঙ্গে আছি। এর মানে হলো আমার সাহায্য-সহানুভূতি তোমার সঙ্গে থাকবে। এর মানে এই নয় যে, প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে স্বত্তাগতভাবে মিশে যায়। এ বিষয়টি একটি সাধারণ লোকেও বুঝে। কিন্তু সূফিবাদীরা নিজেদের ভ্রান্ত মতের স্বপক্ষে উপরোক্ত আয়াত সমূহ ও হাদীসটিকে অপব্যবহার করে থাকে।

প্রশ্ন: আল্লাহর ইস্‌তিওয়া বা আরশে সমাসীন হওয়া গুনের প্রতি আমরা কিভাবে ঈমান আনব?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) এর নাম ও গুনরাজীর উপর বিশ্বাসের ব্যাপারে সালাফে-সালেহীনের আক্বিদাহ ছিলো নিম্নরূপ:

ক. কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আল্লাহর (সুব:) নাম ও গুন সমূহের অর্থ ভাষার দৃষ্টিকোন থেকে সুস্পষ্ট। আরবী জানা যে কোন মুসলিম এগুলোর অর্থ বুঝতে সক্ষম।

খ. আল্লাহর (সুব:) গুনরাজীর ধরন ও প্রকৃতি অজানা। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহর গুনরাজীর ধরণ ও প্রকৃতি বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই এগুলোর ধরণ সন্ধান করাই হলো প্রকাশ্য পথ ভ্রষ্টতা।

গ. কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর যে সকল নাম ও গুনরাজীর বর্ণনা এসেছে সেগুলোর উপর ঈমান আনা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা এগুলো অস্বীকার করা হলো আল্লাহ (সুব:) ও তাঁর রাসূল (সা:) কে অস্বীকার করার নামান্তর।

ঘ. আল্লাহর গুনরাজীর ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করাই হলো বিদ‘আত। এইগুনের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব।

এই মূলনীতি গুলো সামনে রেখে الاســـتواء আল-ইস্‌তিওয়া গুণটি সাব্যস্ত করতে নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলো লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য:

(১) اَلْاِسْـــتِوَاءُ আল-ইস্‌তিওয়া আল্লাহ্ (সুব:) স্ব-সত্তায় আরশের উপরে রয়েছেন এ গুণটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং এর প্রতি ঈমান আনা, কেননা ইহা কুরআন ও হাদীসে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) اَلْاِسْتِوَاءُ আল-ইস্‌তিওয়া গুণটিকে যথাযোগ্য ও পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। আর এর প্রকৃত অর্থ হলো: আল্লাহ (সুব:) স্বীয় আরশের উপরে বিরাজমান রয়েছেন, যেমন তাঁর মহত্বের ও শ্রেষ্টত্বের শোভা পায়।

(৩) আল্লাহ (সুব:) আরশের উপর বিরাজমান থাকাকে সৃষ্টি জীবের আসন গ্রহণের সাথে উপমা না দেওয়া। কেননা আল্লাহ আরশের মুখাপেক্ষী নন। তিনি আরশের মুহ্‌তাজ নন। কিন্তু সৃষ্টি জীবের সমাসীনতা সম্পূর্ণ সতন্ত্র, সৃষ্টিজীব এর মুহ্‌তাজ বা মুখাপেক্ষী। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى/١١)

অর্থ: (সৃষ্টি জীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন, এবং সব দেখেন। (সুরা শুরা ৪২:১১)

(৪) আল্লাহ (সুব:) আরশের উপর বিরাজমানের ধরণ ও পদ্ধতি নিয়ে তর্কে লিপ্ত না হওয়া। কেননা এটা গাইবী (অদৃশ্যের) বিষয়, যা একমাত্র আল্লাহ (সুব:) ছাড়া কেউ জানেনা।

(৫) এ গুণটি হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং এর প্রভাবের প্রতি ঈমান আনা, আর তা হলো আল্লাহ্‌র (সুব:) যথাযোগ্য মহত্ত ও শ্রেষ্টত্ব সাব্যস্ত করা, যা সমগ্র সৃষ্টি হতে তাঁর উর্দ্ধে ও সুউচ্চে (আরশের উপর) অবস্থানই প্রমাণ করে। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বিদাহ। আক্বিদার কিতাব সমূহে ইমাম মালেক (র:) এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে। আর তা হলো:

استوائه معلوم وكيفيته مجهول والايمان به واجب والسوال عنه بدعة

অর্থ: "ইসতোয়া অর্থাৎ বসা বা উর্ধারোহণ এর অর্থ সবাই বুঝে, কিন্তু কিভাবে, তা কেউ জানে না। এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, আর এর ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদা'আত।" (ওসিয়্যাতু আবী উসমান লিস সাবূনী; আদ দুরারুস সানিয়্যাহ ১/১৪২)

প্রশ্ন: আল্লাহ নিরাকার নন এই বিষয়টির প্রমান কি?

উত্তর: আল্লাহ নিরাকার এর সমর্থনে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে কোন প্রমান নেই, হকপন্থী কোন আলেম থেকেও এর প্রমান নেই। এটি কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত একটি ভ্রান্ত আক্বীদাহ। আল্লাহ নিরাকার এটি একটি হিন্দুয়ানী আক্বীদাহ।

কুরআন এবং বহু হাদীসে আল্লাহর চেহারা, হাত, পা, চোখ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু আল্লাহর এসব গুনের কোন সাদৃশ্য বর্ননা করা যাবে না, কোন উপমা দেয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى/١١

অর্থ: "(সৃষ্টি জীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন, এবং সব দেখেন।" (সুরা শুরা ৪২:১১)

আল্লাহ (সুব:) আরও বলেছেন- فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ অর্থ: "তোমরা আল্লাহর জন্য বিভিন্ন রকম উপমা পেশ করো না।" (সুরা নাহল ১৬:৭৪)

তাই ইসলামী আক্বীদাহ হচ্ছে: আল্লাহর অজানা আকার রয়েছে যা তুলনাহীন।

▪ **চেহারা:** কুরআনে চৌদ্দটি আয়াতে আল্লাহর চেহারার উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন- وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "তোমার জালাল এবং ইকরামের অধিকারী রবের চেহারাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।" (সুরা আর রহমান ৫৫:২৭)

▪ **চোখ:** অনেক আয়াতে আল্লাহর চোখের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ (সুব:) বলেন: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا "আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার চোখের সামনে আছেন।" (সুরা তুর ৫২:৪৮)

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ

অর্থাৎ আল্লাহ (সুব:) টেরা নন, অথচ মাসীহুদ দাজ্জালের ডানচোখ টেরা। (সহীহ বুখারী ৩৪৩৯)

▪ **হাত:** তেরটি আয়াতে আল্লাহর হাতের উল্লেখ এসেছে, যেমন তিনি বলেন,

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

অর্থ: "তোমাকে কিসে বাধা দিল তাকে সিজদা করতে, যাকে আমি আমার দুই হাতে সৃষ্টি করেছি। (সুরা ছোয়াদ ৩৮:৭৫)

▪ **পা:** আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ { تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ } حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, (কেয়ামতের মাঠে) জাহান্নাম বলতে থাকবে 'আরো কিছু আছে কি?' শেষ পর্যন্ত আল্লাহ (সুব:) জাহান্নামে তাঁর পা রাখবেন। অত:পর জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট! যথেষ্ট।" (সহীহ বুখারী ৬৬৬১; সহীহ মুসলিম ৭৩৫৬; সুনানে তিরমিজি ৩২৭২) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা .....পৃষ্ঠায় করা হয়েছে।

প্রশ্ন: দুনিয়াতে বসে আল্লাহকে দেখা সম্ভব কি?

উত্তর: এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বিদাহ হলো: দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ (সুব:) হচ্ছেন অসীম। আর মাখলুক সসীম। মানুষের দৃষ্টি শক্তি, শ্রবন শক্তি সবকিছুই সীমিত। সীমিত দৃষ্টি শক্তি দিয়ে অসীম আল্লাহ (সুব:) কে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } [الأنعام : ١٠٣]

অর্থ: "চক্ষুসমূহ তাকে আয়ত্ব করতে পারে না। আর তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ব করেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।" (সুরা আন'আম ৬:১০৩)

মূসা (আ:) আল্লাহকে দেখার জন্য আবেদন করেছিলেন এর উত্তরে আল্লাহ (সুব:) বলেছিলেন:

{قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي} [الأعراف : ١٤٣]

অর্থ: "হে আমার রব! আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে (দুনিয়াতে) কখনো দেখবে না।" (সুরা আ'রাফ ৭:১৪৩)

এ আয়াতগুলো দ্বারা প্রমানিত হলো এই পৃথিবীতে মানুষের চর্ম চক্ষু দিয়ে আল্লাহ (সুব:) কে দেখা সম্ভব নয়। তবে আখেরাতে আল্লাহ (সুব:) কে দেখা যাবে বলে কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আল্লাহ (সুব:) বান্দাকে নিজ অনুগ্রহে ঐ শক্তি দান করবেন।

পরকালে আল্লাহ (সুব:) কে দেখা যাবে। পবিত্র কুরআন থেকে এই ব্যাপারে দলীল-প্রমান।

প্রথম দলীল:

{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس : ٢٦]

অর্থ: "যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি।" (সূরা ইউনুস ১০:২৬)

এই আয়াতে 'আরো বেশী' বলতে আল্লাহর সাক্ষাতকেই বুঝানো হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ – قَالَ – يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ – قَالَ – فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ)

অর্থ: "সুহাইব (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আল্লাহ (সুব:) বলবেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত দিতে পারি? তখন জান্নাতিগণ বলবেন, আপনি কি আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেন নি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন নি? (আমরা আর কি চাব?) তখন আল্লাহ (সুব:) স্বীয় চেহারা থেকে হেজাব (নূরের পর্দা) সরিয়ে ফেলবেন। জান্নাতের যতসব নেয়ামত তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় নেয়ামত হবে আল্লাহর দর্শন। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা:) উপরোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেলেন। যার অর্থ হলো: যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি।" (সহীহ মুসলিম ৪৬৮; সহীহ বুখারী ৩১০৫)

দ্বিতীয় দলীল: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف : ١١٠]

অর্থ: "যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।" (সুরা কাহাফ ১৮:১১০) এই আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, যারা আমলে সালেহ করবে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে

আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না তারা অবশ্যই আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করতে পারবে।

তৃতীয় দলীল: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ} [الأنعام : ٣١)

অর্থ: "তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে।" (সুরা আনআম ৬:৩১)

চতুর্থ দলীল: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ } [الأنعام : ١٥٤)

অর্থ: "অত:পর আমি মূসাকে প্রদান করেছি কিতাব, যে সৎকর্ম করেছে তার জন্য পরিপূর্ণতাস্বরূপ, প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ। যাতে তারা তাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে ঈমান রাখে।" (সূরা আনআম ৬:১৫৪) এছাড়াও আরও অনেক আয়াত রয়েছে। দেখুন: ১০:৪৫, ১৩:২, ২৩:৩৩, ২৯:৫, ৩০:৮, ৩২:১০, ৪১:৫৪, ১০:৭, ১০:১১, ১৮:১০৫, ২৯:২৩, ৩২:২৩ ইত্যাদি আয়াত সমূহ।

হাদীস থেকে দলীল:

ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا

অর্থ: "জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পারবে।" (সহীহ বুখারী ৭৪৩৫)

দ্বিতীয় হাদীস: ইরশাদ হচ্ছে:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِه

অর্থ: "জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকটে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবকে দেখবে যেভাবে এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। আল্লাহ (সুব:) কে দেখতে গিয়ে তোমদের কোন

ভীর করতে হবে না।" (সহীহ বুখারী ৫৫৪; সহীহ মুসলিম ১৪৬৬; সুনানে তিরমিজি ২৫৫৪; সুনানে আবু দাউদ ৪৭৩১; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৭৭)

তৃতীয় হাদীস:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَة قَالَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা:) কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিবসে আমাদের রবকে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতে মেঘমালা বিহীন পরিষ্কার আকাশে চাঁদ দেখতে কোন প্রকার ভোগান্তি পোহাতে হয়? তারা বললেন, না! রাসূলুল্লাহ (সা:) আবার প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কি মেঘমালা বিহীন পরিষ্কার আকাশে সূর্য দেখতে কোন ভোগান্তি পোহাতে হয়? তারা বললেন, না! অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তোমরা ঐ রকমভাবে আল্লাহ (সুব:) কে দেখতে পাবে (যেরকমভাবে পরিষ্কার আকাশে পূর্ণিমার রাতের চাঁদ ও দূপুর বেলার সূর্য দেখা যায়) " (সহীহ বুখারী ৮০৬)

চতুর্থ দলীল:

عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم... إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَة أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّة مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّه مِنْ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِى رَأَوْهُ فِيهَا.قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا فَارَقْنَا النَّاسَ فِى الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّه مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّه شَيْئًا – مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا – حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلبَ. فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّه مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِه إِلاَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً

وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِى صُورَتِهِ الَّتِى رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا.

অর্থ: “আবু সাইদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ (সুব:) পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে, দুনিয়াতে যে যার ইবাদত বা আনুগত্য করতো সে যেন তাকে অনুসরন করে এবং তার দলে চলে যায়। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াতে যে যার আনুগত্য করতো সে তাকে অনুসরন করে তার নেতৃত্বে জাহান্নামে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত যারা শুধুমাত্র আল্লাহ (সুব:) এর ইবাদত করতো এবং আল্লাহ (সুব:) ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করতো না তারা থেকে যাবে। নেককার-গুনাহগার সকলেই থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহ (সুব:) কে তার যে আকৃতিতে চিনে তার চেয়ে সাধারণ আকৃতিতে উপস্থিত হয়ে বলবেন, তোমরা এখানে কিসের অপেক্ষায় আছো? অথচ সকলেই যে যার আনুগত্য করতো তাকে অনুসরণ করে চলে গেছে। তারা বলবে, যখন আমরা ওদের কাছে সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী ছিলাম তখনই ওদের থেকে আলাদ ছিলাম, ওদের সঙ্গী হইনি (আর এখন ওদের সঙ্গী হবো?)। তখন আল্লাহ (সুব) বলবেন, আমিই তোমাদের রব। তখন লোকেরা বলবে, আমরা আপনার থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবো না। একথা তারা দুবার বা তিনবার বলবে। এমনকি কেউ কেউ ওখান থেকে সরে যেতে চাইবে। অত:পর আল্লাহ (সুব:) জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের ও তোমাদের রবের মাঝে কোন বিশেষ পরিচয় চিহ্ন আছে কি? যার মাধ্যমে তোমরা তাকে চিনতে পারবে। তারা বলবে, হ্যা! তখন আল্লাহ (সুব:) তাঁর পায়ের নিম্নাংশ (নলা) প্রকাশ করবেন। তখন যারা শুধু মাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সিজদা করতো তাদের সকলকে সিজদা করার জন্য অনুমতি দেয়া হবে (এবং তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়বে)। আর যারা সুবিধা আদায়ের জন্য ও লোক দেখানোর জন্য সিজদা করতো তাদের পিঠ (কাঠের মত) সোজা করে দেয়া হবে। ফলে তারা যখনই সিজদা করার ইচ্ছা করবে উল্টে পরে যাবে। অত:পর মুমিনরা সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করবেন অত:পর আল্লাহ (সুব:) আবারো সেই প্রথম আকৃতিতে

রূপান্তরিত হবেন এবং বলবেন আমি তোমাদের রব। তখন (তাওহীদবাদী মুমিনরা) বলবেন, হ্যাঁ! আপনিই আমাদের রব। (সহীহ বুখারী ৪৫৮১; সহীহ মুসলিম ৪৭২)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পরকালে আল্লাহ (সুব:) কে দেখা যাবে।

দ্বিতীয় রুকন: মালায়েকা বা ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান

প্রশ্ন: মালায়েকাদের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?

উত্তর: মালায়েকা বা ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনা, ঈমানের ছয়টি রুক্নের দ্বিতীয় রুক্ন বা স্তম্ভ। মালায়েকাদের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন ব্যক্তির ঈমান সঠিক ও গ্রহণ যোগ্য হবেনা। সম্মানিত ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব হওয়ার উপর সকল মুসলিমগণ একমত। যারা সকল মালায়েকাদের অথবা তাঁদের আংশিকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে তারা কুফুরী করলো এবং কুরআন, হাদীস ও ইজমার বিরোধিতা করলো।

প্রশ্ন: সংক্ষিপ্ত ভাবে মালায়েকাদের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তর: মালায়েকাদের প্রতি ঈমান আনার পদ্ধতি হচ্ছে মালায়েকাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ভাবে ঈমান আনা। সংক্ষিপ্ত ঈমান নিম্নের বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথম: তাদের অস্তিত্বের স্বীকার করা, তারা আল্লাহর সৃষ্টি জীব, আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়: আল্লাহ্ (সুব:) তাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন, তাদেরকে সেই সম্মান দেওয়া। তারা আল্লাহর বান্দা বা দাস। আল্লাহ্ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাদের মর্যাদাকে উঁচু করেছেন এবং তাদেরকে নৈকট্য দান করেছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে যতটুকু ক্ষমতার মালিক করেছেন, তারা ততটুকু ক্ষমতারই মালিক। তারা তাদের নিজেদের ও অন্যদের লাভ-ক্ষতির মালিক নয়। তারা আল্লাহর নির্দেশের আগে-ভাগে কোন কাজ করেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} (الأنبياء : ٢٧)

অর্থ: "তারা তাঁর (আল্লাহর) আগ বাড়িয়ে কোন কথা বলে না, তাঁর নির্দেশেই তারা কাজ করে।" (সুরা আম্বিয়া ২১:২৭) আবার আল্লাহ (সুব:) কোন নির্দেশ দিলে তা অমান্যও করে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (التحريم : ٦)

অর্থ: "আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে তারা অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।" (সুরা তাহরীম ৬৬:৬)

প্রশ্ন: মালায়েকারা কিসের তৈরী?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) মালায়েকাদের নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِـــنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

অর্থ: "আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: মালায়েকাদের নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, জ্বীনদের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর আদম (আ:) কে ঐ জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তোমাদেরকে (কুরআনে) বর্ণনা করা হয়েছে (মাটি থেকে)।" (সহীহ মুসলিম ৭৬৮৭)

তাদেরকে আদম (আ:) এর সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْـــسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}

অর্থ: "আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব মালায়েকাদের বললেন, 'নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।" (সুরা বাকারা ২:৩০)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল মালায়েকাদের আদম (আ;) সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।

প্রশ্ন: মালায়েকাদের সংখ্যা কত?

উত্তর: মালায়েকারা সৃষ্ট জীব, তাদের আধিক্যের জন্যে আল্লাহ্ (সুব:) ছাড়া তাদের সংখ্যা কেউ জানে না। সপ্তম আকাশে বায়তুল মা'মুরে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা প্রত্যহ প্রবেশ করছেন। তাদের আধিক্যতার জন্যে একজন দ্বিতীয় বার ফিরে আসার সুযোগ পাবেন না। (সহীহ মুসলিম ৪২৯) কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম উপস্থিত করা হবে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে।

প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা হবে, তারা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবে। রাসুল (সা:) আরো বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, (কেয়ামতের দিন) জাহান্নাম কে নিয়ে আসা হবে, সে দিন তার সত্তর হাজার লাগাম হবে। আর প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার মালায়েকা হবে। তারা তাকে টেনে নিয়ে আসবে।" (সহীহ মুসলিম ৭৩৪৩)

এই হাদীসে ফিরিশ্তাদের এক বিরাট সংখ্যা প্রকাশিত হল। যারা প্রায় (৭০০০০×৭০০০০=) ৪৯০ কোটি জন। শুধু জাহান্নামকে টেনে আনতে যদি এত মালায়েকাদের নিয়োগ করা হয় তাহলে বাকী মালায়েকাদের সংখ্যা কত হতে পারে?

প্রশ্ন: বিশেষ কিছু মালায়েকার নাম উল্লেখ করুন?

উত্তর: কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা:) আমাদের জন্যে যে, সকল মালায়েকাদের নাম উল্লেখ্য করেছেন, তাদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন তিনজন।

(১) জিব্রীল: তাকে জিবরাঈল ও বলা হয়। তিনিই রুহুল কুদ্দস, যিনি অহী নিয়ে রাসূলগণের নিকট আসতেন।

(২) মিকাঈল: তাকে প্রশান্তি বলা হয়। বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত, যা জমির জীবিকা স্বরূপ। আল্লাহ্ যেখানে বর্ষণের আদেশ দেন সেখানে বর্ষণ পরিচালনা করেন।

(৩) ইস্রাফীল: তিনি শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। পার্থিব জীবন শেষে পরকালীন জীবন শুরু হওয়ার ঘোষনা স্বরূপ এবং এর দ্বারাই (মৃত) দেহ সমূহের পুনরুত্থান ঘটবে।

প্রশ্ন: মালায়েকাদের সিফাত বা গুন বৈশিষ্ট্য কি কি?

উত্তর: মালায়েকাদের সিফাত বা বৈশিষ্ট্য: মালায়েকাদের প্রকৃতি হলো তারা সৃষ্টি জীব। তাদের শরীর রয়েছে যা সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত গুনে গুনান্বিত।

মালায়েকাদের কিছু গুন এখানে বর্ণনা করা হলো:

(ক) তাদের সৃষ্টি মহান এবং তাদের শরীর হলো বিশাল আকৃতির। আল্লাহ্ (সুব:) মালায়েকাদের শক্তিশালী ও বড় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। ফলে আল্লাহ (সুব:) তাদেরকে আসমান ও যমিনে যে বড় বড় কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা তার উপযোগী।

(খ) তাদের ডানা রয়েছে: আল্লাহ্ (সুব:) ফিরিশ্তাদের জন্যে দুই, তিন ও চার বা ততোধিক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন: রাসূল (সা:) জিব্রীল (আ:) কে দেখেছিলেন, তার নিজস্ব আকৃতিতে ছয়শত পাখা বিশিষ্ট অবস্থায়। যা আকাশের প্রান্তভাগ ঢেকে রেখেছিল।

(গ) তাদের পানাহার প্রয়োজন হয় না: আল্লাহ্ (সুব:) মালায়েকাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা পানাহারের মুহ্তাজ বা মুখাপেক্ষী নন। তারা বিবাহ করেননা, সন্তান ও হয়না।

(ঘ) মালায়েকারা অন্তর বিশিষ্ট ও জ্ঞানী। তাঁরা আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং আল্লাহ্ (সুব:) তাদের সাথে কথা বলেছেন। তারা আদম ও অন্যান্য নবীদের সাথেও কথা বলেছেন।

(ঙ) তাদের নিজস্ব আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহ (সুব:) স্বীয় মালায়েকাদের পুরুষ মানুষের আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

(চ) মালায়েকারা মৃত্যুবরণ করবেন। মালাকুল মাউত বা জান কবজকারী মালাকাসহ সকল মালায়েকারা কিয়ামত দিবসে মৃত্যু বরণ করবেন। অত:পর আল্লাহ্ (সুব:) তাদেরকে যে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে দায়িত্ব পালন করার জন্য পুনরুত্থান করা হবে।

(ছ) মালায়েকারা আল্লাহর অনেক ধরণের ইবাদাত করেন। সালাত, দু'আ, তাস্বীহ, রুকু, সিজদাহ, ভয়-ভীতি ও ভালবাসা ইত্যাদি। তাদের ইবাদাতের বর্ণনা নিম্নরুপ: (১) তারা অক্লান্ত ভাবে আল্লাহর ইবাদাতে সর্বদা রত থাকেন। (২) তারা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর (সুব:) জন্য ইবাদাত করেন। (৩) তারা নাফারমানী বর্জন করে সর্বদা আনুগত্যে মাশগুল থাকেন, কেননা তারা মা'সুম অর্থাৎ নাফারমানী ও পাপাচার হতে মুক্ত। (৪) অধিক ইবাদাত করার সাথে সাথে আল্লাহর জন্য বিনয়-নম্রতাও তারা প্রকাশ করে থাকে।

প্রশ্ন: মালায়েকাদের কর্মসমূহ কি কি?

উত্তর: মালায়েকারা অনেক বড় বড় কাজ সম্পাদন করেন, যার দায়িত্ব আল্লাহ্ (সুব:) তাদেরকে দিয়েছেন। সে কাজ গুলো নিম্নরূপ:

(১) আরশ বহন করা। (২) রাসূলগণের উপর অহী অবতীর্ণের দায়িত্ব পালন করা। (৩) জান্নাত ও জাহান্নামের পাহারাদারী করা। (৪) উদ্ভিদ, বৃষ্টি-বর্ষণ ও বাদল (মেঘ) পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা। (৫) পাহাড়-পর্বতের দায়িত্ব পালন করা। (৬) শিংগায় ফুৎকারের দায়িত্ব পালন করা। (৭) আদম সন্তানের কর্ম লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করা। (৮) আদম সন্তানকে হিফাজত করার দায়িত্ব পালন করা। আল্লাহ্ যখন আদম সন্তানের উপর কোন কাজ নির্ধারণ করেন, তখন তারা তাকে পরিত্যাগ করেন, অত:পর আল্লাহ তাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছিলেন, তা পতিত হয় বা সংঘটিত হয়। (৯) মানুষের সাথে থাকার ও তাদেরকে কল্যানের দিকে আহ্বানের দায়িত্ব পালন করা। (১০) জরায়ুতে বীর্য সঞ্চার, মানুষের (দেহে) অন্তরে আত্মা প্রক্ষেপ, তার রিযিক, কর্ম ও সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্য লিপিবদ্ধে দায়িত্ব পালন করা। (১১) মৃত্যুর সময় আদম সন্তানের আত্মা কবজ করার দায়িত্ব পালন করা। (১২) মানুষকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ এবং উত্তর অনুযায়ী শান্তি বা শাস্তি প্রদানে দায়িত্ব পালন করা। (১৩) নবী (সা:) এর উপর তাঁর উম্মতের সালাম পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করা। তাই মুসলিম ব্যক্তি নবী (সা:) এর উপর তার সালাম প্রেরণের জন্য তাঁর কাছে (তাঁর কবরের কাছে) ভ্রমণের প্রয়োজন হয় না। উল্লেখিত এ প্রসিদ্ধ কাজ সমূহ ব্যতীত মালায়েকাদের আরো অনেক কাজ রয়েছে।

প্রশ্ন: আমাদের প্রতি মালায়েকাদের কি অধিকার রয়েছে?

উত্তর: আদম সন্তানের উপর মালায়েকাদের অধিকার:

(ক) তাদের প্রতি ঈমান আনা। (খ) তাদেরকে ভালবাসা, সম্মান করা ও তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা। (গ) তাদেরকে গালি দেওয়া, মর্যাদা ক্ষুন্ন করা, ও তাদেরকে নিয়ে হাসি রহস্য করা হারাম। (ঘ) মালায়েকারা যা অপছন্দ করেন তা হতে দূরে থাকা। কারণ, আদম সন্তানরা যাতে কষ্ট পায় তারাও তাতে কষ্ট পায়।

প্রশ্ন: মালায়েকাদের প্রতি ঈমান আনার সুফল কি?

উত্তর: মালায়েকাদের প্রতি ঈমান আনার সুফল হচ্ছে:

(১) ঈমান পরিপূর্ণ হয়। কারণ তাদের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা। (২) তাদের সৃষ্টি কর্তার মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর শক্তি ও রাজত্বে জ্ঞান অর্জন। কারণ, সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব হতে সৃষ্টি জীবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। (৩) তাদের গুনাগুন, তাদের অবস্থা ও কর্ম জানার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়। (৪) আল্লাহ (সুব:) যখন মু'মিনদেরকে মালায়েকাদের দিয়ে হিফাজত করেন, তখন তাদের (মু'মিনদের) শান্তি ও তৃপ্তি অর্জন হয়। (৫) ইবাদাত সঠিক পন্থায় হওয়া এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে মালায়েকাদের ভালবাসা। (৬) খারাপ ও নাফারমানী পূর্ণ কাজকে অপছন্দ করা। (৭) আল্লাহ (সুব:) তাঁর বান্দাদের গুরুত্ব দেন এই জন্য তাঁর প্রশংসা করা। যেমন আল্লাহ্ ঐ সকল মালায়েকাদের কাউকে তাদেরকে (বান্দাদেরকে) হিফাজতের ও কর্ম লিখা ইত্যাদি কল্যাণ জনক কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন।

চতুর্থ রুকন: কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

প্রশ্ন: কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?

উত্তর: রাসূলগনের উপর আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা। ইহা ঈমানের তৃতীয় রুক্ন বা স্তম্ভ। আল্লাহ (সুব:) তাঁর রাসূলগণের (আ:) উপর যেই সকল কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ (সুব:) সত্যিকার অর্থে কিতাব সমূহের মাধ্যমে কথা বলেছেন এবং তা (আল্লাহর পক্ষ হতে) অবতীর্ণ। ইহা আল্লাহর কালাম, মাখলুক বা সৃষ্ট নয়। আর যে ব্যক্তি তা (কিতাব সমূহ) অথবা তাঁর কিছুকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَـــابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء/١٣٦)

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি অবতীর্ণ

করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর যে গুলো অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশ্তাদের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর, এবং রাসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবেনা, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে। (সুরা নিসা ৪:১৩৬)

প্রশ্ন: কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার মূল কথা কি?

উত্তর: কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার মর্ম হলো: আল্লাহ (সুব:) নিজ সত্যের ঘোষণা এবং এর প্রতি আহবানের উদ্দেশ্যে তাঁর নবী ও রাসূলগণের উপর বহু সংখ্যক ছোট বড় কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এগুলোর প্রতি اجْمَالًـــا সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনতে হবে। আর যে সব কিতাবের নাম আল্লাহ (সুব:) উল্লেখ করেছেন যেমন: তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, কুরআন সেগুলোর প্রতি تَفْصِيْلًا বিস্তারিতভাবে ঈমান আনতে হবে। আর কুরআনের প্রতি শুধু ঈমান আনলেই চলবে না বরং তার উপর আমল করা অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(الأنعام : ١٥٥)

অর্থ: "আর এটি কিতাব– যা আমি নাযিল করেছি– বরকতময়। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।" (সুরা আনআম ৬:১৫৫)

'শরহুল আক্বীদা আত্ব ত্বাহাবীয়া' কিতাবে বলা হয়েছেঃ কুরআনের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো তার স্বীকৃতি দেওয়া ও অনুসরণ করা এবং এ অনুসরন অন্যান্য কিতাবের প্রতি ঈমান আনার উপর অতিরিক্ত বিষয়।

তাছাড়া এ কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহর অনেক কিতাব রয়েছে। যা তিনি তাঁর রাসূলগণের (আ:) উপর নাযিল করেছেন। আর তা সত্যিকার অর্থে তাঁর (আল্লাহর) বাণী। আর তা হল হিদায়াত ও আলো। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এ কিতাব সমূহের সংখ্যা কেউ জানেনা।

প্রশ্ন: এসব কিতাব নাযিলের প্রয়োজনীয়তা ও হিক্মাহ কি?

উত্তর: সাধারণ মানুষের জন্য ইলম ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হলো দুটো।

প্রথমত: ইন্দ্রিয়। মানুষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞানার্জণ করে। যেমন চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, নাক দিয়ে ঘ্রান নেয়, জিহবা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে এবং ত্বকের মাধ্যমে স্পর্শ করে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমান জ্ঞানার্জন করা যায়। ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যেখানে শেষ সেখান থেকে জ্ঞানার্জনের দ্বিতীয় উপকরণ বা মাধ্যম বিবেক-বুদ্ধির কাজ শুরু হয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্জিত জ্ঞানকে বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষনা করে অজানা জ্ঞান অর্জন করে থাকে। কিন্তু কিছু ইলম বা জ্ঞান এরকমও আছে যা ইন্দ্রিয় এবং বিবেক বুদ্ধি কোনটি দিয়েই অর্জণ করা সম্ভব নয়। যেমন: দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা যাবে না কেন? নিজের মা অথবা মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না কেন? এসব ইলম অর্জন করার জন্য যে তৃতীয় মাধ্যমটি রয়েছে তাই হলো অহী। যা আসমানী কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আসমানী কিতাব নাযিলের অন্যান হিকমাতগুলো ধারাবাহিকভাবে নিম্নে পেশ করা হলো:

প্রথমত: যাতে রাসূলগণের উপর অবর্তীণ কিতাব তাঁর উম্মাতের জন্য জ্ঞান কোষ স্বরূপ হয়। ফলে তারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্যে এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

দ্বিতীয়ত: যাতে রাসূলগণের উপর অবর্তীন কিতাব তাঁর উম্মতের প্রত্যেক মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়ে ইনসাফ ভিক্তিক বিচারক হয়।

তৃতীয়ত: যাতে অবর্তীণ কিতাব রাসূলগণের মৃত্যুর পর দ্বীন সংরক্ষণকারী হিসাবে দাঁড়াতে পারে। স্থান ও কালের যতই দুরুত্ব হোকনা কেন। যেমন: আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা:) এর পরবর্তী দাওয়াতের অবস্থা।

চতুর্থত: যাতে এ অবর্তীণ কিতাব সমূহ আল্লাহর পক্ষ হতে হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) স্বরূপ হয়। যেন সৃষ্টি জীব এর (কিতাব সমূহের) বিরোধিতা করা এবং এর আনুগত্য হতে বের হয়ে যাওয়ার সামর্থ না রাখে। আল্লাহ (সুব:)বলেন:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُـــمُ الْكِتَـــابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ [البقرة/٢١٣)

অর্থ: "সকল মানুষ একই জাতি সত্ত্বার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অত:পর আল্লাহ্ (সুব:) নবীদেরকে পাঠালেন সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে।

আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন।" (সুরা বাক্বারা ২:২১৩)

প্রশ্ন: কিতাব সমূহের প্রতি কিভাবে ঈমান আনয়ন করতে হবে?

উত্তর: এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ (সুব:) তাঁর রাসূলগণের উপর অনেক কিতাব অবর্তীণ করেছেন। আল্লাহ কুরআন কারীমে যে সকল কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনা। তা হতে আমরা জেনেছি- কুরআন, তাওরাত, যাবুর, ইনজীল এবং ইব্রাহীম ও মূসা এর প্রতি অবতীর্ণ পুস্তিকা সমূহ। আরো ঈমান আনা যে, ঐ সকল কিতাব ছাড়াও আল্লাহর অনেক কিতাব রয়েছে, যা তাঁর নবীগণের উপর অবর্তীণ করেছেন। আর আল্লাহ ছাড়া ঐ সকল কিতাবের নাম ও সংখ্যা কেউ জানেনা। এ কিতাবগুলো অবর্তীণ হয়েছে যাবতীয় সৎকর্ম ও ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর (সুব:) নিমিত্তে সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর তাওহীদ (এককত্ব) বাস্তবায়ন এবং পৃথিবীতে শির্ক ও অন্যায়-অনাচার দূরীভূত করার জন্য।

প্রশ্ন: আল কুরআনের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তর: আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনা হলো: অন্তরে ও মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং কুরআনে যা রয়েছে তার উপর আমল করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

অর্থ: "তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। (সুরা আ'রাফ ৭:৩)

পূর্ববতী কিতাবের চেয়ে কুরআনের কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

- আল-কুরআন স্বীয় শব্দ, অর্থ এবং তাতে যে জ্ঞান ও পার্থিব তথ্য রয়েছে তা সর্ব বিষয়ে এক অলৌকিক শক্তি।
- আল-কুরআন সর্ব শেষ আসমানী কিতাব, কুরআনের মাধ্যমে আসমানী কিতাবের সমাপ্তি ঘটেছে।

- সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে আল্লাহ (সুব:) কুরআনকে হেফাজত করবেন। ইহা অন্যান্য কিতাব হতে স্বতন্ত্র। কেননা সে সব কিতাবে বিকৃতি ও পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটেছে।
- আল-কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন ও সংরক্ষণকারী। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [يوسف/١١١)

অর্থ: "এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্ত যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ, রহমত ও হিদায়াত।" (সুরা ইফসুফ ১২:১১১)

- কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের রহিতকারী।

প্রশ্ন: পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ থেকে কিভাবে সংবাদ গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর: আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি যে, পূর্ববর্তী কিতাবে আল্লাহ (সুব:) তাঁর রাসূলগণের নিকটে অহীর মাধ্যমে যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য, তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এর অর্থ এ নয় যে, বর্তমানে আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের) নিকট যে কিতাব রয়েছে তা গ্রহণ করবো। কারণ তা বিকৃত করা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের নিকট যে ভাবে অবতীর্ণ করেছেন সে ভাবে নেই।

কুরআনে যে সকল বিধান রয়েছে তা মেনে চলা আমাদের অপরিহার্য। তবে পূর্ববর্তী কিতাবে যা রয়েছে তা নয়। কারণ আমরা দেখবো পূর্ববর্তী কিতাবে যে বিধান রয়েছে তা যদি আমাদের শরিয়াতের পরিপন্থী হয়, তবে আমরা তা আমল করবো না। তা বাতিল এ জন্যে নয়, বরং তা সে সময় সত্য ছিল, এখন তা আমল করা আমাদের উপর অপরিহার্য নয়। কারণ তা আমাদের শরীয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর যদি তা আমাদের শরীয়াতের অনুরূপ হয়, তবে তা সত্য বলে বিবেচিত হবে। আমাদের শরীয়াত তা সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى [الأعلى/١٦-١٩]

অর্থ: "বস্তত: তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে, ইব্‌রাহীম ও মূসার কিতাব সমূহে।" (সুরা আ'লা ১৬-১৯)

প্রশ্ন: কুরআন ও হাদীসে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ হয়েছে তা কি কি?

উত্তর: কুরআন ও হাদীসে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ হয়েছে তা হলো:

- **কুরআন মাজীদ:** কুরআন হল আল্লাহর বানী যা তিনি শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা:) এর উপর নাযিল করেছেন। কুরআন সর্ব শেষ অবতীর্ণ কিতাব। আল্লাহ (সুব:) কুরআনকে বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে হিফাজত করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন এবং সকল আসমানী কিতাবের রহিতকারী করেছেন। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر/٩]

অর্থ: "আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" (সুরা হিজর ১৫:৯)

- **তাওরাত:** তাওরাত ঐ কিতাব যাকে আল্লাহ মূসা (আ:) এর উপর নূর (জ্যোতি) ও হিদায়াত স্বরূপ নাযিল করেছিলেন। বনী ইসরাঈলের নবী ও আলেমগণ এর দ্বারা ফায়সালা করতেন। সুতরাং মূসা (আ:) এর উপর আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাত এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, বর্তমান তথাকথিত ইয়াহুদীদের হাতে বিকৃত তাওরাতের প্রতি নয়। আল্লাহ (সুব:) বলেন: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ [المائدة/٤٤] অর্থ: "আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি-----"। (সুরা মায়িদাহ ৫:৪৪)

- **ইঞ্জীল:** ইঞ্জীল ঐ কিতাব যা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ (সুব:) ঈসা (আ:) এর উপর নাযিল করেছিলেন, যা পুর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী। সুতরাং ঐ ইঞ্জীলের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, যা সঠিক মূলনীতি সহ আল্লাহ (সুব:) ঈসা (আ:) এর উপর নাযিল করেছিলেন। খৃষ্টানদের নিকট বিকৃত ইঞ্জীল বা বাইবেলে নয়। আল্লাহ (সুব:) বলেন: (وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ [المائدة/٤٦] অর্থ: "আমি তাকে (ঈসাকে) ইঞ্জীল প্রদান করেছি---।" (সুরা মায়িদাহ ৫:৪৬)

তাওরাত ও ইঞ্জীলে যা রয়েছে তন্মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা:) এর রিসালাতের সুসংবাদ রয়েছে।

- **যাবুর:** যাবুর ঐ কিতাব যা আল্লাহ্ (সুব:) দাউদ (আ:) এর উপর নাযিল করেছিলেন। সুতরাং ঐ যাবুরের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব যা আল্লাহ দাউদ (আ) এর উপর নাযিল করেছিলেন। সে যাবুর নয় যা ইয়াহুদীরা বিকৃত করে ফেলেছে। আল্লাহ (সুব:) বলেন: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا [النساء/١٦٣] অর্থ: আর দাউদকে দান করেছি যাবুর। (সুরা নিসা ৪:১৬৩)

- **ইব্‌রাহীম ও মূসা (আ:) এর সুহুফ বা পুস্তিকা সমূহ:** তা ঐ সকল পুস্তিকা যা আল্লাহ (সুব:) ইব্‌রাহীম ও মূসা (আ:) কে দিয়েছিলেন। কুরআন ও হাদীসে যা উল্লেখ্য হয়েছে তা ছাড়া এ সকল পুস্তিকা নিরুদ্দেশ। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى [الأعلى/١٨، ١٩]

অর্থ: "নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে। ইবরাহীম ও মূসার সহীফা সমূহে।" (সুরা আ'লা ৮৭:১৮-১৯)

রাসুলগনের প্রতি ঈমান

প্রশ্ন: রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) তার আপন বান্দাদের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে তাদেরকে তাঁর একত্ববাদ, ইবাদত, বাতিল মাবুদের অস্বীকৃতি ও ইহ-পরকালের সকল বিষয়ের নিদের্শনা দেওয়ার জন্য বহু সংখ্যক সুসংবাদবাহী, ভীতি প্রদর্শণকারী ও সত্যের প্রতি আহবানকারী নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তারা যা যা সংবাদ দিয়েছেন তা সবই সত্য। আল্লাহর সকল সংবাদই তারা সুস্পষ্টভাবে পৌছিয়েছেন। তারা সকলেই আল্লাহ (সুব:) এর সৃষ্ট মানুষ ছিলেন। রুবুবিয়্যাতের ও উলুহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট তাদের মধ্যে ছিল না।

রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের রুক্ন সমূহের একটি রুক্ন। যা ছাড়া কোন ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা। যে ব্যক্তি কোন রাসূলকে মিথ্যা জানল, সে যেন অস্বীকার করল যা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء/١٥٠، ١٥١]

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অস্বীকার করি এবং এরাই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য অস্বীকারকারী কাফের। আর যারা সত্য অস্বীকারকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমান জনক শাস্তি।" (সুরা নিসা ৪:১৫০-১৫১)

প্রশ্ন: নবী-রাসুলদের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তর: এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর অনেক রাসূল রয়েছে যাদেরকে তিনি তাঁর রিসালাত প্রচার করার জন্য নির্বাচন করেছেন। যারা তাঁদের অনুসরণ করবে, তারা হিদায়াত (সঠিক পথ) পাবে। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করবেনা তারা পথ ভ্রষ্ট হবে। আল্লাহ তাদের নিকট যে

কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা তারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রচার করেছেন। তারা অর্পিত আমানত আদায় করেছেন এবং স্বীয় উম্মাতকে কল্যাণের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন। যা সহ প্রেরিত হয়েছেন তার কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও গোপন না করে স্বজাতির উপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) কায়েম করেছেন। আল্লাহ যে সকল রাসূলদের নাম আমাদের কাছে উল্লেখ করেছেন, আর যাদের নাম উল্লেখ করেননি তাদের সকলের প্রতি আমরা ঈমান আনবো। প্রত্যেক রাসূলই তাঁর পরবর্তী রাসূল আগমণের সুসংবাদ দিতেন এবং পরবর্তী রাসূল পূর্ববতী রাসূলের সত্যায়ন করতেন। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة/١٣٦]

অর্থ: "তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, এবং তদীয় বংশ ধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীকে তাঁদের পালন কর্তার পক্ষ হতে যা দান করা হয়েছে তৎসমূদয়ের উপর। আমরা তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করিনা। আর আমরা তাঁরই (আল্লাহর) আনুগত্যকারী।" (সুরা বাক্বারা ২:১৩৬)

প্রশ্ন: নবুওয়াতের হাকীকাত কি?

উত্তর: নবুওয়াত হলো: স্রষ্টা (আল্লাহ) ও সৃষ্টি জীবের (বান্দার) মাঝে তাঁর শরিয়াত প্রচারের মাধ্যম। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নবুওয়াতের জন্য মনোনীত করেন এবং নবুওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেন। নবুওয়াত (আল্লাহ কর্তৃক) প্রদত্ত, কারো অর্জিত নয়। অধিক ইবাদাত বা আনুগত্যের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। কোন নবীর ইচ্ছায় বা তাঁর চাওয়ার মাধ্যমে ও আসেনা। ইহা শুধু মাত্র মহান আল্লাহর নির্বাচন ও মনোনয়ন। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (الحج/٧٥)

অর্থ: "আল্লাহ ফিরিশ্তা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।" (সুরা হাজ্ব ২২:৭৫)

প্রশ্ন: নাবী-রাসূলদের কেন পাঠানো হয়েছে?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) মানব জাতির কল্যানের জন্য যে অহী বা আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন তা শিক্ষা দেওয়াই হচ্ছে নবী-রাসূল প্রেরনের মূল উদ্দেশ্য । কেননা যদি শুধু কিতাব নাযিল করা হতো তাহলে মানুষেরা আল্লাহর কিতাবের মনগড়া ব্যাখ্যা করে কিতাবের মূল শিক্ষা ধবংশ করে ফেলতো । আর যদি শুধু রাসূল প্রেরণ করতেন অহী বা আসমানী কিতাব না দিতেন তাহলে মানুষেরা নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহ বানিয়ে ফেলতো । এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) মানব জাতির কল্যানের জন্য একদিকে কিতাব দান করেছেন অপর দিকে কিতাবের শিক্ষক হিসাবে নবী ও রাসূলও প্রেরণ করেছেন । নবী ও রাসূল প্রেরনের বিস্তারিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য ধারাবাহিকভাবে নিম্নে পেশ করা হলো:

প্রথমত: বান্দাদেরকে বান্দার ইবাদাত করা হতে মুক্ত করে বান্দার প্রতিপালকের (আল্লাহর) ইবাদাতে নিয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টিজীবের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বীয় প্রতিপালকের (আল্লাহর) স্বাধীন ইবাদাতের পথ দেখানো । আল্লাহ (সুব:) বলেন: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء/١٠٧] (আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি । (সুরা আল-আম্বিয়া:১০৭)

দ্বিতীয়ত: যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্যের সাথে (মানুষকে) পরিচয় করা । সে উদ্দেশ্য হলো তাঁর একত্ববাদ বিশ্বাস ও ইবাদাত করা । ইহা এক মাত্র রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায় । আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

অর্থ: "আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগূত (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত) থেকে নিরাপদ থাক ।" (সুরা নহল ১৬:৩৬)

তৃতীয়ত: রাসূলগণ প্রেরণের মাধ্যমে মানুষের উপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) প্রতিষ্ঠিত করা । আল্লাহ (সুব:) বলেন:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا [النساء/١٦٥]

অর্থ: "সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে, আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময় ।" (সুরা নিসা ৪:১৬৫)

চতুর্থত: কিছু অদৃশ্যের বিষয় বর্ণনা করা, যা মানুষ তাদের জ্ঞান দ্বারা অনুভব করতে পারে না । যেমন-আল্লাহর নাম সমূহ ও তাঁর গুনসমূহ এবং ফিরিশ্তাদের ও শেষ দিবস সম্পর্কে জানা ইত্যাদি ।

পঞ্চমত: যাতে তাঁরা (রাসূলরা) অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ হয় কেননা আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম চরিত্রে পূর্ণ করেছেন । এবং তাঁদেরকে সংশয় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে মুক্ত রেখেছেন । আল্লাহ (সুব:) বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب/٢١]

অর্থ: "তোমাদের জন্য রাসূল (সা:) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ-রয়েছে ।" (সুরা আহ্যাব ৩৩:২১)

ষষ্ঠত: আত্মশুদ্ধি ও পবিত্র করণ এবং আত্ম বিনষ্টকারী হতে সর্তক-সাবধান করা । আল্লাহ (সুব:) বলেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [الجمعة/٢]

অর্থ: "তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াত সমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষাদেন কিতাব ও হিক্মাত ।" (সুরা জুমু'আহ ৬২:২)

প্রশ্ন: রাসূলগণের দায়িত্ব সমূহ কি কি?

উত্তর: রাসূলগণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, তা নিম্নে বর্ণিত হল:

● শরীয়াত প্রচার করা: মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদাত হতে মুক্ত হওয়ার আহ্বান করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا [الأحزاب/٣٩)

অর্থ: "তাঁরা (নবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (সুরা আহ্যাব ৩৩:৩৯)

● দ্বীনের অবতীর্ণ বিধান বর্ণনা করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل/٤٤)

অর্থ: "আপনার কাছে আমি উপদেশ ভান্ডার (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।" (সুরা নাহাল ১৬:৪৪)

● উম্মাতকে কল্যাণের পথ প্রদর্শণ ও অকল্যাণ হতে সতর্ক সাবধান করা এবং তাদেরকে পূণ্যের সুসংবাদ ও শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ [النساء/١٦٥ অর্থ: "সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি।" (সুরা নিসা ৪:১৬৫)

● মানুষকে কথায় ও কাজে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আদর্শবান করে তোলা।

● আল্লাহর শরীয়াত বান্দাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ণ করা।

● রাসূলগণের স্বীয় উম্মাতের বিপক্ষে শেষ দিবসে এ স্বাক্ষ্য দেওয়া যে, তাঁরা তাদের নিকট স্পষ্ট ভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রশ্ন: ইসলাম সকল নাবীদের দ্বীন ছিল তার প্রমান কি?

উত্তর: ইসলাম সকল নবী ও রাসূলগণের দ্বীন। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران/١٩)

অর্থ: "নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন বা দ্বীন একমাত্র ইসলাম। (সুরাআল ইমরান ৩:১৯)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا

অর্থ: "ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম।" (সুরা আল ইমরান ৩:৬৭)

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } [البقرة : ١٣٢ ، ١٣٣)

অর্থ: "আর এরই উপদেশ দিয়েছে ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকূবও (যে,) 'হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনকে চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেয়ো না। নাকি তোমরা সাক্ষী ছিলে, যখন ইয়াকূবের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল? যখন সে তার সন্তানদেরকে বলল, 'আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে'? তারা বলল, 'আমরা ইবাদাত করব আপনার ইলাহের, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের, যিনি এক ইলাহ। আর আমরা তাঁরই অনুগত মুসলিম।" (সূরা বাকারা ২:১৩২-১৩৩)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ} [الحج : ٧٨)

অর্থ: "এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম'।" (সুরা হজ্জ ২২:৭৮)

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা গেল যে, সকল নবী-রাসূলদের দ্বীন ছিল ইসলাম। সকলেরই পরিচয় ছিল মুসলিম। সকলেরই দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদ। তাঁরা সকলেই এক আল্লাহর ইবাদাত করার দিকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত বর্জন করার আহবান জানাতেন। যদিও তাদের শরীয়াত ও বিধি-বিধান ভিন্ন রকম ছিল, কিন্তু তাঁরা সকলেই মূলনীতিতে একমত ছিলেন। তা হলো তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ব। নাবী (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... قَالَ الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, নবীরা একে অপরে বৈমাত্রেয় ভাই, তাদের সকলের মা ভিন্ন তবে দ্বীন একটাই.. ।" (সহীহ মুসলিম ৬২৮১; মুসনাদে আহমদ ৮২৪৮)

প্রশ্ন: রাসূলগণ মানুষ, তাঁরা "গায়েব" জানেন না তার প্রমান কি?

উত্তর: ইলমে গায়েব জানা উলুহীয়াতের (আল্লাহর) বৈশিষ্ট, নাবীগণের গুণ নয়। কারণ তাঁরা অন্যান্য মানুষের মত মানুষ। তাঁরা পানাহার করেন, বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হন, নিদ্রা যান, অসুস্থ হন ও ক্লান্ত হন। আল্লাহ তাঁদেরকে (রাসূলদেরকে ইলমে গাইব হতে) যা অবগত করান তা ব্যতীত কোন ইলমে গাইব জানেন না। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য দলীল-প্রমান রয়েছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে কিছু দলীল পেশ করা হলো:

প্রথম দলীল: আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}

অর্থ: "বল, 'আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে'।" (সুরা আ'রাফ ৭:১৮৮)

দ্বিতীয় দলীল: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الأنعام: ٥٩]

অর্থ: "আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং যমীনের অন্ধকারে

কোন দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না কোন শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।" (সুরা আনআম ৬:৫৯)

তৃতীয় দলীল: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ} [يونس: ٢٠]

অর্থ: "আর তারা বলে, 'তাঁর রবের পক্ষ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন কেন নাযিল করা হয় না'? বল, 'গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রয়েছি'।" (সুরা ইউনুস ১০:২০)

চতুর্থ দলীল: কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا [الجن/٢٦، ٢٧]

অর্থ: "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরন্ত তিনি অদৃশ্যের বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রেও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।" (সুরা জ্বিন ৭২:২৬-২৭)

পঞ্চম দলীল: আমাদের নবী (সা:) ওহীর মাধ্যমে জেনে বলেন:

{ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} [هود: ٤٩]

অর্থ:- এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতি:পূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার কওম। সুতরাং তুমি সবর কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য। (সুরা হুদ: ৪৯)

ষষ্ঠ দলীল: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ} [يوسف: ١٠٢]

অর্থ: "এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে ওহী করছি। তুমি তো তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল অথচ তারা ষড়যন্ত্র করছিল।" (সুরা ইউসুফ ১২:১০২)

সপ্তম দলীল: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: ٥٢]

অর্থ:- অনুরূপভাবে (উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে) আমি তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে 'রূহ'কে ওহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর নিশ্চয় তুমি সরল পথের দিক নির্দেশনা দাও। (সুরা শু'রা: ৫২)

অষ্টম দলীল: আল্লাহ (সুব:) বলেন;

{ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ } [آل عمران: ٤٤]

অর্থ:- এটি গায়েবের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠাচ্ছি। আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের দায়িত্ব নেবে? আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা বিতর্ক করছিল । (সুরা ইমরান ৩:৪৪)

নবম দলীল: কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام : ٥٠]

অর্থ: "বল, 'তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়'।" (সুরা আনআম ৬:৫০)

দশম দলীল: অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ}

অর্থ: "আর আমি তোমাদের বলছি না যে, 'আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ আছে' এবং আমি গায়েব জানি না আর আমি এও বলছি না যে, 'আমি ফেরেশতা।" (সুরা হুদ ১১:৩১)

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে প্রমানিত হলো যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা:) সহ কোন নবী-রাসূল, ফেরেশতা, অলী-আউলিয়া, পীর-বুযুর্গ, গনক-জ্যোতিষী কেউই গায়েব জানে না। তবে নবী যেসমস্ত গায়েবী খবর জানিয়েছেন তা অহীর মাধ্যমে জেনে তারপর সংবাদ দিয়েছেন। যেমন: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى }

অর্থ: "আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।" (সুরা নজম ৫৩:৩-৪)

বুঝা গেল, অহী ছাড়া নবী-রাসূলগণ কোন গায়েবী খবর বলতেন না। একারণেই কুরআন ও হাদীসে এরকম অসংখ্য ঘটনা ও কাহিনী বর্নিত হয়েছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা:) কিছুই জানতেন না। যেমন: ইউসূফ (আ:) এর ঘটনা সম্পর্কে ও মারইয়ামের লালন-পালন সম্পর্কীয় ঘটনা সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বললেন, 'আপনি এগুলো কিছুই জানতেন না। আমি আপনাকে অবহিত করেছি।'

একাদশ দলীল: রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন অহী প্রাপ্ত হয়ে খাদিজার নিকটে গেলেন এবং খাদিজা (রা:) তাকে ওরাকা বিন নাওফালের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন ওরাকা বিন নাওফাল যা বলেছিল, তা হাদীসের কিতাবে এভাবে বিবৃত হয়েছে:

...... فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا

অর্থ: ".....অতপর ওরাক্বা রাসুল (সা:) কে বলল, এই হচ্ছে জিব্রাইল (আ:) যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা (আ:) এর কাছে আসত। আফসোস যদি আমি জিবিত থাকতাম যখন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দিবে। তখন রাসুল (সা:) বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দেবে? তখন ওরাক্বা বলল, হ্যাঁ! তুমি যা নিয়ে এসেছ তা নিয়ে যে কেউ এসেছে তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। তোমার সেই দিন গুলোকে যদি আমি পেতাম

তাহলে আমার সর্ব শক্তি ব্যয় করে তোমাকে সহযোগিতা করতাম। (সহীহ বুখারী ৩)

রাসুল (সা:) যদি গায়েব জানতেন তাহলে রাসুল (সা:) কেন বললেন, আমাকে কি তারা বের করে দেবে? এতেই বুঝা যায় রাসুল (সা:) গায়েব জানতেন না। তবে আল্লাহ যতটুকু জানাতেন ততটুকুই জানতেন।

দ্বাদশ দলীল: রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বকরীর গোশতের সাথে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে অবশ্যই ঐ বিষাক্ত খাবার মুখে দিতেন না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: "আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, একজন ইয়াহুদী মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট একটি বিষ মিশ্রিত বকরী নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ (সা:) তা থেকে কিছু অংশ খেলেন। অত:পর মহিলাকে ধরে আনা হলো আর বলা হলো আমরা কি তাকে হত্যা করবো না। রাসূলুল্লাহ (সা:) নিষেধ করলেন। আনাস (রা:) বলেন, আমি সবসময় রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আলা জিহবায় (উপরে ঝুলন্ত গোশত) এই বিষের প্রতিক্রিয়া অনুভব করতাম।" (সহীহ বুখারী ২৬১৭; সুনানে আবু দাউদ ৪৫১০)

ত্রয়োদশ দলীল: রাসূলুল্লাহ (সা:) এর স্ত্রী আয়েশা (রা:) এর উপর কতিপয় লোক জিনা-ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) তা বিশ্বাস করে আয়েশা (রা:) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত আয়েশা (রা:) এর সাথে দেখা-সাক্ষাত, কথা-বার্তা বন্ধ রাখলেন। এবং অহীর অপেক্ষায় থাকলেন। দীর্ঘ একমাস পরে আল্লাহ (সুব:) অহীর মাধ্যমে যখন আয়েশার নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে অবহিত করলেন তখন প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন। যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে কেনই বা তিনি আয়েশা (রা:) কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন? এবং কেনইবা কথা-বার্তা বন্ধ করে অহীর অপেক্ষায় থাকবেন? আয়েশা (রা:) এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো এই:

{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (١٢) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}

অর্থ: "নিশ্চয় যারা এ অপবাদ[৪] রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

তাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে, যতটুকু পাপ সে অর্জন করেছে। আর তাদের থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহা আযাব। যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, 'এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ'? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে আসল না? সুতরাং যখন তারা সাক্ষী নিয়ে আসেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।" (সুরা নূর ২৪:১১-১৩)

প্রশ্ন: রাসূলগণ মা'সূম বা নিস্পাপ ছিলেন তার প্রমান কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) তাঁর রিসালাত প্রদান ও প্রচার করার জন্য তাঁর সৃষ্টি জীব হতে উত্তম জাতীকে নির্বাচন করেছেন। যারা সৃষ্টিগত ও চরিত্র গত

---

[৪] এটি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা। ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে একস্থানে রাত্রিযাপনের জন্য অবস্থান করেন। রাতের শেষ ভাগে আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একটু দূরে যান। কিন্তু পথে তিনি তাঁর গলার হারটি হারিয়ে ফেলেন। তিনি তাঁর হার খুঁজতে থাকেন। এদিকে কাফেলা রওনা হয়ে যায়। তিনি হাওদার ভিতরেই আছেন মনে করে কেউ তাঁর খোঁজ করেনি কারণ তাঁর শারীরিক গড়ন ছিল হালকা। হার খুঁজে পেয়ে তিনি এসে দেখেন যে, কাফেলা চলে গেছে।

তখন তিনি ছুটাছুটি না করে সেখানেই বসে পড়েন। এ আশায় যে কাফেলার রেখে যাওয়া মালামালের সন্ধানে নিয়োজিত কোন লোক আসবেন। অবশেষে এ কাজে নিয়োজিত সাফওয়ান (রা.) সকাল বেলায় আয়েশা (রা) কে দেখতে পেলেন এবং নিজের উটে তাঁকে আরোহণ করিয়ে নিজে পায়ে হেটে উটের রশি টেনে সসম্মানে তাঁকে নিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আয়েশা (রা) এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলো নাযিল করে আয়েশা (রা) এর পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্তির কথা জানিয়ে দেন। এই ঘটনাটি 'ইফ্ক' এর ঘটনা হিসেবে প্রসিদ্ধ।

দিক হতে পরিপূর্ণ, আল্লাহ তাঁদেরকে কবীরাহ্ গুনাহ হতে নিরাপদে রেখেছেন। সকল ত্রুটি হতে তাঁদেরকে মুক্ত করেছেন। যাতে তাঁরা আল্লাহর অহী স্বীয় উম্মাতের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হন। আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর (আল্লাহর) রিসালাত প্রচারের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে তাঁরা যে মা'সূম তা সর্বজন সিদ্ধ। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ [الأحزاب/٣٩)

অর্থ: "তাঁরা (নবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন, তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না।" (সুরা আহ্যাব ৩৩:৩৯)

যখন তাঁদের কারো পক্ষ হতে এমন কোন ছোট পাপ কর্ম প্রকাশিত হয় যা তাবলীগের (দ্বীন প্রচারের) সাথে সর্ম্পকৃত নয়। নিশ্চয় তখন তা তাঁদের নিকট বর্ণনা করা হবে। আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ ও তাঁর দিকে ধাবমান হওয়ার সাথে সাথেই মনে হবে যেন (এই পাপ) তাঁদের কাছ থেকে প্রকাশ পায় নাই এবং এর বিনিময়ে তাঁরা তাঁদের পূর্বের মর্যাদার চেয়ে আরো উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে পূর্ণ সৎ চরিত্রে ও ভাল গুণে বিশেষিত করেছেন এবং তাঁদের মান-মর্যাদা সুউচ্চ অবস্থান ক্ষুন্ন করে এমন সকল জিনিস হতে তাঁদেরকে আল্লাহ পুত-পবিত্র রেখেছেন।

প্রশ্ন: নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা কত এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা?

উত্তর: রাসূলগণের সংখ্যা তিনশত দশের কিছু বেশী প্রমাণিত হয়েছে। নাবী (সা:) কে যখন রাসূলগণের সংখ্যা সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন:

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ النَّبِيُّونَ؟ قَالَ : مِائَةُ أَلْفِ نَبِىٍّ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ نَبِىٍّ. قُلْتُ: كَمِ الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : ثَلاَثُمِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ

অর্থ: আবু যর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন....... আমি রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞাসা করলাম নবীগনদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, একলক্ষ চব্বিশ

হাজার। আমি বললাম: তাদের মধ্যে রাসুলগনের সংখ্যা কত? তিঁনি বললেন, তিনশত তের। (মুসতাদরাকে হাকেম ৪১৬৬; সুনানে বায়হাকী ১৮১৬৬)

আর নাবীদের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী। আল্লাহ (সুব:) তাঁদের কারো কথা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, আর কারোও কথা বর্ণনা করেন নাই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَـــنْ لَـــمْ نَقْـــصُصْ عَلَيْكَ} [غافر: ٧٨)

অর্থ: "আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো কারো কাহিনী আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি আর কারো কারো কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করিনি।" (সুরা গাফির ৪০:৭৮)

আল্লাহ (সুব:) তাঁর কিতাবে পঁচিশ জন নবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ (সুব:) নবী ও রাসুলদের কাউকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। রাসূলগণের মধ্যে যারা **اولـــوالعزم** "উলুল আয্ম" তাঁরা সর্ব উত্তম। তাঁরা হলেন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, ও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সা:)।

মুহাম্মাদ (সা:) রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব শেষ, মুত্তাকীনদের ইমাম, আদম সন্তানের সরদার। নাবীরা যখন একত্রিত হন তখন তিনি তাঁদের ইমাম। মর্যাদার দিক দিয়ে রাসূল (সা:) এর পরে যিনি তিনি হলেন ইব্রাহীম খালীলুর রহমান (আ:) সুতরাং (আল্লাহর) দু'বন্ধু মুহাম্মাদ (সা:) ও ইব্রাহীম (আ:) উলুল আযমদের সর্বশ্রেষ্ঠ। অত:পর তিন জন নূহ, মূসা ও ঈসা (আ:) অন্য সব নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন: নবীদের (আ:) معجزة মু'জিযাহ্ কি?

উত্তর: আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের সহযোগিতা করেছেন বড় বড় নিদর্শন ও উজ্জ্বল মু'জিযার (অলৌকিক শক্তির) দ্বারা। যাতে হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা প্রয়োজন সাধন হয়। যেমন- কুরআন কারীম, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, লাঠি ভয়ানক সাঁপে পরিণত হওয়া ইত্যাদি। অত:পর মু'জিযাহ্ (স্বাভাবিক নীতি ভঙ্গকারী অলৌকিক শক্তি) নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের দালীল, আর কারামাত (অলীদের জন্য অলৌকিক শক্তি) নবুওয়াতের সত্যতা সাক্ষ্যকারী

প্রমান সরূপ। আল্লাহ (সুব:) বলেন: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ [الحديد/২৫
আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শণাবলী সহ প্রেরণ করেছি। (সুরা হাদীদ ৫৭:২৫) নবী (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِىَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন; প্রত্যেক নবীই নিদর্শন বা মু'জিযাহ প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু মু'জিযার তুলনায় মানুষ ঈমান আনে নাই। আর আমি যা প্রাপ্ত হয়েছি তা সেই অহী যা আমার নিকট (আল্লাহ) অবতীর্ণ করেছেন। ফলে আমি আশাবাদী যে, কিয়ামত দিবসে তাঁদের চেয়ে আমার অনুসারী বেশী হবে। (সহীহ মুসলিম ৪০২)

বি:দ্র: তবে নবীদের মু'জিযাহ আর অলীদের কারামত কোন নিজস্ব ক্ষমতা নয়। বরং সম্পূর্ণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রনে। আল্লাহ (সুব:) যখন যাকে যতটুকু দান করেন তার থেকে কেবলমাত্র ততটুকুই প্রকাশ পায়। যেমন ইয়াকুব (আ:) এর ছেলেরা ইউসূফ (আ:) কে তাঁর নিজ এলাকার কুপে নিক্ষেপ করে বাঘে নিয়ে যাওয়ার রূপ কাহিনী শুনালো তখন তিনি কোন কিছু না বুঝতে পেরে এই কথা বললেন:

(فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف : ١٨ }

অর্থ: "সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে আল্লাহই সাহায্যস্থল।" (সুরা ইউসূফ ১২:১৮) বলে নিজেকে শান্তনা দিলেন। কিন্তু বহু বছর পরে ইউসূফ (আ:) যখন তার ভাইদের সাথে পরিচিত হলেন এবং বললেন:

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ.

অর্থ: "তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, অতঃপর সেটি আমার পিতার চেহারায় ফেল। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে আমার কাছে চলে আস।" (সুরা ইউসূফ ১২:৯৩)

যখন ইউসূফ (আ:) এর ভাইয়েরা সুদূর মিশর থেকে জামা নিয়ে রওয়ানা করলেন ইয়াকুব (আ:) তখন কেনানে বসে বললেন:

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ.

অর্থ: "আর যখন কাফেলা বের হল, তাদের পিতা বলল, 'নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে নির্বোধবৃদ্ধ মনে না কর।" **(সুরা ইউসূফ ১২:৯৪)**

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, ইউসূফ (আ:) যখন তোমার বাড়ির পাশে অসহায় অবস্থায় কুপে পড়ে আছে তখন ঘ্রাণ পাও নাই। আর এখন হাজার মাইল দূর থেকে ঘ্রান পাচ্ছ, ব্যাপারটা কি? কোন কবি সুন্দরই বলেছেন:

زمصرش بوے پیراهن شنیدی+ چرادرچاہےکنعانش نہ دیدی
بگفت احوال مابرق جہاں ست+ دمے پیدا ودیگر دم نہاں ست
کہےبرطارم اعلی نشینم + گہے برپشت پائے خود نہ بینم

অর্থাৎ ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, তখন আল্লাহ (সুব:) ঘ্রাণ পাওয়ার ক্ষমতা দেন নি তাই পায়নি। আর এখন ক্ষমতা দিয়েছেন তাই পেয়েছি। বুঝা গেল মো'জেজা বা কারামত কোন কুক্ষিগত ক্ষমতার নাম নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া তাৎক্ষণিক একটি বিষয়।

প্রশ্ন: রাসুল (সা:) এর নবুওয়াতের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তর: তাঁর (সা:) নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা-ঈমানের মূলনীতি সমূহের একটি অন্যতম মূলনীতি। এর উপর ঈমান আনা ছাড়া কারোও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا [الفتح/١٣)

অর্থ: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (সুরা ফাতাহ ৪৮:১৩)

নিম্নে বর্ণিত বিষয়ের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে নাবী (সা:) এর প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে।

প্রথমত: আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা:) এর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বা জানা। কুরাইশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ইব্রাহীম আল-খালীল এর বংশধর, তাঁর ও আমাদের নবীর উপর সর্ব উত্তম দরুদ ও সালাম

বর্ষিত হউক। তাঁর তেষট্টি বছর বয়স হয়েছিল। নবুয়াতের পূর্বে চল্লিশ বৎসর, নবী ও রাসূল হওয়ার পরে তেইশ বৎসর।

দ্বিতীয়তঃ নবী (সাঃ) যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করা, যে বিষয় তিনি আদেশ করেছেন, তার অনুসরণ করা। যে বিষয় হতে তিনি নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন তা হতে বিরত থাকা। তিনি যে বিধান দান করেছেন সে অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা।

তৃতীয়তঃ তিনি জ্বিন ও ইন্সান সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল এ কথার বিশ্বাস রাখা। সবাইকে তাঁর (সাঃ) অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف/١٥٨)

অর্থঃ "আপনি বলুন হে মানব সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" (সুরা আ'রাফ ৭:১৫৮)

চতুর্থতঃ তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী। তিনি আল্লাহর খলীল ও আদম সন্তানের সরদার বা নেতা। তিনি মহান শাফায়াতের মালিক এবং জান্নাতে সুউচ্চ 'অসীলা' নামক স্থান তাঁরই জন্য। তিনি হাউজে কাউসারের মালিক। তাঁর উম্মাত সর্বশ্রেষ্ঠ বা উত্তম। অধিকাংশ জান্নাতবাসী হবে তাঁরই উম্মত এবং তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী সকল রিসালাতের রহিতকারী।

পঞ্চমতঃ আল্লাহ (সুবঃ) তাঁকে মহান মু'জিযাহ্ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। তা হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর বাণী যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে সংরক্ষিত। আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেনঃ

{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: ٩)

অর্থঃ "নিশ্চয় আমি কুরআন[৫] নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী।" (সুরা হিজর ১৫:৯)

ষষ্ঠতঃ নিশ্চয় রাসূল (সাঃ) রিসালাত প্রচার করেছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। সকল প্রকার কল্যাণের সন্ধান দিয়েছেন ও তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সকল প্রকার অকল্যাণ হতে

[৫] الذكر দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন।

তাঁর উম্মাতকে নিষেধ করেছেন ও তা হতে তাদেরকে সাবধান করেছেন। জিহাদ করেছেন, জিহাদে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

সপ্তমতঃ তাঁকে (সাঃ) ভালবাসা ও তাঁর ভালোবাসাকে নিজের জানের ও সকল সৃষ্টিজীবের ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়া। তাঁকে সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া, ইহ্‌তেরাম করা, ও তাঁর আনুগত্য করা। নিশ্চয় ইহা সে হক্ব বা অধিকার যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর নবী (সাঃ) এর জন্য সাবস্ত করেছেন। কারণ তাঁর ভালবাসা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর আনুগত্য প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর আনুগত্য। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থঃ "আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ ততক্ষন পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত আমি তাদের নিকট তাদের ছেলে সন্তান, পিতামাতা ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম না হবো। (সহীহ বুখারী ১৫; মুসনাদে আহমদ ১২৮১৪)

অষ্টমতঃ নবী (সাঃ) এর উপর দরুদ ও সালাম বেশী বেশী পাঠ করা। কারণ কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার নিকট নবী (সাঃ) এর নাম উল্লেখ হওয়ার পরও তাঁর উপর দরুদ পাঠ করেনা। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب/٥٦)

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ (ঊর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দো'আ করে[৬]। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সুরা আহযাব ৩৩:৫৬)

[৬] ইমাম বুখারী আবুল 'আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর উপর আলাহর সালাত' বলতে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাদের কাছে নবীর প্রশংসা এবং ফেরেশতাদের সালাত হলো দো'আ। আর ইমাম তিরমিযী সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে আলাহর সালাত বলতে রহমত এবং ফেরেশতাদের সালাত বলতে ইস্তেগফার বুঝানো হয়েছে (তাফসীর ইবন কাসীর)।

নবমতঃ আমাদের নবী (সা:) সহ সকল নবী-রাসূলগণ তাঁদের রবের নিকট জীবিত। তবে তাঁদের কবরের জীবন, পৃথিবীর জীবনের মত নয়। তা এমন জীবন যার বিবরণ সর্ম্পকে আমরা জানিনা, সে জীবন তাঁদের হতে মৃত্যুর নামও দূর করেনা।

দশমতঃ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে উচু আওয়াজ না করা, অনুরুপ তাঁর কবরে তাঁর উপর সালাম দেওয়ার সময় উচু আওয়াজ না করা। এটাও নবী (সা:) কে ইহ্‌তেরামের অন্তর্ভুক্ত। দাফনের পর তাঁকে (সা:) সম্মান করা, তাঁর জীবিত অবস্থায় সম্মান করার ন্যায়। অত:পর তাঁকে আমরা সম্মান করবো যে ভাবে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে সম্মান করতেন। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الحجرات: ٢]

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে তোমাদের সকল আমল–নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।" (সুরা হুজুরাত ৪৯:২)

একাদশতমঃ তাঁর (সা:) সাহাবাদেরকে, পরিবার-পরিজনকে ও স্ত্রীদেরকে ভালবাসা ও তাঁদের সকলের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। তাঁদের মর্যাদাহানী হতে বা তাঁদেরকে গালী দেওয়া হতে ও তাঁদের চরিত্রে কোন প্রকার আঘাত হানা হতে সাবধান থাকা। কারণ আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজি হয়েছেন ও তাঁদেরকে তাঁর নাবী (সা:) সহচর হিসাবে নির্বাচন করে নিয়েছেন। এই উম্মাতের উপর তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

দ্বাদশতমঃ তাঁর (সা:) ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা হতে বিরত থাকা। কারণ অতিরঞ্জিত করা তাঁকে (সা:) বড় কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। নবী (সা:) বলেন:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত....রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা আমার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করনা যেমন খৃষ্টানরা ঈসা বিন মারইয়াম (আ:) এর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করেছিল। নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা (আমি আল্লাহ নই বা আল্লাহর কোন অংশও নই) সুতরাং তোমরা আমার ব্যাপারে বল, 'আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'। (সহীহ বুখারী ৩৪৪৫; মুসনাদে আহমদ ১৫৪)

রাসূল (সা:) এর সম্মানের ব্যাপারে বেশী-কমে সীমালংঘন না করা ওয়াজিব। তাই তাঁকে উলুহীয়াতের (মা'বুদের) গুনে গুনান্বিত করা যাবেনা। তাঁর মর্যাদা সম্মান ও ভালবাসার অধিকার কমানোও যাবেনা, যার অন্যতম বৈশিষ্ট হল তার শরীয়াতের অনুসরণ করা, তার নীতির উপর চলা ও তাঁর (সা:) অনুকরণ করা।

ত্রয়োদশতমঃ নবী (সা:) এর প্রতি ঈমান আনা পূর্ণাঙ্গ হবে তাঁকে সত্যায়িত ও তিনি যে শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তার উপর আমল করার মাধ্যমে। এটা তাঁর (সা:) আনুগত্য করার অর্থ। তাঁর আনুগত্য বস্তুত: আল্লাহরই আনুগত্য, আর তাঁর (সা:) নাফারমানী বস্তুত: আল্লাহরই নাফারমানী। আর তাঁকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনা হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ আমাদের নবী (সা:) কি মানুষ ছিলেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই মানুষ ছিলেন। এ কথা কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলীল-প্রমান দ্বারা প্রমানিত।

প্রথম দলীলঃ

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف: ١١٠]

অর্থ: "বল, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। (সুরা কাহ্‌ফ ১৮:১১০)

দ্বিতীয় দলীলঃ

{قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [إبراهيم: ١١]

অর্থ:- তাদেরকে তাদের রাসূলগণ বলল, 'আমরা তো কেবল তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসার সাধ্য আমাদের নেই। আর কেবল আল্লাহর উপরই মুমিনদের তাওয়াক্কুল করা উচিত'। (সুরা ইবরাহিম: ১১)

তৃতীয় দলীল:

{ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا } [الإسراء: ٩٣]

অর্থ:- বল, 'পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসূল ছাড়া কিছু নই'? (সুরা বনী ইসরাঈল: ৯৩)

চতুর্থ দলীল:

عن عبدالله : .... قَالَ « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ (صحيح مسلم)

আল্লাহর রাসুল (সা:) বলেন, নিশ্চই আমি তোমাদের মতই মানুষ। আমি স্বরণ করি যেভাবে তোমরা স্বরণ কর। এবং আমি ভূলে যাই তোমরা যেভাবে ভূলে যাও। (সহীহ মুসলিম ১৩১২)

পঞ্চম দলীল:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ

অর্থ:- উম্মে সালমা (রাযি:) হতে বর্ণিত; রাসুল (সা:) বলেন, নিশ্চই আমি মানুষ। আর আমার কাছে তোমরা বিচার নিয়ে আস। হয়তো তোমাদের কেউ অন্যের তুলনায় নিজের স্বপক্ষে সাঝিয়ে গুছিয়ে দলিল পেশ করতে পারদর্শী (বাকপটু)। অতপর আমি যা শুনি সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেই। অতএব আমি যদি কারো জন্য তার অন্য ভাইয়ের কোন হক্বের ফায়সালা দেই সেটা যেন সে গ্রহণ না করে। কেননা আমি তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটি অশং বরাদ্দ করে দিয়েছি। (সহীহ বুখারী ৬৯৬৭)

প্রশ্ন: আমাদের নবী (সা:) কিসের তৈরী ছিলেন? নূরের না মাটির তৈরী?

উত্তর: সকল নবী রাসুলগন-ই মাটির তৈরী, আদমের সন্তান। আমাদের প্রিয়নবী (সা:)ও যেহেতু আদমের সন্তান। তার বংশ আছে। স্ত্রী, সন্তান ছিল। খাওয়া-দাওয়া করতেন, বাজারে যেতেন। অসুস্থ হতেন। কাজেই তিনি যখন মানুষ, তাহলে মানুষ যা দিয়ে তৈরী তিনিও সেই মাটি দিয়েই তৈরী।

{ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}

অর্থ:- নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত, তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে বললেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল। (সুরা আলে ইমরান: ৫৯)

{وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا } [الفرقان: ٢٠]

অর্থ:- আর তোমার পূর্বে যত নবী আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার রব সর্বদ্রষ্টা। (সুরা ফুরক্বান: ২০) এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল সহ ২৪২-২৪৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: আমাদের রাসুল (সা:) কি আলেমূল গায়েব ছিলেন?

উত্তর: না, তিনি বা অন্য কোন নবী রাসুল, অলী-আউলিয়া, পীর-মুর্শিদ কেউ আলেমূল গায়েব নন। শুধুমাত্র আল্লাহ (সুব:) যাকে যতটুকু জানান সে ততটুকুই জানেন। এ কথা পবিত্র কুরআনে পরিস্কার ভাবে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল সহ ২৪২-২৪৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: আমাদের রাসূল (সা:) কি সব জায়গায় হাজির নাজির? মীলাদে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সম্মানে দাঁড়ানোর বিধান কি?

উত্তর: মীলাদ অনুষ্ঠানটি একটি স্বীকৃত বিদ'আত (সওয়াবের উদ্দেশ্যে নব আবিস্কৃত ভিত্তিহীন ইবাদাত)। আর এতে "আল্লাহর রাসূল (সা:) স্বয়ং হাজির হয়ে যান" এ আক্বীদা পোষণ করা শির্ক। আর সে জন্য দাঁড়ানো আরেকটি বিদ'আত। রাসুল (সা:) এর সাহাবায়ে কিরামগণ সরাসরি রাসুল (সা:) এর স্ব-শরীরে কোন মজলিসে আগমন হলেও দাঁড়াতেন না। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَس قَالَ : " لَمْ يَكُنْ شَخْص أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لَهُ ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَته لِذَلِكَ

অর্থ: "আনাস (রা:) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসুলুল্লাহ (সা:) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলো না। অথচ তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন তারা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না।" (সুনানে তিরমিযী ২৭৫৪)

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِي مِجْلَز قَالَ " خَرَجَ مُعَاوِيَة ، فَقَامَ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَابْن صَفْوَان حِين رَأَوْهُ فَقَالَ اجْلِسَا ، سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّل لَهُ الرِّجَال قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار

অর্থ: "আবু মিজলায (র:) বলেন, মুআবিয়া (রা:) একদা বের হলে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং ইবনে সফওয়ান (রা:) দাঁড়িয়ে গেলেন। মুআবিয়া (রা:) তাদেরকে বসার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি চায় তার জন্য লোকেরা মূর্তির মত দাড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।" (সুনানে তিরমিজি ২৭৫৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২৫৫৮২)

তবে সম্মান প্রদর্শন ছাড়া বিশেষ কোন প্রয়োজনে দাঁড়ানো বা কাউকে সাহায্য করার জন্য দাঁড়ানো জায়েজ। যেমন সা'দ (রা:) অসুস্থ ছিলেন বিধায় তাঁকে সওয়ারী থেকে নামানোর জন্য সাহাবায়ে কিরাম তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَـــارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, যখন বনু কুরাইযা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা:) এর ফায়সালায় (দূর্গ হতে) অবতরন করতে সম্মতি প্রকাশ করল তখন রাসূল (সা:) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। আর তিনি তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকটেই অবস্থান করছিলেন। তিনি একটি গাধার উপরে সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটে পৌঁছলেন, তখন রাসুল (সা:) (আনসার সাহাবীদের লক্ষ্য করে) বললেন: তোমরা তোমাদের সর্দারের দিকে এগিয়ে যাও। (সহীহ বুখারী ৩০৪৩; সহীহ মুসলিম ৪৬৫৯)

পঞ্চম রুকন: আখিরাতের প্রতি ঈমান

প্রশ্ন: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের রুক্ন সমূহের অন্যতম একটি রুক্ন। যার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা। আর যে ব্যক্তি শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, পার্থিব জীবন শেষ হয়ে মৃত্যু ও কবর জীবনের মাধ্যমে অন্য জগত শুরু হবে। অত:পর কবরের প্রশ্নোত্তর, কবরের আযাব ও শান্তি, পুনরুত্থান, কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা, হাশর-নাশর, হিসাব-নিকাশ, দাড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত, ডান অথবা বাম হাতে আমল নামা বিতরন, প্রতিফল প্রদান, হাউজে কাউসার, জান্নাত-জাহান্নাম ও আল্লাহর সাক্ষাত এবং কিয়ামতের পূর্বে সেসব আলামত আসবে সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ } [البقرة : ٤)

অর্থ: "আর তারা পরকালের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।" (সুরা বাকারা ২:৪)

প্রশ্ন: কিয়ামতের আলামত কয় প্রকার? আলামতগুলো কি কি?

উত্তর: শেষ দিবসের পূর্বে কিয়ামতের আলামতকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) ছোট আলামত: যা কিয়ামত নিকটে হওয়া বুঝায়, ইহা অনেক রয়েছে। অধিকাংশ সংঘঠিত না হলেও অনেক সংঘঠিত হয়ে গেছে। যেমন শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) এর আগমন করা। আমানতের খিয়ানত করা। মস্‌জিদ অধিক মাত্রায় সাজ-সজ্জা করা ও তা নিয়ে গর্ব করা। রাখাল ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের বড় বড় অট্টালিকা নির্মানের প্রতিযোগীতা করা এবং তা নিয়ে গর্ব করা। ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের নিহত হওয়া। সময় নিকটবর্তী হওয়া, আমল কমে যাওয়া, ফিৎনা-ফাসাদ প্রকাশ পাওয়া, অধিক হত্যা হওয়া, ব্যভিচার ও অন্যায় কাজ অধিক মাত্রায় হওয়া। আল্লাহ (সুব:) বলেন: **(اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ [القمر/١**)অর্থ: কিয়ামত আসন্ন ও চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (সুরা আল-ক্বামার-আয়াত-১)

(খ) বড় আলামত: যা কিয়ামতের পূর্ব মূহুর্তে সংঘঠিত হবে এবং কিয়ামত শুরু হওয়ার সতর্ক করবে। এমন বড় আলামত দশটি। একটিও প্রকাশিত হয়নি। বড় আলামত সমূহ যেমন:

এক: ইমাম মাহ্‌দীর আগমণ ঘটবে।

দুই: দাজ্জালের অবির্ভাব হবে।

তিন: ঈসা (আ:) আকাশ হতে ন্যায় বিচারক হিসাবে অবতরণ করবেন, তিনি খৃষ্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন, দাজ্জাল ও শুকুরকে হত্যা করবেন। ইসলামী শরীয়াহ অনুপাতে বিচার পরিচালনা করবেন।

চার: ইয়াজুজ, মা'জুজ বের হবে। তাদের ধ্বংসের দু'আ করবেন, অত:পর তারা মারা যাবে।

পাঁচ: তিনটি বড় ভূমিকম্প হবে। পূর্বে একটি, পশ্চিমে একটি, জাজিরাতুল আরবে একটি।

ছয়: ধোঁয়া বের হবে, তা হল আকাশ হতে প্রচন্ড ধোঁয়া নেমে এসে সকল মানুষকে ঢেকে নিবে।

সাত: কুরআন জমিন হতে আকাশে তুলে নেওয়া হবে।

আট: পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে।

নয়: এক অদ্ভুত চতুস্পদ জন্তু (দাব্বাতুল আরদ) বের হবে।

দশ: ইয়ামানের আদন (একটি জায়গার নাম) হতে ভয়ানক আগুন বের হয়ে মানুষদের শামের দিকে নিয়ে আসবে। এটাই সর্বশেষ বড় আলামত। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدِ الْغِفَارِىِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ « مَا تَذَاكَرُونَ » قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ » فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ –صلى الله عليه وسلم– وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

অর্থ: "হুযাইফা বিন উসাইদ আল-গিফারী (রা:) বলেন, নবী (সা:) আমাদের নিকট আগমণ করলেন, এমতাবস্থায় আমরা এক বিষয় নিয়ে

আলোচনা করছিলাম। তিনি বল্লেন, তোমরা কি বিষয় আলোচনা করছো? তাঁরা বল্লেন, আমরা কিয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করছি। তিনি বল্লেন: কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষন না তোমরা তার পূর্বে দশটি আলামত সংঘঠিত হতে দেখবে। অত:পর আলামত সমূহ উল্লেখ করলেন: ধোঁয়া, দাজ্জাল, চতুস্পদ জন্তু পশ্চিম দিক হতে বের হওয়া, সূর্য উঠা, ঈসা বিন মারিইয়াম এর আগমণ, ইয়াজুজ-মা'জুজ আগমণ, তিনটি ভূমি কম্প- একটি পূর্বে আর একটি পশ্চিমে, আর একটি জাজিরাতুল আরবে, শেষ আলামত হল ইয়ামান হতে আগুন বের হয়ে মানুষদেরকে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম ৭৪৬৭)

বর্ণিত আছে যে ঐ নিদর্শন গুলো পর্যায় ক্রমে সংগঠিত হবে, যেমন পুথির মালায় পুথি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে। এগুলোর একটি সংঘঠিত হওয়ার পর পরই অপরটি সংঘঠিত হবে। এ দশটি নিদর্শন সংঘঠিত হওয়ার পর পরই আল্লাহর আদেশে কিয়ামত সংঘঠিত হবে।

প্রশ্ন: কিয়ামত দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তর: কিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ দিন, যে দিন মানুষ আল্লাহর আদেশে তাদের কবর হতে হিসাব নিকাশের জন্য বের হবে। অত:পর সৎকর্মশীলগণ সুফল ও শান্তি এবং অসৎ কর্মশীলগণ কুফল ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ} [المعارج: ٤٣]

অর্থ: "সে দিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে।" (সুরা মাআরিজ ৭০:৪৩)

এ দিনের একাধিক নাম কুরআন কারীমে উল্লেখ রয়েছে:

(يوم القيامة) ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ, (القارعة) আল-ক্বারিয়াহ, (يوم الحساب) ইয়াওমুল হিসাব, (يوم الدين) ইয়াওমুদ্দিন, (الطامة) আত্ত্বামাহ, (الواقعة) আল-ওয়াক্বিয়াহ, (الحاقة) আল-হাক্কাহ, (الصاخة) আস্সাখ্খাহ, (الغاشية) আল-গাশিয়াহ ইত্যাদি।

প্রশ্ন: ফিৎনাতুল কবর বা কবরের পরিক্ষা কি?

উত্তর: কবরের পরিক্ষা-

মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফনের পর তাকে কবরে কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে।

(এক) مَنْ رَبُّكَ তোমার রব কে ?

(দুই) وَمَا دِيْنُكَ তোমার দ্বীন কি ?

(তিন) وَمَنْ نَبِيُّكَ তোমার নবী কে ছিল?

অত:পর যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আল্লাহ (সুব:) সত্যের উপর অটল রাখবেন এবং তারা সঠিকভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবেন। আর যারা কাফের ও মুনাফিক তারা কিছুই বলতে পারবে না। বরং তারা বলবে 'হায়! হায়! আমিতো কিছুই জানি না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ... قَالَ : «وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : رَبِّىَ اللَّهُ. فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا دِينُكَ فَيَقُولُ : دِينِى الإِسْلاَمُ. فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–. فَيَقُولاَنِ : وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ ». زَادَ فِى حَدِيثِ جَرِيرٍ : « فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا) ». الآيَةَ. ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ : « فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِى فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ». قَالَ : « فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا ». قَالَ : « وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ ». قَالَ : « وَإِنَّ الْكَافِرَ ». فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ : « وَتُعَادُ رُوحُهُ فِى جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِى. فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا دِينُكَ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِى. فَيَقُولاَنِ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِى. فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ». قَالَ : « فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا ». قَالَ : « وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ

অর্থ: "বারা ইবনে আযেব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, (মানুষ যখন মৃত্যু ব্যক্তিকে কবর দিয়ে সামান্য দুরে চলে যায়) এমনকি তাদের জুতার আওয়াজ এখনো শুনা যায় এমতাবস্থায় দুজন মালায়েকা তার নিকটে আসে এবং তাকে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমাদের মাঝে যাকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে ছিলেন? যে ব্যক্তি সঠিক মুমিন সে বলবে, আমার রব হলেন 'আল্লাহ (সুব:)'। আমার দ্বীন হলো 'ইসলাম'। আর আমাদের মাঝে যাকে পাঠানো হয়েছিলো তিনি হলেন 'আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল'। অত:পর মালায়েকারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি এগুলো কিভাবে জানলে? সে বলবে আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেছি, তা বিশ্বাস করেছি এবং সত্য বলে মেনে নিয়েছি ও বাস্তবায়ন করেছি। জারির কতৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, এটাই হলো সেই অটল ও দৃঢ় রাখা যার কথা আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে বলেছেন, 'আল্লাহ অবিচল রাখেন ঈমানদারদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আর আল্লাহ যালিমদের পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।' (সুরা ইবরাহীম ১৪:২৭) অত:পর আসমান থেকে ঘোষণা করা হবে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার কবরে জান্নাতের চাঁদর বিছিয়ে দাও এবং তার গায়ে জান্নাতের পোষাক পরিধান করিয়ে দাও ও তার কবরকে জান্নাতের সঙ্গে একটি দরজা খুলে দাও। অত:পর সে জান্নাতের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ পেতে থাকবে এবং তার কবরটাকে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফেককেও অনুরূপ প্রশ্ন করা হবে। তারা প্রতিটি প্রশ্নোত্তরে বলবে হায়! হায়! আমি তো কিছুই জানি না। অত:পর আসমান থেকে ঘোষনা করা হবে, সে মিথ্যা বলেছে, তার কবরে আগুনের চাঁদর বিছিয়ে দাও, তার শরিরে আগুনের পোষাক পরিয়ে দাও এবং তার কবরে জাহান্নামের সঙ্গে দরজা খুলে দাও। অত:পর জাহান্নামের গরম বাতাস এবং অশান্তি পেতে থাকবে ও তার কবরটাকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে। এমনকি একপার্শ্বের পাজরের হাড্ডি অপর পার্শ্বের হাড্ডির ভিতরে ঢুকে যাবে।" (সুনানে আবু দাউদ ৪৭৫৫)

ফিরিশ্তাদ্বয়ের প্রশ্ন করা ও তাঁর পদ্ধতি, মু'মিনরা ও মুনাফিকরা কি উত্তর দিবেন এ সর্ম্পকে বর্ণিত সকল হাদীসের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব।

কবরের শাস্তি ও শান্তি

কবরের শাস্তি ও শান্তির প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। নিশ্চয় ইহা (কবর) জাহান্নামের গর্তের একটি গভীর গর্ত, অথবা জান্নাতের বাগানের একটি বাগান। আর কবর আখিরাতের প্রথম ধাপ বা স্টেশন। যে ব্যক্তি কবর হতে মুক্তি পাবে (তার জন্য) কবরের পরের ধাপ গুলো হতে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি, কবর হতে মুক্তি পাবেনা তার জন্য এর পরের ধাপ গুলো থেকে মুক্তি পাওয়া আরো কঠিন হবে। যার মৃত্যু হল তখন থেকেই তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেল। অত:পর আত্মা ও শরীর, উভয়ে কবরে শাস্তি বা শান্তি ভোগ করবে। আর কখনো কখনো শুধু আত্মা ভোগ করবে। আর কবরের আযাব বা শাস্তি শুধু মাত্র যালেমদের জন্য, আর শান্তি শুধু মাত্র সত্যবাদী মু'মিনদের জন্য।

আর মৃত্যু ব্যক্তি কবর জীবনের শাস্তি অথবা শান্তি প্রাপ্ত হবে, চাই ভূগর্ভস্ত করা হোক বা নাই হোক। যদি ও মৃত্যু ব্যক্তিকে আগুনে জালিয়ে দেওয়া হয়, অথবা পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, অথবা হিংস্র পশু-পাখি খেয়ে ফেলে তারপরও সে এ শাস্তি অথবা শান্তি ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ... إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِى قُبُورِهَا فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ

অর্থ: "যায়েদ ইবনে সাবেত (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, নিশ্চয় এ জাতি (মানবজাতি) কবরে পরিক্ষার মুখোমুখি হয়। যদি তোমরা (তাদেরকে) দাফন করবে না বলে আশংকা না করতাম, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য যা আমি শুনতে পাই।" (সহীহ মুসলিম ৭৩৯২)

প্রশ্ন: শিঙ্গায় ফুৎকার কি?

উত্তর: শিঙ্গা হল বাঁশী স্বরূপ, যাতে ইস্‌রাফীল (আ:) ফুৎকার দিবেন। প্রথম ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ যা জীবিত রাখবেন তা ছাড়া সকল সৃষ্টি জীব মৃত্যুবরণ করবে। দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবী সৃষ্টি হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টিজীবের আর্বিভাব হয়েছিল, তারা সকলেই উঠে যাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ [الزمر/٦٨)

অর্থ: "শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমিনে যারা আছে সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত। অত:পর আবার ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষনাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।" (সুরা যুমার ৩৯:৬৮)

প্রশ্ন: পুনরুত্থান কি?

উত্তর: পুনরুত্থান হলো শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার সময় আল্লাহ (সুব:) সকল মৃতদের জীবিত করবেন। তারা সকলে সমগ্র বিশ্বের প্রতি পালকের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। অত:পর আল্লাহ (সুব:) প্রত্যেক আত্মাকে স্ব-শরীরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলে সকল মানুষ তাদের কবর হতে দাঁড়িয়ে জুতা বিহীন নাঙ্গা পা, বস্ত্র-বিহীন-উলঙ্গ শরীর, খাৎনা বিহীন ও দাঁড়ি-গোঁফ বিহীন অবস্থায় দ্রুত হাশরের ময়দানের দিকে ছুটে যাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ [الأنبياء/١٠٤)

অর্থ: "যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব।" (সুরা আম্বিয়া ২১:১০৪)

ময়দানের অবস্থান দীর্ঘ হবে, সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে, সূর্যের উত্তাপ বেড়ে যাবে। এ উত্তপ্ত ও কঠিন অবস্থান দীর্ঘ হওয়ায় শরীর হতে নির্গত ঘামে হাবু-ডুবু খাবে, কারো ঘাম পায়ের দু'গিঁঠা পর্যন্ত, কারো দু'হাটু পর্যন্ত, কারো মাজা পর্যন্ত, কারো বক্ষ পর্যন্ত, কারো দু'কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছবে। আর কেউ-সম্পূর্ণ ভাবে হাবুডুবু খাবে, এ সব হলো তাদের (ভাল-মন্দ) কর্ম অনুপাতে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [التغابن/٧)

অর্থ: "কাফিররা ধারণা করেছিল যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। বল, 'হ্যাঁ, আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অত:পর

তোমরা যা আমল করেছিলে তা অবশ্যই তোমাদের জানানো হবে। আর এটি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। (সুরা তাগাবুন ৬৪:৭)

প্রশ্ন: হাশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও প্রতিফল কি?

উত্তর: আমরা ঈমান আনবো যে, সকল দেহের হাশর-নাশর হবে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাদের মাঝে বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সকল সৃষ্টিজীবকে স্বীয় কৃত কর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করা হবে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (الكهف: ٤٧)

অর্থ: "আমি তাদেরকে একত্রিত করব, অত:পর তাদের কাউকে ছাড়বনা। (সুরা ক্বাহাফ ১৮:৪৭)

তিনি (সুব:) আরো বলেন:

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (الحاقة/١٩-٢١)

অর্থ: "অত:পর যার আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অত:পর সে সুখী জীবন-যাপন করবে।" (সুরা হাক্কাহ ৬৯: ১৯-২১)

অত:পর হাশর হল: মানুষদেরকে তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য ময়দানে একত্রিত করা।

হাশর ও পুনরুত্থানের মধ্যে পার্থক্য: পুনরুত্থান হল: দেহ সমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা। হাশর হল: পুনরুত্থিত ব্যক্তিদেরকে অবস্থানের ময়দানে একত্রিত করা।

হিসাব, নিকাশ ও প্রতিফল: আল্লাহ (সুব:) তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন ও তাদেরকে তাদের সম্পাদীত কর্ম সর্ম্পকে অবগত করবেন। অত:পর মু'মিন মুত্তাকীনদের হিসাব নিকাশ হল, শুধু মাত্র তাদের নিকট তাদের কর্ম পেশ করা হবে। যাতে তারা তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারে, যে অনুগ্রহ আল্লাহ (সুব:) তাদের নিকট হতে দুনিয়াতে গোপন রেখেছিলেন। আর আল্লাহ আখিরাতে তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আর তাদের হাশর হবে তাদের ঈমান অনুপাতে।

ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে স্বাগত জানাবে ও জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করবে, আর তাদেরকে অস্থিরতা ও সকল প্রকার ভয়-ভীতি এবং এ কঠিন দিনের ভয়াবহতা হতে নিরাপত্তা দিবে, অত:পর তাদের মূখমন্ডল উজ্জল হবে। আর মুখমন্ডল সে দিন হাসি-খুশী, আনন্দ-উৎফুল্ল সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে।

পক্ষান্তরে বিমুখ মিথ্যাবাদীদের (কাফেরদের) হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত কঠিনভাবে হবে। সুক্ষ্মভাবে প্রত্যেকটি ছোট বড় কর্মের হিসাব নেওয়া হবে। তাদের কৃত কর্মের ফল হিসাবে এবং তাদের মিথ্যা বলার কারণে কিয়ামত দিবসে তাদেরকে তাদের মুখের উপর টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে এবং তাদেরকে লাঞ্চিত করা হবে।

কিয়ামত দিবসে সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা:) এর উম্মাতের, তাদের সাথে সত্তর হাজার লোক তাদের পূর্ণ তাওহীদের বদৌলাতে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِـــنْ أُمَّتِـــي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

অর্থ: “ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: আমার উম্মতের সত্তুর হাজার লোক কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হলো: ঐ সকল লোক যারা ঝাঁড়-ফূঁক করে না, অশুভ কোন লক্ষণ মানে না এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপরে ভরসা করে।” (সহীহ বুখারী ৬৪৭২)

আর বান্দার সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে আল্লাহর হক্ব সালাতের (নামাযের) এবং মানুষের মাঝে সর্ব প্রথম ফায়সালা করা হবে রক্তপাতের।

প্রশ্ন: হাউজে কাউসার কি?

উত্তর: আখেরাতের প্রতি ঈমানের অংশ হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাউজের প্রতিও ঈমান আনা জরুরী। আর ইহা বিশাল হাউজ ও সম্মানিত অবতরণ স্থান। কিয়ামতের মাঠে জান্নাতের আল-কাউসার নামক নদী হতে

শরাব প্রবাহিত হবে। এর থেকে মুহাম্মাদ (সা:) এর মু'মিন উম্মাতেরা পান করবে।

হাউজের কিছু বৈশিষ্ট: ইহার শরাব দুধের চাইতে সাদা, বরফের চাইতে ঠান্ডা, মধুর চাইতে অধিক মিষ্টি, মিশকের চাইতে সুগন্ধি, ইহা সুপ্রসস্ত যার দৈর্ঘ ও প্রস্থ সমান, এর প্রতিটি প্রান্তের আয়তন এক মাসের পথের সমান। এতে জান্নাত হতে প্রবাহিত দু'টি নালা রয়েছে। আর এর পানপাত্র আকাশের তারকারাজির চাইতে অধিক । যে ব্যক্তি এর থেকে একবার পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَـــاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَـــا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا

অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: আমার হাউজের আয়তন এক মাসের পথ, তার পানি দুধের চাইতে সাদা, তার ঘ্রাণ মিশকের চাইতে সুগন্ধি, তার পানপাত্র আকাশের তারকা রাজির সংখ্যার ন্যায়। যে ব্যক্তি ইহা হতে একবার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবেনা। (সহীহ বুখারী ৬৫৭৯; সহীহ মুসলিম ৬১১১)

প্রশ্ন: শাফাআত কি? শাফায়াতের শর্ত কি?

উত্তর: যখন হাশরের সেই মহান প্রান্তরে মানুষের বিপদ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এবং সেখানে তাদের অবস্থান দীর্ঘ হবে। তখন তারা এ প্রান্তরের ভয়াবহ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তাদের রবের নিকট সুপারিশ করা হোক এর প্রচেষ্টা করবে। রাসূলদের মধ্য হতে যারা 'উলুল আয্‌ম' (নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসা আ.) তাঁরা অপারগতা স্বীকার করবেন। পরে এই বিষয়টি সর্ব শেষ রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা:) এর নিকটে পৌঁছাবে যার আগের ও পরের গুনাহ্ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন।

অত:পর নবী (সা:) এমন স্থানে দাঁড়াবেন যে স্থানে আগের ও পরের সকলেই তাঁর প্রশংসা করবে এবং এর দ্বারা তাঁর (সা:) মহা সম্মান ও উঁচু মর্যাদা প্রকাশিত হবে। তার পর আরশের নিচে সিজ্‌দা করবেন, আল্লাহ তাঁর নিকট অনেক প্রশংসা, উপযুক্ত আদেশ ইলহাম করবেন। তিনি (সা:)

এর দ্বারা তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসা করবেন ও তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করবেন। তার পর নবী (সা:) তাঁর রবের নিকট (তাদের জন্য) সুপারিশ করার অনুমতি চাইবেন। আল্লাহ (সুব:) নবী (সা:) কে সৃষ্টিজীবের সুপারিশ করার জন্য ঐ অনুমতি দিবেন। যাতে বান্দাদের মাঝে অসহনীয় দু:খ-কষ্ট ও চিন্তা ভোগের পর ফায়সালা করা হয়। অত:পর মুহাম্মাদ (সা:) সুপারিশ করবেন। যাতে সৃষ্টিজীবের মাঝে ফায়সালা সম্পন্ন করা হয়। এ মহান শাফাআত আল্লাহ একমাত্র রাসূল (সা:) এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ ছাড়া তিনি আরো অনেক শাফায়াতের অধিকারী হবেন। আল্লাহর নিকট শাফাআত গ্রহণ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে।

(ক) শাফাআত কারীর শাফাআত করার ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة : ٢٥٥]

অর্থ: "কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া?" (সুরা বাকারা ২:২৫৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [مريم : ٨٧]

অর্থ: "যারা পরম করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না।" (সুরা মারইয়াম ১৯:৮৭)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} [طه : ١٠٩]

অর্থ: "সেদিন পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন আর যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন তার সুপারিশ ছাড়া কারো সুপারিশ কোন কাজে আসবে না।" সূরা ত্বাহা ২০:১০৯)

(খ) শাফাআত কারীর ও শাফাআত কৃত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে। অর্থাৎ শিরক মুক্ত হতে হবে। কেননা মুশরিকের জন্য কোন সুপারিশও নাই আর কোন ক্ষমাও নাই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء : ٢٨]

অর্থ: "আর তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।" (সুরা আম্বিয়া ২১:২৮)

অর্থাৎ সুপারিশকারীকে কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ (সুব:) এর নিকট থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে। যার জন্য সুপারিশ করা হবে সেও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হতে হবে। অর্থাৎ শিরকমুক্ত হওয়া কেননা কোন মুশরিকের জন্য কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না। এই দুই শর্ত যদি না পাওয়া যায় তাহলে কোন সুপারিশ সেদিন গ্রহণযোগ্য হবে না। অত:এব যারা পীর-বুযুর্গ, অলী-আওলিয়া, মাজার-ফেরেশতা ইত্যাদিকে সুপারিশকারী হিসাবে বিশ্বাস করে তাদের জানা উচিত দুনিয়াতে কোন ব্যক্তিকে সুপারিশ করার জন্য ঠিকাদারি দেওয়া হয় নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} [الزمر : ٤٤]

অর্থ: "বলুন! সমস্ত শাফাআত আল্লাহর জন্যই।" (সুরা যুমার ৩৯:৪৪)

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো কোন শাফাআত আল্লাহর কাছে গৃহীত না হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ } [البقرة : ٤٨]

অর্থ: "আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। আর কারো পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারও কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।" (সুরা বাকারা ২:৪৮)

প্রশ্ন: মিযান বা মানদন্ড কি?

উত্তর: মিযান বা মানদন্ড সত্য। এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আর ইহা (মিযান বা মানদন্ড) আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে স্থাপন করবেন, বান্দাদের আমল মাপার ও তাদের কর্মের প্রতিদান প্রদানের জন্য। ইহা বাস্তব মিযান বা মানদন্ড। কাল্পনিক নয়, এর দু'টি পাল্লা ও রশি রয়েছে, এর দ্বারা কর্ম অথবা আমলনামা অথবা স্বয়ং কর্ম সম্পাদন কারীকে মাপা হবে। সবই মাপা হবে, তবে ওজন ভারি-হালকার বিষয়বস্তু হবে শুধু কর্ম। কর্ম সম্পাদনকারী ও আমল নামা নয়। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء/٤٧]

অর্থ: আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায় বিচারের মিযান বা মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমানও হয় আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহনের জন্য আমিই যথেষ্ট। (সুরা আম্বিয়া ২১:৪৭)

যাদের নেকের পাল্লা ভারী হবে তারাই সেদিন সফল হবে। আর যাদের নেকের পাল্লা হালকা হবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ}

অর্থ: "আর সেদিন পরিমাপ হবে যথাযথ। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেই সব লোক, যারা নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি (অস্বীকার করার মাধ্যমে) যুল্‌ম করত।" (সুরা আরাফ ৭:৮–৯)

এ বিষয়ে আরো একটি আয়াত:

{ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ} [القارعة : ٦ – ١١]

অর্থ: "অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে; আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার আবাস হবে হাবিয়া। আর তোমাকে কিসে জানাবে হাবিয়া কি? প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।" (সূরা ক্বারিয়া ১০১:৬-১১)

প্রশ্ন: আস্ সিরাত বা পুল সিরাত কি?

উত্তর: আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার অংশ হিসাবে পুলসিরাতের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব এবং সকলকেই পুলসিরাত পার হতে হবে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (٧١) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا [مريم/٧١، ٧٢]

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় (পুল সিরাতে) পৌঁছবেনা এটা আপনার পালন কর্তার অনিবার্য ফায়সালা। অত:পর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব। (সুরা মারইয়াম ১৯:৭১-৭২)

আর তা হলো জাহান্নামের পিঠের উপর স্থাপিত পুল, যা ভয়-ভীতি সন্ত্রস্ত অতিক্রম স্থল বা পথ। এর উপর দিয়ে মানুষ জান্নাতের দিকে অতিক্রম করবে। কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের ন্যায়। কেউ অতিক্রম করবে বিজলীর ন্যায়। কেউ বাতাসের ন্যায়। কেউ পাখির ন্যায়। কেউ ঘোড়ার ন্যায় চলবে। কেউ মুসাফিরের ন্যায় চলবে। কেউ ঘন ঘন পা রেখে চলবে। সর্ব শেষ যারা অতিক্রম করবে তাদেরকে টেনে ফেলা হবে। সকলেই অতিক্রম করবে তাদের কর্মের ফলাফল অনুপাতে। এমন কি যার ঈমানের আলো তার পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলের পরিমাণ হবে সেও অতিক্রম করবে। কাউকে থাবা মেরে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি পুল সিরাত অতিক্রম করতে পারবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সর্ব প্রথম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা:) অত:পর তাঁর উম্মাত পুল সিরাত পাড়ি দিবেন। আর সে দিন একমাত্র রাসূলগণ কথা বলবেন আর তাদের কথা হবে (اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ) অর্থ: হে আল্লাহ্! মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। জাহান্নামে পুল সিরাতের দু'ধারে হুকের ন্যায় কন্টক থাকবে, এর সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেহ্ জানেনা। সৃষ্টি-জীব হতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকে থাবা মেরে (জাহান্নামে) ফেলে দেয়া হবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন; জাহান্নামের উপর দিয়ে পুল স্থাপন করা হবে, অত:পর রাসূলদের মধ্যে

আমিই সর্ব প্রথম যে তার উম্মত সহ তা অতিক্রম করবে। আর সে দিন রাসূলগণ ব্যতিত অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না। আর রাসূলদের কথা হবে: আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম, (হে আল্লাহ! মুক্তি দাও, মুক্তি দাও)। আর জাহান্নামে অসংখ্য হুক থাকবে (চুলার থেকে তন্দুর রুটি বের করার জন্য মাথা বাঁকা করা লোহাড় রডের মত)। (সহীহ বুখারী ৮০৬)

পুল সিরাতের কিছু বর্ণনা: ইহা তরবারীর চাইতে ধারালো, আর চুলের চাইতে সূক্ষ্ম ও পিচ্ছিল জাতীয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ أَبُو سَعِيد بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন: আমি সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি যে, পুল-সিরাত চুলের চাইতে সূক্ষ্ম আর তরবারীর চাইতে ধারালো হবে।" (সহীহ মুসলিম ৪৭৩)

ইহাতে আল্লাহ্ যাদের পা স্থীর রাখবেন, শুধু মাত্র তাদেরই পা স্থীর থাকবে, আর ইহা অন্ধকারে স্থাপিত হবে। আমানত ও আত্নীয়তা বন্ধনকে পুল সিরাতের দু'পার্শে দন্ডায়মান অবস্থায় রাখা হবে, যারা ইহা সংরক্ষন করেছেন তাদের স্বপক্ষে, আর যারা সংরক্ষন করেনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য।

প্রশ্ন: আল-কানত্বারাহ্ কি?

উত্তর: আমরা ঈমান আনবো এ কথার প্রতি যে, মু'মিনেরা পুল সিরাত অতিক্রম করে কানতারাতে অবস্থান করবে বা দাঁড়াবে। আর ইহা (কানত্বারাহ্) হল জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান, এখানে ঐ সকল মু'মিনদেরকে দাঁড় করানো হবে, যারা পুল সিরাত অতিক্রম করে এসেছে এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছে, জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে (এখানে দাঁড় করানো হবে)। অত:পর তাদের পরি-শুদ্ধির পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। নবী (সা:) বলেন:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا

অর্থ: "আবু সাইদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: মু'মিনেরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে, তার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী কানত্বারাহ্ নামক স্থানে একত্রিত করা হবে। তার পর দুনিয়াতে তাদের মাঝে যে জুলুম নির্যাতন ঘটেছিল একে অপরের পক্ষ হতে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। যখন তারা এসব হতে মুক্ত হবে তখন তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অত:পর শপথ সেই সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদ (সা:) এর প্রাণ, নিশ্চয় তাদের প্রত্যেকে দুনিয়ার বাসস্থান হতে জান্নাতের বাসস্থান বেশী চিনতে পারবে। (সহীহ বুখারী ৬৫৩৫)

প্রশ্ন: জান্নাত ও জাহান্নাম এর ব্যাপারে আমাদের ঈমান কি?

উত্তর: আমরা ঈমান আনবো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, এ দু'টি (জান্নাত ও জাহান্নাম) বর্তমান বিদ্যমান রয়েছে, আর ইহা কখনো ধ্বংস হবে না বরং সর্বদাই রয়েছে। আর জান্নাতবাসীদের নি'আমত শেষ ও ঘাটতি হবে না, অনুরূপ জাহান্নামীদের মধ্যে যার ব্যাপারে আল্লাহ চিরস্থায়ী শাস্তির ফায়সালা করেছেন তার শাস্তি কখনও বিরত ও শেষ হবে না। তবে তাওহীদ পন্থীরা: আল্লাহর রহমতে ও শাফাআত কারীদের শাফায়াতে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবেন।

জান্নাত হল: অতিথীশালা, যা আল্লাহ্ কিয়ামতে মুত্তাকীনদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ }

অর্থ: "সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবী করবে। পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ।" (সুরা ফুসসিলাত ৪১:৩৩)

তথায় রয়েছে প্রবাহিত নদী উন্নত ও সুউচ্চ কক্ষ, মনোলোভা রমণী ইত্যাদি। তথায় আরো রয়েছে মন:পূত-মনোহর সামগ্রী। যার বর্ণনা হাদীসে পাওয়া যায়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اللَّـــهُ أَعْدَدْتُ لعبَادي الصَّالحينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: আল্লাহ (সুব:) বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করেছি এমন জিনিষ যা কোন দিন কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ন শ্রবণ করেনি, আর কোন মানুষের অন্তরেও কোন দিন কল্পনায় আসেনি।" (সহীহ বুখারী ৩২৪৪; সহীহ মুসলিম ৭৩১০)

জান্নাতের নি'আমত চিরস্থায়ী, কোন দিন শেষ হবেনা। জান্নাতে কোড়া সমতুল্য জায়গাহ্ দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে উত্তম। হাদীসের ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ سَهْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

অর্থ: "সাহাল (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, জান্নাতের এক কোড়া পরিমান জায়গা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।" (সহীহ বুখারী ৬৪১৫)

আর জান্নাতের সুগন্ধী চল্লিশ বৎসর দূরত্বের রাস্তা হতে পাওয়া যায়। জান্নাতে মু'মিনদের জন্য সব চাইতে বড় নি'আমত হলো আল্লাহকে সরাসরি স্বচক্ষে দর্শনলাভ করা।

কিন্তু কাফেররা আল্লাহর দর্শনলাভ হতে বঞ্চিত হবে: আর যারা মু'মীনদের জন্য তাদের রবের দর্শনকে অস্বীকার করলো, সে মূলত: মু'মিনদেরকে কাফেরদের সমকক্ষ করে ফেললো। আর জান্নাতে একশতটি ধাপ রয়েছে, এক ধাপ হতে অপর ধাপের দূরুত্ব আসমান হতে জমিনের দূরত্ব অনুরূপ। আর সবচেয়ে উন্নত ও উত্তম জান্নাত হল, জান্নাতুল ফিরদাউস আল-আলা। এর ছাদ হল আল্লাহর আরশ। আর জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, প্রত্যেক দরজার পার্শ্বের দৈর্ঘ "মক্কা "হতে "হাজার" এর দূরত্বের সমান। আর এমন দিন আসবে যে দিনে ইহা ভিড়ে পরিপূর্ণ হবে, আর জান্নাতে

নূন্যতম মর্যাদার অধিকারী যে হবে তার দুনিয়া ও আরো দশ দুনিয়ার পরিমান জায়গা হবে। আল্লাহ (সুব:) জান্নাত সর্ম্পকে বলেন: أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ অর্থ: পরহেজগার মু'মিনদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। (সুরা আল-ইমরান ৩:১৩৩)

জান্নাতবাসীরা চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে এবং জান্নাত ধ্বংস হবে না। এই সর্ম্পকে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِـــيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ [البينة/٨]

অর্থ: "তাদের পালন কর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালন কর্তাকে ভয় করে।" (সুরা আল-বাইয়্যেনাহ ৯৮:৮)

জাহান্নাম: ইহা শাস্তির ঘর যা আল্লাহ্ কাফের ও অবাধ্যদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। তথায় বিভিন্ন প্রকার কঠিন শাস্তি রয়েছে। তার পাহারাদার হবে নিষ্ঠুর ও নির্দয় ফিরিশতারা। আর কাফেররা তথায় চিরস্থায়ী থাকবে। তাদের খাদ্য হবে যাক্কুম (কাঁটা যুক্ত) আর পানীয় হবে পুঁজ, দুনিয়ার আগুনের তাপ জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রার সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৬৯ (উনসত্তর) গুন বেশী, এর প্রত্যেকটি অংশ দুনিয়ার আগুনের ন্যায় বা তার চাইতে আরো উত্তাপ, আর এই জাহান্নাম তার অধিবাসী নিয়ে পরিতুষ্ট হবেনা বরং বলবে যে, আরো আছে কি? তার সাতটি দরজা হবে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামীমের অংশ থাকবে। জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী এবং তা ধ্বংস হবেনা। আল্লাহ (সুব:) জাহান্নাম সর্ম্পকে বলেন: أُعِـــدَّتْ لِلْكَـــافِرِينَ [آل عمران/١٣١] কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। (সুরা আল-ইমরান ৩:১৩১)

জাহান্নামীরা চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে এবং তা ধ্বংস হবেনা। এ সর্ম্পকে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ([الأحزاب/٦٤، ٦٥)

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন, এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে।" (সুরা আহযাব ৩৩:৬৪-৬৫)

প্রশ্ন: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার সুফল কি?

উত্তর: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার অনেক সূফল রয়েছে।

- ছাওয়াবের আশায় আনুগত্য ও কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া।
- এ দিবসের শাস্তির ভয়ে অবাধ্যতায় লিপ্ত ও তত প্রতি সন্তষ্ট থাকা হতে ভয় করা।
- আখেরাতে মু'মিনরা যে নি'আমত ও ছাওয়াব পাবে এ আশা-আকাঙ্খায় দুনিয়ার ছুটে যাওয়া জিনিস হতে নিজের শান্তনা লাভ করা।
- ব্যক্তি ও সমাজিক জীবনে সৌভাগ্যের মূল উৎস হল শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা। কারণ মানুষ যখন এ কথার প্রতি ঈমান আনবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ (সুব:) সৃষ্টি জীবকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন ও তাদের হিসাব নিকাশ নিবেন এবং তাদের কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। মায্লুমের (অত্যাচারিত) পক্ষে যালিম (অত্যাচারকারী) ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তখন সে আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল অকল্যাণের জড় নি:শেষ হয়ে যাবে। সমাজে কল্যাণ বিস্তার লাভ করবে এবং সর্বত্র সম্মান-মর্যাদা, শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়বে। প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বেড়ে যাবে।

তাকদীরের প্রতি ঈমান

প্রশ্ন: কদরের (ভাগ্যের) সংজ্ঞা ও তার প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব কি?

উত্তর: কদর বা (ভাগ্য) হল: আল্লাহর অনন্ত জ্ঞান ও হিকমাত অনুযায়ী সৃষ্টি কূলের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ। আর ইহা আল্লাহর কুদরতের উপর নির্ভলশীল, আর তিনি সর্ব বিষয় ক্ষমতাশীল তিনি যা ইচ্ছা তাহাই করেন।

আর ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা আল্লাহ্‌র (সুব:) রুবুবীয়াতের প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত। আর ইহা ঈমানের ছয়টি রুক্‌নের অন্যতম একটি রুক্‌ন, এর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া এই ছয়টি রুক্‌নের প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে না। মূলত: কদর বা তাকদীর হলো আল্লাহর (সুব:) সৃষ্টি সম্পর্কীয় মহা পরিকল্পনা। আল্লাহ (সুব:) এর নিকট কোন অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত নেই। তার কাছে সব কিছুই বর্তমান। এ কারণেই তিনি সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে নির্দেশ দিলেন, লিখ! কলম প্রশ্ন করলো, কি লিখব? আল্লাহ (সুব:) বললেন, লিখ যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা সংঘটিত হবে। এ থেকে বুঝা যায় অনন্ত ও অনাদীকাল পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তা সবকিছুই আল্লাহ (সুব:) সেই মহা পরিকল্পনার বাস্তবয়ন। এ ব্যাপারে হাদীসে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِى جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَىْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ مُوسَى بِأَرْبَعِينَ عَامًا. قَالَ آدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَفَتَلُومُنِى عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِى بِأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.

অর্থ: “আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আদম ও মূসা (আ:) তাদের রবের নিকটে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। এবং আদম বিজয় লাভ করলেন। মূসা (আ:) আদম (আ:) কে বললেন, আপনিতো সেই আদম, আপনাকে আল্লাহ (সুব:) নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি নিজেই আপনার ভিতরে রূহ ফুকে দিয়েছেন। মালায়েকাদের মাধ্যমে আপনাকে সাজদা করালেন। আপনাকে আল্লাহ (সুব:) জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ দিলেন। কিন্তু আপনি আপনার ভূলের কারণে মানব জাতিকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। উত্তরে আদম (আ:) বললেন: তুমি তো মূসা (আ:)। তোমাকে আল্লাহ (সুব:) স্বীয় রেসালাত ও সরাসরি কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমাকে তাওরাত খন্ড সমূহ দিয়েছেন। যাতে সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তোমাকে আল্লাহ (সুব:) নির্জনে কথা বলার জন্য নৈকট্য দান করেছেন। আচ্ছা! তুমি বলোতো: আল্লাগ (সুব:) আমাকে সৃষ্টির কতবছর পূর্বে তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন। মূসা (আ:) বললেন, চল্লিশ বছর পূর্বে। আদম (আ:) বললেন, আচ্ছা বলতো তুমি কি তাওরাতে এ কথাটি পেয়েছো ‘আদম তার রবের হুকুম আমান্য করলো ফলে সে বিভ্রান্ত হলো’? মূসা (আ:) বললেন, হ্যাঁ! এবার আদম (আ:) বললেন তাহলে তুমি কি আমাকে এমন একটি বিষয়ে তিরস্কার করছো যে বিষয়টি আল্লাহ (সুব;) আমাকে সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: অত:এব মুসা (আ:)আদম (আ:) এর উপর জয়যুক্ত হলেন।” (সহীহ মুসলিম ৬৯১৪; সহীহ বুখারী ৩৪০৯)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্ম পূর্বের থেকেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয় নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি থেকে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ

অর্থ: “আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী (সা:) একটি জানাযায় ছিলেন। সেখানে কিছু একটা হাতে নিয়ে (চিন্তামগ্ন অবস্থায়) মাটিতে মৃদু আঘাত করতে লাগলেন। অত:পর বললেন, তোমাদের প্রতিটি মানুষের ঠিকানা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা আছে। হয়তো জাহান্নামে নতুবা জান্নাতে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি তাহলে আমাদের লিখিত কিতাব (তাকদীর) এর উপর ভরসা করে থাকবো না? এবং আমল করা ছেড়ে দিব না? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, না! তোমরা আমল করতে থাক। নিশ্চয় যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে ঐটার কাজ সহজ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশীলদের (জান্নাতীদের) অন্তর্ভূক্ত তার জন্য সৌভাগ্যশীলদের আমল সহজ করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি হতভাগাদের (জাহান্নামীদের) অন্তর্ভূক্ত তার জন্য হতভাগাদের আমল সহজ করে দেওয়া হবে।” (সহীহ বুখারি ৪৯৪৯; সহীহ মুসলিম ৬৯০৩)

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن ابن عباس قال كنت خلفت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات ...واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعواعلى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف

অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পিছনে বসে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিব। (কথাগুলো মনে রাখবে) ...আর জেনে রাখ! যদি গোটা জাতি একত্র হয় কোন বিষয়ে তোমার উপকার করার জন্য। তবে তারা সকলে মিলে ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ (সুব:) তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। পক্ষান্তরে যদি গোটা জাতি একত্র হয় কোন বিষয়ে তোমার ক্ষতি করার জন্য তবে সকলে মিলে তোমার অতটুকুই ক্ষতি করতে পারবে

ততটুকু আল্লাহ (সুব:) তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন। কলম তুলে রাখা হয়েছে এবং (তাকদীর লিখিত) কিতাব শুকিয়ে গেছে।" (সুনানে তিরমিজি ২৫১৬)

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, তাকদীরে লেখা আছে বলেই আমরা যে কোন ন্যায়-অন্যায় কাজ করি তা কিন্তু নয় । বরং আল্লাহ (সুব:) যেহেতু অতিত বর্তমান ভবিষ্যত সবকিছু জানেন সেহেতু তিনি আমরা যা কিছু করবো বা না করবো সব জানেন। তাই তিনি সবকিছু পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অর্থাৎ তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সেজন্য আমরা করি তা নয় বরং আমরা করবো তা তিনি জানেন তাই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, আল্লাহ (সুব:) যখন জানেন যে, আমরা অন্যায় করবো তাহলে তিনি তো বাঁধা দিলেই তো পারতেন। কেন আমাদেরকে অন্যায় ও পাপকাজ করার সুযোগ দিলেন? তার জবাবে আমরা বলবো, যেহেতু পৃথিবীটা একটা পরিক্ষার হল। এখানে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন পরিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর পরিক্ষার হলে নিয়ম হলো যে ভুল লেখে তাকে হলের ভিতরে সংশোধন করে না দিয়ে বরং সে যা লেখে তাতেই তাতে সহযোগীতা করা হয় প্রয়োজনে আরো বেশী ভূল লেখার জন্য অতিরিক্ত কাগজ দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি ভাবে এই পৃথিবীতেও কেউ যদি নেক আমল করতে চায় তাকে আল্লাহ (সুব:) স্বীয় ইচ্ছা মোতাবেক তাকে সাহায্য করেন। আবার কেউ যদি গোমরাহ হতে চায়, অন্যায়-পাপাচারে লিপ্ত হতে চায় তাতেও আল্লাহ (সুব:) তাকে বাধা প্রদান করেন না। মানুষকে আল্লাহ (সুব:) একটা ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেছেন সে অনুযায়ী মানুষ কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করে। তার ইচ্ছার সাথে যদি আল্লাহ (সুব:) তাওফীক সহায়ক হয় তাহলে সে ঐ কাজটি করতে পারে। নতুবা করতে পারে না।

এক্ষেত্রে আলী (রা:) এর একটি সুন্দর ঘটনা আছে: তার কাছে দুটো লোক এলো। একজন জাবরিয়া মতবাদের আরেকজন কাদরিয়া মতবাদের। একজন বললো, আমি যা ইচ্ছা করি তাই করতে পারি এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কোন ভূমিকা নাই। অপরজন বললো: আমি যা কিছু করি সব কিছুই আল্লাহ

(সুব:) করান। আমার নিজের কোন দোষ নেই। এই মতবাদের লোক বর্তমানেও পাওয়া যায়। যারা বলে 'যেমনে নাচাও তেমনে নাচি, পুতুলের কি দোষ" আলী (রা:) উভয় ব্যক্তিকে বললেন, তোমরা একটি পা উপরে উঠাও। তারা উঠালো। অত:পর বললেন, অপর পা টিও উপরে উঠাও তারা শত চেষ্টা করেও তা পারলো না। আলী (রা:) বললেন, এখানেই তাকদীরের রহস্য নিহীত রয়েছে। প্রথম পা তোমরা উঠাবার ইচ্ছা করো নাই। আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন তাই উঠানে পেরেছো। দ্বিতীয় পা টি উঠানোর ইচ্ছা আগের মতই ছিল কিন্তু আল্লাহ (সুব:) তাওফীক দেন নাই। তাই তোমরা উঠাতে সক্ষম হও নাই। এটাই হলো তাকদীর। এখানে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের ইচ্ছা ক্ষমতাটাও সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন নয়। বরং ওটাও আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير : ٢٩]

অর্থ: "আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।" (সুরা তাকভীর ৮১:২৯)

তাকদীরের বিষয়টি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এ সম্পর্কে নিয়ম হলো আমল করতে থাকা। বেশী জিজ্ঞাসাবাদ না করা এবং এই আক্বিদা পোষন করা যে আল্লাহ (সুব:) যা কিছু করেন ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিক করেন। সব কিছুই সুপরিকল্পিত ও সুপরিমিতভাবে করেন। ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر/٤٩

অর্থ: "নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিত রুপে সৃষ্টি করেছি।" (সুরা ক্বামার ৫৪:৪৯) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « كُلُّ شَىْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "প্রত্যেক জিনিসই পরিমিত, এমনকি বোকা ও বুদ্ধিমত্তা অথবা অক্ষমতা ও পারদর্শীতা।" (সহীহ মুসলিম ৬৯২২)

প্রশ্ন: ভাগ্যের স্তর কয়টি ও কি কি?

উত্তর: চারটি স্তর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে:

প্রথমত: এ বিশ্বাস করা যে, বস্তুনিচয়ের সৃষ্টির পূর্বে এবং বান্দারা তাদের আমল করার পূর্বে অনাদী কালেই আল্লাহ (সুব:) এসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق : ١٢)

অর্থ: "যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞানতো সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।" (সুরা ত্বালাক ৬৫:১২)

আল্লাহর অনন্ত জ্ঞানের প্রতি ঈমান আনা, যা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحج/٧٠)

অর্থ: "তুমি কি জাননা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অবগত যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে, নিশ্চয় ইহা কিতাবে লিখিত আছে আর নিশ্চয় ইহা আল্লাহর নিকট সহজ।" (সুরা আল-হাজ্ব ২২:৭০)

দ্বিতীয়ত: এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ (সুব:) যা কিছু নির্ধারণ ও সম্পাদন করেছেন সবকিছুই লাওহে মাহফুজের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} [يس : ١٢]

অর্থ: "আমি প্রতিটি বস্তু একটি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।" (সুরা ইয়াসীন ৩৬:১২)

লাওহে মাহ্ফুজে যেভাবে অন্যান্য সব কিছু লিপিবদ্ধ আছে সেভাবে তাকদীরে বিষয়টিও লেখা আছে। আল্লাাহ (সুব:) বলেন: **مَا فَرَّطْنَـــا فِـــي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** "আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। (সুরা আন-আম ৬:৩৮)

তৃতীয়ত: এ বিশ্বাস করা যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ কার্যকরি ইচ্ছে, সর্বব্যাপ্ত ইরাদা ও পরিপূর্ণ কুদরত রয়েছে। তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই হয়। এবং যা ইচ্ছে করেন না তা হয় না। বান্দা কোন ভাল অথবা মন্দ কাজের ইচ্ছে করলে আল্লাহ (সুব:) যদি তা অনুমোদন করেন তবে সে তা করতে পারে। আল্লাহর অনুমোদন না হলে সে তা করতে পারবে না। কেননা বান্দার কোন কাজ করার নিজস্ব শক্তি নেই । শক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। বান্দা পুরুস্কৃত বা তিরস্কৃত হয় তার ইচছার কারণে। সে ভাল ইচ্ছা না করলে আল্লাহ (সুব:) জোর পূর্বক কাউকে দিয়ে ভাল কাজ করাবেন না। সে ভাল করতে চাইলে তার ভাল চাওয়ার কারণে আল্লাহ তাকে নিজের অনুমোদন সাপেক্ষে ভাল কাজ করার ক্ষমতা দিবেন। মন্দ চাইলে অনুমোদন শর্তে মন্দও করার ক্ষমতা দিবেন। কেননা ভাল মন্দ পরিক্ষার জন্য তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।

চতুর্থত: এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই এ বিশ্বের জানা-অজানা সবকিছুর স্রষ্টা। সকল বস্তুর সত্তা-গুন ও স্পন্দনসহ সবই তার সৃষ্টি। আল্লাহ (সুব:) বলেন: **(وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَـــا تَعْمَلُـــونَ [الـــصافات/٩٦** আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন। (সুরা সাফ্ফাত ৩৭:৯৬)

আল্লাহ (সুব:) আরো বলেন:

{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} [الزمر : ٦٢]

অর্থ: "আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।" (সুরা যুমার ৩৯:৬২)

উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনাকে 'তাকদীরের' উপর ঈমান আনা বলা হয়।

প্রশ্ন: ভাগ্যের প্রকারভেদ কি কি?

উত্তর: ভাগ্যের প্রকারসমূহ হল-

- সকল সৃষ্টি জীবের সাধারণ ভাগ্য লিপিবদ্ধ করণ। আর ইহাই আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে লাউহে মাহ্ফুজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

● সারা জীবনের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করণ। আর তা হল বান্দার মাঝে রুহ্ বা আত্মা ফুঁকে দেওয়ার সময় হতে তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে নির্ধারণ করা।

● বাৎসরিক ভাগ্য নির্ধারণ করা। ইহা হল, প্রত্যেক বৎসর যা কিছু সংঘটিত হবে তা নির্ধারন করা। আর ইহা প্রত্যেক বৎসরের মহিমান্বিত রজনীতে হতে থাকে। আর তা হলো লাইলাতুল ক্বদরে যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে আল্লাহ (সুব:) বলেন: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ [الـــدخان/٤)
অর্থ: এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। (সুরা দুখান ৪৪:৪)

● দৈনন্দিন ভাগ্য নির্ধারন করণ, আর তা হল সম্মান, অপমান, (কিছু) দেওয়া না দেওয়া, জীবিত করা, মৃত্যু দান ইত্যাদি যা দৈনন্দিন সংঘটিত হবে, তা নির্ধারন করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ [الرحمن/٢٩)

অর্থ: আসমান ও যমিনে বিচরণশীল সকলেই তাঁর কাছে প্রার্থী, প্রত্যেকদিন (সময়) কোন না কোন কর্মেরত রয়েছেন। (সুরা আর-রাহ্মান ৫৫:২৯)

প্রশ্ন: ভাগ্যের ব্যাপারে সালাফদের আকিদাহ বা বিশ্বাস কি?

উত্তর: নিশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা রব, তার মালিক বা অধিকারী। নিশ্চয় আল্লাহ সকল সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টির পূর্বে তাদের ভাগ্য সমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাদের বয়স, রুযী, কর্ম সমূহ নির্ধারন করে রেখেছেন। আরো লিখে রেখেছেন যে, সুখ অথবা দু:খের দিকে তারা ধাবিত হবে। প্রত্যেক জিনিসই স্পষ্ট কিতাবে হিসাব করে রেখেছেন। অত:পর আল্লাহ্ যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। আর যা হয়েছে ও হবে তা সবই জানেন। আর যা হয় নাই যদি তা হতো কি ভাবে হতো তাও জানেন। আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন।

আর নিশ্চয় বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে, যা দ্বারা তাদেরকে যে সকল কাজের সামর্থবান করেছেন তা সম্পাদন করে এই বিশ্বাস রেখে যে আল্লাহ্ যা চান শুধু মাত্র তাই হয়। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [العنكبوت/٦٩)

অর্থ: "যারা আমার পথে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।" (সুরা আল-আন্কাবুত ২৯:৬৯)

আর নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দার ও তার কর্মের সৃষ্টি কর্তা আর তারাই এই কর্ম গুলো প্রকৃত পক্ষে সম্পাদনকারী। ওয়াজিব ছাড়াতে ও হারাম কাজ করাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে কারো কোন হুজ্জাত বা দলীল দাঁড় করানোর সুযোগ নেই, বরং বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পূর্ণ দলীল রয়েছে। বিপদ-আপদে ভাগ্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হলেও নিন্দনীয় ও পাপের কাজে ভাগ্যের অযুহাত দেয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন: কাজ কয় প্রকার? বান্দাদের কর্ম সমূহ কি?

উত্তর: যে সকল কাজ আল্লাহ (সুব:) এই নিখিল বিশ্বে সৃষ্টি করেছেন তা দু' ভাগে বিভক্ত:

প্রথম: আল্লাহ্র (সুব:) কর্ম সমূহের মধ্যে যে সকল কর্ম তাঁর সৃষ্টি জীবের মাঝে পরিচালনা করেন, তাতে কারো কোন প্রকার ইচ্ছা ও ইখ্তিয়ার নেই। বস্তুর সকল ইচ্ছা আল্লাহর জন্য। যেমন জীবিত করা, মৃত্যু দান করা, সুস্থ ও অসুস্থ করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُـــونَ "আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন।" (সুরা সাফ্ফাত ৩৮:৯৬) তিনি আরো বলেন: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْـــسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيـــزُ الْغَفُـــورُ **অর্থ:** "তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদেরকে পরিক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?" (সুরা- মূল্ক ৬৭:২)

দ্বিতীয়: আর যে সকল কর্ম সৃষ্টিজীব সম্পাদন করে থাকে, তা সবই ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। আর ইহা সম্পাদন কারীর ইখ্তিয়ার ও ইচ্ছায় সংঘঠিত হয়, কারণ ইহা আল্লাহ্ তাদের উপর অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ্ (সুব:) বলেন: لِمَنْ شَـــاءَ مِـــنْكُمْ أَنْ يَـــسْتَقِيمَ "যে তোমাদের মধ্যে সোজা পথে চলতে চায়।" (সুরা তাকভীর ৮১:২৫)

তিনি আরো বলেন: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُـــرْ "অতএব যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফুরী করুক।" (সুরা ক্বাহাফ ১৮:২৮)

ভাল কাজ সম্পাদনের জন্য তারা প্রশংসার হক্বদার, আর খারাপ কাজ করার জন্য তারা অপমানের হক্বদার। আল্লাহ্ শুধু মাত্র ঐ কাজ করার জন্য শাস্তি দিবেন, যাতে বান্দার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে।

আল্লাহ্ (সুব:) বলেন: وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ "আর আমি বান্দাদের উপর জুলুমকারী নই।" (সুরা ক্বাফ ৫০:২৯)

আর মানুষ ইচ্ছা ও নিরুপায়ের পার্থক্য জানে। যেরূপ কেহ ছাদ হতে সিঁড়ি বেয়ে নিজ ইচ্ছায় অবতরণ করেন, আর কখনো কেহ্ তাকে ছাদ হতে ফেলে দিতে পারে। প্রথম উদাহরণ হল ইচ্ছার, আর দ্বিতীয় উদাহরণ হল নিরুপায়ের।

প্রশ্ন: আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দার কর্মের মাঝে সমঝতা কি?

উত্তর: আল্লাহ্ বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন ও তার (বান্দার) কর্ম সমূহকে সৃষ্টি করেছেন। ও তাকে ইচ্ছা ও শক্তি দিয়েছেন। তাই বান্দাই প্রকৃত পক্ষে তার কর্মের সম্পাদন কারী। সরাসরি তা আদায় কারী। কারণ তার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে। অত:পর সে যদি ঈমান আনে তবে সে তার ইচ্ছায় ও ইরাদায় ঈমান আনলো। আর সে যদি কুফুরী করে তবে সে তার ইচ্ছায় ও পূর্ণ ইরাদায় কাফের হল। যেমন আমরা বলে থাকি যে, এই ফল এই গাছের আর এই ফসল এই ক্ষেতের। অর্থ হল: ইহা হতে উৎপন্ন হয়েছে। আর আল্লাহর দিক হতে, এর অর্থ হবে: নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহাকে ইহা হতে সৃষ্টি করেছেন। এই দুইয়ের মাঝে কোন প্রকারের বিরোধ নেই।

আর এর দ্বারা (শারউল্লাহ) আল্লাহর প্রনয়ণ ও তাঁর নির্ধারণ এক বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহ (সুব:) বলেন: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات/٩٦]) অর্থ: অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্ম সমূহকে সৃষ্টি করেছেন। (সুরা সফ্ফাত ৩৭:৯৬) তিনি আরো বলেন:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى [الليل/٥-١٠)

অর্থ: অতএব যে দান করে এবং আল্লাহ্ ভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব,

আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়, এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের জন্যে সহজ পথ দান করব। (সুরা লাইল ৯২:৫-১০)

প্রশ্ন: ভাগ্যের ব্যাপারে বান্দার করণীয় কি?

উত্তর: ভাগ্যের ব্যাপারে বান্দার করণীয় কাজ হল দু'টি:

প্রথম: সম্ভাব্য কাজ সম্পাদনের ও সতর্কিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। তাঁর কাছে (আল্লাহর কাছে) আরো চাইবে যেন তাকে সহজ সাধ্য কাজ সহজ করে দেন, আর কঠিন সাধ্য কাজ হতে বিরত রাখেন। আর তাঁর উপর ভরসা করবে ও তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে। অত:পর কল্যাণ অর্জনের জন্য ও অকল্যাণ বর্জনের জন্য তাঁর নিকটেই মুখাপেক্ষী হবে। রাসুল (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم ... احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: তোমরা কল্যাণকর কাজের প্রতি আগ্রহবান হও, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অপারগতা প্রকাশ করোনা। আর তুমি যদি কোন কষ্টের সম্মখীন হও তবে এই রুপ বলিওনা যে আমি যদি এই কাজ করতাম তাহলে এই হত। বরং বল যে, আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন, কারণ যদি কথাটি শায়তানের কর্ম খুলে দেয়।" (সহীহ মুসলিম ৬৯৪৫)

দ্বিতীয়: বান্দা তার জন্য নির্ধারিত বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, ঘাবড়াবেনা। অত:পর জানবে যে, নিশ্চয় ইহা আল্লাহর পক্ষ হতে, সুতরাং সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিবে।

عَنْ أَبِى حَفْصَةَ قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لاِبْنِهِ يَا بُنَىَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ

অর্থ: "আবু হাফসা (রা:) থেকে বর্ণিত, উবাদা ইবনে সামেত (রা:) তাঁর ছেলেকে বললেন: হে আমার আদরের পুত্র! ঈমানের সত্যিকার প্রকৃত স্বাদ তুমি ততক্ষন পর্যন্ত পাবে না যতক্ষন না এই বিষয়ে জ্ঞাত হবে, যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেছে তা তোমাকে ভূল করার ছিল না (না আসার ছিল

না)। আর যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেনি তা তোমার জন্য আসার ছিল না।" (সুনানে আবু দাউদ ৪৭০২)

প্রশ্ন: ভাগ্য ও ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য কেন?

উত্তর: ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। কেননা ইহা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার অন্তর্ভুক্ত। তাই সকল মু'মিনের পক্ষে আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। কারণ আল্লাহর কর্ম ও ফায়সালা সকলই ভাল (ন্যায় পরায়ণ) ইনসাফ ভিত্তিক হিক্মাত পূর্ণ।

সুতরাং যার আস্থা থাকবে যে, নিশ্চয় যা (সুখ-দু:খ) তাকে স্পর্শ করেছে তা তাকে ভূল করার ছিলনা আর যা তাকে ভূল করেছে তা তার নিকট পৌঁছার ছিলনা সে পেরেশানী ও সন্দেহ্ হতে বেঁচে থাকবে। আর তার জীবন হতে ব্যাকুলতা ও দোদুল্যমনতা দূর হবে। হারিয়ে যাওয়া বা ছুটে যাওয়া বস্তুর উপর চিন্তিত হবে না। আর তার ভবিষ্যৎ কে ভয় পাবেনা। আর এর মাধ্যমে সে সব চাইতে সৌভাগ্যবান হবে, আত্নার দিক দিয়ে সব চাইতে পূত-পবিত্র হবে, আর সব চাইতে শান্ত হবে।

আর যে জানতে পারবে যে, তার বয়স সীমিত, রুযী পরিমিত, সে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারবে যে, কাপুরুষতা বয়স বাড়াতে পারে না। কার্পণ্যতা রুযী বাড়াতে পারে না। তাহলে সবই লিখিত রয়েছে। বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, পাপ ও ত্রুটি পূর্ণ কর্ম সম্পাদন করার কারনে ক্ষমা চাইবে। আর আল্লাহ্ যা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তবেই আদেশের আনুগত্য আর বিপদের উপর ধৈর্য ধারণের মাঝে সমন্বয় গড়তে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِـــيمٌ [التغابن/١١)

অর্থ: "আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সুরা তাগাবুন ৬৪:১১)

প্রশ্ন: হিদায়াত কয় প্রকার?

উত্তর: হিদায়াত দু' প্রকার: (হিদায়াতের দু'টি অর্থ)

প্রথম: হিদায়াত অর্থ: **ارائة الطريق** বা সত্যের সন্ধান দেওয়া, সৎপথ প্রর্দশন করা। আর সকল সৃষ্টি জীবই এর অধিকারী। আর সকল রাসূল ও তাঁদের অনুসারীগণ এরই অধিকারী। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [الشورى/٥٢)

অর্থ: "নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।" (সুরা আশ্শুরা ৪২:৫২)

দ্বিতীয়: **ايصال الي المطلوب** বা হিদায়াত এর অর্থ আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদেরকে (ভাল কাজের) তাওফীক প্রদান করা ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা বা অটল রাখা, (আর ইহা) তাঁর মুত্তাকীন বান্দাদের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর এই হিদায়াতের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। কোন মানুষের এই প্রকার হেদায়াত দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থ: "আপনি যাকে ভালবাসেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্ (সুব:)ই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।" (সুরা ক্বসাস ২৮:৫৬)

প্রশ্ন: কুরআনে বর্ণিত (আল্লাহর) ইরাদা কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) এর ইরাদা দুই প্রকার:

প্রথম: ইরাদা কাউনিয়া ক্বাদারিয়া, তা হল সকল সৃষ্টিকূলের তরে নির্ধারিত ঘটনীয় ইচ্ছা, সুতরাং আল্লাহ্ যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। আর ইহা (ইরাদা কাউনিয়া ক্বাদারিয়া) অবশ্যই পতিত হবে। কিন্তু ইরাদা শারয়ীয়া এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (ইহাকে) ভালবাসা ও এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া জরুরী নয়। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ [الأنعام/١٢٥)

"আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে দেন।" (সুরা আনআম, আয়াত-১২৫)

দ্বিতীয়: ইরাদা দ্বীনিয়া শারয়ীয়া, তা হল ধর্মীয় নির্দেশ বা উদ্দেশ্য ও তার অনুসারী কে ভালবাসা ও তাদের প্রতি সন্তষ্ট থাকা। ইরাদা দ্বীনিয়া শারয়ীয়া

বাস্তবায়িত হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত এর সাথে ইরাদা কাউনিয়া সংযুক্ত না হবে। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান, তোমাদের জন্য কঠিনতা চান না। (সুরা বাক্বারা ২:১৮৫)

আর ইরাদা কাউনিয়া অধিক ব্যাপক, কারণ সকল শারয়ী উদ্দেশ্য যা বাস্ত বায়িত হয় তা সৃষ্টিগত দিক হতেও বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট।

আর পতিত সকল কাওনী উদ্দেশ্য বা ঘটমান ইচ্ছা শরীয়াতে তা উদ্দিষ্ট নয়। যেমন আবু বকর (রা:) এর ঈমানের মাঝে উভয় প্রকার ইরাদা বা ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছিল। আর আবু জাহল এর কুফুরীতে শুধুমাত্র ইরাদা কাওনিয়া বা ঘটমান ইচ্ছা ছিল। আর যাতে ইরাদা কাউনিয়া পাওয়া যাবে না, যদিও তা শারীয়াতের দিক থেকে প্রত্যাশিত, যেমন আবু জাহেলের ঈমান। সুতরাং যদি ও আল্লাহ্ নাফারমানী পূর্ণ ইচ্ছা করেন ঘটবার দিক থেকে, এবং সৃষ্টিগত দিক থেকে তা চান কিন্তু তা দ্বীন হিসাবে পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না, ও তার প্রতি নির্দেশ ও দেন না। বরং তার প্রতি বিদ্বেষ রাখেন, অপছন্দ করেন, তা হতে (বান্দাদেরকে) নিষেধ করেন ও তা সম্পাদন কারীকে সাবধান করেন।

আর এসব তাঁরই নির্ধারণ তবে আনুগত্য পূর্ণ কর্ম ও ঈমান আনা নিশ্চয় আল্লাহ্ (সুব:) ইহাকে ভালবাসেন, এর নির্দেশ দেন এবং এর সম্পাদন কারীকে নেকী ও সুন্দর প্রতিদানের ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) দিয়েছেন। তাঁর ইরাদা ছাড়া তাঁর নাফারমানী করা যায় না। আর আল্লাহ্ (সুব:) যা চান শুধু তাই বাস্তবায়ন হয়। আল্লাহ্ তা'আল বলেন: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ অর্থ: "(আল্লাহ) তাঁর বান্দাদের জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না। (সুরা যুমার ৩৯:৭)

তিনি আরো বলেন: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة/٢٠٥) "আল্লাহ্ ফাসাদ (অশান্তি) পছন্দ করেন না। (সুরা বাক্বারা ২:২০৫)

প্রশ্ন: ভাগ্যের সাথে আসবাব এর প্রভাব কি এবং ভাগ্যের রহস্য কি?

উত্তর: ঐ সকল আস্‌বাব বা কারণ সমূহ যা ভাগ্য পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ এই ভাগ্যের জন্য কিছু কারণ তৈরী করে রেখেছেন যা ইহাকে পরিবর্তন ও

প্রতিরোধ করে। যেমন: দু'আ, সাদাকাহ্, ঔষধ, সতর্কতা অবলম্বন, (নিজের) কর্ম দক্ষতা ব্যবহার করা, কারণ সবই আল্লাহর ফায়সালা ও তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ, এমনকি অপারগতা- অক্ষমতা ও বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা।

ভাগ্যের মাস্‌আলা বা বিষয়টি আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মাঝে তাঁর একটি রহস্যময় বিষয়। ভাগ্য নির্ধারণ আল্লাহর গোপন রহস্য, তাঁর সৃষ্টি জীবের মাঝে এ কথাটি শুধু মাত্র ভাগ্যের গোপন দিকের জন্য প্রজোয্য। কারণ সকল জিনিসের হাকীকাত শুধুমাত্র আল্লাহ্ জানেন। মানুষ তা অবগত হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন, হিদায়াত করেন, মৃত্যু দান করেন, জীবিত করেন, নিষেধ করেন ও কিছু প্রদান করেন।

ভাগ্যের ব্যপারে আলী (রাযি:) এর বক্তব্য:

فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر فقال بحر عميق فلا تلجه قال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر قال سر الله فلا تتكلفه

অর্থ: "... জঙ্গে জামাল-এ অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তি আলী (রযি:) কে জিজ্ঞেস করল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদেরকে কদর (ভাগ্য) সম্পর্কে বলুন। তখন আলী (রাযি:) বললেন; কদর হচ্ছে গভীর সমুদ্র তুমি তাতে প্রবেশ করবে না। সে আবার একই প্রশ্ন করল। তখন আলী (রাযি:) বললেন, কদর আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে এক গোপন রহস্য, তুমি তা জানার চেষ্টা করবে না।" (কানযুল উম্মাল ১৫৬৭, জামেউল আহাদীস ৩২৭৬৬)

তবে ভাগ্যের অন্যান্য দিক ও তাঁর মহা হিক্‌মাত স্তর, মর্যাদা ও তাঁর প্রভাব মানুষের নিকট বর্নণা করাও তা তাদেরকে জানানো বৈধ রয়েছে। কারণ ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের রুক্‌ন সমূহের একটি অন্যতম রুক্‌ন, যা শিক্ষা করা ও জানা একান্ত কর্তব্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন জিব্‌রীল (আ:) এর নিকট ঈমানের রুক্‌ন সমূহ উল্লেখ করেন তখন বলেন: তিনি হলেন জিব্‌রীল তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমণ করেছেন।

প্রশ্ন: ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়ার মাস'আলা কি?

উত্তর: ভবিষ্যতে কি হবে বা না হবে এই সর্ম্পকে আল্লাহর পূর্ব জ্ঞান যাকে অদৃশ্য বা গায়েবের ইলম বলে। এটা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

মানুষ ও জ্বিনদের অজানা। এতে কোন ব্যক্তিরই স্বীয় পক্ষ গ্রহণের দলীল নেই। আর যে বিষয় ফায়সালা হয়ে গেছে তার উপর ভরসা করে কর্ম ত্যাগ করা ঠিক নয়। সুতরাং ভাগ্য আল্লাহর বিরুদ্ধে ও তাঁর সৃষ্টির কারো জন্য দলীল বা হুজ্জাত নয়।

যদি খারাপ কাজ করার উপর ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়া বৈধ হতো, তাহলে অত্যাচারী শাস্তি প্রাপ্ত হতনা, মুশরিক ব্যক্তি হত্যা হতো না, হদ্ বা বিধান প্রতিষ্ঠিত হতনা, আর কেহ্ অত্যাচার করা হতে বিরত থাকতো না। আর ইহা দ্বীন ও দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করার মাধ্যম হত, যার ভয়াবহতা সকলের জানা।

যারা ভাগ্য দ্বারা দলীল দেয়, তাদেরকে আমরা বলবো তুমি জান্নাতী না জাহান্নামী এ ব্যাপারে তোমার নিকট নিশ্চিত জ্ঞান নেই। আর যদি তোমার নিকট এই ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান থাকত অবশ্যই আমরা তোমাকে সৎকাজের আদেশ দিতাম না ও অন্যায় থেকে নিষেধও করতাম না। বরং তুমি কর্ম সম্পাদন কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে তাওফীক প্রদান করবেন, আর তুমি জান্নাত বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিছু কিছু সাহাবা যখন ভাগ্যের হাদীস সমূহ শুনতেন তখন বলতেন: এখন তুমি আমার চাইতে বেশী প্রচেষ্টাকারী নও। (অর্থাৎ আমি বেশী প্রচেষ্টাকারী)। নবী (সা:) কে আত্মপক্ষ সমর্থনে ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়া সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى)
إِلَى قَوْلِه (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

অর্থ: "তোমরা কর্ম সম্পাদন করতে থাকো। যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজ সাধ্য হবে, সুতরাং যারা সৌভাগ্যবান হবে তাদেরকে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের যে কাজ সেই কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। আর যারা দূর্ভাগ্যবান হবে, তাদেরকে তাদের দূর্ভাগ্যবান ব্যক্তিদের যে কাজ সেই কাজ সহজ করে দেওয়া হবে। অত:পর নিম্নের আয়াত পাঠ করলেন:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى [الليل/٥-١٠)

অর্থ: "অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। (সুরা লাইল ৯২:৫-১০)

যেমন পরীক্ষার হলে যে ছাত্র ভুল লিখে তাকেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহযোগিতা দেয়া হয়। আবার যে সঠিক উত্তর লিখে তাকেও একই রকম সহযোগিতা করা হয়। কাউকে ভুল ধরিয়ে দেয়া হয় না। কারণ এই তিন ঘন্টা তাকে স্বাধীনমত ইচ্ছামত লিখতে দেয়া হয়েছে। তারপর খাতা দেখে পরে নাম্বার দেয়া হবে। ঠিক তেমনি দুনিয়াতে আল্লাহ (সুব:) আমাদেরকে পরীক্ষার ময়দানে ছেড়ে দিয়েছেন। এখানে যে যা করতে চায় আল্লাহ (সুব:) তাকে সেই কাজ করার সুযোগ করে দেন। ফলাফল হবে কিয়ামতে।

প্রশ্ন: আসবাব বা (মাধ্যম সমূহ) গ্রহণ করার ব্যাপারটি কিরূপ?

উত্তর: বান্দার নিকট দু' প্রকার কাজ উপস্থিত হয়:

- এমন কর্ম যাতে বাহানা বা অজুহাত রয়েছে তা সম্পাদনে সে অপারগ নয়।
- এমন কর্ম যাতে বাহানা ও অজুহাতের অবকাশ নেই, তা পালনে সে ধৈর্য ধারণ করে না। আল্লাহ্ (সুব:) বান্দা বিপদে পতিত হওয়ার পূর্বেই বিপদ সর্ম্পকে জানেন।

তাঁর (আল্লাহর) বিপদ সর্ম্পকে জ্ঞান রয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, তিনিই বিপদ গ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদে পতিত করেছেন, বরং এই বিপদ পতিত হয়েছে এর নির্ধারিত কারণ সমূহের দ্বারাই। যদি বিপদ হতে রক্ষাকারী মাধ্যম যা ব্যবহার ও গ্রহণ করার জন্য ইসলামী শরীয়াত অনুমতি দিয়েছেন পরিত্যাগ করার কারণে পতিত হয়, তবে সে নিজেকে হিফাজত না করার কারণে ও তাঁকে বিপদ হতে রক্ষাকারী মাধ্যম গ্রহণ না করার কারণে দোষী হবে।

আর যদি এই বিপদ প্রতিরোধ করার তার ক্ষমতা না থাকে তবে সে মা'জুর হবে। সুতরাং মাধ্যম গ্রহণ করা ভাগ্য ও ভরসার পরিপন্থী নয় বরং ইহা (মাধ্যম গ্রহণ করা) এরই (ভাগ্য ও ভরসারই) অন্তর্ভুক্ত।
আর যখন ভাগ্য পতিত হয়ে যায় তখন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ও তা মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়ে যায় ও নিম্নের কথার দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করবে। **قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ** অর্থ: আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন। তবে ভাগ্য পতিত হওয়ার পূর্বে মানুষের দায়িত্ব হল বৈধ মাধ্যম গ্রহণ করা ও ভাগ্যের দ্বারা ভাগ্যের প্রতিরোধ করা।

নাবীগণ নিজেদেরকে নিজেদের শত্রু থেকে হিফাযতকারী পদ্ধতি ও মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন, অথচ তাঁরা আল্লাহর অহী ও নিরাপত্তা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা:) সকল ভরসা কারীদের নেতা ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি মাধ্যম গ্রহণ করতেন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা থাকার পরও। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা, সবল মু'মিন আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম ও প্রিয়, তবে উভয়ের মাঝে কল্যাণ নিহত রয়েছে। যা তোমাকে উপকার করবে তা আদায়ে তুমি আগ্রহী হও। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর অপারগতা প্রকাশ করোনা। তোমাকে কোন বিপদ স্পর্শ করলে তুমি বলো না যে নিশ্চয় আমি এই কাজ করলে এই এই হতো বরং তুমি বল: **قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ** আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ (لـو) "যদি" শব্দটি শয়তানের কর্মকে খুলে দেয়। (সহীহ বুখারি ৬৯৪৫; সুনানে ইবনে মাজাহ ৭৯; মুসনাদে আহমদ ৮৭৯১)

প্রশ্ন: ভাগ্যকে অস্বীকার কারীর বিধান কি?
উত্তর: যে ব্যক্তি ভাগ্যকে অস্বীকার করল সে ইসলামী শরীয়াতের মূলনীতি সমূহের একটি অন্যতম মূলনীতিকে অস্বীকার করলো। আর এর মাধ্যমে সে কুফুরী করলো। কিছু কিছু সালাফগণ বলেন: "তোমরা কাদরীয়াহ সম্প্রদায়ের সাথে জ্ঞান দ্বারা মুনাযারা কর, তারা যদি অস্বীকার করে তাহলে তারা কুফুরী করলো আর যদি তারা স্বীকার করে তাহলে তারা (তোমাদের সাথে) ঝগড়া করলো।"

প্রশ্ন: ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার ফলাফল কি?
উত্তর: ফায়সালা ও ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার অনেক শুভ-পরিনাম সুন্দর প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব রয়েছে যা জাতীয় ও ব্যক্তি জীবনে কল্যাণ নিয়ে আসে।

(ক) নিশ্চয় "ঈমান বিল কদর" বা ভাগ্যের প্রতি ঈমান বিভিন্ন প্রকার নেক আমল ও ভাল গুন অর্জন করার সুযোগের জন্ম দেয়। যেমন আল্লাহর ইখলাস বা একনিষ্ঠতা, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার আশা করা, তাঁর প্রতি ভাল ধারণা রাখা, ধৈর্য ধারণ করা, প্রখর সহনশীলতা, নৈরাশ্যতা দূর করা, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, একমাত্র আল্লাহর শুকরিয়া করা, তাঁর অনুগ্রহ দয়া পেয়ে খুশী হওয়া। একমাত্র আল্লাহর জন্য বিনয় নম্রতা প্রকাশ করা, উদাসীনতা ও অহংকার ত্যাগ করা। আল্লাহর প্রতি ভরসা করতঃ ভাল পথে ব্যয় করার মন মানুষিকতাও সৃষ্টি করে। বীরত্ব সৃষ্টি করে, ভাল কাজ করার দিকে অগ্রসর করে, অল্পে তুষ্ট থাকার গুন তৈরী করে, আত্ম সম্মানী করে, উচ্চাভিলাশী করে, কর্ম দক্ষতা সৃষ্টি করে, কর্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টা তৈরী করে সুখে-দুখে মধ্যম পথ অবলম্বনকারী তৈরী করে, হিংসা ও প্রতিবাদ করা থেকে নিরাপদে রাখে। বাজে গাল-গল্প ও বাতিল কাজ হতে বিবেককে মুক্ত রাখে। আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির ব্যবস্থা করে।

(খ) "ঈমান বিল কদর" ভাগ্যের প্রতি ঈমান ওয়ালা ব্যক্তি তার জীবনে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত হয়। অধিক নি'য়ামত তাকে পথভ্রষ্ট করতে

পারে না, আর বিপদে নৈরাশ হয় না। আর সে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, তাকে যে বিপদ স্পর্শ করেছে তা তার জন্য আল্লাহর নির্ধারণ মাত্র, তার পরিক্ষা স্বরূপ। ঘাবড়ায় না বা বিচলিত হয় না। বরং ধৈর্য ধারণ করে ও নেকীর আশা রাখে।

(গ) নিশ্চয় "ঈমান বিল কদর" পথ ভ্রষ্টের কারণ সমূহ ও জীবনের অশুভ সমাপনী হতে হেফাজত করে। ইহা মু'মিনের জন্য সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা থাকার স্থায়ী প্রচেষ্টা, নেক কাজ বেশী বেশী করার সুযোগ, নাফারমানী পূর্ণ ও ধ্বংসাত্বক কাজ থেকে বিরত থাকার সুযোগ করে দেয়।

(ঘ) নিশ্চয় "ঈমান বিল কদর" মু'মিনদের জন্য সুদৃঢ় অন্তর ও পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা ভয়ানক ও কঠিন কর্মকে প্রতিহত করার মনোভাব তৈরী করে দেয়, মাধ্যম বা উপকরণ গ্রহণ করার সাথে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

অর্থ: "আবদুর রাহমান ইবনে আবী লায়লা (রা:) সুহাইব (রা:) থেকে বর্ননা করেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেন, মুমিনের অবস্থাটা কি আর্শ্চয্যজনক! নিশ্চয় তার সকল কর্মই ভাল, আর এটা শুধু মু'মিনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কারো বেলায় নয়। যদি তাকে কোন আনন্দ স্পর্শ করে তবে সে আল্লাহর প্রশংসা করে, ফলে তা তাঁর জন্য কল্যাণ হয়। আর যদি তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করে সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণ হয়। (সহীহ মুসলিম ৭৬৯২)

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

প্রশ্ন: نواقض الايمان দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয় বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: نـــاقض 'নাকেদ' বা বিনষ্টকারী বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার অস্তিত্বের কারণে অন্য কোনো জিনিস বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সালাত বিনষ্ট বা বাতিল হওয়ার যেমন কিছু কারণ ও বিষয় আছে, তেমনিভাবে দ্বীন বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় আছে। মুসল্লি যদি সালাত বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর যে কোনো একটিতে পতিত হয়, তাহলে সাথে সাথে তার সালাত বাতিল হয়ে যায়। যেমন সালাতের মধ্যে বায়ূ ত্যাগ করা, শব্দ করে হাসা, কিছু আহার করা বা পান করা ইত্যাদি। এমনি ভাবে তাওহীদ তথা দ্বীন বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় রয়েছে যার মধ্যে বান্দা পতিত হলে তার তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে সে কাফের মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়।

প্রশ্ন: نواقض الايمان দ্বীন বিধ্বংসী বিষয়গুলো কি কি?

উত্তর: দ্বীন বিধ্বংসী বিষয় হচ্ছে:

১। আল্লাহর সাথে শরীক করা: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا [النساء/٤٨)

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।" (সুরা নিসা ৪:৪৮) আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ: "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন আর তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সুরা মায়েদাহ ৫:৭২)

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত-মানসা করা,

অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আইন বিধানদাতা মানা, অন্য আইনে বিচার-ফায়সালা চাওয়া ইত্যাদি সবই শিরক যা একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শিরক মুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।" (সূরা আন'আম ৬:৮২) যতবড় ঈমান ও আমলের অধিকারী হোক না কেন শিরক থাকলে তার সবকিছুই বরবাদ হয়ে যাবে। আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা:) কে আল্লাহ (সুব:) সতর্ক করে ঘোষণা করলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر/٦٥)

অর্থ: "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" (সুরা যুমার ৩৯:৬৫)

সুরা আন'আমের ৮৩-৮৭ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ১৮ জন নবীর নাম নিয়ে তাদের ব্যাপারে বলেছেন:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام/٨٨)

অর্থ: "যদি তারা শিরক্ করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত।" (সূরা আন'আম ৬:৮৮)

২। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম স্থির করা যার কাছে বান্দা সুপারিশ কামনা করে এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল করা।

আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّـــهِ [يونس/١٨)

অর্থ: "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর ইবাদত করে, যা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারও করতে পারে না। তারা বলে: এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনুস ১০:১৮)

আল্লাহ (সুব:) অন্যত্র আরোও বলেন:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থ: "আর যারা তাকে ব্যতীত অলী আউলিয়া ধারণ করেছে (এবং প্রার্থনা ও মান্নত-মানসা ইত্যাদি ইবাদত সাব্যস্ত করে) তারা বলে আমরা তাদের উপাসনা করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছিয়ে দিবে।" (সুরা যুমার ৩৯:৩)

এটা হচ্ছে আউলিয়া এবং নেককার লোকদের কবরের উদ্দেশ্যে যারা যায় তাদের অবস্থা। তারা সেখানে গিয়ে কবরবাসিকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হয়, কবরবাসী আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে এ বিশ্বাসে। যেমন: তাদের কাছে দোয়া করা, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা, পশু যবাই করা, তাদের কাছে সাহায্য কামনা করা এবং কবরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করা।

৩। মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে সহীহ মনে করা।

আল্লাহ (সুব:) বলেন: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّـــهِ الْإِسْـــلَامُ "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৯)

অন্যত্র বলেন: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (সুরা আল ইমরান ৩:৮৫)

এখানে সন্দেহ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে তার কুফরীর ব্যাপারে কোনো মুসলিমের সন্দেহ পোষণ করা। যেমন: ইহুদী, নাসারা ও মুশরিক (অর্থাৎ ইহুদী নাসারা ও মুশরিকদের কুফরীর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কোনো দ্বিমত নেই, তাই কোনো মুসলিম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না।

করলে সেও কুফরী মতবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে) এ দৃষ্টি কোন থেকে জাহেলি যুগের মুশরিক যারা নিজেদের মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে নিজেরাই স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, আর বর্তমান যুগের মুশরিক যারা ইসলাম ও ঈমানের দাবী করে অথচ আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হককে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, এই দুই ধরনের মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৪। রাসূল (সা:) এর দ্বীন, অথবা (পুন্য কাজের) সাওয়াব অথবা (পাপের জন্য) শাস্তি এবং দ্বীনের যে কোনো বিষয় রং-তামাশা বিদ্রুপ করা।

আল্লাহ (সুব:) বলেন:

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

অর্থ: "আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে, তার রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? তামাশা করো না, তোমরা তো ঈমান প্রকাশ করার পর কাফের হয়ে গেছো।" (সূরা তাওবাহ ৯:৬৫-৬৬)

ইমাম মোহাম্মদ বিন আ: ওয়াহ্হাব তাঁর 'কাশফুশ শুবুহাত' পুস্তিয়কায় বলেন: "এটা যখন নিশ্চিত ভাবে প্রমানিত যে কতিপয় মুনাফিক যারা রাসুল (সা:) এর সাথে রোমের যুদ্ধে অংশগ্রহন করে ও তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপাত্মক কথা দ্বারা কুফরী করেছে, তখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যে ব্যক্তি সম্পদের স্বল্পতার আশংকায় কিংবা কিছু প্রাপ্তির আশায় অথবা কারো মনতুষ্টির জন্য কুফরী কথা বলল অথবা কুফরী কর্ম করল, সে অবশ্যই ঐ ব্যক্তির চেয়ে জঘন্য কাজ করেছে যে ঠাট্টা ও বিদ্রুপাত্মক কথা বলেছে।"

এমন অবস্থা আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমদের। যারা পর্দা করা, দাড়ি রাখা অথবা দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। প্রকারান্তরে তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাথেই ঠাট্টা করে।

৫। যাদু: যাদুর মধ্যে রয়েছে (যাদু-মন্ত্র দ্বারা) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা। উভয়ের মধ্যে পরষ্পরের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা। তাছাড়া "তাওলার" আশ্রয় নেয়া। তাওলা হচেছ (যাদু মন্ত্রের সাহায্যে) স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বশীভূতকরণ। এর মধ্যে রয়েছে ভেলকিবাজী এবং ভালবাসা সৃষ্টি করে বলে কথিত রিং। এগুলো নি:সন্দেহে কুফরী। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ [البقرة/١٠٢)

অর্থ: "তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিতো না যে, দেখো, আমরা নিছক পরীক্ষা মাত্র অতএব তুমি কুফরী করো না।" (সূরা বাকারা ২:১০২)

৬। মুসলমানদের বিরূদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও সহযোগিতা করা।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা, তাদেরকে কাফেরদের হাতে ধরিয়ে দেয়া ইত্যাদি সবই কুফরী ও ঈমান বিধবংসী বিষয়। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١)

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নি:সন্দেহে আল্লাহ (সুব:) জালেমদেরকে হেদায়াত করেন না।" (সূরা মায়েদাহ ৫:৫১)

৭। যে ব্যক্তি রাসূল (সা:) এর আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করল সে কুফরী করল। যদিও সে ওই আমলটি নিজে পালন করে।

আল্লাহ (সুব:) বলেন:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد/٢٨)

অর্থ: "এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৮)

৮। মুহাব্বত ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথবা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ [البقرة/

অর্থ: "আর কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহর (সুব:) সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি

ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় অনেক বেশী ।" (সূরা বাকারা ২:১৬৫)

৯। যে ব্যক্তি মনে করে যে, নবী (সা:) এর নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য মানব রচিত বিধান পরিপূর্ণ বা উত্তম ।

আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ [آل عمران/١٩]

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলে ইসলাম ।" (সুরা আল ইমরান ৩:১৯)

অন্যত্র বলেন: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে ।" (সুরা আল ইমরান ৩: ৮৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب : ٣٦]

অর্থ: "আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে ।" (সূরা আহযাব ৩৩:৩৬) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء : ٦٥]

অর্থ: "অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় ।" (সূরা নিসা ৪:৬৫)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, ঐ জাতের শপথ যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত রয়েছে, এই উম্মাতের ইয়াহুদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক আমার সম্পর্কে শোনার পর যদি আমার প্রতি এবং আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে তবে অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গন্য হবে ।" (সহীহ মুসলিম ৪০৩; মুসনাদে আহমদ ৮২০৩)

১০। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া বা অমনোযোগী হওয়া ।

আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ [السجدة/٢٢]

অর্থ: "যে ব্যক্তিকে তার রবের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে অত:পর সে তা থেকে বিমূখ হয়েছে তার চেয়ে বড় যালিম কে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।" (সুরা সাজদাহ ৩২:২২)

এসব ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী বা ভয় দ্বারা প্রভাবিতদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই । তবে যে ব্যক্তি নিরূপায় ও বাধ্য তার কথা ভিন্ন । এগুলো সবই অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সচরাচরই ঘটে থাকে । মুসলিমদের উচিত এগুলোতে পতিত হওয়ার আশংকায় ভীত এবং সতর্ক থাকা । যে সব কাজ আল্লাহর ক্রোধ এবং তার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে অপরিহার্য করে দেয় সেগুলো থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ।

তাওহীদের মর্মকথা

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ
জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الأنبياء : ٢٥)

অর্থ: "আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।"

সুরা আম্বিয়া ২১:২৫

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (النحل : ٥١)

অর্থ: "আর আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।"

সূরা নহল ১৬:৫১

চতুর্থ অধ্যায়ঃ তাওহীদের মর্মকথা

প্রশ্নঃ দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত দু'টি বিষয় কি কি?

উত্তরঃ দ্বীনের দুটি ভিত্তি ও মূলনীতি হচ্ছে (نفي) নাফী ও (اثبــات) ইসবাত অর্থাৎ ‘‘ত্বাগুতকে বর্জন করা এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।”

দ্বীনের ভিত্তি ও মূলনীতি নাফি (না বোধক) ও ইছবাত (হ্যাঁ বোধক) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাইখ আলী আল খুদাইর তাওহীদ প্রসংগে বলেন, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব সাব্যস্তকরন দুটি জিনিসকে ওয়াজিব করেঃ

১। নাফি, সমস্ত ব্যক্তি এবং বস্তুর ইবাদতকে অস্বীকার করা (লা ইলাহা- কোন কিছুরই ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা নেই) অর্থাৎ সবকিছুকে না করা।

২। ইছবাত, আল্লাহর জন্য পরিপূর্নভাবে তা (ইবাদতকে) সাব্যস্ত করা (ইল্লা আল্লাহ- আল্লাহ ব্যতীত) (আত্ তাওহীদ ওয়া তাতিম্মাত' গ্রন্থে)

لَا اِلَـــهَ 'লা ইলাহা' মানে সকল বাতিল ইলাহ কে বর্জন, اِلَّـــا اللهُ 'ইল্লাল্লাহু' মানে শুধু আল্লাহকে গ্রহণ।

لَا اِلَهَ 'লা ইলাহা' মানে تَخْلِيَـــةٌ – সকল غَيْـــرُ اللهِ থেকে নিজেকে মুক্ত করা, আর اِلَّا اللهُ 'ইল্লাল্লাহু' মানে تَحْلِيَةٌ – শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

لَا اِلَهَ 'লা ইলাহা' সকল غَيْرُ اللهِ এর نَفِـــىْ আর اِلَّـــا اللهُ 'ইল্লাল্লাহু' মানে শুধু আল্লাহর اِثْبَاتٌ।

এখানেই কাফিরদের/মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের মূল পার্থক্য। কাফিররা আল্লাহকে ও মানে আবার দেব-দেবী ও মূর্তিও মানে। তাই একদিকে আল্লাহর ইবাদত করতো আবার অপর দিকে খানায়ে কাবা ও তার আশ-পাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপনও করে ছিল। এজন্য কাফিরদের সঙ্গে আমাদের الا الله নিয়ে কোন বিরোধ নাই, বিরোধ হচ্ছে لا اله নিয়ে।

এ জন্যেই বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক পীর সাহেবদেরকে দেখা যায়, তারা মুরীদদের কে শুধু الا الله যিকির করায় আবার কেউ لا اله আস্তে الا الله জোরে যিকির করায়, আবার কেউ الا الله আগে لا الـــه পরে যিকির করায় যাতে কাফির, মুশরিক এবং শয়তানরা শুনে ক্ষেপে না যায়।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আঃ ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, দ্বীনের মূলনীতি দু'টি বিষয়ঃ

প্রথমতঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেয়া যার কোন অংশীদার নেই। এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করা। এ নীতির ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এটির বর্জনকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা।

দ্বিতীয়ত : শিরককে পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর ইবাদতে শিরকের বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করা। এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা। এ নীতির ভিত্তিতে (বারাআহ) বৈরীতা স্থাপন করা। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা। (আদ দুরার আসসানিয়্যাহ ২/২২)

প্রশ্নঃ দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো দালীল প্রমানসহ আলোচনা করুন?

উত্তরঃ মূলনীতি ও ভিত্তির অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো দ্বীনের ভিত্তি ও মূলনীতি ইছবাত (হ্যা বোধক) ও নাফি (না বোধক) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম মূলনীতিগুলো হচ্ছে হ্যা বাচক এবং দ্বিতীয় মূলনীতিগুলো না বোধক। হ্যা বাচক এবং না বাচক দু'টি বিষয়ের প্রত্যেকটির রয়েছে চারটি করে প্রয়োজনীয় দিক। গুরুত্ব ও জরুরতের দিক থেকে প্রথমটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন, অত:পর দ্বিতীয়টি, অত:পর তৃতীয়টি অত:পর চতুর্থটি গুরুত্বপূর্ন।

ইমাম আব্দুর রহমান ইবন হাসান আল শাইখ রহ. বলেন, ‘‘এই মূলনীতি ও ভিত্তি সমূহের দালীল কুরআনে এতই বেশী যে তার সংখ্যা নিরূপন করা যাবে না।” (আদ দুরার আসসানিয়্যাহ ২/২০৩)

ইছবাত বা হ্যা বাচক মূলনীতিঃ এর রয়েছে ৪ টি প্রয়েজিনীয় দিক, প্রথম দু'টি স্বয়ং তাওহীদের বিষয়ে আর শেষ দু'টি তাওহীদের লোকদের বিষয়ে।

ক) একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেয়া যার কোন অংশীদার নেই

আল্লাহ (সুবঃ) নির্দেশ দিয়েছেন,

قُلْ يَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلَمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ ٱللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُــواْ ٱشْــهَدُواْ بِأَنَّــا مُسْلِمُونَ

অর্থ: “বলুন: ‘হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কাউকে রব বা পালনকর্তা বানাব না।’ তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, ‘সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম।” (সুরা আল ইমরান ৩:৬৪) তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوٓاْ إِلاَّ إِيَّاهُ

অর্থ: “তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না।” (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:২৩) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (يوسف : ٤٠)

অর্থ: “আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” (সুরা ইউসুফ ১২:৪০)

প্রয়োজনীয় এ প্রথম বিষয়টি হ্যাঁ-বাচক মূলনীতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন।

খ) এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً

অর্থ: “তার চাইতে উত্তম দ্বীন কার? যে আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করে, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।” (সুরা নিসা ৪:১২৫) পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে:

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [القصص/٧١-٧٣)

অর্থ: “তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে, তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” (সুরা কাসাস ২৮:৭০-৭৩)

রাসুল (সা:) সীরাত থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে তিনি কুরবানীর স্থানে, বাজারে, লোকসমাগমে যেতেন এবং লোকদেরকে তাওহীদকে আঁকড়ে ধরতে আহ্বান জানাতেন, লোকদেরকে এই জন্য উৎসাহিত করতেন এই বলে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا ‘ইয়া আইয়্যুহান নাসু কূলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তুফলিহু’ অর্থাৎ ‘হে লোকসকল বল, আল্লাহ ছাড়া কোন ইবাদতযোগ্য ইলাহ নেই, তোমরা সফলকাম হবে।’ (মুসনাদে আহমদ ১৬০২৩; সুনানে বায়হাকী ৩৬১)

প্রয়োজনীয় এ বিষয়টি হ্যাঁ বাচক মূলনীতির প্রথম বিষয়টির পরেই এর সরাসরি গুরুত্ব।

গ) এ নীতির ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এই বিষয়টি সুস্পষ্ট আল্লাহর কথা থেকে। আল্লাহ বলেন, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ “আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের আউলিয়া (বন্ধু)।” (সুরা তাওবাহ ৯:৭১) তিনি আরও বলেন,

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থ: "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অত:পর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অত:পর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার।" (সুরা আল ইমরান ৩:১০৩) রাসুল (সা:) বলেন,

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

অর্থ: "আবু মুসা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, মুমিনদের একে অপরের উদাহরন যেন একটি বিল্ডিং এর মত, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। (সহীহ বুখারী ৪৮১; সহীহ মুসলিম ৬৭৫০; সুনানে তিরমিজি ১৯২৮; সুনানে নাসায়ী ২৫৫৯) রাসুল (সা:) আরও বলেন,

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (صحيح البخاري)

অর্থ: "আনাস (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণনা করেন: তোমাদের কেউ ততক্ষন ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষন সে অপরের জন্য তাই ভাল না বসে যা সে তার নিজের জন্য ভালবাসে।" (সহীহ বুখারী ১৩; সহীহ মুসলিম ১৭৯; সুনানে তিরমিজি ২৫১৫)

হ্যাঁ বাচক মূলনীতির তৃতীয় এ বিষয়টির গুরত্ব সরাসরি দ্বিতীয় মূলনীতির পরে।

ঘ) এটির বর্জনকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা। আল্লাহ (সুব:) নির্দেশ দেন:

قُلْ يَٰأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ– لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

অর্থ: "বলুন, হে কাফেরগন! আমি ইবাদত করিনা, তোমরা যার ইবাদত কর।" (সুরা কাফিরুন: ১-২) পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থ: "ইব্‌রাহীম ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমরা তোমাদেরকে মানি না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চির শত্রুতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।" (সুরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে হাসান (রহ) বলেন, একজন ব্যক্তি কখনই মুওয়াহহিদ হতে পারবে না তিনটি কাজ করা ব্যতিত। **এক:** শিরককে পুরোপুরি বর্জন করা। **দুই:** এটা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া। **তিন:** যে এটা করে তাকে কাফের ঘোষনা করা। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ২/২০৪)
তিনি আরো বলেন, একজনের তাওহীদ পূর্ন হবে না যতক্ষন না মুশরিকদের থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের সাথে শত্রুতা না করবে এবং তাদেরকে কাফের বলে ঘোষনা না দিবে। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ১১/৪৩৪) হ্যাঁ বাচক এই চতুর্থ দিকটির গুরুত্ব সরাসরি তৃতীয়টির পরে।

২) না বোধক মূলনীতি: এর চারটি প্রয়োজনীয় দিক রয়েছে। প্রথম দু'টি শিরকের ব্যাপারে এবং শেষ দু'টি শিরকের লোকদের ব্যাপারে।
ক) শিরককে পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর ইবাদতে শিরকের বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করা। আল্লাহ (সুব:) তাঁর নাবী (সা:) কে নির্দেশ দিয়েছেন,

قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ

অর্থ: "বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন।" (সুরা রাদ ১৩:৩৬) আরও বলেছেন,

إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ– أَن لاَّ تَعْبُدُوٓاْ إِلاَّ ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ

অর্থ: "নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি।" (সুরা হুদ ১১:২৫-২৬) হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে প্রশ্ন করলাম, "হে আল্লাহর রাসুল! সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি?" রাসুল (সা:) বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা, অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সহীহ বুখারী ৪৪৭৭, সহীহ মুসলিম ২৬৭) না বাচক দিকের প্রথম এই বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন।

খ) এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা। আল্লাহ (সুব:) নির্দেশ দিয়েছেন:

فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

অর্থ: "মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক।" (সুরা তাওবাহ ৯:৫) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه

অর্থ: "আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা (শিরক) অবশিষ্ট থাকে; এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (সুরা আনফান ৮:৩৯) হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

অর্থ: "ইবন ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন "আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার যতক্ষন পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) হলেন আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। অত:পর যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে তাহলে তা ভিন্ন। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ (সুব:) এর নিকট।"(বুখারী হা:-২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম হা: ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ তিরমিযী হা:৩৩৪১,নাসাঈ হা:২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১–৩০৯৫, আবু দাউদ হা:-১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮ ইবন মাযাহ হা: ৭১,৭২,৩৯২৭–৩৯২৯) আল্লাহ ঈমানদারদের নির্দেশ দিয়েছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } [التوبة: ١٢٣)

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক্ আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (সুরা তাওবাহ ৯:১২৩)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (র:) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, কুফফারদেরকে হত্যা করার জন্য, তাদেরকে রেইড দেয়ার জন্য, তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাটিতে ওঁৎ পেতে থাকার জন্য যতক্ষন না তারা শিরক থেকে তাওবাহ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে। সকল সালফে সালেহীনগণ এবং সকল মাযহাব এর ইমামগন এবং ফুকাহাদের এই ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে । (ফাতওয়া আল আইম্মাহ আল নাজদিয়্যাহ ২/৪৭২)

এবং ইমাম (র:) আরও বলেন, 'ত্বাগুতকে বর্জন করা'র অর্থ ও দাবী হচ্ছে আপনি নিজেকে সেসব কাফেরদের থেকে মুক্ত করবেন যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে জ্বীন, গাছ, পাথর এবং অন্য যেকোন কিছুর ইবাদত করে এবং আপনি তাদেরকে কাফের বলে ঘোষনা দিবেন, তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষনা দিবেন, তাদেরকে ঘৃনা করবেন, এমনকি যদিও তারা আপনার বাবা বা ভাই হয় তবুও। (আদ দুরার আস সনিয়্যাহ ২/১১১-১১২)
না-বাচক মূলনীতির এই দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় দিকটির গুরুত্ব প্রথম বিষয়ের পরে।

গ) এ নীতির ভিত্তিতে বৈরীতা স্থাপন করা। ইবরাহীম (আ:) বলেন,

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ – أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ – فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِـي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: "ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? বিশ্বপালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু।" (সুরা শুয়ারা ২৬:৭৫-৭৭)
ইবরাহীম (আ) আরও বলেছিলেন,

{وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا} [مريم: ٤٨]

অর্থ: "আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদেরকে।" (সুরা মারইয়াম ১৯:৪৮) আল্লাহ (সুব:) আমাদের হুকুম করেছেন:

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا

অর্থ: "তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না।" (সুরা আন নিসা ৪:৮৯) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّـهُ بِأَيْـدِيكُمْ
"যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন।" (সুরা তাওবাহ ৯:১৪)

শাইখ আলী আল খুদাইর বলেন, শত্রুতার ধরনগুলো হচ্ছে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষনা দেয়া, তাদেরকে পরিত্যাগ করা, অভিশাপ দেয়া, উপহাস করা, হত্যা করা, বন্দী করা, বহিষ্কার করা ইত্যাদি।

শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (র:) বলেন, আপনাদের যাদেরকে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা রহমত করেছেন, যারা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা নেই, এটা ভেবো না যে যদি তুমি বল, 'এই তাওহীদ সত্য এবং আমি শিরককে পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু আমি মুশরিকিনদের বিরোধিতা করি না, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলি না" তাহলে তুমি ইসলামের মধ্যে থাকবে না। বরং তুমি বাধ্য তাদেরকে ঘৃনা করতে, তাদেরকে যারা পছন্দ করে তাদেরকেও ঘৃনা করতে, তাদেরকে উপহাস করতে এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখতে, যেমন তোমার পিতা ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর সাথীরা বলেছিলেন:

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থ: "আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চির শত্রুতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।" (মুমতাহিনা ৬০:৪) (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ২/১০৯) তৃতীয় এই বিষয়টির গুরুত্ব দ্বিতীয় বিষয়টির পরে।

ঘ) যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা। আল্লাহ (সুব:) রাসূলুল্লাহ (সা:) কে তাকফীর করতে নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে: قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ "(হে নবী) আপনি বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।" (সুরা যুমার ৩৯:৮)
ইবরাহীম (আ) তাঁর জাতির লোকদের তাকফীর করেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে:

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا

অর্থ: “আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য।” (মুমতাহিনা ৬০:৪) (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ২/১০৯)

রাসুলূল্লাহ (সা:) কে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন, বলুন, হে কাফেরকূল! আমি ইবাদত করিনা, তোমরা যার ইবাদত কর। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে। (সুরা কাফিরুন)

ইমাম আব্দুর রহমান বিন হাসান (র:) বলেছেন, আল্লাহ অগনিত আয়াতে শিরকের লোকদের ‘কাফির’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং কাফেরদের তাকফীর করা ওয়াজিব, যেহেতু কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর এটি একটি অন্যতম দিক। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ২/২০৫)
ইমাম সুলাইমান ইবন আব্দিল্লাহ (র:) বলেন, যে ব্যক্তি সেই মুশরিকিনদের তাকফীর করতে অস্বীকার করে যারা কালিমা উচ্চারণ করে (অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে মুসলিম দাবি করলেও অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে না) এবং তাদের ব্যাপারে বলে যে, ‘তারা কাফের নয় বরং অন্য কিছু’। তাহলে মূলত সে তাদেরকে মুসলিমই বললো। কারণ কুফরী এবং ইসলামের মধ্যবর্তী কিছু নেই। সুতরাং যদি তারা কাফের না হয় তবে তারা মুসলিম। আর যে ব্যক্তি কুফর কে ইসলাম বলে অথবা কাফের কে মুসলিম বলে সে কাফের হয়ে যায়। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ৮/১৬১)
এবং না বোধক মূলনীতির এই চতুর্থ বিষয়টির গুরুত্ব তৃতীয় বিষয়টির পরে।
সুতরাং এই ইছবাত (ইতিবাচক) এবং নাফি (নেতিবাচক) বিষয়গুলোকে একত্রে দ্বীনের ভিত্তি এবং মূলনীতি বলা হয়, যাকে মিল্লাতে ইবরাহীম ও বলা হয়।

প্রশ্ন: দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্গত এই বিষয়গুলো কিভাবে জানা গেল?
উত্তর: এই মূলনীতি গুলো জানা গিয়েছে নাবী রাসুলদের দাওয়াতের মাধ্যম, এবং তাদের সবার এই একই দাওয়াত ছিল। আল্লাহ (সুব:) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦)

অর্থ: “আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।” (সুরা নাহল ১৬:৩৬)
সুতরাং সমস্ত নাবী এবং রাসুলরাই তাদের জাতিকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর। আল্লাহ (সুব:) আরও বলেছেন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة/٢٥٦)

অর্থ: “যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়।” (সুরা বাকারা ২:২৫৬)
উপরোক্ত আয়াতে নেতিবাচক দিক হচ্ছে- **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّــاغُوت** এর মধ্যে রয়েছে “কারোরই ইবাদতের যোগ্যতা নেই”

ইতিবাচক দিক হচ্ছে, **وَيُــؤْمِنْ بِاللَّـــه** এর মধ্যে রয়েছে “একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত”। আর এটাই মূলত: তাওহীদের কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দ্বারা বোঝায়। সুতরাং প্রত্যেক নাবী এবং রাসুল নাফি (কারোরই ইবাদত যোগ্যতা নেই) এবং ইছবাত (একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত) নিয়ে আগমন করেছেন। এবং এটিই হচ্ছে তাওহীদের কালিমা, যা হচ্ছে এই কথার সমান- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগুতকে বর্জন কর। এবং এটিই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি।

তাওহীদ

প্রশ্ন: তাওহীদ কি?

উত্তর: তাওহীদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ একীকরণ (কোন কিছু এক করা) অথবা দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষণা করা এবং এটার উৎপত্তি আরবী وَحَّـــدَ 'ওয়াহহাদা' শব্দ হতে যার অর্থ এক করা, ঐক্যবদ্ধ করা অথবা সংহত করা। কিন্তু যখন তাওহীদ শব্দটি আল্লাহর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ সম্পর্কিত মানুষের সকল পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর্মকান্ডে আল্লাহর এককত্ব উপলব্ধি করা ও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অক্ষুন্ন রাখা বুঝায়। সালফে সালেহীনগন তাওহীদকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-

তাওহীদ হল- কায়মনোবাক্যে এ সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষন করা যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও একক, অদ্বিতীয়, নিরুপম, সমকক্ষহীন, তুলনাহীন। তিনি ব্যক্তিসত্ত্বা, কর্মরাজি, সুন্দর নামসমূহ, গুনাবলী এবং ইবাদতের সার্বভৌম অধিকারে সম্পূর্ন এক ও একক। তেমনিভাবে তিনি একত্বের অধিকারী সৃষ্টিকর্মে ও নির্দেশদানে। (শরহুল আক্বিদাহ আত্ তাহাবিয়্যাহ)

তাওহীদ হচ্ছে- আল্লাহর লেশমাত্র দোষহীন, পরিপূর্ন গুনরাজিতে আল্লাহর একত্বের হৃদয়গত ইলম ও বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। (কিতাবুত তাওহীদ, মু: বিন আ: ওয়াহহাব)

তাওহীদ হচ্ছে- একমাত্র সত্য মা'বুদের জন্যে একমাত্র সত্য দ্বীন ও ঈমানের পথে একাভিমুখী বান্দাহ হয়ে যাওয়া। (মাজমুওত তাওহীদ, ইবনিল কায়্যিম রহঃ)

প্রশ্ন: তাওহীদ শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে?

উত্তর: প্রকৃতপক্ষে তাওহীদ শব্দটি কোরআনে অথবা রাসূল (সা:) এর বাণীর (হাদীস) কোথাও সরাসরি উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও, নবম হিজরী সনে রাসূল (সা:) যখন মুআয ইবনে যাবাল (রা:) কে ইয়েমেনে গভর্ণর করে পাঠালেন তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি খৃষ্টান ও ইহুদী (আহলে কিতাবদের) কাছে যাবে, কাজেই তুমি প্রথমেই তাদের কাছে আল্লাহ এর এককত্ব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করবে يُوَحِّـــدُوا اللَّـــهَ (ইউওয়াহহিদু আল্লাহ)। (সহীহ বুখারী ৭৩৭২)

এই হাদীসে নবী (সা:) যে ক্রিয়ার বর্তমান কাল রূপ ব্যবহার করেছেন, সেই ক্রিয়ার বিশেষ্য হতে তাওহীদ শব্দটির উৎপত্তি।

প্রশ্ন: কালিমাতুত তাওহীদ তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর গুরুত্ব ও মর্যাদা কি?

উত্তর: لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ এর গুরুত্ব যে কত অপরিসীম, এর মর্যাদা যে কত উচ্চ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা এ কালেমার গুরুত্ব এবং মর্যাদা তুলে ধরছি।

☞ لَا اِلَـــهَ اِلَّـــا اللهُ এটি ইসলামের মূল কালেমা। এর স্বাক্ষ্য দানই ইসলামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা। এ হচ্ছে এমন এক কালেমা যা মানুষের ঈমান এবং কুফরীর মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

☞ নাবী-রাসুলদের মূল দাওয়াতই ছিল لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ এর দিকে আহ্বান করা, যাদেরকে আল্লাহ (সুব:) মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

☞ কালেমা لَا اِلَـــهَ اِلَّـــا اللهُ ইসলামের মূল ভিত্তি। ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে শাহাদাতাইন বা দুটি বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া। প্রথম যে বিষয়ে স্বাক্ষ্য দিতে হয় তা হচ্ছে لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ ।

☞ কালেমা لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা।

☞ কালেমা لَـــا اِلَـــهَ اِلَّـــا اللهُ কে মেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী কাজ করা, বান্দার প্রতি আল্লাহর হাক্ব।

☞ এ কালেমার দাবী অনুযায়ী কাজ করার জন্য আল্লাহ (সুব:) মানুষ এবং জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ কালেমার স্বীকৃতির মাধ্যমে বান্দাহ্ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্বকে মেনে নেয়।

☞ لَا اِلَهَ اِلَّـــا اللهُ এমন এক মহান কালেমা যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ (সুব:), ফেরেশতা এবং যারা জ্ঞানবান তারা দিয়েছেন। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران : ١٨]

অর্থ: "আল্লাহ্ স্বাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন হক্ ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানবান লোকেরা সততা ও ইনসাফের সাথে এ স্বাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহা পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞানী ছাড়া কেহই ইলাহ হতে পারে না।" (সুরা আল ইমরান ৩:১৮)

☞ এ কালেমার স্বীকৃতি দেওয়া না দেওয়ার উপরই নির্ভর করে বান্দার সফলতা ব্যর্থতা। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: "যে ব্যক্তি لَـــا اِلَـــهَ اِلَّـــا اللهُ এর নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (সহীহ মুসলিম ১৫২)। রাসূলুল্লাহ (সা:) আরও বলেন, "আল্লাহ (সুবঃ) ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ উচ্চারণ করেছে।" (সহীহ বুখারী ৬৪২২)

প্রশ্ন: তাওহীদের উপকারিতা কি?

উত্তর: মানুষের একক ও সমষ্টিগত জীবনে لَا اِلَـــهَ اِلَّـــا اللهُ র সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে যখন সত্যিকার তাওহীদ আসবে তখন অতীব সুন্দর ফল পাওয়া যাবে। তাওহীদের উপকারিতা অনেক, তার মধ্যে আছে:

১. তাওহীদ মানুষকে অপরের দাসত্ব এবং গোলামী থেকে মুক্ত করে প্রকৃত বিনিময়দাতা ও একমাত্র লাভ-ক্ষতির মালিক আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনে।

২. তাওহীদ সঠিক ব্যক্তিত্ব গড়তে সহায়তা করে। মানুষ এতে সঠিকভাবে জীবন গঠন করতে পারে এবং সত্যিকারের দিক নির্দেশনা পায়। তার লক্ষ্য বস্তুকে নির্দিষ্ট করে দেয়। কারণ সে বুঝে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

৩. তাওহীদ হচ্ছে মানুষের জীবনে নিরাপত্তার ভিত্তি। কারণ, এর দ্বারাই সে নিরাপত্তা ও শান্তি পায়। সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।

৪. তাওহীদ হচ্ছে মানুষের মনের শক্তির উৎস। তা তাকে মানসিক শক্তি যোগায়। ফলে তার অন্তর আল্লাহ্ হতে প্রাপ্তির আশায় ভরে যায়।

৫. তাওহীদ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব এবং একতার বন্ধনের মূল।

প্রশ্ন: তাওহীদ তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ফাযীলত কি?

উত্তর: لَا اِلَـــهَ اِلَّـــا اللهُ এর সাক্ষ্য যে ব্যক্তি প্রদান করে সে মুসলিম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সর্বোত্তম জিনিস ঈমান অর্জণ করে। لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ তথা তাওহীদ এর অনেক ফযীলত। সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে কিছু ফযীলতের কথা আমরা তুলে ধরছি-

এক: তাওহীদের এ কালেমা জান্নাতে প্রবেশ করায়। আল্লাহর রাসুল বলেন,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: "যে ব্যক্তি মারা গেল এ অবস্থায় যে সে জানে আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম ১৪৫)

দুই: لَا اِلَهَ اِلَّـــا اللهُ এমন মহান কালেমা যা জাহান্নামকে হারাম করে দেয়। আল্লাহর রাসুল (সা:) বলেন:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ

অর্থ: "যে কেউ অন্তর হতে সত্য সহকারে এ কালেমার স্বাক্ষ্য প্রদান করবে যে, (আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ ইলাহ নেই) এবং মুহাম্মদ (সা:) তাঁর রাসুল আল্লাহ তাঁর উপর জাহান্নমের আগুন কে হারাম করে দিবেন।" (সহীহ বুখারী ১৫১)

তিন: কিয়ামতের কঠিন এবং ভয়াবহ মূহূর্তে তাওহীদের এ কালিমার সাক্ষ্যদানকারীর জন্য নবী (সা:) সুপারিশ করবেন। প্রিয় নবী (সা:) ইরশাদ করেন:

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ

অর্থ: "আমার শাফাআত পেয়ে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করবে ঐ ব্যক্তি যে তার অন্তর থেকে খালেসভাবে বলবে لا اله الا الله (সহীহ বুখারী ৯৯)

চার: এ কালেমার যিকির সর্বোত্তম যিকির। নবী (সা:) বলেন- أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ "সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে لَا اِلَـــهَ اِلَّـــا اللهُ। (সুনানে তিরমিজি ৩৩৮৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৮০০)

পাঁচ: এ কালেমা যে স্বীকার করে নেবে এবং শিরক মুক্ত থাকবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। প্রিয় নবী (সা:) বলেন, " "আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার যতক্ষন পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) হলেন আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। অত:পর যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে তাহলে তা ভিন্ন। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ (সুব:) এর নিকট।"(বুখারী হা:-২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম হা: ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ তিরমিযী হা:৩৩৪১,নাসাঈ হা:২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১- –৩০৯৫, আবু দাউদ হা:-১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮ ইবন মাযাহ হা: ৭১,৭২,৩৯২৭–৩৯২৯)

ছয়: **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ** আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ দেয় এবং গুনাহ মাফ করায়। নবী (সা:) এর হাদীসে এসেছে:

مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ

অর্থ: "যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নাই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সা:) তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। আর ঈসা (আ:) আল্লাহর দাস এবং আল্লাহর (সুব:) ঐ কথা যা মরিয়ম (আ:)- এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি ঈসা (আ:) আল্লাহ্ হতে প্রেরিত রূহ, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য- তবে তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে জান্নাতের আটটি দরজার যে কোন দরজা দিয়েই ইচ্ছে করলে প্রবেশ করতে পারবে।" (সহীহ মুসলিম ১৪৯)

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ يَابْنَ آدَمَ ! إنك لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لقيتني لا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ (সুব:) বলেছেন: হে আদম সন্তান! যদি তুমি কোন শির্ক না করে আমার সামনে দুনিয়া ভরতি পাপরাশি সহ হাজির হও, তবে আমি তোমাকে দুনিয়া ভরতি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব।"(সুনানে তিরমিযী ৩৫৪০)

এই সমস্ত হাদীসসমূহ তাওহীদের ফযীলত প্রকাশ করছে। মানুষের সুখের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় কাজ। তার গুনাহ মাফের জন্য এবং তার ভুলভ্রান্তি মুছে ফেলার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় অছিলা।

তাওহীদের প্রকারভেদ

প্রশ্ন: তাওহীদ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর: তাওহীদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তা হচ্ছে-

১) তাওহীদ আর-রবুবিয়্যাহ (প্রতিপালকের এককত্ব অক্ষুন্ন রাখা)

২) তাওহীদ আল-আছমা ওয়াছ ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর এককত্ব বজায় রাখা)

৩) তাওহীদ আল-ইবাদাহ (উলুহিয়্যাহ) (আল্লাহর ইবাদতের এককত্ব বজায় রাখা)

প্রশ্ন: 'রব' মানে কি?

উত্তর: কুরআনে অনেক জায়গায় রাব্বুল আলামীন বা বিশ্বজাহানের রব বলা হয়েছে। 'রব' এমন একটি শব্দ যা অন্য ভাষায় এক শব্দে যথাযথ অনুবাদ করা সম্ভব নয়। সাধারনভাবে যদিও রব মানে প্রতিপালক করা হয় কিন্তু রব মানে- প্রভু, স্রষ্টা, সত্বাধিকারী. ব্যবস্থাপক, পরিচালক, পরিকল্পনাকারী. পরিচর্যাকারী, নিরাপত্তা দানকারী ইত্যাদি।

প্রশ্ন: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: রুবুবিয়্যাহ বা প্রভূত্বের তাওহীদ : তা হচ্ছে আল্লাহর কার্যাবলী, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় তাকে একক বিশ্বাস করা। যেমন সৃষ্টি, মালিকানা, রিযিকদান, জীবন-মৃত্যু দান, সমগ্র রাজ্য ও বিষয়াদি নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করা, সার্বভৌমত্ব, আইন-বিধান দান, উপকার-অপকারের ক্ষমতা, বিপদ-সংকট থেকে পরিত্রান দেয়া ইত্যাদির অধিকার ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর এ বিশ্বাস করা এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁর বিন্দুমাত্র শরীক নেই।

আধুনিক বস্তু বিজ্ঞানে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা কত সুন্দরভাবেই না ফুটে উঠেছে। সবুজ জীবনময় পৃথিবী তল তারই রুবুবিয়্যাতের এক সাগড় দয়ার নিদর্শণ। সূর্য রশ্মিকে উদ্ভিদ জগতের উপর ফেলে সালোক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তিনিই তৈরী করছেন প্রাণী জগতের জন্য খাদ্য ভান্ডার। বান্দাদের দুয়ারে দুয়ারে রিযিক পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন গভীর সমুদ্রে নিম্ন চাপ। তার সাহায্যে দমকা হওয়া

সৃষ্টি করে উদ্ভিদের পুরুষ পরাগ রেণুকে নারী পরাগ রেণুর সাথে সম্মিলিত করছেন। যে সম্মিলনের ফল হল সুস্বাদু বিচিত্র রকমের ফল-মূল, শস্য-দানা আরও কত কী! চির বাষ্পস্বভাব পানি রাশিকে হাউড্রোজেন চেইন লাগিয়ে তিনিই করেছেন তরল। যাতে তাঁর বান্দারা সুমিষ্ট-সুশীতল পানি পান করে প্রাণ রক্ষা করতে পারে। মৃত এমাইনো এসিডে তিনিই সঞ্চার করেছেন তাঁর নির্দেশিত প্রাণ। সহস্র সহস্র কম্পিউটার বেস স্ক্যানার সমতুল্য নয়নযুগল তাঁরই রূবুবিয়্যাতের এক মহা নিদর্শণ। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র শ্রুতিযন্ত্র বিশিষ্ট দুটো কান তাঁরই বান্দাহ পালনের বার্তাবাহক নয় কি? বস্তুত মহা বিশ্বটি একটি মহা কম্পিউটার। যার স্রষ্টা ও নির্মাতা হলেন মহান রাব্বুল আলামীন, যা অকল্পনীয় সুক্ষতায় তাঁরই প্রোগ্রাম ও নির্দেশে চলমান। দ্বিতীয় কারো হস্তক্ষেপ হলে চোখের পলকেই ধ্বংস নেমে আসত মহাবিশ্ব জুড়ে। ইরশাদ হচ্ছে:

{فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [يس : ٨٣)

অর্থ: "পবিত্রতা সেই মহান সত্তার যাঁর হাতে রয়েছে বস্তু নিচয়ের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও স্বত্বাধিকার। আর তোমরাতো তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। (সুরা ইয়াসিন ৮৩) তাই মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনায় অপর কারো কর্তৃত্ব হস্তক্ষেপের সাংঘর্ষিক বিশ্বাসে তাওহীদুর রূরুবিয়্যাহকে ধ্বংস করলে তা হবে এক বিরাট জুলুম ও অমার্জনীয় অত্যাচার। রুবুবিয়্যাতের অন্তর্ভূক্ত কিছু বিষয় নীচে কুরআন থেকে উল্লেখ করা হল-

সৃষ্টি :

{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } [الزمر: ٦٢)

অর্থ: "আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা।" (সুরা যুমার ৬২)

রিযক্ বা জীবিকা:

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِـــي كِتَابٍ مُبِينٍ } [هود: ٦)

"আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিয়েছেন তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।" (সুরা, হুদ ১১:৬)

কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব :

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" (সুরা আল ইমরান ৩:২৬)

জীবন ও মৃত্যু :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।" (সুরা মুলক ৬৭:২)

আইন বিধান দান :

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

"আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সুরা ইউসূফ ১২:৪০)

সন্তান প্রদান:

{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ } [الشورى: ٤٩]

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। (সুরা শুরা ৪২:৪৯)

{أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ }

অর্থ: "অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।" (সুরা শূরা ৪২:৪৯-৫০)

কল্যান ও অকল্যান:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"আর আল্লাহ্ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খন্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত; তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।" (সুরা ইফনুস ১০:১০৭)

প্রভুত্ব/ প্রতিপালন:

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাঁর নিজের ব্যাপারে সর্বমোট ৪২ বার রাব্বুল আলামীন বা বিশ্ব জাহানের রাব্ব বলে পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন: তাওহীদ আল আছমা ওয়াস সিফাত বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: তাওহীদ আল আছমা ওয়াস সিফাত অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর ক্ষেত্রে এককত্ব। তা হচ্ছে এই যে, কোরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুনাবলী উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোকে কোন বিকৃতি, বিলুপ্তি, ধরণ পদ্ধতি, অপব্যাখ্যা ও তুলনা উপমা ছাড়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়া। কোন অবস্থাতেই আল্লাহর গুণ অস্বীকার করা, এসবের বিকৃত অর্থ করা, উপমা ও ধরণ বর্ণনা করা যাবে না। চাই গুণাবলীগুলো আচরণগত হোক চাই সত্ত্বাগত। যেমন আরশে সমুন্নত হওয়া, কথা বলা, ভালবাসা, রাগ করা, হাসা, আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, চক্ষু, মুষ্টি, আকার আকৃতি ইত্যাদি। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

"বল আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো ঔরসে জন্মও নেননি। তার সমতুল্য কেউ নেই।" (সুরা ইখলাছ) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأعراف/١٨٠)

তিনি আরোও বলেন: "আল্লাহর উত্তম নামসমূহ রয়েছে। অতএব, তোমরা তাকে এসব নামের অসীলায় ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে (বিকৃতি ঘটিয়ে)। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই পাবে।" (সুরা আ'রাফ ৭:১৮০) আল্লাহ (সুব:) আরো বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى/١١)

অর্থ: "তার মতো কোন কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সুরা শূরা ৪২:১১)

তাওহীদ আল আছমা ওয়াস সিফাত এর প্রধান কয়েকটি শর্ত রয়েছে-

১) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখার প্রথম শর্ত হ'ল, কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা:) আল্লাহর যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া আর কোনভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না।

২) তাওহীদ আল্-আছ্মা ওয়াস-সিফাত এর দ্বিতীয় রূপ হল আল্লাহর উপর কোন নতুন নাম ও গুণাবলী আরোপ না করে তিনি নিজেকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবেই তাঁকে উল্লেখ করা। উদাহরণস্বরূপ, যদিও তিনি বলেছেন যে তিনি রাগ করেন তথাপি তাঁর নাম আল্-গাদিব (রাগী জন) দেয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ বা তাঁর রাসুল (সা:) কেউ এই নাম ব্যবহার করেননি।

৩) তাওহীদ আল্-আছ্মা ওয়াছ-ছিফাত এর তৃতীয় শর্ত অনুযায়ী আল্লাহকে কখনোই তাঁর সৃষ্টির গুণাবলি দেয়া যাবে না।

৪) আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করতে কোরআনের আয়াতকে মৌলিক নিয়ম হিসাবে অনুসরণ করতে হবে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সুরা শুরা ৪২: ১১) যেমন, শ্রবণ ও দর্শন মানুষের গুণাবলী কিন্তু যখন তা স্রষ্টার উপর আরোপিত করা হয় তখন সেগুলি

তুলনাবিহীন এবং ত্রুটিমুক্ত। যাহোক এই গুণাবলী মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চোখ ও কান অপরিহার্য, যা স্রষ্টার জন্য প্রযোজ্য নয়। স্রষ্টা সম্বন্ধে মানুষ কেবলমাত্র ততটুকুই জ্ঞাত যতটুকু তিনি তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং, মানুষ এই সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য।

৫) তাওহীদ আল্-আছ্মা ওয়াছ্-ছিফাতের চতুর্থ রূপের জন্য প্রয়োজন মানুষের উপর আল্লাহর গুণাবলী আরোপ না করা।

৬) আল্লাহর নামের এককত্ব বজায় রাখার আরও অর্থ হ'ল যদি নামে আগে আব্দ' (অর্থ ভৃত্য অথবা বান্দা) সংযোজিত না করা হয় তাহলে তার সৃষ্টিকে আল্লাহর কোন নামে নামকরণ করা যাবে না। কিন্তু 'রাউফ' এবং 'রহিম' এর মত কিছু নাম মানুষের নাম হিসাবে অনুমোদিত। কারণ রাসুল (সা:) কে উল্লেখ করতে যেয়ে আল্লাহ এই ধরনের কিছু নাম ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন: আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় নিষিদ্ধ?

উত্তর: আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ তা হচ্ছে-

১. **تأويـــل** তা'বিল: পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীসের বিপরীত কোন আচরণ করাই হচ্ছে তা'বিল। যেমন: اسْـــتَوَي ইসতাওয়া (উর্ধ্বে আরোহণ, বসা) ইত্যাদির অর্থ ইসতাওলা করা বা শক্তি প্রয়োগে দখল করা।

২. **تعطيــــل** তা'তীল: তা হচ্ছে আল্লাহ্র কোন সিফাতকে (গুণ) অস্বীকার করা। যেমন: আল্লাহ্ (সুব:) আসমানের উপর আছেন। কিন্তু অনেকেই এটিকে অস্বীকার করে এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান।

৩. **تكيـــــف** তাকইফ: তা হচ্ছে আল্লাহ্র (সুব:) কোন গুণকে কোন নির্দিষ্ট আকারে চিন্তা করা। যেমন:- আল্লাহ্ (সুব) যে আরশের উপর আছে তা

তার অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। অথচ তিনি কিভাবে আরশের উপর আছেন তা কেউ জানে না।

৪. تمثيل তামছিল: তা হচ্ছে আল্লাহ্র (সুব) কোন গুণকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। যেমন:- আল্লাহ্ (সুব) প্রতি রাত্রে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর অবতীর্ণ হওয়া ও আমাদের কোন জায়গায় অবতীর্ণ হওয়া এক নয়।

৫. تفييد তাফবীদ: আকৃতি দেয়া, সালাফে সালেহীনদের মত আল্লাহ্র (সুব:) আকৃতির ব্যাপারে কোন কথা আসলে তা তারা বলতেন আমরা আকৃতি জানি না কিন্তু যে সমস্ত অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা বুঝি। যেমন আল্লাহর হাত, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর হাত আছে কিন্তু এর আকৃতি কেমন আমরা জানি না। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (র:) এর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো:

استوائه ونزوله ويده معلوم وكيفيته مجهول والايمان به واجب والسوال عنه بدعة

অর্থ: ইসতোয়া অর্থাৎ বসা বা উর্ধারোহণ এর অর্থ সবাই বুঝে, কিন্তু কিভাবে, তা কেউ জানে না। এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, আর এর কৈফিয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিদা'আত।

প্রশ্ন: তাওহীদ আল উলুহিয়্যাত বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: তাওহীদ আল উলুহিয়্যাত হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ হিসেবে গ্রহন করা, আল্লাহর জন্যই সমস্ত আত্মিক, মৌখিক এবং শারিরীক সকল প্রকারের ইবাদত নিবেদন করা। এটি হচ্ছে বান্দার কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে এক ও একক বলে মানা। একে তাওহীদ আল ইবাদাহও বলা হয়।

তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল তাওহীদ আল-ইবাদাহ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা। যেহেতু একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের প্রাপ্য এবং মানুষের ইবাদতের ফল হিসাবে একমাত্র তিনিই কল্যাণ মঞ্জুরী করতে পারেন, সেজন্য সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই করতে হবে।

একটি মানব হৃদয় প্রীতি ও ভালবাসার যে প্রান্তসীমায় পৌছতে পারে সেই প্রান্তসীমায় পৌছে প্রীতি হেতু ততটা বিনয় অবনত, বিগলিত হয়ে যাওয়া যতটা বিনয়ী ও বিগলিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব। এ চূড়ান্ত প্রণয় বিগলিত বান্দাহকেই বলা হয় 'আবদুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দাহ'।

ইবাদতরূপ পরম প্রণয় ও বিনয়ের লক্ষ্যেই জ্বীন ও মানবের সৃষ্টি। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات : ٥٦)

অর্থ: "আমি তো জ্বীন ও মানব জাতিকে আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সুরা যারিয়াত ৫১:৫৬)

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (র:) বলেন:

ليس العبادة غير توحيد المحبة # مع خضوع القلب والأركان

والحب نفس وفاقه فيما يحبه # وبغض ما لا يرتضي بجنان

ووفاقه نفس اتباعك أمره # والقصد وجه الله ذي الاحسان

অর্থ: "হৃদয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চুড়ান্ত বিনয়ের সাথে প্রীতি ও ভালবাসার একত্ববাদকেই ইবাদত বলে। আল্লাহ যা ভালবাসেন তার সাথে পূর্ণ একাত্মতা এবং যা অপছন্দ করেন তার সাথে হৃদয় প্রাণ দিয়ে ঘৃণা পোষণ করাকেই ভালবাসা বলে। অবদানের অধিপতি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করাকে একত্বতা বলা হয়।" (আল ক্বাসীদাতুন নাবাবিয়্যাহ ২/২১৮)

যে তাওহীদ নিয়ে সকল নাবী-রাসূলগণ এসেছিলেন তা ছিল ইবাদাতের তাওহীদ তথা পরম প্রণয় প্রীতি, চরম আকুতি-মিনতি ও বিনয়ের তাওহীদ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ }

অর্থ: "আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।" (সুরা আম্বিয়া ২১:২৫)

এটাই হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তাওহীদ। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ, মাহবুব, মাকছুদ নেই। এ হল এ তাওহীদের মর্মকথা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} [البقرة: ١٦٣]
অর্থ: "এবং তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া ইবাদতযোগ্য আর কোন ইলাহ নেই। তিনি মহা করুনাময়, দয়ালু।" (সুরা বাকারা ২:১৬৩)
এই তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন স্বয়ং আল্লাহ (সুব:), তাঁর সকল মালায়েকা এবং সমস্ত উলুল ইলম বা জ্ঞানীগণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [آل عمران/١٨]
অর্থ: "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত ইবাদতযোগ্য কোন হক্ ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানবান লোকেরা সততা ও ইনসাফের সাথে এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহা পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞানী ছাড়া কেহই ইলাহ হতে পারে না।" (সুরা আল ইমরান ৩:১৮)
এই তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহর সাক্ষ্য প্রদানকেই পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـذَا الْقُـرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَـا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} [الأنعام : ١٩]
অর্থ: "বল, 'সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় বস্তু কী?' বল, 'আল্লাহ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে। আর এ কুরআন আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌঁছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি। তোমরাই কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে রয়েছে অন্যান্য উপাস্য? বল, 'আমি সাক্ষ্য দেই না'। বল, 'তিনি কেবল এক ইলাহ আর তোমরা যা শরীক কর আমি নিশ্চয় তা থেকে মুক্ত'।" (সুরা আন'আম ৬:১৯)
সুতরাং ইবাদতের যত প্রকার রয়েছে তার সব কিছুই নিবেদন করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ (সুব:) এর জন্যই। ইবাদতের প্রকার সমূহ যা আল্লাহ (সুব:) নির্দেশিত করেছেন তা হচ্ছে: ইসলাম, ঈমান, ইহসান, দোয়া, খওফ, আশা-আকাংখা, তাওয়াক্কুল, অনুরাগ, ভয়-ভীতি, খুশু, অমংগলের

আশংকা, ইনাবাহ, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা, বিপদে উদ্ধার চাওয়া, যবাহ, আন নযর ইত্যাদি। এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে, তাঁর সাথে বিন্দুমাত্র কাউকে শরীক করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَـارْهَبُونِ} [النحـل : ٥١]

অর্থ: "আর আল্লাহ (সুব:) বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।" (সূরা নহল ১৬:৫১)

প্রশ্ন: কেন শুধু আল্লাহকেই একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ হিসেবে গ্রহন করতে হবে?

উত্তর: ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (র:) তার "কায়েদাতুন জামেয়া ফি তাওহীদিল্লাহ ওয়া ইখলাছিল আমল ওয়াল ওয়াজহে লাহু" নামক পুস্তিকায় তাওহীদুল উলুহিয়্যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অনেক তথ্য এবং যুক্তির সমাহার ঘটিয়েছেন। আমরা সে গুলোর কিছুটা সংক্ষিপ্ত সার এখানে তুলে ধরছি।

১. * আল্লাহই মানুষের হৃদয়ের মাকছুদ, হৃদয় শুধু আল্লাহকেই চায়। * এ মাকছুদ তথা আল্লাহকে পেতে তিনিই সাহায্যকারী। * গায়রুল্লাহ হৃদয়ের কাছে অনাকাংখিত। * এ অনাকাংখিত গায়রুল্লাহকে হৃদয় থেকে দূর করতে তিনিই সাহায্যকারী। এই চারটি বিষয় শুধু আল্লাহর সাথে জড়িত। তাই তাঁরই ইবাদত করতে হবে। সাহায্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আর এই হচ্ছে- اياك نعبـد وايـاك نـستعين "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়িন" অর্থাৎ আমরা শুধু আপনাইরই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য কামনা করি এই কথার মর্ম।

২. মানুষ আল্লাহর সৃজন ও রুবুবিয়্যাতের প্রতি যতটা মুখাপেক্ষী তার চেয়ে অনেক বেশী মুখাপেক্ষী তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি। কেননা

ইবাদতই হচ্ছে তার সৃষ্টি ও জীবনের লক্ষ্য। যা ব্যতীত তার জীবন নিস্ফল ও ব্যর্থ বরং ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য।

৩. সৃষ্টির কাছে বান্দার কল্যান ও অকল্যানের, দান ও বঞ্চনার কোন কিছুই নেই। কেউ সন্তুষ্ট হলেই বান্দার উপকার করতে পারবে না যদি আল্লাহ তা মঞ্জুর না করেন, আবার ক্ষতিও করতে পারবে না যদি তিনি তা অনুমোদন না করেন। পক্ষান্তরে তিনি বান্দার কল্যান বা অকল্যান করতে চাইলে তা রুখবার মত কেউ নেই। সুতরাং অক্ষম গায়রুল্লাহর ইবাদত করে কি লাভ।

৪. আল্লাহর ইবাদতের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, সৃষ্টির সাথে তার চেয়ে অধিক সম্পর্ক রাখা বান্দার জন্য ক্ষতিকর। যেমনিভাবে ক্ষতি করে অতিরিক্ত খাদ্য পানীয়। তাই আল্লাহর দিকেই ধাবিত হওয়া উচিত। এবং সৃষ্টির সাথে ভালবাসা ও সম্পর্ক তাঁর দ্বীনের জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিত।

৫. অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমানিত হয়েছে যে, বান্দা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর ভরসা করলে কিংবা কারো আশা করলে নিরাশা আর ব্যর্থতাই তার পাওনা। তাই সকল আশা-ভরসা আল্লাহর উপরই করতে হবে। এতেই রয়েছে বান্দার কল্যান। এর ব্যতিক্রম করলে অকল্যান ও ধ্বংসই হবে তার প্রাপ্য।

৬. আল্লাহ নিজে অভাবমুক্ত, পরম উদার, বড়ই করুণাময়। কোন প্রয়োজন ছাড়াই তিনি বান্দার উপকার করেন। তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আর বান্দার প্রতি অন্য বান্দার ভালবাসাতো কোন না কোন স্বার্থেই হয়ে থাকে। তাই নি:স্বার্থ আল্লাহই মানুষের প্রকৃতবন্ধু। তিনি বান্দার উপকারের জন্যই বান্দাকে কাছে নিতে চান। যাতে শুধু বান্দারই উপকার। এ সত্যটি বুঝলে তা আপনাকে মাখলুকের কাছে আশা করা থেকে বিরত রাখবে।

৭. অধিকাংশ মানুষ আপনাকে দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাইবে। যদিও তা আপনার জন্য ক্ষতিকর হয়। কারণ প্রয়োজনগ্রস্থ ব্যক্তি অন্ধ। সে প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া আর কিছূই বোঝে না।

৮. আপনি কোন ভয়, ক্ষুধা ও রোগে আক্রান্ত হলে সৃষ্টিকুল আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া তা প্রতিহত করতে পারে না। আর তারা নিজের কোন স্বার্থ ছাড়া তা দূর করার ইচ্ছাও করবে না।

৯. সৃষ্টি যেহেতু আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া আপনার কোনই কল্যান অকল্যান করতে পারে না, তাই আপনার আশা-ভরসা আল্লাহর সাথেই সংযুক্ত করুন।

১০. আপনি নিজেই নিজের কল্যান- অকল্যান যথোচিতভাবে বুঝেন না। তাহলে কিভাবে অপর কোন সৃষ্টি আপনার কল্যান অকল্যান বুঝবে। আল্লাহ সবই জানেন আর তিনি সক্ষমও বটে। তিনি আপনাকে তাঁর বিরাট অনুগ্রহ দান করতে সক্ষম। তাই একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য কারা উচিত নয় কি?

প্রশ্ন: শুধুমাত্র তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাত ও আসমা ওয়াস সিফাতের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয় তার প্রমান কি?

উত্তর: ইসলামী মতে তাওহীদকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ এবং আল্-আছমা ওয়াছ-ছিফাত অবশ্যই এদের পরিপূরক তাওহীদ আল্-ইবাদাহ্-র সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। কোরআনে আল্লাহ রাসুল (সা:) কে পৌত্তলিকদের বলতে বলেছেন:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ [يونس/٣١)

অর্থ: "বল কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে? তখন তারা বলবে, আল্লাহ"। (সুরা ইউনুছ ১০:৩১) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [العنكبوت/٦٣)

অর্থ: "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ভুমি মৃত হবার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে তাকে সঞ্জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'।" (সুরা আনকাবুত ২৯: ৬৩)

মক্কাবাসীদের তৌহিদ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্বেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি তারা অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে নাস্তিক (কাফের) এবং পৌত্তলিক (মুশরিক) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। ফলে তৌহিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল তৌহিদ আল-ইবাদাহ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা।

প্রশ্ন: নাবী-রাসুলরা কোন তাওহীদের দিকে নিজ নিজ জাতিকে আহ্বান করেছিলেন?

উত্তর: সকল নাবী-রাসুলগন নিজ নিজ জাতিকে তাওহীদুল উলুহিয়্যাত তথা আল্লাহকে একক ইলাহ হিসেবে গ্রহন করার জন্য আহবান করেছিলেন।

সে সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থ: "আমি তোমার পুর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি তার কাছে এই ওহী ছাড়া যে আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই সুতরাং আমারই ইবাদত কর।" (সুরা আম্বিয়া ২১:২৫)

সুতরাং সমস্ত নবী-রাসূলগনের আহ্বানের কালিমা ছিল একটাই: لَا إِلَهَ إِلَّا الله আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাদের প্রধান দাওয়াত ছিল তাগুত তথা সমস্ত বাতিল উপাস্যের ইবাদতকে বর্জন করে একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ আল্লাহর ইবাদত করা।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦)

অর্থ: "আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।" (সুরা নাহল ১৬:৩৬)

তাওহীদের শর্তাবলী

প্রশ্ন: শর্ত কাকে বলে?

উত্তর: শর্ত এমন একটি বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্যের অনুপস্থিতি অপরিহার্য এবং যার অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। আরবীতে একটি মূলনীতি হলো: اذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ অর্থ: "শর্ত বাতিল হলে 'মাশরূত্ব'ও বাতিল।" যেমন: সালাতের একটি শর্ত হচ্ছে ওজু বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল করা। এখন কেউ যদি ওজু না করেই সালাতে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তার সালাত কবুল হবে না এজন্য যে, সে সালাতের অপরিহার্য একটি শর্ত পূরণ করে নাই। শর্ত হচ্ছে কোন জিনিসের বাইরের বিষয় যা মাশরূত্বকে শুরু করার পূর্বেই পূরণ করতে হয়।

প্রশ্ন: তাওহীদের শর্তাবলী পূরন করা কেন জরূরী?

উত্তর: তাওহীদের বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং তাওহীদের শর্তগুলো পূরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, কারো মাঝে তাওহীদের কোনো শর্ত না পাওয়া গেলে তার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মূলই পাওয়া গেলো না বলে বিবেচিত হবে। যেমন সালাত সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে যদি কোনো একটি শর্ত যেমন কেবলামুখী হওয়া অথবা ছতর ঢাকা ইত্যাদি না পাওয়া যায় তাহলে সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। শর্ত যেহেতু বাইরের বিষয় এবং মাশরূত্বটি শুরু করার পূর্বেই তা পূরণ করতে হয় সেহেতু কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবী করলে তাকে অবশ্যই তাওহীদের শর্তাবলী নিজের মধ্যে পূরণ করতে হবে।

প্রশ্ন: তাওহীদের শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর: তাওহীদের শর্ত সাতটি। এগুলো হচ্ছে-

প্রথম শর্ত اَلْعِلْمُ (জ্ঞান) : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

({فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } [محمد : ١٩

অর্থ: "তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৯)

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ এক এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার'- এ কথা না জানা, বান্দার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে বিরাট অন্তরায়। এ কারণেই (তাওহীদের) ইলম বা জ্ঞানকে বান্দার ইসলাম কবুলের জন্য শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ »

অর্থ: "ওসমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে যাবে।" (সহীহ মুসলিম ১৪৫; মুসনাদে আহমদ ৪৯৮)

এই হাদীসে 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' এই কথা জানতে বলা হয়েছে।

আল্লামা আবুল মুজাফফর 'ইফছাহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বাক্ষ্য দানের দাবী হচ্ছে, স্বাক্ষ্যদানকারীর অবশ্যই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে।

তিনি আরো বলেনঃ "আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে إِلَّا শব্দের পরে আল্লাহ শব্দের পেশ হওয়ার দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, উলুহিয়্যাত (ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা) একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অতএব আল্লাহ সুব. ছাড়া অন্য কেউ উলুহিয়্যাতের হকদার হতে পারে না। তিনি বলেনঃ এখানে সারকথা হচ্ছে, 'তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা' উভয় বিষয়ই যে এ কালেমার অন্তর্ভূক্ত এ কথাটি জেনে নেয়া।"[৭]

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতিন (র:) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

{هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}

[৭] আদ দারু সুন্নাহ।

অর্থ: "বস্তুত: সকল মানুষের জন্য এটা একটা পয়গাম। আর এটা পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করা হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজনই, আর বুদ্ধিমান লোকেরা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।" (ইবরাহীম ১৪:৫২)

উপরোক্ত আয়াতে وَلْيَقُوْلُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ (যাতে তারা বলে, প্রকৃত পক্ষে ইলাহ একজনই) বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে (যাতে তার জানে)। কেননা ঈমান কবুল হওয়ার জন্য ঈমানের মূল কথার জ্ঞান থাকা জরুরী। বলা বা না বলা তার পরের হিসাব। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ

{ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [الزخرف : ٨٦]

অর্থ: "যারা জেনে শুনে সত্যের স্বাক্ষ্য দিয়েছে।" (সুরা যুখরূফ ৪৩:৮৬)

অর্থাৎ তারা অন্তরে যা জানে তাই মুখে স্বাক্ষ্য দিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই" এ কথা জানা অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করেছে সে জান্নাতে যাবে।

এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এটাই প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের ওপরে সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে জানা। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে "অর্থ সহ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর জ্ঞান অর্জন" আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হচ্ছে "অর্থসহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর জ্ঞান না থাকা"। অতএব অর্থসহ কালেমার জ্ঞান লাভ যেমনি ভাবে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব, তেমনিভাবে কালেমার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মূর্খতা।

শাইখ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (র:) বলেছেন, অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালেমা (লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ) এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাব্দিক স্বাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না। একারণেই আল্লাহ সুব. মুনাফিকদের কর্ম ও দাবীর ব্যাপারে তাদের মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রদানকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ স্বাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যে তারা কয়েক ধরণের "তাগিদ" (emphasis) ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون : ١]

অর্থ: "আপনার কাছে মুনাফিকরা যখন আসে তখন বলে: আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল। আর আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (মুনাফিকুন ৬৩:১)

মুনাফিকরা তাদের মৌখিক স্বাক্ষ্যকে আরবী গ্রামারের দৃষ্টিকোন থেকে তিনটি إِنَّ (নিশ্চয়ই) لَامٌ (অবশ্যই) এবং **جُمْلَــةٌ اِسْــمِيَةٌ** (বিশেষ্য প্রধান বাক্য) এর মাধ্যমে তাগিদ (বসঢ়যধংরং) ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তায়ালাও তাদের স্বাক্ষ্যকে বাক্যের মধ্যে হুবহু তাগিদ (বসঢ়যধংরং) দিয়ে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। এ তথ্যের মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, ঈমান নামটির মধ্যে অবশ্যই আন্তরিক স্বীকৃতি এবং তদানুযায়ী আমল (কর্ম) পাওয়া যেতে হবে।

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বাক্ষ্য দিলো আবার গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছু) ইবাদত করলো, তার এ স্বাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই, যদিও সে সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং ইসলামের কিছু কাজ কর্ম করে। কারণ তার ঈমানের মূল শর্তই পূরণ হয় নি।

দ্বিতীয় শর্ত: اَلْيَقِيْنُ (দৃঢ় বিশ্বাস) :

তাওহীদ অথাৎ আল্লাহর একাত্ববাদ জানার পর এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এই কালেমার প্রতি বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। সাথে সাথে সব ধরনের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করতে হবে এ কথার প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ ব্যাপারে তার অন্তরে কোনো ধরণের দ্বিধা ও সন্দেহ থাকতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [الحجرات : ١٥]

অর্থ: "প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি ঈমান এনেছে, অত:পর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি।" (সূরা হুজুরাত ৪৯:১৫)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: "আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 'যে বান্দা স্বাক্ষ্য দেয়, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসুল' আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ না করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে (মৃত্যু বরণ করে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম ১৪৭)

তৃতীয় শর্ত: اَلْقُبُوْلُ (গ্রহণ করা) :

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর কালেমাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদকে কবুল করতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেন:

{إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنَّــا لَتَــارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} [الصافات : ٣٥ ، ٣٦]

অর্থ: "এসব লোকেরা এমন ছিলো যে, তাদেরকে যখন বলা হতো: "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো। তারা বলতো: আমরা এক পাগল কবির কথায় নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করবো?" (সাফফাত ৩৭:৩৫-৩৬)

অর্থাৎ অহংকার বশত তারা তাওহীদের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করতো। সুতরাং কেউ যদি তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানার পরে গ্রহন না করে তার অবস্থা হবে উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত মুশরিকদের মত। অর্থাৎ সে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে না।

চতুর্থ শর্ত: اَلْاِنْقِيَــادُ (সমর্পন করা) : তাওহীদ জানার পর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, প্রকাশ্যে কালেমা গ্রহণ করার পর অবশ্যই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে হবে। এ সমর্পন হবে সকল তাগুতের সাথে কুফরী করার মাধ্যমে, তাগুত থেকে নিজেকে মুক্ত করার মাধ্যমে এবং এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء : ٦٥]

অর্থ: "না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামে কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অত:পর তুমি যাই ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে।" (সূরা নিসা ৪:৬৫)

এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল ঈমানে একটি অন্যতম দাবী হলো নিজেকে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের সামনে সমর্পণ করা।

আল্লামা আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (র:) বলেছেন, ইসলাম শুধুমাত্র একটি দাবী এবং মৌখিক উচ্চারণের নাম নয়। বরং ইসলামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্বকে মেনে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ ও সোপর্দ করা, একমাত্র আল্লাহর রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কাছে আত্নসমর্পন করা (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করা)। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة : ٢٥٦]

অর্থ: "যে তাগুত (আল্লাহ বিরোধী সব কিছুকে) অস্বীকার ও অমান্য করে আর আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন এক সুদৃঢ় ও মজবুত অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে, যা ভাংগবার নয়।" (বাকারা ২:২৫১)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন:

{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } [يوسف : ٤٠]

অর্থ: "বস্তুত সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, স্বয়ং তাঁকে ছাড়া তোমরা কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটাই সঠিক ও খাটি জীবন বিধান। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।" (সূরা ইউসুফ ১২:৪০) (আদ্ দুরার আস্ সুন্নিয়া কিতাবুত তাওহিদ ২/২৬৪পৃঃ)

পঞ্চম শর্ত: اَلصِّدْقُ (সত্যতা) :

তাওহীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তা মনে প্রাণে কবুল করা, এর প্রতি নিজেকে সমর্পন করার পর অবশ্যই বান্দাকে কালেমার ক্ষেত্রে স্বীয় সত্যতাকে প্রমাণ করতে হবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم... قَالَ « مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তিই সত্যনিষ্ঠ অন্ত রে স্বাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।" (সহীহ মুসলিম ১৫৭)

যে ব্যক্তি এ কালেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কালেমা দ্বারা যা বুঝানো হয় তা যদি অন্তরে অস্বীকার করে তবে সে নাজাত (মুক্তি) লাভ করতে পারবে না, যেমনটি আল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিকরা লাভ করতে পারে নি। মুনাফিকরা শুধু মুখে বলেছিলো: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল" এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বললেন:

{وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون : ١]

অর্থ: "আল্লাহও জানেন, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচেছন যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (মুনাফিকুন ৬৩:১)

এমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা করেছেন:

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ } [البقرة : ٨]

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।" (সুরা বাক্বারা ২:৮)

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈমান কবুল হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে অন্তরের সত্যায়ন। অন্তরের সত্যতা ছাড়া কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না।

তৃতীয় শর্ত, চতুর্থ শর্ত ও পঞ্চম শর্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তৃতীয় শর্ত (কবুল) কথার মধ্যে, আর চতুর্থ শর্ত (ইনকিয়াদ) হচ্ছে কর্মের মধ্যে আর পঞ্চম শর্ত (সত্যতা) হচ্ছে অন্তরের মধ্যে।

৬ষ্ঠ শর্ত: اَلْاْخْلَاصُ (সততা ও একনিষ্ঠতা) :

লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ এবং ঈমানের সত্যতা যাচাই এর পর বান্দাকে অবশ্যই কালেমার ব্যাপারে মুখলেস বা একনিষ্ঠ হতে হবে। আর ইখলাস হচ্ছে, বান্দার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হওয়া, গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও নিবেদিত না হওয়া। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة : ٥)

অর্থ: "তাদেরকে এ ছাড়া কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।" (সুরা বাইয়্যিনাহ ৯৮:৫)

ইখলাসের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, বান্দা এ কালেমা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিংবা কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেও না আকড়েও ধরবে না। সুতরাং ইখলাসও ঈমান তথা তাওহীদ কবুল হওয়া জন্য একটি শর্ত।

সপ্তম শর্ত: الْمَحَبَّةُ (ভালবাসা) :

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পন, ঈমানের সত্যতার যাচাই, কালেমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার পর বান্দাকে অবশ্যই কালেমাকে মুহাব্বত করতে হবে। অন্তর দিয়ে কালেমাকে মুহাব্বত করতে হবে, আর মুখে কালেমার প্রতি মুহব্বতকে প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

{ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ} [البقرة : ١٦٥)

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য ইলাহদের আল্লাহর সমকক্ষরূপে সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহব্বত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। আর কতইনা ভাল হতো যদি এ জালেমরা পার্থিব কোনো কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করে অনুধাবন করে নিতো যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।" (সুরা বাক্বারা ২:১৬৫)

কালেমার এই সাতটি শর্তের ব্যাপারে শাইখ সুলাইমান বিন সামহান (র:) বলেন: "একজন মানুষের মধ্যে যখনই এ শর্তগুলোর সমাবেশ ঘটবে এবং এর জ্ঞান, আমল ও ধ্যান ধারণার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এ কালেমাকে উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (র:) এর উল্লেখকৃত, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক দশটি বিষয় থেকে সে মুক্ত থাকবে, তখনই তার ইসলাম সঠিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ, এগুলোই হচ্ছে কালেমার মূল।" (আদ্ দুরার আস সুন্নিয়া কিতাবুত তাওহীদ)

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ বলেন: অধিকাংশ লোকই লা-ইলাহা ইল্লাহর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অবস্থা এই যে, যদি মুখে কালেমার কথা উচ্চারণ করে, তাহলে অর্থের দিকটা অস্বীকার করে। তাই এই সাতটি বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ সাতটি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত একজন বান্দা কুফ্‌রী ও মুনাফেকী থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। একজন বান্দার মধ্যে সাতটি বিষয়ের সমাহার এবং তদানুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই সত্যিকারে মুসলিম হওয়া সম্ভব। তাই জ্ঞান, আমল, বিশ্বাস, গ্রহণ, মুহাব্বত ও আনুগত্যের দিক থেকে বান্দার অন্তর ও জবানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

অতএব একজন মুসলিমের জ্ঞান এমন হতে হবে, যেখানে মুর্খতার অবকাশ নেই। তার ইখলাস হবে শিরক মুক্ত, সত্যতা হবে মিথ্যাচার মুক্ত, তার চরিত্র হতে হবে শিরক এবং নিফাক মুক্ত। তার বিশ্বাস হতে হবে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত। সে কালেমা উচ্চারণ করবে এবং তার মনে কালেমা দ্বারা যা বুঝায় তার ব্যাপারে এবং এর দাবীগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না। তার মনে থাকবে সেই ভালবাসা, যার মধ্যে থাকবে না কোনো ঘৃণা, থাকবে এমন গ্রহণ করার মানসিকতা যার মধ্যে থাকবে না কোনো অস্বীকৃতি। সেই আরব মুশরিকদের মতো তার অবস্থা হবে না যারা কালেমার অর্থ বুঝতো অথচ তা গ্রহন করেনি। একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা চাই সেই আনুগত্য, যার মধ্যে থাকবে না শিরকের অস্তিত। কালেমার এসব দাবী ও অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বান্দার ইসলাম ও ঈমান পরিশুদ্ধ হয়।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতিফলন যথার্থ ভাবে যার জীবনে ঘটবে, সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সে তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভাল-মন্দের বিচার বুদ্ধি, হেদায়াত ও স্থিরতার সাহায্যে তার দ্বীনকে উপলদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন: তাওহীদ সম্পর্কে কেন জানতে হবে? এ ব্যাপারে বর্তমানে অধিকাংশ লোকের কি অবস্থা?

উত্তর: ইসলামে প্রবেশের একটি মাত্র কালেমা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ইহাকে কালেমা তাইয়্যেবা বা কালেমাতুত তাওহীদ বলে। এ কালেমা সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহ (সুব:) নির্দেশ করেছেন: **[محمـــد/١٩ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)** "তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৯) রাসূল (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: "ওসমান (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই'একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম ১৪৫; মুসনাদে আহমদ ৪৬৪)

আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (র:) বলেছেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থসহ সেই এলমে ইয়াকীনী বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যা نَفِىْ اِثْبَاتْ (কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা) সহ জানা আল্লাহ্ ওয়াজিব করে দিয়েছেন।"

আল্লাহ (সুব:) আরো বলেছেন: 'যারা জেনে শুনে সত্যের সাক্ষ্য দিবে তাদের কথা ভিন্ন'।

শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (র:) বলেছেন, "অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালেমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাব্দিক সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। বরং এ মৌখিক সাক্ষ্য আদম সন্তানের বিরুদ্ধে একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত।" তিনি আরও বলেন, "আপনি জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন) যে, সালাত-সাওম ফরজ কিন্তু এরও আগের ফরজ হচ্ছে **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ** 'র সাক্ষ্য দানের বিষয়টি জেনে নেয়া। অতএব সালাত-সাওম গবেষণার অপরিহার্যতার চেয়ে বান্দার জন্য অধিকতর অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ** এর অর্থ নিয়ে গবেষণা করা।

এ কালেমা সম্পর্কে জানা অপরিহার্য এ জন্য যে, "আল্লাহ এক এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য হকদার" এটা না জানলে কোন ব্যক্তির ইসলামে প্রবেশ গ্রহনযোগ্য নয়। এ জন্যই তাওহীদের ইলমকে বান্দার ইসলাম কবুলের শর্তরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এ কালেমা সম্পর্কে অজ্ঞ, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তায়ালা যার প্রতি করুনা করেছেন, আর শিরক্ থেকে রক্ষা করেছেন, সে ছাড়া অধিকাংশ লোকের মধ্যেই কতিপয় শিরক্ লুকায়িত আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে তারা জানে না এ কালেমার অর্থ কি, কি এর গুরুত্ব ও মর্যাদা, এ কালেমার দাবীই বা কি, এ কালেমার সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে কি তারা স্বীকার করে নিয়েছে আর কি অস্বীকার করেছে। তারা দাবী করছে আমরা মুসলিম আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর করো ইবাদত করি না অথচ তারা বাস্তবিকভাবে আল্লাহর পাশাপাশি অন্য অনেক কিছুর ইবাদত করছে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف/١٠٦]

অর্থ: "বেশীর ভাগ লোক ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক" (সুরা ইউসুফ ১২:১০৬)
অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} [البقرة : ٨]

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়।" (সুরা বাকারা ২:৮)

বর্তমান যুগে এ আয়াতদ্বয়ের বাস্তবতায় আমরা দেখছি অধিকাংশ মানুষ মুখে ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে শিরক্ করছে।

তাওহীদের রুকন

প্রশ্ন: রুকন কাকে বলে? তাওহীদের রুকনের গুরুত্ব কি?

উত্তর: রুকন হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে। রুকন অবশ্যই মূল বিষয়টির অন্তর্গত হওয়া চাই। যেহেতু রুকন কোন জিনিসের আভ্যন্তরীণ বা ভেতরের বিষয়, সেহেতু ঐ জিনিসটি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন জিনিষের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না।

রুকন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে তাওহীদ আল্লাহ (সুব:) আপনার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে তাওহীদেরও সালাতের মতোই রুকন আছে। সালাত যেমন তার রুকন যথা: তাকবীরে তাহরিমা, রুকু, সেজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না, কোনো ব্যক্তি যদি সালাতের কোনো রুকন বাদ দেয় তাহলে তার সালাত যেমন ভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ভাবে কোনো ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোনো একটি রুকন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী (মুওয়াহহিদ) ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার কোনো কাজে আসবে না, সে আর মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফেরে পরিণত হয়ে যাবে।

বি:দ্র: রুকন এবং শর্তের মধ্যে পার্থক্য হলো, রুকন বলা হয় কোন জিনিষের ভিতরের মূল অংশকে আর শর্ত বলা হয় কোন জিনিষের বাহিরের পূর্ব প্রয়োজনীয় বিষয়কে। যেমন: অজু সালাতের জন্য শর্ত। যা সালাতের ভিতরের কোন অংশ নয় আর রুকু-সেজদা সালাতের রুকন। যা সালাতের ভিতরের অংশ।

প্রশ্ন: তাওহীদের রুকন কয়টি ও কি কি? এবং তার প্রমাণ কি?

উত্তর: তাওহীদের রুকন দু'টি। আর তা হলো:

(১) **الكفر بالطــاغوت**। কুফর বিত ত্বাগুত বা ত্বাগুতকে বর্জণ করা এবং (২) **الايمان بالله**। ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর উপর ঈমান আনা।

এর প্রমাণ হচ্ছে: আল্লাহ (সুব:) নিম্মোক্ত বানী:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا [البقرة/٢٥٦]

অর্থ: "যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়"। (সুরা বাকারা ২:২৫৬)

উপরোক্ত আয়াতে فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ হচ্ছে প্রথম রোকন, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ হচ্ছে দ্বিতীয় রোকন এবং بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى শক্ত রজ্জু বলতে কলেমা لا اله الا الله কে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই মূলত: তাওহীদের কালেমা। তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে এই দ্বীনের মূল ভিত্তি ও এর প্রধান মূলনীতি, এ দিকেই সমস্ত নাবী-রাসুলরা আহ্বান করছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

অর্থ: "আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।" (সুরা নাহল ১৬:৩৬)

প্রশ্ন: তাগুত কি? তাগুতের সংজ্ঞা কি?

উত্তর: ত্বাগুত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সীমালংঘন কারী, আল্লাহদ্রোহী, বিপথে পরিচালনাকারী। ত্বাগুত শব্দটি আরবী **طغيان** 'তুগইয়ান' শব্দ থেকে উৎসারিত, যার অর্থ সীমালংঘন করা, বাড়াবাড়ি করা, স্বেচ্ছাচারিতা। ত্বাগুত শব্দের ক্রিয়ামূল **طغي** 'ত্বগা'।

শরীয়তের পরিভাষায়, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ত্বাগুত যে, আল্লাহদ্রোহী হয়েছে এবং সীমালংঘন করেছে, আর আল্লাহর কোনো হককে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন বিষয়ে নিজেকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

সুস্পষ্ট ভাবে ত্বাগুত এর অর্থ হচ্ছে, কোন মাখলুক (সৃষ্টি) নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়কে (আল্লাহর স্থলে) নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা:-

- কোন মাখলুক (সৃষ্টি) কর্তৃক আল্লাহ (সুব:) কার্যাবলীর যে কোন কার্য সম্পাদনের বিষয়টি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন সৃষ্টি করা, রিজিক দান অথবা শরীয়ত (বিধান) রচনা।
- কোন মাখলুক (সৃষ্টি) আল্লাহ (সুব:) এর কোন সিফাত বা গুন কে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন ইলমে গায়েব জানা।
- যে কোন ইবাদত মাখলুক বা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা। আল্লাহ ব্যতিত অন্য যার উদ্দেশ্যে ইবাদত সম্পাদন করা হয় সেই ত্বাগুত, যদি সে এই ইবাদতে রাজি থাকে। যেমন: দোয়া, মানত, নৈকট্য লাভের জন্য পশু জবাই অথবা বিচার-ফায়সালা চাওয়া ইত্যাদি। ইমাম আত্ তাবারী (রহ:) বলেন:

والصواب من القول عندى فى الطاغوت، أنه كل ذى طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شى.

অর্থ: "আল্লাহর দেয়া সীমালংঘনকারী মাত্রই তাগুত বলে চিহ্নিত, যার অধীনস্থ ব্যক্তিরা চাপের মুখে তার ইবাদত করে বা তাকে তোষামোদ করার জন্য বা তার আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য তার ইবাদত করে। এ (তাগুত) উপাস্যটি মানুষ কিংবা শয়তান বা মূর্তি অথবা অন্য যেকোন বস্তু হতে পারে।" (তাফসীরে তাবারী, ইফাবা/৫ম খন্ড, ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীর)

আল্লামা ড: মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হেলালী ও আল্লামা ড: মুহাম্মদ মুহসিন খান কর্তৃক অনুদিত কুরআন মাজীদের ইংরেজী অনুবাদের সুরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে উল্লেখিত ত্বাগুত শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ "তাগুত" শব্দটি বিস্তৃত অর্থ বোঝায়। এটার অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয়"। যেমন সকল মিথ্যা উপাস্য; এটা শয়তান, মৃত ব্যক্তির আত্মা, মুর্তি, পাথর, সূর্য, তারকা, অথবা কোন মানুষও হতে পারে। (The Noble Quran English TranslaTion, P.58)

سيد قطب: والطاغوت صيغة من الطغيان، تفيد كل ما يطغى على الوعى ويجوز على الحق، ويتجاوز الحدود التى رسمها الله للعبادة، ولا يكون له ضابط من العقيدة

فى الله، من الشريعة التى يسنها الله، ومنه كل منهج غير مستمد مـــن الله، وكـــل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لايستمد من الله.

সাইয়্যেদ কুতুব (রহ:) বলেন, "তাগুত বলতে সেইসব ব্যক্তি ও ব্যবস্থাকে বোঝায় যেগুলো ঐশী দ্বীন এবং নৈতিক, সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলাকে অবমাননা করে এবং আল্লাহ নির্দেশিত বা তার দেয়া দিক-নির্দেশনা থেকে উদ্ভুত নয় এমন সব মূল্যবোধ ও রীতিনীতির ভিত্তিতে এই জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করে।" (তাফসীরে ফি যিলালিল কোরআন)

ইমাম মালেক (রহ:) তাগুতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: "এমন প্রত্যেক জিনিসকেই তাগুত বলা হয়, আল্লাহতা'য়ালাকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়।" (ফতহুল ক্বাদীর, আল্লামা শওক্বানী)

মুজাহিদ (র:) বলেছেন: "তাগুত হল মানুষরুপী এক শয়তান যাদের কাছে মানুষ আসে বিচার পাওয়ার জন্য এবং মানুষরা তাদের অনুসরণ করে।"

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন:"এ কারণে যে কিনা বিচার করে কোরআনের হুকুম ছাড়া তারা তাগুত।" (মাজমু'আল ফাতাওয়া-২৮খন্ড, ২০১পৃ:)

ابن القيم : الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطـــاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونـــه مـــن دون الله، أويعبدونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهـــذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عـــدلوا مـــن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى طاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.

ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেছেন: "তাগুত হল সীমাজ্ঞনকারী। যদিও কিনা সে ইবাদত করে, আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। তাই সমাজের মধ্যে তাগুত সেই ব্যক্তি যাকে সমাজের লোকেরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা:) পাশে বিচারক হিসেবে স্থান দেয়, অথবা আল্লাহ ব্যতীত, তার ইবাদত করে অথবা আল্লাহর নির্দেশনা উপেক্ষা করে, তার অনুসরণ করে অথবা জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার আনুগত্য করে।" (ই'লাম আল-মুওয়াক্বী'য়ীন-প্রথম খন্ড-৫০পৃ:)

মোটকথা: আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় এবং তারা এতে সন্তুষ্ট চাই সেটা ইবাদতের কোন অংশ বিশেষ হোক তারাই তাগুত। আল্লাহর পরিবর্তে যাদের কাছে বিচার-আচার নিয়ে যাওয়া হয়, আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয়, যাদের নামে মান্নত করা হয়, পশু যবেহ করা হয় এবং আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা যাদের জন্য সাব্যস্ত করা হয় তারাও তাগুত।

কুরআনের চারটি আয়াতে طَاغُوْتٌ (তাগুত) এর বৈশিষ্ট্য:

প্রথম আয়াতের ঘোষণা: ত্বাগুত হল সেই غَيْـــرُ الله যার ইবাদত করা হয়ে থাকে, যাকে মান্য করা হয়, এবং যার একনিষ্ঠ অনুসরণ করা হয়, অথচ তা হারাম এবং নিষিদ্ধ। দলীল :

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى}

অর্থ: "যারা ত্বগুতের ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয় তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ।" (সুরা যুমার ৩৯:১৭)

এই আয়াতে ত্বাগুত বলতে ঐ সমস্ত স্বত্তাকে বুঝানো হয়েছে যাদের ইবাদত করা হয়।

দ্বিতীয় আয়াতের ঘোষণা: তাগুত হল এমন غَيْـرُ الله যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। দলীল :

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُـــونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا } [النساء : ٥١)

অর্থ: "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও তাগুতকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুমিনদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।" (সুরা নিসা ৪:৫১)

তৃতীয় আয়াতের ঘোষণা: ত্বাগুত হল এমন غَيْـــرُ الله যার নিকট বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয়। দলীল :

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء : ٦٠]

অর্থ: "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।" (সুরা নিসা ৪:৬০)

চতুর্থ আয়াতের ঘোষণা: ত্বাগুত হল সেই غَيْرُ الله যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একদল প্রাণন্তকর সংগ্রাম করে। দলীল :

{الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء : ٧٦]

অর্থ: "যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল।" (সুরা নিসা ৪:৭৬)

সুতরাং পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে ত্বাগুত সেই غَيْرُ الله বা শক্তি যার ইবাদত করা হয়, যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, যার কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় এবং যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম করা হয়।

প্রশ্ন: প্রধান প্রধান ত্বাগুত কারা?

উত্তর: ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহ:) বলেন, তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে পাঁচ ধরণের তাগুত নেতৃত্বের আসনে রয়েছে:

১. শয়তান: গায়রুল্লার ইবাদতের দিকে আহবানকারী শয়তান;

২. শাসক: আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসক;

৩. বিচারক: আল্লাহ(সুব:)-র নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার-ফায়সালা করে;

৪. গনক, জ্যোতিশি: আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যক্তি এলমে গায়েব জানে বলে দাবী করে;

৫. মৃত বা জীবিত পীর-ফকীর, দরবেশ, প্রবৃত্তি, বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ: আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়।

প্রশ্ন: আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসকরা কিভাবে ত্বাগুতের অন্তর্ভূক্ত?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا

অর্থ: "আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে ফয়সালার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি তাকে (তাগুতকে) অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (সুরা নিসা ৪:৬০)

আল্লাহ (সুব:) আরও ইরশাদ করেছেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/٤٠]

অর্থ: "বিধান দিবার অধিকার আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সুরা ইউসুফ-১২:৪০)

আল্লাহ (সুব:) আরও ইরশাদ করেছেন: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ [الأعراف/٥٤

"জেনে রেখো সৃষ্টি এবং বিধান তাঁরই।" (সুরা আরাফ -৭:৫৪)

সুতরাং আল্লাহর আইন-বিধানদানের এ সার্বভৌম অধিকারের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিই সীমালংঘন করবে সে ত্বাগুতে পরিণত হবে। কারণ সে আল্লাহর

খাস অধিকারের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করেছে। কোরআনে আল্লাহ (সুব:) ফেরাউনকে ত্বাগুত বলেছেন। আল্লাহ ফিরাউনের ব্যাপারে বলেন:

{اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [طه: ٢٤)

অর্থ: "ফির'আউনের কাছে যাও; নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।" (সুরা ত্বাহা ২০:২৪) অপর জায়গায় আল্লাহ (সুব:) বলেন:

فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى [النازعات/٢٣، ٢٤)

অর্থ: "দেশবাসীকে জড় করে সে ভাষণ দিলো, অতপর সে বললো, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় 'রব'।" (সুরা নাযিয়াত ৭৯:২৩-২৪)

ফেরাউন নিজেকে 'রব' বলতে কী বুঝিয়েছে? সে কি দাবী করেছিলো যে, সে আসমান যমীন, মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে? না, এমন দাবী সে কখনো করেনি। সে যদি এমন দাবী করতো তাহলে তার সংগী-সাথীরাই তাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিতো। বরং সে নিজেও বিভিন্ন পূজা-পার্বনে অংশ নিতো, তারও অনেক ধরনের ইলাহ, মাবুদ বা উপাস্য ছিলো। কোরআন থেকেই এর প্রমাণ দেখে নিন:

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ

অর্থ: "ফেরাউনের জাতির নেতারা (ফেরাউনকে) বললো, আপনি কি মূসা ও তার দলবলকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির সুযোগ দিবেন আর তারা আপনাকে ও আপনার ইলাহদের এভাবে বর্জন করে চলবে?" (সুরা আরাফ ৭: ১২৭)

তাহলে তার 'রব' দাবী বলতে আসলে কী বুঝায়? কোরআনই আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ফেরাউনের দাবী ছিল সার্বভৌমত্বের দাবী। সারা পৃথিবীতে নয় তার দাবী ছিল কেবল মিশরের শাসন ক্ষমতার উপর নিরংকুশ আধিপত্যের দাবী। তার দাবী ছিলো মিশরের সাধারণ জনগণের জন্যে তার ইচ্ছানুযায়ী যেমন খুশী তেমন আইন-কানুন ও মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতার দাবী। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِـــنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ [الزخرف/٥١)

অর্থ: "ফেরাউন তার জাতির উদ্দেশ্যে (এক) ভাষণ দিলো। সে বললো, মিশরের সার্বভৌমত্ব কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছো না যে, এই

নদীগুলো আমার (রাজত্বের) অধীনেই বয়ে চলছে--------।" (সুরা যুখরুফ ৪৩:৫১)

যেসব শাসকেরা আল্লাহর হালাল-হারামের বিধানকে পরিবর্তন করেছে তারাও তাগুতের অন্তর্ভূক্ত। তারা নিজেদের মিথ্যা রবের আসনে বসিয়েছে, যদিও তারা মুখে বলে না তারা রব। তিরমিযীতে উদ্ধৃত হাদিসে

عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال أمـــا إنهـــم لم يكونـــوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرمـــوا علـــيهم شـــيئا حرموه (سنن الترمذي)

অর্থ: "আদী ইবনে হাতেম (রা:) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে এসে দেখলাম তিনি সুরা তওবার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন: "তারা তাদের সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজক (পীর, পুরোহীত ও নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে) আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে-----।" (সুরা তওবা ৯:৩১) আদী (রা:) বলেন, আহলে কিতাবরা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) তো আলেম/ দরবেশদের (তথা নেতাদের) পূজা উপাসনা করতো না! রাসূল (সা:) বললেন, তা সত্য। তবে তারা মনমতো কোনো কিছুকে বৈধ কিংবা অবৈধ ঘোষণা করলে জনগণ তা নির্বিচারে মেনে নিতো। এটাই তাদের ইবাদত।

বর্তমান তাগুতী (সীমালঙ্ঘনকারী) সরকার ব্যবস্থায় এর উদাহরণ দেখুন: মদ, জুয়া, লটারী, সুদ, বেপর্দা, নারী নেতৃত্ব, বেশ্যাবৃত্তি (ব্যভিচার) এমন আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা কঠোর ভাবে অবৈধ ঘোষণা করেছেন, পক্ষান্তরে, তারা এগুলোকে বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়েছে।

প্রশ্ন: কিভাবে 'কুফর বিত ত্বাগুত' তথা ত্বাগুতকে বর্জন করতে হবে?

উত্তর: ত্বাগুতকে পাঁচভাবে বর্জণ করতে হবে-

১। তাগুতের ইবাদত বাতিল এ আক্বীদা পোষণের মাধ্যমে:

মানুষ যত ধরনের ইবাদতই তাগুতের জন্য নিবেদন করুক তা সবই বাতিল এ আক্বীদা বা বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُـــوَ الْعَلِـــيُّ الْكَبِيرُ [الحج/٦٢)

অর্থ: "আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান।" (সুরা হজ্জ ২২:৬২)

২। তাগুতকে পরিত্যাগ ও তাগুত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে:

এর অর্থ হচ্ছে তাগুতের ইবাদত পরিত্যাগ করা, পরিহার করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦)

অর্থ: "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।" (সুরা নাহল ১৬:৩৬)

৩। দুশমনি বা শত্রুতার মাধ্যমে:

আল্লাহ (সুব:) ইবরাহীম (আ:) এর ঘটনা বর্ণনা করত: বলেন

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ0 أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ 0 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِـــي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: "ইবরাহীম বললো: তোমরা এবং তোমাদের অতীত বাপ-দাদারা যে সব জিনিসের ইবাদত করে আসছো, সে গুলি কি কখনো তোমরা চোখ মেলে দেখেছো? এরা সবাইতো আমার দুশমন একমাত্র রাব্বুল আলামীন ছাড়া।" (সূরা শুআরা ২৬:৭৫-৭৭)

যে ব্যক্তির ন্যুনতম জ্ঞান আছে এবং দাবী করে যে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে সে কখনো তাগুতকে বন্ধু হিসেবে নিতে পারে না। বরং তাগুতের সাথে থাকবে তার দুশমনি বা শত্রুতা।

৪। ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْـــضَاءُ أَبَـــدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থ: "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলো: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা যতক্ষণ না এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ততক্ষণ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে থাকবে চির শত্রুতা, ক্রোধ ও ঘৃণা।" (সুরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

সুতরাং তাগুতকে অস্বীকারের দাবী হচ্ছে তাগুত এবং যে ব্যক্তি তার ইবাদত করে কাফেরে পরিণত হয়েছে উভয়কেই পরিত্যাগ করতে হবে এবং উভয়ের সাথে ঈমানদারদের থাকবে দুশমনি, ঘৃণা-বিদ্বেষ।

৫। অস্বীকার করার মাধ্যমে: ত্বাগুতকে অস্বীকার করা। তাগুতের যারা উপাসনা করে এবং নেতৃত্বের আসনে বসায় তাদেরকে অস্বীকার করা এবং যে ব্যক্তি কুফরী মতবাদের প্রবর্তন করে অথবা কুফরীর দিকে আহবান জানায় তাকে অস্বীকার করা।

প্রশ্ন: ত্বাগুতকে অস্বীকার করা কেন অপরিহার্য?

উত্তর: ত্বাগুতকে অস্বীকার করা অপরিহার্য। কারন:

- সালাত, যাকাত বা অন্যান্য ইবাদতের পূর্বে আল্লাহ আদম সন্তানদের আদেশ করেছেন তা হল আল্লাহর (সুব:) প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং ত্বাগুতকে পরিত্যাগ ও অস্বীকার করা।
- ত্বাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে এই দ্বীনের মূল এবং ভিত্তি। সুতরাং তাগুতকে বর্জন না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হবে অর্থহীন।
- এই বিশ্বাসের অবর্তমানে কোন দাওয়া, জিহাদ, সালাত, সাওম, যাকাত বা হজ্জ কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তিকেই জাহান্নামের

আগুন থেকে বাচাঁনো যাবে না যদি সে এই ভিত্তির প্রতি ঈমান না এনে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

"যারা ত্বাগুতের ইবাদত হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমূখী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।" (সুরা যুমার ৩৯:১৭)

- সমস্ত নাবী রাসুলদের মূল দাওয়াতই ছিল আল্লাহর ইবাদত করা এবং ত্বাগুতকে অস্বীকার করার জন্য।

প্রশ্ন: তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন 'ঈমান বিল্লাহ' বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা হচেছ আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এবং তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী (আসমা ও সিফাত) এর ক্ষেত্রে একত্বকে স্বীকার করে নেয়া এবং এমন সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্বকে মেনে নেয়া যা একমাত্র তাঁরই জন্য প্রযোজ্য। (আল্লাহর প্রতি ঈমান এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শেষদিকে রয়েছে)

শিরক

শিরকের পরিচয়, প্রকারভেদ ও ভয়াবহ পরিনাম

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটি ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং কেহ আল্লাহর শরীক্ করলে সে এক মহাপাপ আরোপ করে।"

সুরা নিসা ৪:৪৮

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ: "কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।"

সুরা মায়েদা ৫:৭২

পঞ্চম অধ্যায়ঃ শিরক

প্রশ্ন: শিরক্ কি?

উত্তরঃ শির্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ- অংশীদারিত্ব, অংশীবাদ, মিলানো, সমকক্ষ করা, অংশীস্থির করা, সমান করা, ভাগাভাগি, সম্পৃক্ত করা।

ইংরেজীতে Poytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস), Share, Partner, Associate.

উপরোক্ত সককটি অর্থের মধ্যে মিশ্রণ এবং মিলানো অর্থ পাওয়া যায়। যেমন অংশ অর্থে ব্যবহার করলে মিশ্রণ এবং মিলানো অর্থ দুটো এভাবে সে যায় যে, এক অংশিদার অপর অংশিদারের সাথে সংমিশ্রিত থাকে এবং তার অংশ অপর জনের অংশের সাথে মিলানো থাকে। আল্লামা রাগেব ইস্পাহনী (রঃ) তার 'মুফরাদাত" গ্রন্থে বলেনঃ 'শিরক হচ্ছে দুই স্বত্তাধিকারীর মিশ্রণ। আবার কেউ বলেন, কোন বস্তু বা বিষয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হওয়াকে শিরক বলে।

শিরকের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, এতে দুই শরীকের অংশ সমান হওয়া আবশ্যক নয়। বরং শতভাগের একভাগের অংশীদার হলেও তাকে অংশিদার বলা হবে। তাই আল্লাহ (সুবঃ) এর হকের সামান্যতম অংশও অন্য কাউকে দিলে তা শিরকে পরিণত হবে। এতে আল্লাহর অংশটি যত বড়ই রাখা হোক না কেন।

শিরকের পারিভাষিক অর্থঃ

ওলামাগণ শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। অর্থের দিক থেকে এগুলো সব এক হলেও ভাষাগতভাবে ভিন্ন।

একঃ সিহাহ ও মিছবাহ গ্রন্থকারদ্বয় শিরককে কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দুইঃ আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী বড় শিরকের সংজ্ঞায় বলেছেনঃ 'আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করা।" আর ছোট শিরকের সংজ্ঞায় বলেছেনঃ কোন বিষয়ে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহর প্রতি লক্ষ্য করা।

তিনঃ আল্লামা রাবি ইবনু হাদী আল মাদখালী (রঃ) বলেনঃ শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোন সমকক্ষ স্থীর করা যাকে আল্লাহর মতই ডাকা হয়, ভয়

করা হয়, তার কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতই তাকে ভালবাসা নিবেদন করা হয়, তার কোন প্রকারের ইবাদাত করা হয়।

চারঃ ডঃ ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদ আল-বুরাইকান তাঁর 'আল-মাদখাল' নামক গ্রন্থে বলেন, শিরকের দুটো অর্থ রয়েছে। প্রথমতঃ আম বা সাধারণ অর্থ। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা রূবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, আসমাউস সিফাত এর মধ্যে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমান মনে করা। এখানে সমান মনে করা অর্থ হল, গায়রুল্লাহকে যে কোন একটি অংশ, চাই তাতে আল্লাহ গায়রুল্লাহর সমান হন কিংবা তাঁর চেয়ে বড় অংশের অধিকারী হন। দ্বিতীয়তঃ খাছ বা নির্দিষ্ট অর্থ। আর তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা। এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন-সুন্নাহ ও সালফে-সালেহীনের বক্তব্যের মধ্যে শিরকের এ অর্থটিই সচারচর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। শিরক বলতে সাধারণত তারা ইবাদতের শিরককেই বুঝান।

কেউ কেউ শিরকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ "যেসব গুনাবলী কেবল আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত সেসব গুনে অন্য কাউকে গুনান্বিত ভাবা বা এতে অন্য কারো অংশ আছে বলে মনে করাই শিরক্।"

কারো কারো মতেঃ শিরক্ হচ্ছে আল্লাহর সাথে এমন বিষয়ে সমকক্ষ স্থীর করা যেটা আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কারো নিকট আশা করা, আল্লাহর চাইতে অন্য কাউকে বেশী ভালবাসা, অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের কোন একটি অন্যের দিকে সম্বোধন করাকে শিরক্ বলে। তাওহীদুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত মানুষের সকল বিশ্বাস, কথা ও কাজে আল্লাহর এককত্বের উপলব্ধি ও মেনে চলা। পক্ষান্তরে শিরক্ হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইমাম কুরতুবী বলেন, শিরক্ হল আল্লাহর নিরংকুশ প্রভূত্বে কারো অংশীদারিত্বের আক্বীদা পোষণ করা।

আক্বীদার পরিভাষায়, শিরক্ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কোন বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা।

প্রশ্ন: শিরকের ভয়াবহতা কি?

উত্তর: শির্কের পরিণাম ভয়াবহ। এটি মানুষের চুড়ান্ত ধ্বংস ডেকে আনে। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে এর ভয়াবহতার স্বরূপ তুলে ধরা হল:

১। শিরক্ সবচেয়ে বড় অপরাধ, বড় জুলুম। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان/١٣)

অর্থ: "আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম।" (সুরা লুক্মান ৩১:১৩) এ আয়াতে শিরককে সবচেয়ে বড় জুলুম বলা হয়েছে। জুলুম মানে হল, কোন জিনিষ অপাত্রে স্থাপন করা, একের জিনিষ অন্যকে দেয়া। অতএব শিরক নামক জুলুমের মানে হল, আল্লাহর জিনিষ আল্লাহকে না দিয়ে অন্যকে দেয়া। শিরককারীরা এ জুলুমটি তিন ভাবে করে থাকে।

(ক) আল্লাহর কোন সিফাত বা গুণ সৃষ্টির উপর প্রয়োগ করা যেমন: ইলমূল গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান কোন সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করা। আল্লাহর এ গুন দ্বারা সৃষ্টিকে বিশেষিত করা।

(খ) আল্লাহর কোন কাজ সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করা। যে কাজ আল্লাহ করেন সে কাজটি অন্য কেউ করছে বলে উক্তি করা। যেমন: রোগ নিরাময়। এটি আল্লাহর কাজ। কেউ যদি বলেন ডাক্তার নিরাময় করেছেন তাহলে সে আল্লাহর কাজটি ডাক্তারের সাথে সম্পৃক্ত করল।

(গ) আল্লাহর জন্য করণীয় কোন ইবাদত সৃষ্টির জন্য করা। যেমন: সেজদা, এটি আল্লাহর পাওনা। এটি অন্য কাউকে দিলে আল্লাহর পাওনা অপরকে দিয়ে দেয়া হল। এভাবে আল্লাহর পাওনা ও হকগুলো যেগুলো ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহর ছাড়া কারো নেই অন্যকে দেয়া সবচেয়ে বড় জুলুম। যে এমনটি করে তার থেকে বড় জালিম আর কেউ নেই।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি?" রাসুল (সা:) বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা, অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সহীহ বুখারী ৪৭৬১)

২। শিরকের গুনাহ আল্লাহ্ (সুব:) ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا [النساء/٤٨)

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটি ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং কেহ আল্লাহর শরীক্ করলে সে এক মহাপাপ আরোপ করে।" (সুরা নিসা ৪:৪৮) হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعْ الْحِجَابُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا وُقُوعُ الْحِجَابِ قَالَ أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ

অর্থ: "জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, নবী (সা:) বলেছেন- "বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষন পর্যন্ত হিযাব বা পর্দা পতিত না হয়।" বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল! হিযাব বা পর্দা কি?" তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক্ করা।" (মুসনাদে আহমদ ২১৫২৩; ইবনে কাছীর ১ম খন্ড ৬৭৮পৃ:)

৩। শিরক্ করলে জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ [المائدة/٧٢)

অর্থ: "হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।" (সুরা মায়েদা ৫:৭২)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

অর্থ: "ইবনে নুমাইর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুল (সা:) কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক্ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে ।" (সহীহ মুসলিম ২৭৮)

৪ । শিরক্ করলে সব আমল বাতিল হয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় । আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر/٦٥)

অর্থ: "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই ওহী হয়েছে তুমি আল্লাহর সাথে শরীক্ করলে তোমার আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ ।" (সুরা যুমার ৩৯:৬৫)

সুরা আন'আমের ৮৩-৮৭ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) **১৮** জন নবীর নাম নিয়ে তাদের ব্যাপারে বলেছেন:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام/٨٨)

অর্থ: "যদি তারা শিরক্ করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত ।" (সুরা আন'আম ৬:৮৮)

৫ । শিরক্কারী ধ্বংসে এবং বিপর্যয়ে পতিত হয় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [الحج/٣١)

অর্থ: "যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল ।" (সুরা হাজ্জ ২২:৩১) রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে ।" সাহাবাগণ

বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল সেগুলো কি?" রাসুল (সা:) বললেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু---------- ।" (সহীহ বুখারী ২৭৬৬; সহীহ মুসলিম ২৭২)

৬ । শিরক্কারী মুশরিক ও অপবিত্র । তার জন্য দোয়া করা যাবে না, এরা সৃষ্টির অধম । আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التوبة/٢٨)

অর্থ: "নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র ।" (সুরা তাওবাহ ৯:২৮)

আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة/١١٣)

অর্থ: "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী ও মু'মিনদের সংগত নয়, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী ।" (সুরা তাওবাহ ৯:১১৩) আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ [البينة/٦)

অর্থ: "আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফেররা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে । তারাই সৃষ্টির অধম ।" (সুরা বাইয়্যেনাহ ৯৮:৬)

প্রশ্ন: শিরক্ না করতে আমাদের প্রতি নির্দেশ কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) নির্দেশ দিয়েছেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا [النساء/٣٦)

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না ।" (সুরা নিসা ৪:৩৬)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف/١١٠)

অর্থ: "বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি এই ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ । সুতরাং যে তার রবের

সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (সুরা কাহফ ১৮:১১০)

আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [يونس/١٠٥]

অর্থ: "আর উহা এই যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না।" (সুরা ইউনুস ১০:১০৫)

মু'আয বিন জাবাল (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ (সা:) আমাকে বলেছেন: لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ "আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক্ করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা পুড়িয়ে মারা হয়।" (মুসনাদে আহমাদ ২২০৭৫)

প্রশ্ন: শিরকের ক্ষতিকর দিক ও বিপদসমূহ কি কি?

উত্তর: শির্‌কে অনেক অনিষ্টকর দিক আছে। ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে তার ক্ষতিকর প্রভাবগুলো তুলে ধরা হলো:

- শির্‌ক মানবতার জন্য অবমাননাকর মানুষের সম্মানকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে ও তার সামর্থ্যকে নিচু করে দেয়।
- শির্‌কের কারণে সমস্ত আজেবাজে কুসংস্কার ও বাতিল রুসূমাত মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে ।
- শির্‌ক সবচেয়ে বড় যুলুম।
- শির্‌ক হচ্ছে সমস্ত কল্পনা ও ভয়ের মূল কারণ। শিরককারীর মাথায় কুসংস্কার বাসা বাঁধতে শুরু করে এবং সমস্ত আজেবাজে কথা ও কাজকে সে গ্রহণ করতে থাকে, ফলে সমস্ত দিক থেকেই সে ভয় পেতে শুরু করে।
- শির্‌কের কারণে নেক আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায়।
- শির্‌ক উম্মতকে টুকরো টুকরো করে দেয়।

প্রশ্ন: শির্‌ক না করার ফযীলত কি?

উত্তর: শিরক না করলে আল্লাহ (সুব:) নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শির্‌ক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।" (সুরা আন'আম ৬:৮২)

শিরক না করলে আল্লাহ (সুব:) শাস্তি দিবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عن معاذ رضي الله عنه قال : كنت ردف النبي صلى الله عليه و سلم على حمار يقال له عفير فقال (يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله) . قلت الله ورسوله أعلم قال (فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا

অর্থ: "মুয়ায (রা:) থেকে বর্নিত তিনি বলেন- আমি উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে নাবী (সা:) এর পেছনে বসেছিলাম। নাবী (সা:) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি কি জান বান্দার নিকট আল্লাহর হক্ কি?" আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেন: "বান্দাহর নিকট আল্লাহর হক্ হল বান্দাহ তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর বান্দাহর নিকট আল্লাহর অধিকার হলো তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না।" (সহীহ বুখারী ২৬৪৬)

শিরক না করলে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

অর্থ: "আবু যর (রা:) নাবী (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, নাবী (সা:) বলেন- "জিব্রাঈল এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক্ স্থাপন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে।" আবু যর বললেন, যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও কি? নাবী (সা:) বললেন, "হ্যাঁ যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও"। (সহীহ বুখারী ১২৩৭) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

অর্থ: "জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি নাবী (সা:) এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, জান্নাত এবং জাহান্নাম ওয়াজিব কারী বস্তু দু'টি কি কি? তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মারা গেল সে জাহান্নামী।" (সহীহ মুসলিম ১৭৭)

প্রশ্ন: শিরকের কারনগুলো কি কি?

উত্তর: কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে আমরা এখানে শির্কের ৪ টি কারণ উপস্থাপন করছি, যেন সকলে এগুলো জেনে শির্ক থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কারণগুলো হলো:

১। আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা ও খারাপ মনেবৃত্তি পোষণ করা:

মন্দ ধারণাই শিরকের নেপথ্য কারণ। যে কোন শিরকের পেছনে আল্লাহ সম্পর্কে কোন না কোন দোষ-ক্রুটি ও মন্দ ধারণা কাজ করে। ভালবাসার বিপরিত এই মন্দ ধারণা পোষণ করার কারণেই মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করে। গাইরুল্লাহকে তার জন্য আল্লাহর চেয়ে অধিক দয়ালু ও কল্যাণকামী মনে করে। আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা মহা পাপ। এর জন্য রয়েছে মহ শাস্তি। আল্লাহ বলেন:

{وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } [الفتح : ٦)

অর্থ: "আর যেন তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষকে যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে; তাদের উপরই অনিষ্টতা আপতিত হয়। আর আল্লাহ তাদের উপর রাগ করেছেন এবং তাদেরকে লা'নত করেছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জাহান্নাম; এবং গন্তব্য হিসেবে তা কতইনা নিকৃষ্ট!" (সুরা ফাতাহ ৪৮:৬)

মুশরিকদের এই মন্দ ধারণার বিরূদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে তাওহীদের ঈমাম ইবরাহিম (আ:) তাঁর চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও মূর্তিপূজারী জাতির সামনে দিয়েছিলেন পবিত্র কুরআনে তা এভাবে উদ্বৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٨٥) أَئِفْكًا آَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٧ [الصافات/٨٥–٨٧)

অর্থ: "তোমরা কিসের পুজা করছ? তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা অলীক মা'বুদগুলোকে চাও? তাহলে বিশ্ব জাহানের রব সমন্ধে তোমাদের কি ধারণা?" (সুরা সাফফাত ৩৭:৮৫-৮৭)

এ কথার মর্ম হলো, তোমরা রাব্বুল আলামীনের মধ্যে কী ধরনের দোষ ক্রুটি ও মন্দের ধরণা পোষণ করছ? যার ফলে তাঁকে পরিত্যাগ করেছ এবং তাঁর পরিবর্তে এতসব মা'বুদ ও দেবতা বানিয়ে নিয়েছ? আল্লাহর সত্তা তাঁর গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে তোমরা কি ধরনের খারাপ মনোবৃত্তি পোষণ করছ? কী ধরনের দোষ-ক্রুটি তাঁর মধ্যে আছে বলে ধারণা করছ? কী ধরনের অক্ষমতা, অপারগতা, করুণার অভাব তাঁর মধ্যে আছে বলে তোমরা মনে করছ? যার ফলে সরাসরি তার ইবাদত না করে ভায় ও মাধ্যমের পূজা করছ? তাদের কাছেই কল্যাণের প্রত্যাশা করছ? এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের শরণাপন্ন হচ্ছ?

বস্তুত মুশরিকরা মনে করে যে, আল্লাহ তাদেরকে দয়া করবেন না। এজন্যই তারা মাধ্যম ও ভায়া মা'বুদের ইবাদত করে। আল্লাহর নিকট এসব ভায়া মা'বুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তাদেরকে ভাল না বাসলেও ভায়া মা'বুদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের কল্যাণ করতে বাধ্য। ভায়া মা'বুদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের কল্যাণ করতে বাধ্য। ভায়া মা'বুদরা সুপারিশ করলে সে সুপারিশ আল্লাহ (সুব:) বাতিল করতে পারেন। এর জবাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (٧٣) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } [الحج : ٧٣ ، ٧٤)

অর্থ: "হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল। তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।" (সুরা হজ্জ ২২:৭৩-৭৪)

যারা সম্মিলিত শক্তি দিয়ে একটি মাছি সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। মাছি তাদের কিছু ছিনিয়ে নিলে তা উদ্ধার করতেও সক্ষম নয়। তারা তোমাদের জন্য কি কল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে। অথবা তোমাদের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে নিজ ক্ষমতাবলে কিইবা উদ্ধার করে আনতে পারে? মাছির কাছে যারা পরাজিত, মহাশক্তিধর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে তারা কীভাবে বিজয়ী হতে পারে? আল্লাহর কাছ থেকে কিছু উদ্ধার করে আনা তো দূরের কথা, তাঁর সন্তুষ্টি ও অনুমোদন ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

আল্লাহর রহমান নামের অর্থ হল স্বভাবগত দয়ালু, করুণায় পরিপূর্ণ সত্তা। যাঁর দয়া পাবার জন্য কোন ভায়া বা মাধ্যমের সুপারিশের কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি স্বভাবগতভাবেই তাঁর সৃষ্টিকে দয়া করেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন:

{وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} [الأعراف : ١٥٦]

অর্থ: "আমার দয়া প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।" (সুরা আ'রাফ ৭:১৫৬)

নবী ও পুন্যবানদের যে সুপারিশ আল্লাহ তাঁর তাওহীদবাদী বান্দাদের জন্য অনুমোদন করেছেন, তা তো নবী ও পুন্যবানদের রহমত ও করুণা নয় বরং কেবলমাত্র তাঁরই করুণার বহি:প্রকাশ। যার মাধ্যমে নবী ও পুন্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আল্লাহর ক্বারীব নামের অর্থ হল নিকটবর্তী। যিনি জ্ঞান, শ্রবন, দর্শন, হেদায়াত, সাহায্য-সহযোগিতায় বান্দাদের সরাসরি নিকটে। বান্দা ও তাঁর মধ্যে কোন প্রহরী-দারোয়ান ও পরিষদবর্গ দিয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়নি। তিনি তো দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের মত নন যে, প্রহরী-দারোয়ান ও পরিষদবর্গের অন্তরায় ডিঙ্গিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে যেতে হবে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة : ١٨٦]

অর্থ: "আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই।" (সুরা বাকারা ২:১৮৬)

ভায়া বা মাধ্যম গ্রহণের কোনই প্রয়োজন নেই। এমনকি তাঁকে ডাকতে বড় শব্দ করে ডাকারও প্রয়োজন নেই। যাকে তোমরা ডাক, তিনি বধির নন, দূরবর্তীও নন। তিনি তো সর্ব শ্রোতা, সন্নিকটবর্তী। আল্লাহকে এমন মনে করা মস্ত বড় মন্দ ধারণা করার শামীল। আর আল্লাহর সাথে কোন মন্দ ধারণা করাই শিরক ও ধ্বংসের নেপথ্য কারণ। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

অর্থ: "তোমাদের ঐ মন্দ ধারণা যা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে পোষণ করতে, তাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে, যার ফলে তোমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছ।" (সুরা ফুসসিলাত ৪১:২৩)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (র:) বলেন:

فادخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن سوء

অর্থ: "আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর মধ্যে ভায়া মাধ্যমের অনুপ্রবেশ ঘটানো হল তাঁর একত্ববাদ, মা'বুদ হওয়ার বৈশিষ্ট্য ও তাঁর প্রতিপালনের অধিকার ক্ষুন্ন করা ও তাঁর সাথে দোষ-ক্রটি ও মন্দ ধারণা পোষণ করার নামান্তর। (আল জাওয়াবুল কাফী ১/১৫১)

২। সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা: আল্লাহর সাথে শিরকের অন্যতম কারণ হচ্ছে, সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى : ١١]

অর্থ: "তাঁর সমতুল্য কোন কিছুই নেই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সুরা শুরা ৪২:১১) আল্লাহ (সুব:) আরো বলেন:

{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص : ٤]

অর্থ: "তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সুরা ইখলাস ১১২:৪) অন্যত্র তিনি বলেন:

{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} [البقرة : ٢٢]

অর্থ: "তোমরা তাঁর জন্য সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।" (সুরা বাকারা ২:২২)
তিনি আরো বলেন:

{هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا } [مريم : ٦٥]

অর্থ: "আপনি তাঁর সমমান কাউকে জানেন?" (সুরা মারইয়াম ১৯:৬৫)

কিভাবে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য করা হয়:

১. যে ব্যক্তি তার দুআ-প্রার্থণা, ভয়, আশা-ভরসা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করল সে এসব কাজে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সমতুল্য করে ফেলল।

২. যে ব্যক্তি তার প্রণয়-বিনয়, দাসত্ব-আনুগত্য সর্বশক্তিমান আল্লাহকে না দিয়ে শক্তিহীন, নি:স্ব, মুখাপেক্ষী, ব্যক্তিগতভাবে সর্বহারা ও সর্বগুণহীন দাস-দাসীকে দিল সে ঐ দাস-দাসীকে আল্লাহর সমতুল্য করে নিল।
সার্বভৌম ক্ষমাত, নিরঙ্কুশ মালিকানার অধিকারী, স্বয়ং সম্পূর্ণ, সর্বগুণে গুণান্বিত, সকল দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র, উপমাহীন, তুলনাহীন, সমকক্ষহীন, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রাব্বুল আলামীনের সাথে গাভী, তুলসী গাছ, মাটি ও খড় কুটোর তৈরী মূর্তি, সৃজিত ও লালিত-পালিত দাসানুদাসদেরকে তুলনা করা কত বড় কদর্য, কুৎসিত, বিশ্রী ও মন্দ তুলনা তা কি আর ভাষায় ব্যক্ত করা যায়।

৩. নবী, ফেরেশতা, জ্বীন, ওলী-আউলিয়া, পোপ-ফাদার, পুরোহিত, পীর বাবা, খাজা বাবা, দয়াল বাবা, উলঙ্গ ফকির, কবর-মাজারস্থ মৃত ব্যক্তি, মূর্তি-দেবতার কাছে মানুষের লাভ-ক্ষতি, দান ও বঞ্চনার ক্ষমতা আছে বলে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, এসব বিষয়ে তাদেরকে আল্লাহর সমতুল্য করল।

৪. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করল সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল।

৫. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর ভরসা করল সে ব্যক্তি তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল।

৬. যে ব্যক্তি সশ্রদ্ধভাবে আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করল সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল।

৭. সে ব্যক্তি অহংকার করল, মানুষকে তার প্রশংসা ও তার সামনে বিনয় প্রকাশ করার জন্য বলল, নিজেকে মানুষের আশা-ভরসাস্থল বলে প্রকাশ করল, মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা বলে দাবি করল, আল্লাহর আইন-বিধান পরিবর্তণ করে নিজেই আইন-বিধান তৈরী করল সে নিজেকে আল্লাহর সমতুল্য করল।

৮. যে ব্যক্তি নিজেকে শাহানশাহ (রাজাধিরাজ), মালিকুল আমলাক, সুলতানুস সালাত্বীন, আমীরুল উমারা, আহকামূল হাকিমীন, কাজীউল কুজাত নামকরণ করল সে নিজেকে আল্লাহর সমতুল্য করল। রাসুলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الْأَسْـــمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِك الْأَمْلَاك قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ شَاهْ

অর্থ: "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত বিরাগভাজন ব্যক্তি সেই যাকে রাজাধিরাজ বলা হয়।" (সহীহ বুখারী ৬২০৬; ভারতীয় ছাপা ২য় খন্ডের ৯১৬ পৃষ্ঠার ৩নং টিকা সহ দ্রষ্টব্য)

৯. যে ব্যক্তি আব্দুল কাদের জীলানীকে 'গাওছুল আযম' (সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা) বলল সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল এবং তাঁর চেয়েও বড় সাব্যস্ত করল।

১০. যে ব্যক্তি বলল, مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِــئْتَ 'যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন'। একথা কাউকে বললে সে তাকে আল্লাহর সমতুল্য করল। রাসূলুল্লাহ (সা:) কে এক ব্যক্তি এ কথাটি বললে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য করে ফেললে? বরং এক আল্লাহ যা চান (তাই সংঘটিত হয়)।
অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) লোকদেরকে এ কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন: مَا شَاءَ اللَّـــهُ ثُـــمَّ شِـــئْتَ "যা আল্লাহ চেয়েছেন অত:পর আপনি চেয়েছেন।" (সুনানে নাসায়ী ৩৭৮২; সুনানে ইবনে মাজাহ ২১১৭)
শিরককারীদের এসব অমর্যাদাকর সমতুল্য করণ বাতিল করার উদ্দেশ্যে কুরআনুল কারীমের মধ্যে মহান আল্লাহ (সুব:) নিজের জন্য দুটো উপমা উপস্থাপন করেছেন:
প্রথম উপমা:

{ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [النحل : ٧٥)

অর্থ: "আল্লাহ উপমা পেশ করেছেন; একজন অধিনস্ত দাস যে কোন কিছুর উপর ক্ষমতাা রাখে না। আর একজন যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিযক দিয়েছি, অত:পর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।" (সুরা নাহ্ল ১৬:৭৫)

দ্বিতীয় উপমা:

{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [النحل : ٧٦)

অর্থ: "আর আল্লাহ উপমা পেশ করেছেন, দু'জন ব্যক্তি, তাদের একজন বোবা, যে কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না এবং সে তার অভিভাবকের উপর বোঝা। তাকে যেখানেই পাঠানো হয়, কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সে আর ঐ ব্যক্তি কি সমান, যে ন্যায়ের আদেশ করে এবং রয়েছে সরল পথের উপর?" (সুরা নাহ্ল ১৬:৭৬)

প্রথম উপমাটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর দ্বিতীয় উপমাটি তিনি প্রয়োগ করেছেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ মাল ও জ্ঞানে তাঁর সাথে সৃষ্টির কোন তুলনাই চলে না যেমনি চলে না অন্য কোন ক্ষেত্রেও। আল্লাহ (সুব:) তাঁর বান্দাদেরকে তাদেরই অবস্থা দিয়ে নিজের মর্যাদা ও সমতুল্যহীন হওয়ার বিষয়টি কত সুন্দরভাবেই না বুঝালেন।

মানব সমাজে অক্ষম ও সম্পূর্ণ নি:স্ব কোন ক্রীতদাস এবং ধনবান, বিত্তশীল দানবীর ব্যক্তিকে মর্যাদার দিক থেকে কেউই এক সমান মনে করে না যেমন, তেমনি মূক, অক্ষম, অপরের উপর বোঝা, কল্যাণকর কাজে যোগ্যতাহীন, মূর্খ-আহমক কোন ব্যক্তিকে একজন সুশিক্ষিত, ন্যায়-নীতিবান জ্ঞানী ব্যক্তির সমান কেউ মনে করে না। মানব সমাজে কি কখনো কোন ব্যক্তি নি:স্ব, হতদরিদ্র কাঙ্গালের দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কিছু

পাবার আশায় যায়? অথবা কখনো কি কেউ কোন বোবা ও বধির, মূর্খ ও জ্ঞানহীন নাদানের নিকট জ্ঞান শেখার আশায় ধর্ণা দেয়? তাই যদি হয় তোমাদের নিজেদের অবস্থা, তবে কীভাবে সকল সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক, সকল জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিকারী, সর্ববিষয়ে ন্যায়নীতিবান মহান আল্লাহকে তাঁর সৃজিত, লালিত-পালিত, নি:স্ব, জাত মূর্খ, জাত কাঙ্গাল দাসানুদাসাদেরকে তাঁর সমতুল্য করছ? কীভাবে নি:স্ব, কাঙ্গাল, জাত ফকিরদেরকে দুআ ইবাদাত নিবেদন করছ? আমাকে ছেড়ে নিষ্প্রাণ লক্ষ্মীর কাছে ধন আর স্বরস্বতীর কাছে জ্ঞান প্রার্থনা করছ। কীভাবে আমার প্রাপ্য মূর্তিকে দিচ্ছ? এই কি তোমাদের ন্যায় বিচার! এটাই কি তোমাদের জ্ঞানের পরিচয়। এটা কি তাঁর আত্মমর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী নয়? এটা কি সবচেয়ে বড় জুলুম ও অবিচার?

সৃষ্টিকে আল্লাহর সমতুল্য করা শিরকে আকবার। তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করলে যার পরিণাম চির জাহান্নাম। এহেন শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিরা জাহান্নামে পতিত হয়ে যে উক্তি করবে কুরআনে তা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে:

{تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

অর্থ: আল্লাহর কসম! আমরা (জাহান্নামবাসী) সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে (পূজিত) রাব্বুল আলামীনের সমতুল্য করেছিলাম। (সুরা শুয়ারা ২৬:৯৭-৯৮)

৩। আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা না দেয়া: শিরক মানে আল্লাহর সমস্ত মর্যাদাকে অস্বীকার করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [الزمر/٦٧)

অর্থ: "তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র মহান তিনি। তারা যাকে শরীক করে তিনি তাঁর উর্দ্ধে।" (সুরা যুমার ৩৯:৬৭)

৪। আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মুর্খতা: শিরকের কারণ সমূহের মধ্যে এটি হল অজ্ঞতা ও মুর্খতা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ [الزمر/٦٤)

অর্থ: "বলুন, হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ?" (সুরা যুমার ৩৯:৬৪)

প্রশ্ন: সাধারন ও বিস্তৃত অর্থে শিরক্ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর: সাধারন এবং বিস্তৃত অর্থে শিরক্ তিন প্রকার:

১। **শিরক্ ফিররুবুবিয়্যাহ:** শিরক্ ফিররুবুবিয়্যাহ হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্বে কাউকে তার সমকক্ষ করা। এই প্রকারের প্রচলিত শিরকগুলো হচ্ছে: আল্লাহ ছাড়া কাউকে আইন বিধান দাতা হিসেবে মানা, গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটদানের মাধ্যমে কাউকে আইন বিধানদাতা নির্বাচন করা, যাদু, তাবিজ-কবজ, শুভ-অশুভ সংকেত গ্রহন, কাউকে কল্যান-অকল্যানের মালিক, বিপদ রোগ-শোক থেকে মুক্তিদাতা, সন্তান দিতে পারে বলে মনে করা, আল্লাহর স্ত্রী বা সন্তান আছে বলে মনে করা ইত্যাদি।

২। **শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত:** তা হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর ক্ষেত্রে শিরক্ করা। আল্লাহর গুনাবলীর সাথে সৃষ্টির গুনাবলীর তুলনা করা। যেমন একথা বলা যে আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মত। তাছাড়া আল্লাহর গুন ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির আছে বলে বিশ্বাস করা। যেমন ভাগ্য গননা, রাশিচক্রে বিশ্বাস, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইলমুল গায়েব বা অদৃশ্য জানে বলে বিশ্বাস করা।

৩। **শিরক্ ফিল উলুহিয়্যাহ বা শিরক্ ফিল ইবাদাহ:** তা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা। যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দোয়া করা, সিজদা করা, অন্যের নামে নজর মানা, অন্যকে আল্লাহর মত ভয় করা, ভালবাসা, আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনের কাছে বিচার চাওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন: اَلشِّرْكُ الْخَاصُّ খাছ বা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক্ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর: খাছ বা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক হচ্ছে আল্লাহর (সুব:) সাথে গায়রুল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে শিরক্ করা। কুরআন-সুন্নাহ এবং সালফে সালেহীনগনের বক্তব্যের মধ্যে শিরকের এ অর্থটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

শিরক্ বলতে তারা সাধারনত ইবাদতের শিরককেই বুঝান। এই অর্থে শিরক তিন প্রকার-

১। اَلشِّرْكُ الْأَكْبَرُ আশ-শিরক্ আল আকবার বা বড় শির্ক।

এর অর্থ হল- আল্লাহর কোন সমকক্ষ স্থির করে আল্লাহর মত তার ইবাদত করা ও আনুগত্য করা। এই শিরক্ যে কাউকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।

২. اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرُ **আশ- শিরক্ আল আসগার বা ছোট শিরক্**। আর তা হচ্ছে আমলের কাঠামো ও মুখের কথায় গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ করা। অথবা কথায় ও কাজে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহর মনতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই শিরক্ অনেক বড় কবীরা গুনাহ, কিন্তু এটি মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না।

৩. اَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ **আশ্-শিরক্ আল খফী বা গোপন শিরক্**। আর তা হচ্ছে- হৃদয়ের এমন গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কমূলক কথা যাতে আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ সমান হয়ে যায়। এটি কখনও বড় শিরক্ আবার কখনও ছোট শিরক্ হতে পারে।

উপরোক্ত তিন প্রকার শিরক্ আবার অনেক প্রকারে বিভক্ত।

প্রশ্ন: اَلشِّرْكُ الْأَكْبَرُ শিরক আল আকবার বা বড় শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?

উত্তর: শিরকে আকবার এর প্রকার বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন: শিরক আল আকবার বা বড় শির্ক চার প্রকার-

প্রথম প্রকার: اَلشِّرْكُ فِي الدَّعْوَةِ শিরক্ ফিদ্-দাওয়াত বা আহবানে শির্ক: আল্লাহকে ডাকার মত গায়রুল্লাহকে ডাকা। সে ডাক কোন প্রাপ্তি বা মুক্তির জন্য হোক কিংবা শুধু ইবাদত বা বিনয় প্রকাশার্থে হোক। এ দোয়া তিনটি শর্তে শিরক্ হবে- ক) রূপক কোন অর্থ উদ্দেশ্য না করে বাস্তব অর্থে ডাকলে। খ) প্রার্থিত বিষয়টি আল্লাহ ছাড়া আর কারও অধিকারে না থাকলে। গ) প্রার্থনাকারী প্রার্থিত ব্যক্তির সামনে উপস্থিত না থাকলে অথবা মৃত হলে। যেমন-

* জীবিত পীর, খাজা, গাউস-কুতুবের কাছে সন্তান, রোগ নিরাময়, ব্যবসায় উন্নতি, বিপদ হতে পরিত্রান ও পরলৌকিক সুপারিশ ও মুক্তির প্রার্থনা করা। * কোন মৃত, কবরস্থ কিংবা অনুপস্থিত পীর দরবেশের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা। এর প্রমান আল্লাহ (সুব:) বলেন

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ [العنكبوت/٦٥)

অর্থ: "যখন তারা নৌকায় আরোহন করে তখন একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহকে ডাকে। অত:পর তিনি যখন, তাদের মুক্তি দিয়ে ডাঙ্গায় নিয়ে যান তখনই তারা শিরক করে ।" (সুরা আনকাবুত ৩৯:৬৫)

দ্বিতীয় প্রকার: اَلشِّرْكُ فِي الْـإِرَادَة শিরক্ ফিল ইরাদাহ বা নীয়্যাত, ইচ্ছা ও সংকল্পে শিরক: নিজের আমল দ্বারা সংক্ষেপে ও সবিস্তারে গায়রুল্লাহকে উদ্দেশ্য করা। এ শিরক্ আক্বীদাহ বিশ্বাসের মাঝে বিরাজ করে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র:) বলেন: এ শিরক্ হচ্ছে এমন এক সাগর যার কোন কুল কিনারা নেই। অনেক অল্প মানুষই এ থেকে পরিত্রান পেয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নিজ আমলের দ্বারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নৈকট্য কামনা করবে, তার কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করবে অথবা শুধু পার্থিব কল্যানের উদ্দেশ্যেই আমল করবে সে ব্যক্তি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত হবে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود/١٥، ١٦)

অর্থ: "যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে পুরোপুরিভাবে তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ কারিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হ'ল সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্যে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ হয়ে গেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বাত্বিল বলে গণ্য।" (সুরা হূদ ১১:১৫-১৬)

তৃতীয় প্রকার: اَلشِّرْكُ فِي الطَّاعَةِ শিরক্ ফিত তা'আ বা আনুগত্যের শিরক।

হুকুম বা বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ বিধান প্রনয়ন বা হুকুম প্রদান করা আল্লাহর হক বা অধিকার সমূহের অন্তর্ভূক্ত। * কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী মানব রচিত আইনের আনুগত্য উপরোক্ত প্রকারের শিরকে আকবারের অন্তর্ভূক্ত। * সুফীবাদের শিরকযুক্ত তরীকাহ সমূহে কুরআন-সুন্নাহর দলীল প্রমান ব্যতীত পীরের সমস্ত কথাকে মেনে নেয়াকে অপরিহার্য করা হয়। এসবগুলোই শিরকের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [التوبة/٣١)

অর্থ: "তারা আল্লাহ (সুব:) কে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার বিরাগী আলেমদিগকে তাদের রব রূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়মের পুত্র ঈসা সমীহকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল মাত্র একজন উপাস্যের (আল্লাহর) ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তারা যার সাথে তার শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।" (সুরা তাওবাহ ৯:৩১)

চতুর্থ প্রকার : اَلشِّرْكُ فِي الْمَحَبَّةِ মুহাব্বত বা ভালবাসার শির্ক।

আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে এমনভাবে ভালবাসা যে বান্দাহ গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) সামনে বিনীত বিগলিত ও তার দাস হয়ে যায়, চাই সে ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার সমান হোক বা কম বেশী হোক। শিরক্ আল মুহাব্বার উদাহরন হল- * মূর্তিপুজারী সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের বিভিন্ন মূর্তির প্রতি ভালবাসা। * কিছু নামধারী মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক গাউস, কুতুব, পীর ফকির, খাজা, দরগাহ- মাজার ইত্যাদির প্রতি ভালবাসা। * অপর কিছু সম্প্রদায় কর্তৃক আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির প্রতি অন্ধ ভালবাসা। * তরুন-তরুণী সম্প্রদায় কর্তৃক গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা, শিল্পীদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা। * পার্থিব জীবন, বিত্য-বৈভব, ভোগ-বিলাসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা যা আল্লাহ ও পরকালকে ভুলিয়ে দেয়। এগুলো এই শিরকের অন্তর্ভূক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِس عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: ধ্বংস হোক স্বর্ন মুদ্রার দাস, ধ্বংস হোক রৌপ্য মুদ্রার দাস, ধবংস হোক মোলায়েম চাঁদর ও মোটা চাঁদরের দাস। যদি তাকে এগুলো দেয়া হয় তাহলে সে খুশি আর যদি না দেয়া হয় তাহলে অসন্তুষ্ট।" (সহীহ বুখারী ৬৪৩৫; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪১৩৫) আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَــدُّ حُبًّا لِلَّهِ [البقرة/١٦٥]

অর্থ: "মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) সমকক্ষ বলে ধারণ করে তারা তাদেরকে আল্লাহর ভালবাসার মতোই ভালবাসে। আর যার মুমিন আল্লাহর জন্যই তাদের ভালবাসা প্রবল।" (সুরা বাকারাহ ২:১৬৫)

আবুল বাকা আল-হানাফী

আবুল বাকা আল-হানাফী তার 'কুল্লিয়্যাতে'র মধ্যে শিরককে অন্য আরো ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. শিরকুল ইস্তেকলাল (شرك الاستقلال) :

এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: দুজন ভিন্ন ভিন্ন বা স্বতন্ত্র মালিকানা সম্পন্ন শরীক সাব্যস্ত করা । অথবা আল্লাহর পাশাপাশি আরো দু'জন স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীক থাকার ধারণা পোষণ করাকে 'শিরকুল ইস্তেকলাল' বলা হয়। যেমন- অগ্নিপূজকদের শিরক; তারা যাবতীয় কল্যাণের বিষয়াদিকে 'ইয়াজদান' নামক দেবতার কাজ বলে মনে করতো, আর যাবতীয় অকল্যাণমূলক কাজকে 'আহরমন' নামক দেবতার কর্ম বলে মনে করতো। অথবা তারা আলোকে কল্যানের স্রষ্টা ও অন্ধকারকে অকল্যানের স্রষ্টা মনে করতো।

২. শিরকুত তাবয়ীদ (شرك التبعيض) :

একাধিক মা'বুদের সমন্বয়ে এক মা'বুদ হওয়ার বিশ্বাস করাকে 'শিরকুত তাবয়ীদ' বলা হয়। যেমন- খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের শিরক। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ, ঈসা (আ:) ও মারইয়াম (আ:) এর দ্বারা সমন্বিত একটি সত্তাই হচ্ছে মা'বুদ। মুসলিম দাবীদার হয়েও যারা মুহাম্মাদ (সা:) কে আল্লাহর জাতি নূর দ্বারা তৈরী অথবা আল্লাহর সত্তার অংশ অথবা তাঁর

রুহানী সত্তা মনে করে তারাও উক্ত শিরকে গেলে আক্রান্ত। যেমন: বেরেলভী ও পীর-সূফীদের একাংশের বিশ্বাস।

৩. শিরকুত তাকরীব (شرك التقريب) :

আল্লাহ (সুব:)র নিকটবর্তী করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহর উপাসনা করাকে 'শিরকুত তাকরীব' বলা হয়। যেমন: প্রাচীণ জাহেলী যুগের মূর্তিপুজারিদের শিরক, পোপ পূজারী খৃষ্টানদের শিরক, পুরোহীত পূজারী হিন্দুদের শিরক এবং পীর-মাশায়েখ পূজারী মুসলমানদের শিরক। কেননা এরা সকলেই যাদের পূজা করে তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দিবে এই আশায় পূজা করে। আরবের মুশরিকরা বলতো:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

"আমরা দেবতাদের উপাসনা কেবল এ-জন্যেই করছি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।" (সূরা যুমার ৩৯:৩)

৪. শিরকুত তাকলীদ (شرك التقليد) :

অন্যের অন্ধ অনুসরণে গায়রুল্লাহর উপাসনা করাকে 'শিরকুত তাকলীদ' বলা হয়। যেমন- আরব জনগণের শিরক, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণে মূর্তি পূজা করতো। যারা বর্তমানেও পূর্বপূরুষদের দোহাই দিয়ে পীর-পূজা, মাজার পূজা ইত্যাদিতে লিপ্ত তারাও এই প্রকার শিরকে আক্রান্ত।

৫. শিরকুল আসবাব (شرك الأسباب) :

কোন বিষয় আল্লাহর কারণে হয়েছে এমনটি না বলে অপর কোন বস্তুর প্রভাবে তা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা বা বলাকে শিরকুল আসবাব বলা হয়। যেমন- জড়বাদী ও প্রকৃতিবাদীদের শিরক, যারা যে কোন কল্যাণকে প্রকৃতির দান ও অকল্যাণকে প্রকৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া বলে বিশ্বাস করা। এ জগত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য আল্লাহর পরিকল্পনাকে স্বীকার না করে প্রকৃতিকেই এর পরিচালক বলে মনে করে।

৬. শিরকুল আগরায (شرك الأغراض) :

সম্পূর্ণ গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করাকে ‘শিরকুল আগরাদ’ বলা হয়। যেমনঃ প্রকৃত মুনাফিকদের সালাত। যা তারা কেবল মাত্র মানুষকে দেখানোর জন্যই আদায় করে থাকে।

শায়খ মুবারক ইবন মুহাম্মদ আল-মীলী শিরকে আকবারকে ভিন্নভাবে চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. শিরকুল এহতিয়ায (شـــرك الاحتيـــاز) অর্থাৎ স্বতন্ত্র মালিকানা ও স্বত্তাধিকারের শিরক। এর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো কোন অণু পরিমান বস্তুর উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিকানা রয়েছে বলে বিশ্বাস করাকে শিরকুল এহতিয়ায বলা হয়। কেননা আসমান যমিনে অনু পরিমান বস্তুর মধ্যেও আল্লাহ ভিন্ন কারো কোন মালিকানা নেই।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে:

অণুর ভিত্তি.......................................পরমানু
পরমানুর ভিত্তি..................................ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন।
ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এর ভিত্তি........ কোয়ার্ক
কোয়ার্কের ভিত্তি................................ফোটান বা আলোর কণা
ফোটানের ভিত্তি.................................ইনফরমেশনের বা তথ্যকণা।
ইরফরমেশনের ভিত্তি.......................... কুন ফাইয়াকুনের উপর।

অতএব, এ মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল বিস্তীর্ণ আকাশ পর্যন্ত সবকিছুই ‘কুন’ বা ‘হও’ নির্দেশের দ্বারা সৃষ্টি। যে নির্দেশটি দিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ। তাই এ মহা বিশ্বে আল্লাহর (সুবঃ) ছাড়া কারো স্বত্তাধিকারের দাবি সম্পূর্ণ অসত্য ও অবাস্তব।

২. শিরকুশ শিয়া’ (شرك الشياع) যৌথ মালিকানার শিরক:

এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ জগতের কোন বস্তুতে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো একচ্ছত্র মালিকানা না থাকলেও কোন কোন বস্তুতে আল্লাহর সাথে অন্যের যৌথ মালিকানা রয়েছে। যদিও উভয়ের মাঝে অবস্থান ও মর্যাদার দিক থেকে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহর সাথে এ ধরণের শরিকানাও অসম্ভব।

৩. শিরকুল এ’য়ানত (شـــرك الإعانـــة) অর্থাৎ সাহায্য সহযোগীতার শিরক:

এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ জগতের কোন কিছুতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মালিকানা বা শরিকানা না থাকলেও এর কোন কোন বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্যকারী রয়েছে। এ জাতিয় আক্বিদায় পোষণ করাও শিরক। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) স্বয়ম্ভু, সর্ব শক্তিমান, অমুখাপেক্ষী।

৪. শিরকুশ শাফা’আত (شرك الشفاعة) শাফাআতের শিরক।

এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ (সুবঃ)র দরবারে তাঁর বান্দাদের মাঝে এমন কতিপয় বান্দাও রয়েছেন যারা তাঁদের মর্যাদার বদৌলতে আল্লাহ (সুবঃ)র দরবারে তাঁর পূর্ব অনুমতি ছাড়াই নিজস্ব শাফা’আতের মাধ্যমে নিজ নিজ ভক্ত অনুরক্তদের আল্লাহ পাকড়াও থেকে নাজাত দিতে সক্ষম। অথচ এ আক্বিদাহ পোষণ করাও শিরক। কেননা আল্লাহ সন্তুষ্টি ও নির্দেশ ব্যতিত কেউ নিজ ক্ষমতা ও মর্যাদা বলে কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না।

শায়েখ মুবারক ইবনুল মুহাম্মদ তাঁর এ চার প্রকার শিরক প্রমাণের জন্যে পবিত্র কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ــ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْـــدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

অর্থ: “আল্লাহ (সুবঃ) ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য বলে ধারণা করেছ তারা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহ্‌র সহায়কও নয়। যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহ্‌র কাছে কারও শাফা’আত কারো জন্যে উপকারে আসবে না। (সূরা সাবা ৩৪:২২-২৩)

তিনি এ আয়াতটি উদ্ধৃত করে বলেন: এ আয়াত থেকে শিরকের কোন প্রকারই বাদ পড়ে যায় নি। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এ প্রকার

গুলো আল্লামা আবুল বাকা ও ইমাম ইবনুল কাইয়িম বর্ণিত প্রকার সমূহের সাথে সামাঞ্জস্যশীল। পার্থক্য শুধু ভাষা ও বর্ণনায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা:

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, উপকার একমাত্র তার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, যার মধ্যে এই চারটি গুনের একটি হলেও বিদ্যমান আছে।
এক: ইবাদতকারী তার কাছে যা আশা করে তার স্বতন্ত্র মালিক হওয়া।
দুই: স্বতন্ত্র মালিক না হলেও অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে যে কোন ভাবে মালিক হওয়া।
তিন: অংশিদার না হলেও সে জিনিষের ব্যাপারে মালিকের সাহায্য কারী হওয়া।
চার: সাহায্য কারীও না হলে অন্তত পক্ষে মালিকের কাছে কারো জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখা। আল্লাহ (সুব:) উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে শিরকের এই চারটি স্তরকেই ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ (সুব:) দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, **لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ** অর্থাৎ তার সার্বভৌমত্ব ও রাজত্বে অন্য কারো মালিকানা নেই। দ্বিতীয় অংশে **وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ** অর্থাৎ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতেও অন্য কারো মালিকানা নেই। তৃতীয় অংশে **وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ** অর্থাৎ তার কোন সাহায্য ও সহায়তাকারীও নেই। চতুর্থাংশে **وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ** অর্থাৎ তার কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতিত কারো জন্য সুপরিশ করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও কারো নেই। নবী-রাসূল ও পূণ্যবানদের সে সুপারিশ সাব্যস্ত করেছেন সেটা তার অনুমতিক্রমে হয় বলে তাতে মুশরিক ও অংশিবাদির কোন অংশ নেই। কারণ নাবী-রাসূল ও পূণ্যবানদের সুপারিশ তাওহীদবাদি বান্দা ছাড়া অন্য কেউ পাবে না।

প্রশ্ন: শিরক্ আল আসগার বা ছোট শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?

উত্তর: শিরকে আসগার বা ছোট শিরককে নিম্নোক্ত প্রকার সমূহে ভাগ করা যায়।

১. اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرُ الْقَوْلِيُّ কথাগত ছোট শিরক্। যা মুখের কথার দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন- গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর) নামে শপথ করা, আপনি চাইলে আর আল্লাহ চাইলে এ কাজটি হবে, আমি আল্লাহ এবং আপনার উপর ভরসা করছি, আমি আল্লাহ এবং আপনার হেফাজতে রয়েছি, আল্লাহ আর আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, এটি আল্লাহ এবং আপনার দান, কুকুরটি না হলে আজ ঘরে চোর ঢুকত, মাঝি বড় দক্ষ ছিল তাই আজ জীবন রক্ষা পেল, ড্রাইভারের দক্ষতায় বাসটি রক্ষা পেল, যেমন সার দিয়েছি তেমন ধান হয়েছে ইত্যাদি। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ . وَلَكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ)

অর্থ: "একদা এক ব্যক্তি নবী (স) কে বলল- আল্লাহ যা চেয়েছেন আর আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে), রাসুল (স) তাকে বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করলে? বল! আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ২১১৭; সুনানে নাসায়ী ৩৭৮২)

২. اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرُ الْعَمَلِيُّ কার্যগত ছোট শিরক্। অর্থাৎ এমন ছোট শিরক্ যা কর্মের দ্বারা সংহঠিত হয়। যেমন-যাত্রাকালে ঘরের দুয়ারে ভিখারী দেখে তাকে কুলক্ষন মনে করা, কাক মাথার উপর উড়ে যাওয়াকে কোন অকল্যানের পূর্বাভাস মনে করা, ভুতুম পেঁচার ডাককে কোন বিপদ বা মৃত্যুর দু:সংবাদ মনে করা, ভাগ্য গননার উদ্দেশ্যে গনকের কাছে যাওয়া, চোর ধরার জন্য বাটি, লাঠি ও বাঁশ চালান দেয়া, হারানো বস্তর সন্ধান লাভে মাটিতে রেখা অংকন, আয়না ও তৈল পড়াতে বিশ্বাস করা, চোর সনাক্ত করার জন্য রুটি পড়া বা চাল পড়া খাওয়ানো, হারানো বস্তর সন্ধান লাভের জন্য পীর-ফকির, দরবেশ, জ্বীন ও খনারের কাছে যাওয়া- এ ধরণের আরো অন্যান্য প্রচলিত কার্যাবলী শিরকের অন্তর্ভূক্ত। রাসুল (সা:) বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ». ثَلاَثًا

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'কুলক্ষন গ্রহন করা শিরক্।" (সুনানে আবু দাউদ ৩৯১২)

৩. اَلــشِّرْكُ الْقَلْبِـــيُّ হৃদয়গত শিরক্। যেমন- লৌকিকতা, সুনাম ও যশ লাভের আশা, কোন আমল করে তার দ্বারা শুধু দুনিয়া কামনা করা। যথা: * সক্ষম হওয়া সত্বেও বুজুর্গী প্রকাশের উদ্দেশ্যে দূর্বল ভঙ্গিমায় চলা, লম্বা তাসবীহ্ সারা দিন হাতে রাখা, তালিওয়ালা ও ছেড়া-ফাড়া পোশাক পরিধান করা। * ক্রেতার কছে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রমান করার জন্যে দোকানে বসে উচ্চস্বরে সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ ইত্যাদি ঘন ঘন পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

مَنْ صَامَ رِيَاءً فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ رِيَاءً فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ صَلَّى رِيَــاءً فَقَــدْ أَشْرَكَ

"যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করলো সে শিরক করল, যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার জন্য দান করল সে শিরক্ করল, যে ব্যক্তি অপরকে দেখাবার জন্য সালাত আদায় করলো সে শিরক্ করল।" (মুসনাদে বায্যাজ ২৬৬৩)

প্রশ্ন: الشرك الخفــي আশ্-শিরক্ আল খফী বা গোপন শিরক্ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: গোপন শিরক হচ্ছে হৃদয়ের এমন ইচ্ছা বা মুখের এমন কথা যাতে আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ সমান হয়ে যায়। অথচ সে ইচ্ছা বা কথা এমন সংগোপনে বিরাজ করে যে, তাকে সহজে শিরক্ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। এ শিরক্ কখনো শিরকে আকবার আবার কখনো শিরকে আসগার হয়ে থাকে। গোপনীয়তার কারণে এ শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি সঠিকভাবে তা নির্ণয় করতে পারে না। তাই বড় শিরক্ হওয়া সত্বেও তাকে ছোট শিরক মনে করে। আবার ছোট শিরক্ হওয় সত্বেও তাকে বড় শিরক্ মনে করে।

বস্তুতপক্ষে এ প্রকারটি শিরকে আকবার ও শিরকে আসগারের মধ্যে দোদুল্যমান একটি প্রকার। যা গোপন দুর্বোধ্য, অতি সংগোপনে অতি সন্তপর্নে ইচ্ছা ও কথার মধ্যে মিশে থাকে। এ প্রকারের শিরক الشر أخفي من

دبيب النمل علي صفاء ســوداء কঠিন কালো পাথরের উপর কালো পিপড়ার গুটি গুটি পায়ে চলার চেয়েও সুক্ষ্ম ও গোপন হয়ে থাকে। (আশ্ শিরকু ওয়া মাজাহিরুহু ৬৩)

জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন- রাসুল (সা:) বের হলেন অত:পর বললেন:

أيها الناس اتقوا الشرك الخفي الشرك الخفى أن يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل

"হে লোকসকল! তোমরা গোপন শিরক্ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। তারা বললেন- হে আল্লাহর রাসুল! গোপন শিরক্ কি? তিনি বললেন- কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করার জন্য দাড়াল, অত:পর পরিশ্রম করে সালাতকে সুন্দর করে আদায় করে, কেননা সে দেখেছে মানুষ তার প্রতি লক্ষ্য করছে। এটাই হল গোপন শিরক্।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২০৪, হাদীসটি হাসান)

আর-রিয়াঃ গোপন শিরক্

প্রশ্নঃ اَلرِّيَاءُ আর রিয়া কি?

উত্তরঃ রিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ লোক দেখানো, অবলোকন করানো, দৃশ্যমান করা। শরীয়তের পরিভাষায় রিয়া হচ্ছে "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন আমল করার অভিনয় করা অথচ নিয়্যত থাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টি অর্জন করা।" হতে পারে নিয়্যতটি সম্পূর্ণ মিথ্যা নিয়্যত যেথায় যে ব্যক্তি আমলটি করছে তার আল্লাহর (সুবঃ) ব্যপারে কোন চেতনা নাই, অথবা হতে পারে এটা আংশিকভাবে মিথ্যা নিয়্যত, যেথায় ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্ আছে কিন্তু এই সময়ে অন্য মানুষের প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা করে। এই সংজ্ঞা হতে দেখা যায় রিয়া অন্তরে সৃষ্টি হয়।

প্রশ্নঃ আমলের ক্ষেত্রে শিরকমুক্ত, বিশুদ্ধ নিয়্যাতের গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ আমলের ক্ষেত্রে শিরকমুক্ত, বিশুদ্ধ নিয়্যাত খুবই জরুরী। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

অর্থ: "সমস্ত কর্মকান্ডই নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকের জন্য তাই হবে, যার সে নিয়্যাত করেছে।" (সহীহ বুখারী ১; সহীহ মুসলিম ৫০৩৬; সুনানে আবু দাউদ ২২০৩)

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, "ইসলামের ভিত্তি তিনটি হাদীসের উপর দাঁড়িয়ে আছেঃ উমর (রাঃ)-এর হাদীস, "নিয়্যাত অনুযায়ী আমল (উপরে উল্লেখিত): নু'মান ইবন বশীরের হাদীস: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ "হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট----" (সহীহ বুখারী ২০৫১) এবং আয়িশা (রাঃ) হাদিস: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ "যে কেউ আমাদের ব্যাপারে (ইসলাম) নতুন কিছু প্রচলিত (বিদআত) করে যা এর সংশ্লিষ্ট নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" (সহীহ বুখারী ২৬৯৭)

প্রত্যেক ব্যক্তি তাই অর্জন করবে যা সে নিয়্যাত করেছে। তার পুরস্কার অর্জন নির্ভর করে সে যা নিয়্যাত করেছে তার উপর। এক্ষেত্রে যদি

নিয়্যাতটি ভাল কাজের জন্য হয়, কিন্তু একজন গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে কাজটি সম্পন্ন করতে সমর্থ হলো না, ব্যক্তিটি অবশ্যই কাজটির কল্যাণ অর্জন করবে। অপরদিকে কেউ যদি আমল করে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের সন্তুষ্টি বা প্রশংসা চায় তাহলে সে পুরষ্কারের পরিবর্তে শাস্তিযোগ্য হবে।

প্রশ্নঃ রিয়ার ভয়াবহতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে কেমনভাবে সতর্ক করেছেন?

উত্তরঃ রিয়ার ক্ষতি সমূহ অনেক। সুতরাং নবী (সাঃ) উম্মাহর প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং উদ্বেগের কারণে, অন্য কিছুর চেয়ে এর ভয়াবহতাকে বেশী ভয় করেছেন। মাহ্মুদ ইবন লাবীদ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ

অর্থ: "তোমাদের জন্য যে বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই তা হলো ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! ছোট শিরক কি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ রিয়া।" (মুসনাদে আহ্মাদ ২৩৬৩০)

অন্য হাদীসে নবী (সা) দেখিয়েছেন যে, তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রিয়ার ক্ষতিকেই বেশী মনে করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

অর্থ: "আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের নিকট আসলেন যখন আমরা দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম এবং বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়টা জানাব না

যাকে আমি তোমাদের জন্য ভয় করি, এমনকি দাজ্জালের ফিৎনা থেকেও অধিক? এটা হলো লুকানো শিরক। এক ব্যক্তি সালাতের জন্য দাঁড়ায় এবং তার সালাত সুন্দর করে কারণ সে মনে করে লোকজন তাকে দেখছে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২০৪)

প্রশ্ন: রিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি?

উত্তর: রিয়ার কিছু ক্ষতিকর দিকসমূহ আলোচনা করা হলো:

১। **ঈমান এবং তাওহীদ দূর্বল করে:** রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে, অর্থাৎ সত্যিকারভাবে আল্লাহর (সুব:) ইবাদতের পরিবর্তে সে আল্লাহর (সুব:) ইবাদতের ভান করে।

২। **ছোট আকারের শির্ক:** নবী (সা:) বলেন,

الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

অর্থ: "লুক্কায়িত শিরক হলো এক ব্যক্তি সালাতে দাঁড়ায় এবং সে তার সালাতকে সুন্দর করে কারণ সে দেখছে যে লোকজন তাকে লক্ষ্য করছে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২০৪)

৩। **পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পায়:** কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তিটি রিয়া করে তার অন্তরে রোগ আছে এবং যদি এই রোগ থেকে আরোগ্য না হয়, তাহলে এটা পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করবে।

৪। **কল্যাণ মূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হওয়া।** হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

অর্থ: " আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা:) ইরশাদ করেন: আল্লাহ (সুব:) বলেন, আমি সকল অংশীদার থেকে নিজেই সম্পূর্ণ যথেষ্ট, আমার কোনও অংশীদারের প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার মধ্যে সে আমার সাথে অন্যকে অংশিদার করে আমি তাকে এবং তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি।" (সহীহ মুসলিম ৭৬৬৬)

৫। **আল্লাহ্ কর্তৃক অবমাননা ও লাঞ্চনা।** হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ

অর্থ: "আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করে, আল্লাহ্ (সুব:) বিচার দিবসে তাঁর সকল সৃষ্টি লোকের সম্মুখে তাকে হীন ও অপদস্থ করবেন।" (মুসনাদে আহমদ ৭০৮৫)

৬। **জাহান্নামের আগুনে প্রবেশের জন্য প্রথম কারণ।** সহীহ হাদীসে বর্নিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ .ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِى النَّارِ

অর্থ: "আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি: ক্বিয়ামাতের দিন প্রথম এক শহীদ ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা দেয়া হবে। হাশরের ময়দানে তাকে পেশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দেয়া তার সকল নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তার এসব নি'য়ামতের কথা স্মরণ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বললেন, তুমি এসব নি'য়ামত পাবার পর তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কী কী কাজ করেছ? সে উত্তরে বলবে আমি তোমার রাস্তায় (কাফিরদের

বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি, এমনকি আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি লড়েছো তেমাকে বীর বাহাদুর বলার জন্য। তা বলা হয়েছে (তাই তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে)। তখন তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জ্ঞানার্জন করেছে, অন্যকে জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছে, কুরআন পড়েছে, তাকে উপস্থিত করা হবে। তাকে দেয়া সব নি'য়ামত তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। এসব নি'য়ামত তার স্মরণ হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নি'য়ামতের তুমি কি শোকর আদায় করেছ? সে উত্তরে বলবে আমি 'ইলম অর্জন করেছি, মানুষকে ইলম শিক্ষা দিয়েছি, তোমার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তোমাকে "আলিম বলা হবে, ক্বারী বলা হবে, তাই তুমি এসব কাজ করেছ"। তোমাকে দুনিয়ায় এসব বলা হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং মুখের উপর উপুড় করে টেনে হেচঁড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন ধরনের মাল দিয়ে সম্পদশালী করেছেন। তাকেও আল্লাহর সামনে আনা হবে। আল্লাহ তাকে দেয়া সব নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এসব তারও মনে পড়ে যাবে। আল্লাহ তাকে এবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নি'য়ামতের শুকরিয়া কি আমাল দিয়ে আদায় করেছ? সে ব্যক্তি উত্তরে বলবে, আমি এমন কোন খাতে খরচ করা বাকী রাখিনি যে খাতে খরচ করাকে তুমি পছন্দ কর। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি খরচ করেছ মানুষ তোমাকে দানবীর বলার জন্য । সে খিতাব তুমি পেয়ে গেছো দুনিয়ায়। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টে্নে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহ মুসলিম ৫০৩২)

৭। **আল্লাহ (সুবঃ) কে সিজদা করতে অক্ষম।**

এটি লাঞ্ছনার অন্য একরূপ। যারা লোক দেখানো ইবাদত করে, আল্লাহ (সুবঃ) তাদের তাঁকে সিজদা করা থেকে বিরত রাখবেন যখন তারা তা করতে চাবে। এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ হাদীস আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الـــدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا

অর্থ: "তিনি বলেন আমি আল্লাহর নবী (সা:) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যখন তার পেণ্ডুলিকে (পায়ের নিম্নাংশ) প্রকাশ করবেন তখন সকল মু'মিন পুরুষ ও মহিলারা আল্লাহকে সিজদা করবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতিত যে দুনিয়াতে সিজদা করত মানুষদের দেখানোর জন্য। অতপর সে সিজদা করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তার পিঠ শক্ত তখতার ন্যায় হয়ে যাবে।" (সহীহ বুখারী ৪৯১৯)

৮। **অভিশপ্ত কাজঃ**, আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেন-

عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا تزين الرجـــل لعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرضين

অর্থ: "যে ব্যক্তি পরলৌকিক আমলের ভূষনে ভূষিত হয় অথচ পরলৌকিক কল্যাণ তার অভিষ্ট নয় বা পরকাল সে চায়ও না, আসমানে ও যমীনে তাকে অভিসম্পাত করা হয়।" (মু'জামূল আউসাত ৪৭৭৬)

প্রশ্নঃ রিয়ার কারণ কি?

উত্তরঃ রিয়ার প্রাথমিক কারণ হলো ঈমানের দূর্বলতা। এই ঈমানের দূর্বলতা একজন ব্যক্তিকে পরকালের কল্যাণ ও পুরষ্কারের প্রতি অজ্ঞ করে তোলে এবং দুনিয়ার যশ ও সম্মান পাওয়ার ইচ্ছাকে বৃদ্ধি করে। এই ইচ্ছার কারণে একজন ব্যক্তি রিয়ায় লিপ্ত হয়।

তিনটি লক্ষণ দ্বারা রিয়াকে চিহ্নিত করা যায়। এবং এই লক্ষণগুলোকে এড়িয়ে চলা একজন ঈমানদারের জন্য অতীব জরুরী।

১) প্রশংসার প্রতি ভালবাসাঃ প্রথম তিন ব্যক্তি যারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে; ঐ আলেম ব্যক্তি, ঐ শহীদ এবং ঐ ব্যক্তি যে সম্পদ দান করেছে। এই তিন ব্যক্তি সকলেই আল্লাহ (সুবঃ) র সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের প্রসংশাকে কামনা করেছিল। যে ব্যক্তি মানুষকে প্রসংশা কামনা করে সে অবশ্যই মনে মনে নিজেকে নিয়ে গর্বিত হয়। এই জন্য যে, সে মনে করে সে এই প্রসংশা পাওয়ার যোগ্য।

২) সমালোচনার ভয়: যে ইসলামের আদেশ মান্য করে, আল্লাহর (সুব:) জন্য নয়, বরং সমালোচনার ভয়ে। কারণ সে ভয় পায় লোকজন তাকে লক্ষ্য রাখছে এবং তাকে সমালোচনা করবে যদি সে না করে।

৩) লোকজনের বিত্তবিভবের প্রতি লোভ: পদবী, অর্থ অথবা ক্ষমতার মালিক হওয়া প্রবলভাবে কামনা করা রিয়ার কারণ হিসেব চিহ্নিত।

প্রশ্ন: রিয়ার ধরনগুলো কি কি?

উত্তর: রিয়া কোন আমল করার পূর্বে, করার সময় এবং করার পরে সংঘটিত হতে পারে । প্রত্যেক পর্যায়ে, শয়তান সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যে, কোন কল্যাণময় নেক আমলকে রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করতে।

কৃত আমলের পূর্বে: প্রশংসা পাওয়ার জন্য একটি নেক আমল করার মনস্থ করা। নি:সন্দেহে এটা রিয়ার সবচেয়ে জঘন্যতম অবস্থা। এই ধরনের নেকআমল আল্লাহর (সুব:) কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং এটা মুনাফিকির আত্মিক রোগের একটি শক্ত পূর্ব লক্ষন।

যখন আমলটি করা হয়: এমতাবস্থায়, একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শুধু আল্লাহর জন্য আমল শুরু করে কিন্তু যখন সে খেয়াল করে লোকজন তাকে দেখছে তখন সে আমলগুলো আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে, অধিক ধার্মিক হিসেবে প্রমান করার উদ্দেশ্যে। উদাহরণ স্বরুপ- সে মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করা শুরু করেছে এবং যখন সে জানতে পারল লোকজন তার দিকে মনযোগ দিয়েছে তখন সে তাদের জন্য তার কণ্ঠকে সুন্দর করবে এবং খুবই আবেগ দেখানোর চেষ্টা করে।

আমলটি করার পর: সর্বশেষ পর্যায়ে ঘটে যখন একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর (সুব:) জন্য ইবাদত করে, তখন লোকজন এটার জন্য তার প্রশংসা করা শুরু করে। সে তখন এই আমলের জন্য গর্ব অনুভব করতে শুরু করে এবং প্রশংসা পেয়ে খুশী হয় যা মানুষদের থেকে পায়। কতিপয় আলেম লিখেছেন–"এটা সম্ভব যে একজন আবেদ রিয়া'কে এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন অন্যান্য লোকজন তার আমলকে উল্লেখ করে এবং তার প্রশংসা করে, এই ধরনের প্রশংসার ক্ষেত্রে সে অস্বস্তি এবং অপছন্দ সূচক কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়না। বরং, খুশী হয় এবং ভাবে যে

এই ধরণের প্রশংসা তার জন্য তার ইবাদতকে সহজ করে দিবে। এই অনুভূতি লুকানো শিরকের খুবই সুক্ষ অভিব্যক্তি ...."

প্রশ্ন: রিয়া থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তর: আমরা জানতে পেরেছি যে, রিয়া করার মূল কারণ হচ্ছে ঈমানের দূর্বলতা। তাই যে সকল আমলের দ্বারা একজন ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়, ঐ সকল আমলের দ্বারাই রিয়ার প্রভাব কমানো সম্ভব। এর মধ্য থেকে কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য:-

১। জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

তাওহীদ সম্পর্কে ইলম বৃদ্ধি করা, রিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো চিন্তা করা, আর মনে মনে এই ধারণা করা যে, আল্লাহ আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

২। দু'আ। রাসূলুল্লাহ (সা:) কে সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, শিরক যখন পিপড়ার চলার চেয়েও সুক্ষ্ম তাহলে আমাদের তার থেকে বাঁচার উপায় কি? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন তোমরা আল্লাহর কাছে এই দোআ কর:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ

অর্থ: "হে আল্লাহ্! আমাদের জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্‌ক থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থণা করছি।" (মুসনাদে আহমেদ ১৯৬০৬)

৩) জান্নাত ও জাহান্নামের উপলব্ধি অন্তরে সৃষ্টি।

৪) ভাল আমল গোপন রাখা:

আহলে সুন্নাহর কিছু আলেমগণ বলেছেন, "আমাদের পূর্বের লোকেরা এমনভাবে ইবাদত করতে পছন্দ করতেন যে, তাদের স্ত্রী অথবা ঘনিষ্ট বন্ধুরাও এ বিষয় জানতে পারত না"

৫) নিজের দোষ ত্রুটির ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া।

৬) জ্ঞানী বা আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকা ।

আল্লাহ (সুব:) বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (সুরা তাওবা ৯:১১৯)

প্রশ্ন: আস-সাদেকূন বা সত্যবাদী কারা?

উত্তর: সত্যবাদীদের পরিচয় আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিচ্ছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে;

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: ١٥]

অর্থ: "মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই হচ্ছে সত্যবাদী।" (সুরা হুজুরাত ৪৯:১৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } [الحشر : ٨]

অর্থ: "যাদেরকে নিজেদের ঘর–বাড়ী ও ধন–সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেণ। এরাই তো সত্যবাদী।" (সুরা হাশর ৫৯:৮)

আরবাব, আলিহা, আনদাদ

প্রশ্ন: اَرْبَابٌ আরবাব কি?

উত্তর: আরবাব শব্দটি রুবুবীয়াহ শব্দ থেকে এসেছে, রবের বহুবচন হচ্ছে আরবাব। আল্লাহ্ (সুব:) আমাদের একমাত্র রব। আল্লাহ্র (সুব:) রুবুবিয়্যার কোন অংশ যদি কেউ দাবী করে তাহলে সে মিথ্যা রুবুবিয়্যাহ দাবী করল, তাকে একজন আরবাব হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। আর তার এ দাবী যদি কেউ মেনে নেয় তাহলে সে তাকে একজন রব হিসেবে গ্রহন করল।

মূলকথা, আল্লাহ্ (সুব:) একমাত্র রব, তাঁর কাজগুলো অন্যেরাও করতে পারে বা দিতে পারে এই বিশ্বাসে যাদের কাছে যাওয়া বা চাওয়া হয় অথবা এসবের অংশ যাদেরকে দেওয়া হয় তাদেরকেই আরবাব বলে। আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন আল-কুরআনে বলেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ [التوبة/٣١]

অর্থ: "তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও দরবেশগণকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" (সুরা তওবা ৯:৩১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– وَفِى عُنُقِى صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ. قَالَ :« أَجَلْ وَلَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيُحَرِّمُونَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ »

অর্থ: "আদী বিন হাতিম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন: আমি আল্লাহর রাসূলের (সা:) কাছে প্রবেশ করলাম এমতাবস্থায় যে আমার গলায় রৌপের ক্রশ ঝুলছিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) তখন পবিত্র কুরআনের আয়াত **اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ** তারা তাদের পন্ডিত ও পুরোহিতদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়েছে' পাঠ করছিলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জিজ্ঞেস করলাম: হে মুহাম্মাদ! (সা:) তারা তো পন্ডিত ও

দরবেশগণের ইবাদত করে না, তাহলে তাদেরকে কিভাবে রব হিসাবে গ্রহণ করা হলো? মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন: ‘পন্ডিত ও দরবেশগণ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম এবং যা হারাম করেছেন তা হালাল করে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে না? এবং জনগন কি তা অন্ধভাবে মানেনা? আদী বিন হতিম উত্তর দিলেন; জি হ্যাঁ মানে, তখন মুহাম্মাদ (সা:) বললেন; ইহাই হলো তাদের ইবাদত করা’। (এবং এভাবেই তাদেরকে রব বানানো হয়।) (সুনানে বায়হাকী ২০৮৩৭; সুনানে তিরমিজি ৩০৯৫)

যারা মানবরচিত সংবিধানের মাধ্যমে আল্লাহর হারাম করা জিনিসগুলোকে হালাল করছে, যেমন- সুদ, জুয়া, মদ, লটারী, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন, আর সংবিধানের মাধ্যমে এগুলোকে বৈধ বা হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। আর মানুষ তাদেরকে মেনে নিয়ে আল্লাহর পাশাপাশি আরবাব হিসেবে গ্রহন করছে। অথচ আল্লাহ (সুব:) নির্দেশ দিয়েছেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অর্থ: “তুমি বল, হে আহলে কিতাবগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রব (আরবাব) হিসেবে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে লয় তবে বল তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।” (সুরা আল ইমরান ৩:৬৪)।

প্রশ্ন: اَلِهَةٌ আলিহা কি?

উত্তর: ইলাহ্ শব্দের বহুবচন ‘আলিহা’। আল্লাহই আমাদের একমাত্র ইবাদত যোগ্য ইলাহ। এখন কেউ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর পাশাপাশি কারও ইবাদত করে তাহলে তাকে সে আলিহা বানাল।

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহর রুবুবিয়্যার ধারণা অনেকটা সঠিক থাকলেও উলুহিয়্যা অর্থাৎ ইবাদাত করার ব্যাপারে সমস্যাটি প্রকট। কেউ কেউ আল্লাহ (সুব:) কে রব হিসেবে মানলেও ইবাদাত করার ক্ষেত্রে

অন্যান্যকে শরীক করে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বর্তমান সমাজের অনেক ব্যক্তিই মাযারে গিয়ে মান্নত করে, মৃত ব্যক্তির কাছে সন্তান ইত্যাদি চাওয়ার মত শির্কে লিপ্ত হয়।

জাহেলিয়াত যুগের মুশরিক আরবরাসহ প্রাচীন জাতিসমূহের এসব ধারণা খণ্ডন করে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آَلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

অর্থ: “তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব ইলাহ এজন্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা (আলিহারা), তাদের শক্তির কারণ হতে পারে।” (সুরা মারইয়াম ১৯:৮১)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ [يس/٧٤)

অর্থ: “তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব ইলাহ এজন্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।” (সুরা ইয়াসীন ৩৬:৭৪)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আলিহা শব্দ দুটো শক্তির কারণ এবং সাহায্যকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা মুর্তিগুলোকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সুপারিশকারী হিসেবে মনে করতো। অথচ তারা স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে মানতো।

রুবুবিয়্যার ব্যাপারে অনেকেরই ধারণা থাকলেও সকল সমস্যা দেখা যায় উলুহিয়্যার ব্যাপারে। সুরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াত অনুযায়ী বিধান দেওয়ার মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলাই। অথচ বাস্ত বক্ষেত্রে দেখা যায় ঈমানের দাবীদার বেশকিছু লোকেরাও জেনে অথবা না জেনে অহরহ মানুষের দেওয়া কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী বিধান মেনে চলছে। আবার কাউকে বলতে শুনা দেশের আইন মানা ফরজ। অথচ তারা জানে না যে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত দেশের আইন মানা ফরজ। কুফুরি ও মানব রচিত আইন বিধান দিয়ে পরিচালিত দেশের আইন মানা মোটেই ফরজ নয়। আবার ধর্মীয় দিক থেকে তারা কতিপয় পীর, অলী, বুজুর্গ, গাউস, কুতুব, দরবেশদাবীদার, এমন কি কবর, মাজার, গাছ-পাথরকে তাদের ভয়, মানত, সেজদা সহ অনেক ইবাদত নিবেদন করে আলিহা রূপে গ্রহন করছে।

মানুষ তার নফসকেও ইলাহরূপে গ্রহন করতে পারে। কারণ মানুষকে গোমরাহ করার মত যত জিনিস আছে তার মধ্যে মানুষের নফসই হচ্ছে তার সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। যে ব্যক্তি নিজের খাহেশাতের দাসত্ব করবে, আল্লাহ্‌র বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান হবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ্‌ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ্‌ তাআলাকে তার ইলাহ রূপে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র ইলাহের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে আল্লাহ্‌র হেদায়াত লাভ করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا [الفرقان/٤٤]

অর্থ: "(হে নবী!) যে ব্যক্তি নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তুমি কি এ ধরনের মানুষের পাহারাদারী করতে পার? তুমি কি মনে কর যে, এদের মধ্যে অনেক লোকই (তোমার দাওয়াত) শোনে এবং বুঝে? কখনও নয়। এরা তো একেবারে জন্তু-জানোয়ারের মত বরং তা অপেক্ষাও এরা নিকৃষ্ট।" (সূরা ফুরকান ২৫:৪৩-৪৪)

প্রশ্ন: اندادا আনদাদ কি?

উত্তর: আনদাদ অর্থ সমকক্ষ অথবা আরো সুনির্দিষ্টভাবে এমন কোনকিছু যাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানান হয়েছে। এটা যে কোন আকারে হতে পারে যেমন সম্পদ, পরিবার, সমাজ, নেতৃত্ব ও অন্যান্য কোনকিছুকে ভালবাসা স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ যদি এই জিনিসগুলোকে আল্লাহর জন্য তার যে ভালবাসা সেই পরিমান অথবা তার চেয়ে বেশী ভালবাসে তাহলে সেটা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা হয়। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ [البقرة/١٦٥]

অর্থ: "আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর আনদাদ (সমকক্ষ) সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুন বেশী। আর কতইনা উত্তম হত যদি এ যালেমরা পার্থিব কোন কোন আজাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর আজাবই সবচেয়ে কঠিনতর।" (সুরা বাক্বারা ২:১৬৫) আল্লাহ (সুব:) কুরআনে বলেন:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة/٢٤]

অর্থ: "হে নবী বলে দাও যে, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা এবং তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের সেই ধন-মাল যাহা তোমরা উপার্জন করেছ, সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় কর, আর তোমাদের সেই ঘর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ কর-তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয়, তা হলে তোমরা অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ তো ফাসেক লোকদের কখনই হেদায়াত করেন না।" (সুরা তাওবা ৯:২৪)

সবকিছুর প্রতি আমাদের ভালবাসা অবশ্যই আল্লাহ (সুব:) এবং তার রাসূল (সা:) এর প্রতি আমাদের ভালবাসার পরে আসতে হবে। এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সব ধরনের আনদাদ ত্যাগ করতে হবে।

প্রচলিত কতিপয় শিরক

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ
জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

অর্থ: "নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"

সূরা জ্বীন ৭২:১৮

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অর্থ: "বেশীর ভাগ লোক ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক"

সুরা ইউসুফ ১২:১০৬

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রচলিত কতিপয় শিরক্

প্রশ্ন: গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাংসদদেরকে মানা, নির্বাচনে ভোট দেয়া শিরক কেন?

উত্তর: Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফল ঘটে। মানুষকে মানুষের 'রব' হিসেবে উপস্থাপন করেছে এই গণতন্ত্র। এটি মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌঁছে দেয়। অথচ একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ্ (সুব:)। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

অর্থ: "আল্লাহ্ হুকুম দেন, তাঁর হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।" (সুরা রা'দ ১৩:৪১) তিনি আরও বলেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ ٱللَّهُ

অর্থ: "ওদের কি এমন কতগুলি মা'বুদ আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?" (সুরা শূরা ৪২:২১)

মুহাম্মদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতি (র:) বলেন: "এবং কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ (সুব:) প্রণীত এবং রাসূল (সা:) এর মুখ নি:সৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখ নি:সৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শির্ক। এতে কোন সন্দেহ নেই'। (আদ্বওয়া আল-বাইয়ান, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৮২-৮৫)

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোন অস্তিত্বই থাকবে না নির্বাচন ব্যতীত। জনগণ যদি নির্বাচন পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। যেহেতু কেউ কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিবে না তাই নির্বাচিত কোন সাংসদ পাওয়া যাবে না যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন করবে অথবা সরকারের নীতিমালার বাস্তবায়ন করবে।

শাইখ আবু বাসির মুস্তফা হালিমাহ বলেন: "প্রথমত: যে নীতির উপর গণতন্ত্র স্থাপিত তা হল জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, সাধারণ জনগণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন, যে প্রতিনিধিরা আইন তৈরী ও প্রণয়নের কাজ করবে। অন্য কথায় গণতন্ত্রে যে আইন প্রণয়নকারী এবং যার আনুগত্য করা হয় আসলে সে আল্লাহ্ নয় বরং একজন সাধারণ মানুষ। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আইন প্রণয়ন ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যার ইবাদত অথবা আনুগত্য করা হয় সেও একজন জনগণ, একজন মানুষ, একজন সৃষ্টি, সে মহান আল্লাহ্ নয়। এটাই হল কুফর, শিরক এবং পথভ্রষ্টতার মূল অস্তিত্ব এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহ ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবেই দুর্বল এবং অজ্ঞ লোকেরা শাসন-কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একক ইলাহিয়্যাতের সাথে শরীক করে।' (হুকুম আল ইসলাম ফী আদ্-দিমুক্রাতিয়্যাহ আত-তা'দ্দুদিয়্যাহ আল-হিযবিয়্যাহ, পৃ:২৮)

শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আজিজ বলেন: 'তাদের নিজেদের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যারা ভোট দেয় তাদেরকে (সাংসদ), তারা অনুসরণ করছে কেননা ভোটাররা বস্তুত: তাদের পক্ষে শিরকের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। কারণ এই প্রতিনিধিরাই আল্লাহ্র পাশাপাশি আইন-প্রণয়নের কাজে হাত দেয় এবং এভাবেই ভোটাররা সংসদ সদস্যদেরকে শির্কের বাস্তবায়নের অধিকার দেয় এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পাশাপাশি আইন প্রণয়নকারী প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে।

আমরা যদি একবারের জন্যেও ভোটারদের কার্যকলাপ এবং যখন কোন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় তার কার্যকলাপকে একত্রিত করি তাহলে তাদের উভয়ের দ্বারা কৃত কুফর বা শির্কের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

প্রশ্ন: যাদুবিদ্যা শিরক এবং কুফরীর অন্তর্ভূক্ত কিভাবে?

উত্তর: যাদু বিদ্যার মাধ্যমে যাদুকর নিজের এমন মিথ্যা ক্ষমতা প্রদর্শন করে যে ক্ষমতা রব হিসেবে একান্তই আল্লাহর রয়েছে। জাদুমন্ত্র নিজেই মূর্তিপূজার একটি শাখার প্রতিনিধিত্ব করে। জাদু মন্ত্রের মাধ্যমে ভাগ্যের ভাল-মন্দ, কল্যান-অকল্যানের বিষয়টি এর উপর নিহিত করা হয় যে কর্তৃত্ব রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। যাদু বিদ্যার মাধ্যমে কোন কোন সময়

শয়তানের পছন্দ করে এমন সব কুফরী ও শিরকী কাজ করতে হয় যার ফলে সন্তুষ্ট হয়ে শয়তান যাদুকরের জন্য কাজ করে দেয়।

আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [البقرة/١٠٢]

অর্থ: "তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অত:পর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।" (সুরা বাক্বারাহ ২:১০২) রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা:) বলেন- "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে।" সাহাবাগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল সেগুলো কি?" রাসুল (সা:) বললেন, ''আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু---।"(সহীহ বুখারী ২৭৬৬; সহীহ মুসলিম ২৭২) তিনি (সা:) আরও বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে গিরা দিল অতপর তাতে ফুঁক দিল, সে যেন যাদুই করল। আর যে যাদু করল সে অবশ্যই শিরক করল অর্থাৎ মুশরিক হয়ে গেল।" (সুনানে নাসয়ী ৪০৯০)

প্রশ্ন: তাবিজ-কবজ ব্যবহার শিরকের অন্তর্ভূক্ত কিভাবে?

উত্তর: আল্লাহই একমাত্র ভাল ভাগ্য ও মন্দ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক, কল্যান অকল্যানের মালিক, রোগ থেকে মুক্তিদাতা, সন্তানদাতা। তাবিজ কবজ ব্যবহার করে এসব কিছুর ব্যাপরে আল্লাহ ব্যতীত এগুলোর উপর নির্ভর করা হয়, যা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ (সা:) বলতে শুনেছি, ঝারফূঁক, তাবিজ-কবজ এবং যাদুটোনা ব্যবহার করা শিরক। (সুনানে আবু দাউদ ৩৮৮৫, সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৩০; মুসনাদে আহমদ ৩৬১৫) আবদুল্লাহ বিন উকাইম থেকে মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ "যে ব্যক্তি কোন জিনিস (অর্থাৎ তাবিজ- কবজ) লটকায় সে উক্ত জিনিসের দিকেই সমর্পিত হয়"। (অর্থাৎ এর কুফল তার উপরই বর্তায়) (সুনানে নাসায়ী ৪০৯০; মুসনাদে আহমাদ ১৮৭৮১; সুনানে তিরমিজি ২০৭২)

যে সব ঝাড়-ফুঁক শিরক মুক্ত তা দলিলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোখের দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষের ব্যাপারে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

প্রশ্ন: বালা মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা (সূতা) ইত্যাদি পরিধান করা শিরক তার প্রমান কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ

অর্থ: (হে রাসূল) "আপনি বলে দিন, তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো, তারা কি তাঁর (নির্ধারিত) ক্ষতি হতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে?" (সুরা যুমার ৩৯:৩৮) হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا هَذِهِ قَالَ مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا

অর্থ: "ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) একজন লোকের বাহুতে রৌপের একটি রিং দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, ওহে হতভাগা! এটা কি?" লোকটি বললো, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, "এটা খুলে ফেলো। কারণ এটা তোমার দুর্বলতাকেই শুধু বৃদ্ধি করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে তুমি কখনো সফলকাম হবে না।" (মুসতাদরাকে হাকেম ৭৫০২; সহীহ ইবনে হিব্বান ৬০৮৫) একটি "মারফু" হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ

অর্থ: "উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় (পরিধান করে) আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন। যে ব্যক্তি কড়ি, শঙ্খ বা শামুক ঝুলায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।" (মুসনাদে আহমাদ ১৭৪০৪; মুসনাদে আবী ই'য়ালা ২৯৬)

প্রশ্ন: শুভ-অশুভ লক্ষণ বা সংকেত গ্রহন শিরক কিভাবে?

উত্তর: শুভ-অশুভ সংকেত গ্রহন করা শিরকের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণ:

১) ইবাদতের প্রক্রিয়া যাকে নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কুল) বলা হয় তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করা হয়, এবং

২) ভাল ও মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিষের উপর অর্পন করা হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَسَحَّرَ اَوْ تَسَحَّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تَكَهَّنَ لَهُ أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تَطَيَّرَ لَهُ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: যে যাদু করলো বা যার জন্য যাদু করা হলো, যে ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে এবং যার উদ্দেশ্যে করা হয়, যে তিয়ারা বা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করলো বা যার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলো তারা কেউ আমাদের মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত নয়।" (তাবরানী ৪২৬২; বাইহাকী ১১৭৬)

এখানে "আমাদের" বলতে মুসলিম জনগোষ্ঠী বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তিয়ারা এমন একটি কাজ যার উপর বিশ্বাস একজনকে ইসলামের বহির্ভূত করে দেয়। অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِى الْكُهَّانَ. قَالَ « فَلاَ تَأْتُوا الْكُهَّانَ ». قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ. قَالَ « ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِى نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ ».

অর্থ: "মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস সুলামী (রা:) বলেন, আমি রাসুলকে (সা:) বললাম, "আমরা জাহেলী যুগে কতগুলো কাজ করতাম যেমন গণক, জ্যোতিষিদের কাছে যেতাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, না জ্যোতিষিদের কাছে যেও না। আমি বললাম, আমরা পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ সংকেন নির্ধারণ করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: এটা তোমরা নিজেরাই তৈরী করেছ, এটা যেন তোমাদের কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে।" (সহীহ মুসলিম ৫৯৪৯) অর্থাৎ তুমি যা করতে চাও এটা যেন তোমাকে তা করতে বাধা না দেয়। কারণ এ সব সংকেত মানুষের কল্পনাপ্রসূত বানানো গল্প যার কোন বাস্তবতা নেই।

কাঠে টোকা দেয়া, লবণ উল্টে পড়া, আয়না ভাঙ্গা, ভাঙ্গা ঝারু, খালি কলসি, তের নম্বর সংখ্যা ইত্যাদি বাতিল শিরকী আক্বিদা মানুষের মধ্যে প্রচলিত। অথচ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ». ثَلاَثًا

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্নিত, আল্লাহর রাসুল (সা:) বলেছেন, তিয়ারা শির্ক, তিয়ারা শিরক, তিয়ারা শির্ক। তিন বার বললেন। (সুনানে আবু দাউদ ৩৯১২; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৩৮) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَـرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে কেউ তিয়ারার ('কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারনার) কারণে কিছু করা থেকে বিরত হল, সে শির্ক করল।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "এর প্রায়শ্চিত্ত কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "বল: আল্লাহুম্মা লা' খাইরা ইল্লা খাইরুক, ওয়া লা তাইরা ইল্লা তাইরুক, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।" অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি প্রদত্ত মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল নাই এবং তুমি প্রদত্ত অমঙ্গল ব্যতীত কোন অমঙ্গল নেই এবং তুমি বিনা অন্য কোন ইলাহ নাই।" (মুসনাদে আহমদ ৭০৪৫)

প্রশ্ন: 'আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন' বলা শিরক কিভাবে?

উত্তর: হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ قُتَيْلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ إِنَّكُـمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ

অর্থ: "জুহাইনা গোত্রের জনৈক মহিলা সাহাবী কুতাইলা (রা:) থেকে বর্ণিত, একজন ইয়াহুদী রাসূল (সা:) এর কাছে এসে বললো, 'আপনারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকেন।' কারণ আপনারা বলে থাকেন, 'আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন'। আপনারা আরো বলে থাকেন 'কাবার কসম' (এগুলোতো স্পষ্ট শিরক)। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে 'কাবার রবের

কসম'। আর বলবে 'আল্লাহ যা চেয়েছেন অত:পর আপনি যা চেয়েছেন'। (সুনানে নাসায়ী ৩৭৮২) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَعَلْتَنِي وَاللَّهَ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর উদ্দেশ্যে বললো, 'আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন (তাই হয়েছে)' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেললে?' বরং আল্লাহ যা এককভাবে ইচ্ছা করেছেনে (তাই হয়েছে)।" (মুসনাদে আহমদ ১৮৩৯; সুনানে বায়হাকী ৫৬০৩) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنِ الطُّفَيْلِ أَخِى عَائِشَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُـسْلِمِينَ نِعْـمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ . فَسَمِعَ النَّبِىُّ (فَقَـالَ « لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ »

অর্থ: "আয়েশা (রা:) এর ভাই তুফায়েল (রা:) থেকে বর্ণিত, একজন মুশরিক একজন মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বললো তোমরা কতই না ভাল সম্প্রদায় যদি 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ (স:) যা ইচ্ছা করেছেন (তাই হয়)' একথা না বলতে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ (স:) যা ইচ্ছা করেছেন (তাই হয়)' একথা তোমরা বলো না বরং তোমরা বলো, 'এককভাবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন অত:পর মুহাম্মদ (সা:) যা ইচ্ছা করেন (তাই হয়)।" (সুনানে দারমী ২৭৫৫; সুনানে ইবনে মাজাহ ২১১৮)

প্রশ্ন: বাক্যের মধ্যে 'যদি' শব্দের ব্যবহার শিরকের দরজা খুলে দেয় কিভাবে?

উত্তর: হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم....احْرِصْ عَلَـى مَـا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَـذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে এ কথা বলো না, 'যদি আমি এরকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো'। বরং তুমি এ কথা বলো, 'আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা 'যদি' কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয় (যদি শব্দটি শয়তানের চাবি)।" (সহীহ বুখারি ৬৯৪৫; সুনানে ইবনে মাজাহ ৭৯; মুসনাদে আহমদ ৮৭৯১)

প্রশ্ন: মিলাদে কি ধরনের শিরক প্রচলিত?

উত্তর: একদল মানুষ নাবী (সা:) এর নামে মিলাদ নামক বিদ'আত অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে মিলাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং ধারণা করে যে, নবী (সা:) এর রুহ মোবারক মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকে- তাই দাঁড়াতে হয়। অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর একদল খাস ফেরেশতা রয়েছে যারা পৃথিবীময় বিচরণ করে আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছায়।" (সুনানে নাসায়ী ১২৮১; সুনানে তিরমিজি ৩৬০০; মুসনাদে আহমদ ৩৬৬৬; মেশকাতুল মাসাবীহ ৯২৪; মুসতাদরাকে হাকেম ৩৫৭৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৮৭০৫; সহীহ ইবনে হিব্বান ৯১৪; সুনানে বায়হাকী ১৫৮২)

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) মিলাদ মাহফিলসহ অন্য কোথাও হাজির হন না। কেননা সর্বত্র যিনি তাঁর ইলম ও জ্ঞানের মাধ্যমে হাজির-নাজির তিনি হচ্ছেন শুধুমাত্র আল্লাহ (সুব:)। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা:) কেও হাজির-নাজির জ্ঞান করা আল্লাহর সিফাতের ভিতরে শিরক করার অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা:) কে নিজেদের জান-মাল, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু থেকে ভালবাসা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর জীবদ্দশায় স্বশরীরে কোন মজলিশে আগমন করলেও

দাঁড়াতেন না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) এটা পছন্দ করতেন না। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُوا مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ

অর্থ: "আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) এর চেয়ে আর বেশী প্রিয় কেউ ছিল না। অথচ তারা যখন রাসূলুল্লাহ (সা:) কে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন রাসূলুল্লাহ (সা:) তা পছন্দ করেন না।" (সুনানে তিরমিজি ২৭৫৪; মুসনাদে আহমদ ১২৩৪৫; মেশকাত ৪৬৯৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২৫৫৮৩)

সুতরাং প্রচলিত মিলাদ একটি স্বীকৃত বিদ'আত। আর এতে রাসূলুল্লাহ (সা:) স্বয়ং বা তার রুহু উপস্থিত হয় বিশ্বাস করা শিরক। কারো সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকা রাসূলুল্লাহ (সা:) একদম পছন্দ করতেন না। এজন্য তিনি কঠোরভাবে হাদীসে ঘোষণা করেছেন:

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ " خَرَجَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ فَقَالَ اجْلِسَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থ: "আবু মিজলায (র:) বলেন, মুআবিয়া (রা:) একদা বের হলে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং ইবনে সফওয়ান (রা:) দাঁড়িয়ে গেলেন। মুআবিয়া (রা:) তাদেরকে বসার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি চায় তার জন্য লোকেরা মূর্তির মত দাড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।" (সুনানে তিরমিজি ২৭৫৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২৫৫৮২)

সুতারাং রাসূলের মাহাব্বাতের নামে মিলাদ নামক শিরক ও বিদআতযুক্ত জঘন্য কাজ থেকে বিরত থেকে রাসূলুল্লাহ (সা:) যে দ্বীন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, যে দ্বীন কায়েমের জন্য রক্ত দিয়েছেন সে দ্বীন কায়েমের জন্যই সর্বাত্মক চেষ্টা করে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সত্যিকার মাহাব্বাতের প্রমান দেওয়া উচিত।

মিলাদে রাসূলুল্লাহ (সা:) উপস্থিত হন এই ধারণার মাধ্যমে আরো একটি জঘন্য শিরক করা হয়। আর তা হলো: ইলমূল গায়েবের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে আল্লাহর অংশিদার বানানো। কেননা মিলাদে হাজির হতে হলে তাকে জানতে হবে পৃথিবীর কোথায় কোথায় মিলাদ হচ্ছে, কখন তথাকথিত তাওয়াল্লুদ পড়া হবে আর তখনই তাঁকে হাজির হতে হবে। অথচ ইলমূল গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ (সুব:)। নবী-রাসূল, জ্বীন-ফেরেশতা, ওলী-আওলিয়া কেহই আলেমূল গায়েব নন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل/٦٥]

অর্থ: "(হে নবী) "বলুন! আসমান ও জমীনে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েবের ব্যাপারে জানে না।" (সুরা নামল ২৭:৬৫)

অতএব গায়েবের ঈলম একমাত্র আল্লাহই জানেন। এ ইলম নবী (স) এর সাথে সম্পৃক্ত করলে আল্লাহর সাথে শিরক্ হবে। নবী-রাসূলগণ শুধুমাত্র ততটুকুই ইলম রাখেন যতটুকু ইলম আল্লাহ (সুব:) দান করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।

{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ}

অর্থ: "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া।" (সুরা জ্বীন ৭২:২৬-২৭)

তাই আল্লাহ (সুব:) যেই অর্থে আলেমূল গায়েব অর্থাৎ নিজের থেকে নিজে সবকিছু জানেন, কোন ভায়া-মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না সে অর্থে অন্য কেউ আলেমূল গায়েব হতে পারে না। বরং তাদেরকে আল্লাহ (সুব:) যতটুকু জানান ততটুকুই জানেন।

প্রশ্ন: পীর-দরবেশ, ওলী-আউলিয়া এবং কবরে শায়িতদের নিকট দোয়া-প্রার্থনা করা শিরক্ এ বিষয়টির প্রমান কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس/١٠٦]

অর্থ: "আল্লাহ ব্যতীত অন্য এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার উপকার করতে পারবে না ও অপকারও করতে পারবে না। যদি তুমি অন্যকে ডাক তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।" (সুরা ইউনুস ১০:১০৬)

এ আয়াতে জালিম বলতে 'মুশরিক' হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআনে শিরককে সবচেয়ে বড় জুলুম বলে ঘোষণা করা হয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে)। আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে ডাকে যে কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? তারা তাদের ডাকা সম্পর্কে খবরও রাখে না। যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতের কথা অস্বীকার করবে।" (সুরা আহকাফ ৪৬:৫-৬) আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر/١٣، ١٤]

অর্থ: "আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটির মালিকও নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমদের শিরকের কথা অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাদেরকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।" (সুরা ফাতির ৩৫:১৩-১৪)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهْوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: "আবুদল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (সা:) একটি কথা বললেন আমি তার সাথে আরেকটি কথা যোগ করলাম।

নবী (সা:) বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে, আর এ অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতিত অন্যকে আল্লাহর শরীক হিসাবে না ডেকে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ বুখারী ৪৪৯৭)

কবরবাসীরা জীবিতদের ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ [النمل/٨٠]

অর্থ: "আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না, আর শোনাতে পারবেন না বধিরকেও কোন প্রকার আহ্বান, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (সুরা নামল ২৭: ৮০)

যারা কথা শুনে না তারা কিভাবে অপরকে সাহায্য করবে? অপরকে শান্তনা দিবে, অপরের মাকসুদ পূর্ন করবে? বরং তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।

প্রশ্ন: কবর-মাযার-দরগায় দান বা ভোগ দেয়া শিরক্ তার প্রমান কি?

উত্তর: হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبَابٍ ، مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ عَكَفُوا عَلَى صَنَمٍ لَهُمْ وَقَالُوا : لاَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ إِلاَّ قَدَّمَ شَيْئًا ، فَقَالُوا لأَحَدِهِمَا : قَدِّمْ شَيْئًا ، فَأَبَى فَقُتِلَ ، وَقَالُوا : للآخَرِ : قَدِّمْ شَيْئًا ، فَقَالُوا : قَدِّمْ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَالَ : وَأَيْشٍ ذُبَابٌ ، فَقَدَّمَ ذُبَابًا فَدَخَلَ النَّارَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ هَذَا النَّارَ فِي ذُبَابٍ.

অর্থ: "সালমান (রা:) বলেন: একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে এবং একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। (ঘটনাটি হলো) দু'ব্যক্তি এক গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের একটি মূর্তি ছিল, সে মূর্তিকে কিছু না দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে পারত না। (মুর্তির খাদেমরা) প্রথম ব্যক্তিকে বলল: তুমি কিছু দিয়ে যাও। লোকটি অস্বীকার করলো ফলে তারা তাকে হত্যা করে ফেললো। (অত:পর লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করল) তারা (মূতি পুজক-রা) দ্বিতীয় জনকে বলল, কিছু দিয়ে যাও। (সে বললো: আমার নিকট কিছুই নেই যা আমি পেশ করব।) তারা তাকে

বলল: একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। সে বললো, মাছি কি? পরিশেষে সে একটি মাছি দান করল, অত:পর সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। প্রথম ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করলো আর দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করলো। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩৩৭০৯; বায়হাকী ফী শুআবিল ঈমান ৭৩৪৩; ইমাম নাসীরুদ্দীন আলবানী র. বলেছেন হাদীসটি সহীহ)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল গাইরুল্লাহর নামে কোন কিছু দান করা বা ভোগ দেয়া শিরক।

প্রশ্ন: মাযারে, ওরসে পীর-ফকিরদের উদ্দেশ্যে যবেহ করা, দান করা শিরক, তার প্রমান কি?

উত্তর: পশু যবেহ করা, দান-সাদাকা করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এগুলো যখন আল্লাহর নামে করলে আল্লাহর ইবাদত হয় তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর নামে করলে সেই গাইরুল্লাহর ইবাদত হয়। আল গাইরুল্লাহর ইবাদত শিরক। কেননা সকল প্রকার ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الأنعام/١٦٢]

অর্থ: "আপনি বলুন, "আমার সালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ (সবই) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যার কোন শরিক নেই।" (সুরা আনআম : ১৬২)

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) [الكوثر:٢]

অর্থ: "আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত পড়ুন এবং কোরবানী করুন।" (সুরা কাউসার ১০৮:২) হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَىْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ مَا أَسَرَّ إِلَىَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ وَلَكِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ ».

অর্থ: “আবু তুফাইল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আলী (রা:) কে অনুরোধ করলাম যে, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু সম্পর্কে বলুন যা শুধুমাত্র আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা:) গোপনে দান করেছেন। আলী (রা:) বললেন, না! আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা:) গোপনে এমন কিছু বলেন নি যা অন্যের থেকে গোপন করেছেন। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে (চারটি বিষয়ে) বলতে শুনেছি, (ক) যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে (পশু) যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লা'নত। (খ) যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। (গ) যে ব্যক্তি নিজ পিতা- মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। (ঘ) যে ব্যক্তি জমির সীমানা (চিহ্ন) পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লা'নত। (সহীহ মুসলিম ৫২৪০)

পূর্বে উল্লেখিত দু'ব্যক্তির হাদীসটি যাদের একজন জাহান্নামে গিয়েছিল মুর্তিকে মাছি দেয়ার কারনে, এটিও এ বিষয়ের একটি দালীল।

প্রশ্ন: গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক তার প্রমান কি?

উত্তর: 'আল ইস্তি'আযা' বা আশ্রয় কামনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। শুধুমাত্র আল্লাহ (সুব:) তার বান্দাকে আশ্রয় দেয়ার মালিক। এ জন্য সুরায়ে নাস এবং ফালাকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর আশ্রয়ের পরিবর্তে অন্য কারো আশ্রয় কামনা করে সে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার বানালো। আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিকট আশ্রয় চাওয়ার নিন্দা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا [الجن/٦)

অর্থ: “মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জ্বিনের কাছে আশ্রয় চাচ্ছিল, এর ফলে তাদের (জ্বিনদের) গর্ব ও আহমিকা আরো বেড়ে গিয়েছিল।” (সুরা জ্বীন ৭২:৬) হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ شَىْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ ».

অর্থ: “খাওলা বিনতে হাকীম আস সুলামিয়্যাহ (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন বাড়িতে প্রবেশ করে বললো, “আমি আল্লাহ (সুব:) এর পূর্ণাঙ্গ কালামের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।” তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম ৭০৫৪)

প্রশ্ন: নেককার ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লংঘন গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রমান কি?

উত্তর: ইমাম মালেক (র:) মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) করেছেন:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

অর্থ: “হে আল্লাহ আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির উপর আল্লাহর কঠিন গজব নাযিল হয়েছে যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।” (মুয়াত্তা মালেক ৪১৪; মুসনাদে আহমদ ৭৩৫৮) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

অর্থ: “ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) কবর যিয়ারত কারিনী (মহিলা) দেরকে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে আর (কবরে) বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। (সুনানে তিরমিজি ৩২০; সুনানে আবু দাউদ ৩২৩৮; সুনানে নাসায়ী ২০৪২; শায়খ আলবানী র. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

প্রশ্ন: বরকত হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া কি শির্ক?

উত্তর: হ্যাঁ! বরকত হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া, সুতা বাঁধা শির্ক। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي وَاقِد اللَّيْثِيِّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ قَالَ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاط قَالَ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَة خَضْرَاءَ عَظِيمَة قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قُلْتُمْ وَالَّذي نَفْسي بِيَده كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى { اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّهَا لَسُنَنٌ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً

অর্থ: "আবু ওয়াকেদ আল লাইছী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ রাসুল (সা:) এর সাথে মক্কা থেকে বের হয়ে হুনাইনে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মুশরিকদের জন্য একটি বড়ই গাছ ছিল তারা (বরকতের জন্য) গাছটির নিকট অবস্থান করত এবং তাতে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। তাকে 'যাতে আনওয়াত' বলা হতো। আমরা একটি সবুজ বড় বরই গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। (রাবি বলেন) আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের জন্য একটি 'যাতে আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন যেমনভাবে তাদের জন্য 'যাতে আনওয়াত' রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা:) বললেন: (সুবহানাল্লাহ) ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! (এটা এমন একটি দাবী) যা তোমরা বললে যেমন বলেছিল বানী ইসরাঈলরা মুসা (আ) কে "আমাদের জন্য আপনি মা'বুদ বানিয়ে দিন যেমন তাদের মা'বুদ রয়েছে। তিনি (মুসা আ.) বললেন: তোমরা বড়ই নির্বোধ সম্প্রদায়।" নিশ্চয়ই এটি (মানুষের) একটি নীতি। তোমরা এমন নীতির অনুকরণ করবে যে নীতির উপর তোমদের পূর্ববর্তীরা ছিল।" (সুনানে তিরমিজি ২১৮০; মুসনাদে আহমদ ২১৮৯৭;)

প্রশ্ন: আল্লাহ ব্যতীত বাপ-দাদা, মাতা, পীর-দরবেশ কিংবা অন্যকিছুর নামে কসম করা শিরক্ এর প্রমান কি?

উত্তর: এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِى وَلاَ بِآبَائِكُمْ

অর্থ: "আবদুর রাহমান ইবনে সামুরাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমরা তাগুতের নামে ও বাপ-দাদার নামে কসম করো না।" (সহীহ মুসলিম ৪৩৫১; সুনানে ইবনে মাজাহ ২০৯৫) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে, মা-নানীর নামে এবং প্রতিমার নামে কসম করো না এবং আল্লাহর নামে সত্য কসম ব্যতীত কসম করো না।" (সুনানে আবু দাউদ ৩২৫০; সুনানে নাসায়ী ৩৭৭৮) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحْلِفُ لاَ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

অর্থ: "সা'দ ইবনে উবায়দা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে ওমর (রা:) এক ব্যক্তিকে এই বলে কসম করতে শুনলেন, 'না! কাবার কসম!' তখন ইবনে ওমর (রা:) বললেন, আমি রাসুল (স) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করল সে অবশ্যই শিরক করল।" (সুনানে তিরমিজি ১৫৩৫, সুনানে আবু দাউদ ৩২৫৩; মুসনাদে আহমদ ৬০৭২)

প্রশ্ন: নবী (সা:) কে আল্লাহর নূরের তৈরী মনে করা শির্ক কেন? তিনি যে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন তার প্রমান কি?

উত্তর: এক শ্রেনীর মানুষ বলে, নবী (সা:) কে তৈরী না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না। এ ব্যাপারে তারা যে হাদীসটি বলে তা একটি জাল বা বানোয়াট হাদীস। তারা আরও বলে আল্লাহ নাবী (সা:) কে তাঁর নিজের নূর দিয়ে তৈরী করেছেন, নাবী (সা:) নূরের তৈরী। আর নবী (সা:) এর নূরে সমস্ত জগত তৈরী। সর্ব প্রথম আল্লাহ নাবী (সা:) কে তাঁর নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তারা আল্লাহর সাথে শিরক্ করে থাকে। কারণ, এতে আল্লাহর সত্ত্বার সাথে সৃষ্টির সংমিশ্রণ ঘটানো হয়, যা তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে শিরকের অন্তর্ভূক্ত। অথচ সহীহ

হাদীসে রয়েছে আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে লিখতে বলেন। ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ

অর্থ: "ওবাদা ইবনে সামেত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ (সুব:) সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। অত:পর কলমকে বললেন, লিখ! কলম বলল কি লিখব? আল্লাহ (সুব:) বললেন, তাকদীর লিখ, যা সংঘটিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে তা সবকিছু লিখ।" (সুনানে তিরমিজি ৩৩১৯)

রাসূলুল্লাহ (সা:) যে মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে। মহান আল্লাহ (সুব:) বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ [الكهف/ ١١٠]

অর্থ: "বলুন! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট অহী আসে যে, নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। (সুরা কাহফ ১৮: ১১০)

আলোচ্য আয়াতে মুহাম্মদ (স) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষনা করেছেন: আমি মানুষ, তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে পার্থক্য এই যে, আমার নিকট অহী আসে। আল্লাহর রাসুল মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন তার কিছু প্রমান আমরা তুলে ধরছি।

প্রথম প্রমান: মুহাম্মদ (সা:) অন্যান্য মানুষের মতই আদম সন্তান ছিলেন। মানুষ যেমন পানাহার করে, তেমনি মুহাম্মদ (সা:) ও পানাহার করতেন। অন্যান্য মানুষের যেমন সন্তানাদি ছিল, তেমনি রাসুলেরও সন্তাানাদি ছিল, স্ত্রীও ছিল। তিনি বলেছেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِى

অর্থ: "নিশ্চয় আমি মানুষ, আমি তোমাদের মত ভূলে যাই। যদি আমি ভূলে যাই তবে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেবে।" (সহীহ মুসলিম ১৩০২; সুনানে আবু দাউদ ১০২২; সুনানে নাসায়ী ১২৪৩; মুসনাদে আহমদ ৪১৭৪; সুনানে দারাকুত্বনী, প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করার অধ্যায়ের প্রথম হাদীস)

দ্বিতীয় প্রমাণ: অন্যান্য মানুষের মত রাসুলেরও বংশ তালিকা ছিল। একথা সকলেই জানেন। রাসুল যে মানুষ নবী ছিলেন কোরাইশ বংশে জন্ম গ্রহন তার বিরাট প্রমান। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বংশ তালিকা নিম্নে পেশ করা হলো:

মুহাম্মদ (সা:) আবদুল্লাহর পুত্র, তিনি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র, তিনি হাশেমের পুত্র, হাশিম কুরাইশ বংশের, কুরাইশ কেনানা বংশের, কেনানা আরব বংশোদ্ভুত, আরবগণ ইসমাইলের বংশধর, ইসমাইল ইবরাহিম (আ:) এর বংশধর, ইবরাহিম নূহ (আ:) এর বংশধর, নূহ (আ:) আদম (আ:) এর বংশধর, আর আদম (আ:) হলেন মাটির তৈরী। অতএব মুহাম্মদ (সা:) নিজেও মাটির তৈরী মানুষ। সর্বোত্তম মানব বংশেই তাঁর জন্ম। মানব পিতা-মাতার মানব শিশু হিসাবেই তিনি দুনিয়াতে আগমন করেছেন। মাটির তৈরী মানুষের জন্য মাটির তৈরী রাসূল প্রেরণই ছিল মহান আল্লাহ (সুব:) এর চিরাচরিত নীতি। মানব জাতির জন্য প্রেরিত কোন রাসূলই মানব জাতির বাহির থেকে আসেননি। এ হচ্ছে কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি আক্বিদাহ। যার বিরোধিতা করা সুস্পষ্ঠ কুফ্‌র। মুহাম্মদ (সা:) যে মানব ছিলেন সে ব্যাপারে আল্লামা আবদুর রউফ মুহাম্মদ ওসমান ইজমা নকল করেছেন:

إن من العقائد الثابتة التي أكدها نصوص الشرع وأجمعت عليها الأمة أن رسل الله أجمعين بشر من جنس المرسل إليهم . كما جرت بذلك سنة الله في المرسلين {وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل بل كان بشرا مثلهم يوحى إليه. وبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واضح لكل من قرأ القرآن أو تصفح السنة أو قلب نظره في سيرته وأحواله

অর্থ: "এ আক্বিদা-বিশ্বাস শরিয়ার বাণী সমূহ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও যার উপর গোটা মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা সর্বসম্মত অভিমত ব্যাক্ত হয়েছে যে, রাসূলগণ যে জনগোষ্ঠির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন তারা তাদেরই জাতিভূক্ত ছিলেন। রাসূলগণের ব্যাপারে এই হলো আল্লাহর সুন্নাহ (নীতিমালা)। আর আল্লাহর নীতিমালায় কোন পরিবর্তণ নেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: **{وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} [الأحزاب : ٦٢]**)

"তুমি আল্লাহর সুন্নাহ তথা নীতিতে কোন ব্যতিক্রম পাবে না।" (সুরা আহযাব ৩৩:৬২) আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা:) কোন নতুন রাসূল ছিলেন না। বরং পূর্ববর্তী রাসূলগণের মত তিনিও অহী প্রাপ্ত মানুষই ছিলেন। কুরআন, সুন্নাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সিরাত ও জীবনী সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞান আছে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মানব বংশোদ্ভুত হওয়ার বিষয়টি তার কাছেই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।" (মুহাব্বাতুর রাসূল ১ম খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك... قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ...أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ اللَّه عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَــزَّ وَجَلَّ

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আল্লাহর কসম! আমি এটি ভালবাসি না যে, তোমরা আমাকে ঐ মর্যাদার উর্দ্ধে তুলে দাও যেই মর্যাদায় আল্লাহ আমাকে আসীন করেছেন।" (মুসনাদে আহমদ ১২৫৫১) অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّه وَرَسُولُهُ

অর্থ: "ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা আমার প্রশংসা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছিলো খৃষ্টান জাতি ইসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে (তারা ঈসা আ. কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছিলো)। তাই তোমরা আমার ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলো আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" (সহীহ বুখারী ৩৪৪৫; মুসনাদে আহমদ ১৫৪)

তৃতীয় প্রমাণ: মুহাম্মদ (সা:) অন্যান্য মানুষের মত পানাহার করতেন। রাসুল (সা:) পানাহার করতেন এজন্য কাফেররা উপহাস করতো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন:

{وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ} [الفرقان : ٧]

অর্থ: "তারা বলতো মুহাম্মদ কেমন রাসুল যে পানাহার করে, আবার বাজারে চলাফেরা করে।" (সুরা ফুরকান ২৫:৭) এ কথাটি মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের। তৎকালীন কাফেরদের ও বর্তমান তাদের অনুসারীদের এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ [الأنبياء/٨]

অর্থ: "আর আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করত না, আর তারা স্থায়ীও ছিল না।" (সুরা আম্বিয়া :৮)

অর্থাৎ যেহেতু সমস্ত নবী খাদ্য গ্রহন করতেন, সেহেতু মুহাম্মদ (সা:) ও একজন খাদ্য গ্রহনকারী রাসুল ছিলেন। এটা তাঁর মানুষ হবার অন্যতম প্রমাণ।

চতুর্থ প্রমাণ: রাসুল অন্যান্য নবীদের মত মৃত্যু বরণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْـتُمْ عَلَـى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران : ١٤٤]

অর্থ: "আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে ? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।" (সুরা আল ইমরান ৩:১৪৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ [الزمر/٣٠]

অর্থ: "নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারা সকলে মৃত্যু বরণ করবে।" (সুরা যুমার ৩৯:৩০)।

রাসুল (স) অতি মানব ছিলেন না যে, তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। বরং তিনি ছিলেন মানুষ নবী, তাই তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। উল্লেখিত প্রমাণাদি দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মুহাম্মদ (স) একজন মানুষ নবী ছিলেন।

সকল নবী-রাসূলগণ মৃত্যু বরণ করেছেন। আমাদের রাসূল (সা:) যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন বিষয়টি অনেকের কাছেই অস্পষ্ট ছিল। এমনকি ওমর বিন খাত্তাব (রা:) তরবারী হাতে ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মদ (সা:) মরে গেছে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। একারণে রাসূল (সা:) এর মৃত্যু নিয়ে একটি ধুম্রজালের সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর যখন আবু বকর আসলেন তখন তিনি আয়েশার হুজরায় চলে গেলেন এবং চাঁদর উত্তোলন করে রাসূলুল্লাহ (সা:)কে চুমু খেলেন। এবং বললেন, আপনার প্রতি আমার পিতা মাতা কুরবান হোক, আপনাকে আল্লাহ (সুব:) দুইবার মৃত্যু দিবেন না। যে মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য বরাদ্দ ছিল তা আপনি গ্রহণ করেছেন। একথা বলে চাঁদর ঢেকে দিয়ে তিনি জনসম্মুখে এলেন। এবং নিম্নের ঐতিহাসিক খুৎবাটি দিলেন:

عَنْ عَائِشَةَ .....فقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} إِلَى الشَّاكِرِينَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا

অর্থ: "আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি (আবু বকর রা:) বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মদ (সা:) এর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ মুহাম্মদ (সা:) মৃত্যুবরণ করেছেন, আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:)চিরঞ্জীব তার কোন মৃত্যু নেই। এরপর তিনি কুরআন মাজিদের নিম্মোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন:

{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ ...

অর্থ: "আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে ? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।' (সুরা আল ইমরান ৩:১৪৪) এ আয়াত শোনা মাত্র সকলের কাছে মনে হলো যে, তারা ইতিপূর্বে এ আয়াত কখনো

শুনেন নাই, আবু বকর থেকেই প্রথম শুনলেন এবং সকলের মুখে মুখে এ আয়াত উচ্চারিত হতে লাগলো। " (সহীহ বুখারী ১২৪১) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} [الأنبياء : ٣٤]

অর্থ: "আর তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে ?"[৮]

তাছাড়া একথা কিভাবে গ্রহণ করা যায় যে, তিনি নূরের তৈরী, অথচ যাকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য, অনুসরণীয় একমাত্র আদর্শ হিসেবে আল্লাহ পাঠালেন মাটির মানুষদের কাছে। নূরের তৈরী সৃষ্টির প্রকৃতি, চাল-চলন তো হবে ভিন্ন, তাকে কিভাবে মানুষ পুরোপুরি আদর্শ হিসেবে গ্রহন করে তার যথাযথ অনুসরণ করবে। যাদের বিবেক বুদ্ধি আছে, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এ ব্যাপারে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

প্রশ্ন: ওয়াসীলার নিষিদ্ধ এবং শিরকী দিকগুলো কি কি?

উত্তর: মৃতদের মাধ্যমে অসিলা খোঁজা। তাদের কাছে কোন প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া, সাহায্য চাওয়া যেমনটা আজ দেখা যাচ্ছে। একে মানুষ অসিলা মনে করে, কিন্তু মূলত: এটি সঠিক নয়। কারণ, অসিলার অর্থ হল আল্লাহ্ নিকটবর্তী হওয়া; যা ঈমানের দ্বারা এবং নেক কাজের দ্বারা সম্ভব। অন্যদিকে মৃতদের কাছে দোয়া করা আল্লাহ্ হতে মুখ ফিরানোর নামান্তর। তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেন:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس/١٠٦]

অর্থ: "আল্লাহ্ ছাড়া এমন অন্যের কাছে দোয়া কর না যারা না পারে তোমার উপকার করতে, আর না পারে তোমার ক্ষতি করতে। যদি তা কর তবে নিশ্চয়ই তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সুরা ইউনুস ১০: ১০৬)

নবী (সা:) এর সম্মানের অসিলা খোঁজা:

যেমন বলা, হে আমার রব! রাসূল (সা:)-এর অসিলায় আমাকে রোগমুক্ত কর। এটা বেদ'আত। কারণ সাহাবীরা কেউ এটা করেন নি। কারণ

---

[৮] সুরা আম্বিয়া ৩৪।

খলীফা ওমর (রা:) রাসূল (সা:)-এর চাচা আব্বাস (রা:)-এর অসিলায় দোয়া করেছিলেন তার জীবিত অবস্থায় এবং রাসূল (সা:)-এর মৃত্যুর পর তাঁর অসিলায় বৃষ্টির জন্য দোয়া করেননি। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ (صحيح البخاري: ١٠١٠)

অর্থ: "আনাস বিন মালেক (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিত তখন ওমর (রা:) আব্বাস (রা:) এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দোয়া করাতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নবীর মাধ্যমে ওসীলা করে দোয়া করতাম অতপর তুমি আমাদের কে বৃষ্টি দিতে। আর এখন আমরা ওসীলা করছি নবীর চাচা আব্বাস (রা:) এর মাধ্যমে। সুতরাং তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তিনি বলেন, অতপর বৃষ্টি বর্ষিত হল।" (সহীহ বুখারী ১০১০)

আর এই বেদ'আতী অসিলা মানুষকে শির্‌কে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় যখন এই ধারণা করা হয় যে, আল্লাহ্ (সুব:) কোন মাধ্যম ছাড়া করতে পারেন না।

প্রশ্ন: তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা, এটি শিরক এবং কুফরী এর প্রমান কি?

উত্তর: প্রথম প্রমাণ: আল্লাহ (সুব:) বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ: "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে, আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে (তার প্রতিও ঈমান এনেছি) তারা বিবাদ পূর্ণ বিষয়কে (মীমাংসার জন্য) তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" (সুরা আন নিসা ৬০)

শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল শাইখ তাঁর তাইসীরুল আজিজিল হামীদ নামক গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় বলেন: এ আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়ার কাজটি পরিত্যাগ করা ফরজ এবং যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালার জন্য যাবে সে মুমিন তো নয়ই, এমনকি সে মুসলিমও নয়।

আল্লামা জামালউদ্দিন আল-কাসেমী তাঁর বিখ্যাত মাহাসিনুত তাবীল নামক কিতাবে সুরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "তারা চায় বিচার ফয়সালা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে, অথচ তাকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ হয়েছে।" তাগুতের নিকট বিচার ফয়সালা চাওয়াকে তাগুতের প্রতি ঈমান পোষন হিসেবে গন্য করা হয়েছে। আর এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাগুতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থই আল্লাহকে অস্বীকার করা, ঠিক যেমনটি তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ [البقرة/٢٥٦]** আল্লাহর এ বাণী উল্লেখ করে বলেন: তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাগুতের প্রতি ঈমান আনা। (ফাতহুল মাজিদ)

আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত 'শয়তান তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চায়' আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, বিচার ফায়সালা চাওয়ার কাজটি শিরকে আকবার (বড় শিরক), যা জঘণ্যতম গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত (বা বিধান) ছাড়া অন্য কোনো বিধানের মধ্যে বিচার ফয়সালা প্রার্থনা করলো, সে মারাত্মক গোমরাহীতে পতিত হলো। কেননা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালা চাওয়া বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয় প্রমাণ: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/٤٠]

অর্থ: "বিধান দেয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করোনা। এটাই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।" (সুরা ইউসুফ ৪০)

আল্লাহই একমাত্র রব, তিনিই একমাত্র বিধান দাতা, এ অধিকার শুধুমাত্র তাঁরই। আল্লাহ-ই (সুব:) বিধান দাতা এ বিশ্বাসের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, বিচার ফয়সালা চাওয়া নামক ইবাদতও তাঁরই উদ্দেশ্যে করা। এ ইবাদত যদি আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে বাদ দিয়ে করা হয়, তাহলেও এটা হবে শিরকে আকবার বা বড় ধরনের শিরক।

শাইখ আবদুর রহমান আস্ সা'দী কিতাবুত তাওহীদের উপর লেখা তাঁর বই 'কাওলুন সাদীদ' এ সুরা নিসার ৬০ নং আয়াতের ব্যাখা প্রসংগে বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাছুলকে বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালা (অন্য কোনো বিধান বা ব্যক্তির কাছে) চায়, তাহলে সে ঐ প্রার্থীত ব্যক্তি বা মতাদর্শকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চেয়েছে।

প্রশ্ন: নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন আমাল করা শিরক তার প্রমান কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود:١٥، ١٦)

অর্থ: "যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল।" (সুরা হুদ ১১:১৫-১৬)

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, দীনার ও দেরহাম অর্থাৎ টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। রেশম পূজারী (পোষাক- বিলাসী) ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলেই খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। সে ধ্বংস হোক, তার আরো খারাপ হোক, কাঁটা-ফুটলে সে তা খুলতে সক্ষম না হয় (অর্থাৎ সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক) সে বান্দা সৌভাগ্যের অধিকারী যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলো-মেলো করেছে আর পদযুগলকে করেছে ধূলোমলিন। তাকে পাহারার দায়িত্ব দিলে সে পাহারাতেই লেগে থাকে। সেনাদলের শেষ ভাগে তাকে নিয়োজিত করলে সে শেষ ভাগেই লেগে থাকে। (অথচ জনসাধারণের কাছে তাদের কোন মূল্য নেই) সে অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। সে যদি কারো ব্যাপারে সুপারিশ করে তাহলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না। (কিন্তু আল্লাহর কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য)।" (সহীহ বুখারী ২৮৮৭; বায়হাকী ফী শুআবিল ঈমান ৪২৮৯)

প্রশ্ন: "আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান" এ ধারনাটি বাতিল এবং শির্ক বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন?

উত্তর: আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই বিশ্বাস অতিশয় বিপজ্জনক; মূর্খতা এই কারণে যে, এই বিশ্বাস আল্লাহর সৃষ্টির ইবাদত করার মত সবচেয়ে বড় পাপকে উৎসাহিত করা হয় যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করে। এটা 'তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত' বিশ্বাসের বিপরীত শিরকের একটি রূপ। কারণ এটা স্রষ্টার জন্য এমন এক বিশেষণ দাবি করে যা তাঁর নয়। কুরআন অথবা রাসূলের (সা:) জীবনীতে আল্লাহর এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে কুরআন এবং সুন্নাহ এই বক্তব্যের বিপরীত।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তিনি আরশে সমাসীন বিষয়টির প্রমান হচ্ছে-

১। কোরআন থেকে প্রমাণ: আল্লাহ তার সৃষ্টির উর্ধ্বে আরশে সমাসীন কোরআনে এরূপ প্রচুর আয়াত আছে। এই গুলি কোরআনের প্রায় প্রতি

সুরাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। আল্লাহর (সুব:) আরশের উপর সমাসীন এই আয়াতটি পবিত্র কুরআনে সাত বার উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব আল্লাহ (সুব:) সর্বত্র বিরাজমান রয়েছে এই বিশ্বাসকারী কাফের এবং ইসলাম থেকে বহিস্কৃত। বস্তুত: আল্লাহ (সুব:) মর্যাদা ও পরাক্রমে, জাত ও সত্তাগতভাবে যেমন সবার উর্ধ্বে তেমনি তিনি অবস্থানের দিক থেকেও সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে। আল কুরআনের প্রায় এক হাজার আয়াত দ্বারা আল্লাহর উর্ধ্বে অবস্থান করার গুনটি বুঝা যায়। আল্লাহ (সুব:) আরশের উপর সমাসীন থেকেই সবকিছু দেখেন ও শুনেন। আরশের উপর সমাসীন হওয়ার সাতটি আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হলো।

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف : ٥٤]

অর্থ: "নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর আরশে উঠেছেন।" (সুরা আ'রাফ ৭:৫৪)

{ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [يونس : ٣]

অর্থ: "নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর আরশে উঠেছেন।" (সুরা ইউনুস ১০:৩)

{ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}

অর্থ: "আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অত:পর তিনি আরশে উঠেছেন।" (সুরা রা'দ ১৩:২)

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } [طه : ٥]

অর্থ: "তিনি রহমান, আরশে সমাসীন।" (সুরা ত্বাহা ২০:৫)

{الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان : ٥٩]

অর্থ: "যিনি আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে উঠেছেন। পরম করুণাময়। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে যিনি সম্যক অবহিত, তুমি তাকেই জিজ্ঞাসা কর।" (সুরা ফুরকান ২৫:৫৯)

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [السجدة : ٤]

অর্থ: "আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন।" (সুরা আলিফ লাম মীম সাজদাহ ৩২:৪)

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}

অর্থ: "তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশে উঠেছেন।" (সুরা হাদীদ ৫৭:৪)

এ আয়াতগুলোতে বর্ণিত اِسْتَوَي 'অধিষ্ঠিত হয়েছে' এটি فِعْلِي وَجُوْدِي صِفَت 'ফে'লি ওজুদী সিফাত' বা ক্রিয়াগত ইতিবাচক গুন। এ ধরণের গুনগুলো আল্লাহর ইচছা-ইরাদার সাথে সংশ্লিষ্ট। যখন ইচ্ছে এগুলো করেন আবার যখন চান এগুলো পরিহার করেন। আরশ সৃষ্টির পূর্বে اِسْتَوَي বা অধিষ্ঠান ক্রিয়াটি পরিত্যাক্ত ছিল। এ ধরনের গুনগুলো **قديمة النوع حادثة الاحاد** অর্থাৎ আল্লাহর (সুব:) অনাদীকাল থেকেই এগুলো দ্বারা গুনান্বিত ছিলেন এবং অনন্তকাল ব্যাপী গুনান্বিত থাকবেন। তবে এগুলো তার ইচ্ছাধীন হওয়ায় তিনি যখন চাইবেন প্রকাশ করবেন। আর যখন চাইবেন পরিত্যাগ করবেন। যেমন: হাঁসি-খুশি, বিস্ময়, কেয়ামত দিবসে আগমন এসব যখনই ইচ্ছে তখনই তিনি করেন। (আল মাদখাল ৯১-৯২)

اِسْتَوَي শব্দটি দ্বারা আল্লাহ (সুব:) তাঁর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার গুনটি প্রকাশ করেছেন। তিনি আরশের উপরই বিরাজমান। সত্তাগতভাবে তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (র:) বলেন, 'এ শব্দটির ব্যাখ্যায় সালাফে সালেহীন থেকে চারটি শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

১. اِسْتَقَرَّ 'ইস্তাকার্‌রা' অর্থ 'অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

২. عَلَا 'আলা' অর্থ 'সমুন্নত হয়েছেন'।

৩. اِرْتَفَعَ 'ইরতাফা'আ' অর্থ 'সমুচ্চ হয়েছেন।

৪. صَعُدَ 'সায়িদা' অর্থ আরোহন করেছেন।

এ সব অর্থই একথা প্রকাশ করে যে, আল্লাহ (সুবঃ) আরশের উপর অধিষ্ঠিত।

কুরআনে আরেকটি আয়াত:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ [المعارج/٤)

অর্থ: "ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্দ্ধগামী হয় এমন একদিনে যাহা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। (সুরা মাআরিজ ৭০:৪)

সুতরাং যারা গভীরভাবে চিন্তা করে, কোরআন নিজেই তাদের স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তার সৃষ্টির অনেক ঊর্ধে আরশে সমাসীন এবং কোন ভাবেই এর ভিতরে অথবা এর দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়। যদি আল্লাহ (সুবঃ) আরশে সমাসীন না হন তাহলে ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় কি করে?

মিরাজ থেকে প্রমাণ: মদীনায় হিজরত করার দুই বৎসর পূর্বে রাসূল (সাঃ) মক্কা হতে জেরুজালেমে অলৌকিক রাত্রি ভ্রমণ (ইসরা) করেন এবং সেখান হতে মিরাজ করেন অর্থাৎ সাত আসমানের উপর সৃষ্টির সর্বোচ্চ সীমায় গমণ করেন। আল্লাহ (সুবঃ) আরশে সমাসীন অধিষ্ঠিত হওয়ার উপর যদি অন্যকোন দলীল-প্রমান নাও থাকতো তবুও শুধু মেরাজের ঘটনা একটাই যথেষ্ট ছিল আল্লাহ (সুবঃ) আরশে আছেন তা প্রমান করার জন্য। মেরাজের ঘটনা হাদীস ও তাফসীরের গ্রহণযোগ্য সকল কিতাবেই বিশুদ্ধ সনদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। তিনি যাতে সরাসরি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে পারেন এ জন্য তাকে এই অলৌকিক ভ্রমন করান হয়েছিল। সেখানে সপ্তম আসমানের উর্দ্ধে, দিনে পাঁচবার সালাত (আনুষ্ঠানিত প্রার্থণা) বাধ্যতামূলক করা হয়, আল্লাহ সরাসরি রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে কথা বলেন এবং সুরা আর বাক্বারার (কোরআনের দ্বিতীয় সুরা) শেষ আয়াত গুলি অবতীর্ণ। (বুখারীতে বিস্তারিতভাবে বর্নিত আছে)

যদি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হতেন তাহলে রাসূলকে (সাঃ) কোথাও যেতে হত না। তিনি নিজের বাড়ীতে সরাসরি আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে পারতেন। সুতরাং এই ঘটনাটি একটি প্রমান যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন, তিনি আরশে সমাসীন।

২। হাদিস থেকে প্রমাণ: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিবরণের মধ্যে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যেগুলি পরিস্কার ভাবে প্রতিষ্ঠা করে যে আল্লাহ পৃথিবী অথবা তার সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নন। আবু হুরায়রাহর বর্ণনায় পাওয়া যায় যেখানে রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তিনি তার কাছে তার আরশের উপর রক্ষিত একটি পুস্তক (যা তিনি রেখেছিলেন) লিখেছেন, নিশ্চয়ই আমার করুনা আমার ক্ষোভ হতে অগ্রগামী হবে।" (সহীহ বুখারী ৩১৯৪; মুসনাদে আহমদ ৮১২৭) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جَارِيَةٌ لِى صَكَكْتُهَا صَكَّةً. فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقُلْتُ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ : « ائْتِنِى بِهَا ». قَالَ : فَجِئْتُ بِهَا قَالَ : « أَيْنَ اللَّهُ ». قَالَتْ : فِى السَّمَاءِ. قَالَ : « مَنْ أَنَا ». قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ : « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ».

অর্থ: "মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী বলেন: আমি বললাম। হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি বাঁদি আছে আমি তাকে একটি ধপ্পর মেরেছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার এই কাজটিকে বড় অন্যায় হিসাবে দেখলেন। আমি বললাম তাহলে আমি তাকে স্বাধীন করে দেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে (দাসীকে) জিজ্ঞাস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে উত্তর দিল, আল্লাহ (সুবঃ) আকাশে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মেয়েটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সে উত্তর দিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তাকে মুক্তি দাও, কারণ নিশ্চয়ই সে একজন সত্যিকার মুমিন। (সহীহ মুসলিম ১২২৭; সুনানে আবু দাউদ ৯৩১; মুসনাদে আহমদ ১৭৯৪৫)

অপর হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহ (সুবঃ) প্রতি রাতের শেষভাগে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন। আর এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, অবতরণ বলা হয় উপর থেকে নিচে নামাকে। যদি আল্লাহ (সুবঃ)

সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান থাকেন। তাহলে আবার কোথা থেকে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন? হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, আমাদের রব আল্লাহ (সুব:) প্রতি রাতের শেষ তৃতিয়াংশে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন। অত:পর তিনি আহবান করতে থাকেন, কে আছ! আমাকে ডাকবে যার ডাকে আমি সাড়া দিব? কে আছ! আমার কাছে আবেদন করবে, যার আবেদনে আমি দান করবো? কে আছ! আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করবে, যাকে আমি ক্ষমা করবো?" (সহীহ বুখারী ৭৪৯৫; সহীহ মুসলিম ১৮১৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৩৮৮)

সুতরাং, ইসলাম এবং এর প্রধান তত্ত্ব তৌহিদ অনুসারে নিরাপদে বলা যায় যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি হতে সর্ম্পূণ আলাদা। কোন প্রকারেরই সৃষ্টি তাঁকে বেষ্টিত করে নেই অথবা তাঁর ঊর্ধ্বে বিদ্যমান নেই। আল্লাহ সকল বস্তুর ঊর্ধে। ইসলামের মূল সূত্র হিসাবে আল্লাহ সম্বন্ধে এটাই হল সঠিক মতবাদ। এটা খুব সহজ এবং দৃঢ়।

প্রশ্ন: আল্লাহ (সুব:) তো নিরাকার, তিনি আরশে সমাসীন হন কিভাবে?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) নিরাকার এ কথাটি নাস্তিকতার নামান্তর। তিনি নিরাকার নন। তিনি অজানা আকার। তাঁর চেহারা, হাত, পা, চোখ, আঙ্গুল ইত্যাদি আছে। তবে এগুলো তার বিশেষন। তাঁর সত্তার ধরণ-ধারণ, রূপরেখা কেমন এটা যেমন তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তেমনি তার চেহারা, হাত, পা, চোখ, আঙ্গুল কেমন তাও তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। তাঁর সত্তার আকৃতি ও ধরণ-ধারণ জানা থাকলে তাঁর বিশেষনের ধরণ-ধারণ জানা সম্ভব হতো। তাঁর সত্তার রূপ যেহেতু তিনি ছাড়া আর কারো জানা নেই সেহেতু তাঁর বিশেষনের আভিধানিক অর্থ ব্যতিত এর কোন রূপ-রেখা তিনি ভিন্ন আর কারোরই জানা নেই। এগুলোর রূপরেখা জানা সৃষ্টির ক্ষুদ্র জ্ঞানের বহু-বহু উর্ধ্বে। আল্লাহ (সুব:) বলেন,

{وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طه : ١١٠]

অর্থ: "তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে না।" (সুরা ত্বহা ২০:১১০)

এগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহ (সুব:) যেভাবে বর্ণনা করেছেন ঠিক সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। এগুলোর কোন আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা করা যাবে না। সৃষ্টি জগতের কোন কিছুর সাথে কিছুতেই তুলনা করা যাবে না। এগুলোর আভিধানিক অর্থের বাইরে কোন রূপ অর্থগত বা শব্দগত বিকৃতি করা যাবে না। এগুলোকে অর্থহীনও করা চলবে না কিছুতেই। কুরআন ও সুন্নাহতে এ গুলো যেরূপে বর্ণিত হয়েছে সেরূপেই এগুলোর উপর ঈমান আনা ফরজ। এগুলো কেমন সে প্রশ্ন করা বিদআত ও ভ্রান্তি। আক্বিদার কিতাব সমূহে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে:

استوائه معلوم وكيفيته مجهول والايمان به واجب والسوال عنه بدعة

অর্থ: "আল্লাহর আরশে সামসীন হওয়া, এমনিভাবে আরশ থেকে প্রথম আসমানে অবতরন করা, আল্লাহর হাত, পা, চোখ, চেহারা ইত্যাদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানা, এগুলোর ধরণ-ধারণ ও রূপরেখা অজানা, এগুলোর উপর ঈমান রাখা ফরজ, প্রশ্ন করা বিদআত ও বিভ্রান্তি।"

প্রশ্ন: আল্লাহর যে অজানা আকার তথা চেহারা, হাত, পা, চোখ, আঙ্গুল আছে তার প্রমান কি?

উত্তর:

আল্লাহর চেহারা: আল্লাহর চেহারা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ ...حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ »

অর্থ: "আবু মুসা আশ'আরী (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের মাঝে পাঁচাটি কথা বলার জন্য দাড়ালেন। তিনি বললেন...তাঁর পর্দা হলো নূর বা জ্যোতী। যদি এ পর্দা তিনি খুলে দেন তবে তার চেহারার জ্যোতী সমূহ তাঁর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তথা গোটা সৃষ্টি জগতকে জ্বালিয়ে দিবে।" (সহীহ মুসলিম ৪৬৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৯৫)

আল্লাহর সত্তার জ্যোতির সামান্যতম তাজাল্লি বা বহি:প্রকাশের পাহাড় চূর্ন-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিরাকার হলে কিসের তাজাল্লিতে পাহাড়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো?

আল্লাহর হাত: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح : ١٠]

অর্থ: "আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।" (সুরা ফাতাহ ৪৮:১০)

আল্লাহর চোখ: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه : ٣٩]

অর্থ: "যাতে তুমি (মূসা) আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।" (সুরা ত্বাহা ২০:৩৯)

আল্লাহর পা: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ { تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ } حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, (কেয়ামতের মাঠে) জাহান্নাম বলতে থাকবে 'আরো কিছু আছে কি?' শেষ পর্যন্ত আল্লাহ (সুব:) জাহান্নামে তাঁর পা রাখবেন। অত:পর জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট! যথেষ্ট।" (সহীহ বুখারী ৬৬৬১; সহীহ মুসলিম ৭৩৫৬; সুনানে তিরমিজি ৩২৭২)

আল্লাহর আঙ্গুল: হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) এই দোয়াটি বেশী বেশী বলতেন, 'হে অন্তরসমূহকে স্থীরকর্তা! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর স্থীর রাখ। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি। তবে কি আপনি আমাদের ব্যাপারে কোন আশংকা বোধ করছেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, হ্যা! নিশ্চয় সব

অন্তরগুলো আল্লাহর আঙ্গুল সমূহ থেকে দুই আঙ্গুলের মধ্যে। তিনি ওগুলোকে উলট-পালট করেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২৯১৯৬)

প্রশ্ন: ভাগ্য গননা শির্ক কিভাবে?

উত্তর: মানবজাতির মধ্যে অনেকে আছে যারা অদৃশ্য এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করে। তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন-গণক, ভবিষ্যৎ-বক্তা, পূর্ব-পরিজ্ঞেয়ক, দৈবজ্ঞ, যাদুকর, পূর্বাভাষদাতা, দৈববাণী প্রকাশক, জ্যোতিষী, হস্তরেখা বিশারদ ইত্যাদি। গণকরা বিভিন্ন পদ্ধতি এবং মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাদি বের করে আনার দাবী করে, যার মধ্যে রয়েছে: চায়ের পাতা পড়া, রেখা অংকন, সংখ্যা লেখা, হস্তরেখা-পড়া, রাশিচক্র পরীক্ষা করা, স্ফটিক বলের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং হাড়গোড়, ছড়ি-ছোড়া, লাঠি চালনা, বাটি চালান ইত্যাদি।

গুপ্ত বিদ্যা পেশাজীবিগণ যারা অদৃশ্য প্রকাশ করতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম বলে দাবী করে তাদের প্রধানত: দুশ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে:

(১) যাদের সত্যিকার কোন জ্ঞান বা গুপ্ত বিষয় জানা নেই। তারা প্রায়ই অনেকগুলি অর্থহীন আচারানুষ্ঠান করে খরিদ্দারদের ধোঁকা দেয় এবং তারপর তারা পরিকল্পিতভাবে সাধারণ অনুমানগুলিই বলে। তাদের কিছু কিছু অনুমান, সাধারণতার কারণে, সচরাচর সত্য হয়ে যায়। বেশীর ভাগ লোকের গুটিকয়েক ভবিষ্যদ্বাণী যা সত্য হয় সেগুলি স্মরণ রাখার প্রবণতা দেখা যায় এবং যেগুলি সত্য হয় না তার বেশীরভাগই তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

(২) দ্বিতীয় দলভুক্ত তারা যাদের জ্বীনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এই দলটি সবচেয়ে গুরুতর। কারণ এর সঙ্গে সাধারণত: শির্ক এর মত মারাত্মক গুনাহ জড়িত। যারা এই কাজে জড়িত তাদের তথ্যাদি অতি নির্ভূল হয় এবং এইভাবে মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের মধ্যে একইভাবে সত্যিকার ফিত্না (প্রলোভন) সৃষ্টি হয়।

অপবিত্র বিশ্বাস জড়িত থাকার কারণে ইসলাম ভাগ্য গণনার প্রতি কঠোর দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করেছে। যে কোন প্রকারের গণক দর্শন সম্বন্ধে রাসূল (সা:) পরিস্কারভাবে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً »

অর্থ: "সাফিয়্যা (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: "যদি কেউ গণকের কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে ৪০ দিন রাত পর্যন্ত তার সালাত গ্রহীত হবে না।" (সহীহ মুসলিম ৫৯৫৭; মুসনাদে আহমদ ১৬৬৩৮) এই হাদিসের বর্ণিত শাস্তি শুধু মাত্র গণকের কাছে যাবার এবং তাকে কৌতুহল বশত: প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার করণেই।

আর গণক অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের খবর জানে এই বিশ্বাস নিয়ে যে কেউ গণকের কাছে যায় সে কুফরি করলো। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: "আবু হুরাইরা এবং হাসান (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, যে গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মদের উপর (সা:) উপর যা নাজিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করল। (মুসনাদে আহমদ ৯৫৩৬; সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৩৯;)

এই ধরণের বিশ্বাস আল্লাহর অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে সৃষ্টির উপর আরোপ করে। ফলে এটি 'তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত'কে ধ্বংস করে এবং তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ধরণের শিরকের বাস্তব নমুনা। গণকদের লেখা জিনিস (বই, পত্রিকা ইত্যাদি) পড়া এবং তাদের কথা রেডিওতে শোনা অথবা টেলিভিশনে দেখাটাও কুফরীর অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ (সুব:) স্পষ্ট ভাবে কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্য সম্পর্কে জানে না, এমনকি রাসূলও (সা:) না। ইরশাদ হচ্ছে:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ [الأنعام/٥٩]

অর্থ: "অদৃশ্যের কুঞ্জি (চাবিসমূহ) তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। (সুরা আন'আম ৬:৫৯) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف/١٨٨]

অর্থ: "তারপর আল্লাহ (সুব:) রাসূল (সা:) কে বলেন, বল! আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজস্ব ভালমন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমি প্রভূর কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না।" (সুরা আ'রাফ ৭:১৮৮)

প্রশ্ন: রাশিচক্র সম্বন্ধে ইসলামের রায় কি?

উত্তর: জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা শুধু হারামই নয় বরং একজন জ্যোতিষবিদের কাছে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বই কেনা অথবা একজনের কোষ্ঠী যাচাই সম্পূর্ন নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা এই বিদ্যা চর্চা করে তাদের জ্যোতিষী বা গণক বলে গণ্য করা হয়। ফলস্বরূপ, যে তার রাশিচক্র খোঁজে সে রাসূল (সা:) প্রদত্ত নিম্নের বিবৃতির অধীনে পড়ে:

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً »

অর্থ: "সাফিয়্যা (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: "যদি কেউ গণকের কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে ৪০ দিন রাত পর্যন্ত তার সালাত গ্রহীত হবে না।" (সহীহ মুসলিম ৫৯৫৭; মুসনাদে আহমদ ১৬৬৩৮) এই হাদিসের বর্ণিত শাস্তি শুধু মাত্র গণকের কাছে যাবার এবং তাকে কৌতুহল বশত: প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার করণেই।

জ্যোতিষের বক্তব্যের সত্যতায় সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও একজনের শুধু তার কাছে যাওয়া এবং প্রশ্ন করার শাস্তি এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ জ্যোতিষ সংক্রান্ত তথ্যাদির সত্য মিথ্যায় সন্দিহান হয়, তবে সে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যরাও হয়তো অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানে বলে সন্দেহ পোষণ করলো। এটা এক ধরনের শিরক। কেউ তার রাশিচক্রে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করলে সে সরাসরি কুফরি (অবিশ্বাস) করলো। কারণ রাসূল (সা:) বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: "আবু হুরাইরা এবং হাসান (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, যে গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মদের উপর (সা:) উপর যা নাজিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করল। (মুসনাদে আহমদ ৯৫৩৬; সুনানে ইবনে মাজাহ ৬৩৯;)

পূর্বে বর্ণিত হাদিসের মত এই হাদিসে শাব্দিকভাবে গণকের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলেও জ্যোতিষবিদদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। উভয়ই ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে। কোন পুরুষ অথবা মহিলা কর্তৃক খবরের কাগজের রাশিচক্রের কলাম পড়া অথবা পড়তে শোনাও সম্পূর্ন নিষেধ।

গনতন্ত্র: একটি বাতিল দ্বীন এবং এ ব্যাপারে সংশয় সমূহের জবাব

প্রশ্ন: গনতন্ত্রের অর্থ এবং সংজ্ঞা কি?

উত্তর: গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ হল Democracy। Democracy শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ Demos ও Cra:us থেকে উদ্ভুত। Demos শব্দের অর্থ হল 'মানুষ/জনগণ' এবং Cra:us অর্থ 'পরিচালনা'। Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফল ঘটে।

আইনের অধ্যাপক ডক্টর আবদুল হামিদ মিতওয়ালী বলেন: শাসন ব্যবস্থায় 'গনতন্ত্র' জাতির প্রভূত্বের (রবের) নীতিতে পরিণত হয়েছে, অধিকন্তু সংজ্ঞানুযায়ী প্রভুত্ব হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যার উপর অন্য কোন কর্তৃত্ব নেই। (Dr. Hamid Mitwali's Ruling System in Devoloping Country সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ: ৬২৫)

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ যোসেফ ফ্রাংকেল বলেন: প্রভূত্বের অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা এর উপরে অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং যার পশ্চাতে সিদ্ধান্তসমূহ পূনর্বিবেচনা করার মত কোন বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী নেই। (যোসেফ ফ্রাংকেলের the International Relationship তুহামা পাবলিশিং, ১৯৮৪, পৃ: ২৫)

প্রশ্ন: গনতন্ত্রের শিরকী এবং কুফরী দিকসমূহ কি ?

উত্তর: ইসলাম সম্পর্কে যার ন্যুনতম জ্ঞান আছে তিনি বুঝতে পারবেন মানুষকে মানুষের 'রব' হিসেবে উপস্থাপন করেছে এই গনতন্ত্র। কারণ 'গণতন্ত্র' এমন একটা পদ্ধতি যার দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত অস্তিত্ত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং যা আল্লাহ্‌র ঐ অধিকারের বিপক্ষে আচরণ করতে শেখায় যা একমাত্র আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। এবং এটা মানুষকে আল্লাহ্‌র পরিশুদ্ধ একটি ইবাদত হতে ফিরিয়ে শির্কের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করায়। এটি মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌঁছে

দেয়। অথচ একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ্ (সুব:)। মহান আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

"এবং আল্লাহ্ হুকুম দেন, তাঁর হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।" (সুরা রা'দ ১৩:৪১)। তিনি আরও বলেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সুরা শুরা ৪২:২১)

এই সকল আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধিরা যখন জনগণের জন্য আইন নির্ধারণ করে তা দ্বিধাযুক্ত অবস্থায় অথবা নির্দিধায়ে তারা সেটা মানতে বাধ্য থাকে। এভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাসমূহ প্রাধান্য পায় আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশ গুলোর উপর। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

أَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَٱلأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً

"তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? তুমি কি মনে কর যে ওরা অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুরই মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।" (সুরা ফুরকান ২৫: ৪৩-৪৪)

অতএব মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে এবং বিচারের ভার সে মিথ্যা উপাস্যের কাছে অর্পন করে, আর তারাই হল 'তাগুত'। এই অন্যায় অধিকার বাস্তবায়নের অপর নামই হল আল্লাহ্‌র বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করা। যে সব মানুষ অথবা পদ্ধতিগুলো আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আইনের বিরুদ্ধে শাসন করে আল্লাহ্ (সুব:) তাদেরকেই 'তাগুত' বলে সাব্যস্ত করেছেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً

"আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন যারা দাবী করে যে তারা বিশ্বাস করে আপনার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে। অত:পর তারা তাগুতের কাছে তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে এর (তাগুতের সাথে) কুফরী করার আদেশ দেয়া হয়েছিল...।" (সুরা নিসা ৪:৬০)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন: "আল্লাহ্‌র ইবাদত বাদ দিয়ে অথবা সত্য পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তির উপাসনা বা ইবাদত করা হয়; অথবা ঐ ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোনও আদেশ দেয় তাহলে সেই হল 'তাগুত'। এই কারণে যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে তারাই হল 'তাগুত'।" (আল-ফাতওয়া, খন্ড-২৮, পৃ:২০০)

মুহাম্মদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতি (রহ:) বলেন: 'এবং কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ (সুব:) প্রণীত এবং রাসূল (সা:) এর মুখ নি:সৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখ নি:সৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শির্ক। এতে কোন সন্দেহ নেই'। (আদওয়া উল-বায়ান, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৮২-৮৫)

এখন সত্যিকার অর্থে মুসলিমরা জেনে গেছে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য কি? এর মূল লক্ষ্য হল অধিকাংশের ইচ্ছার ভিত্তিতে জনসাধারণকে শাসন করা যা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের বৈপরিত্যকে ঘোষণা করে।

প্রশ্ন: গনতন্ত্র ইসলামিক শুরার মত এই যুক্তিতে যারা এতে অংশগ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?

উত্তর: কিছু অজ্ঞ লোকেরা গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের বৈধতা দেয়ার জন্য একে ইসলামিক শুরা বা মজলিসে শুরার সাথে তুলনা দেয়। তারা বলে, গনতন্ত্র ইসলামিক শুরার অনুরূপ। আল্লাহর উপর ভরসা করে আমরা এইসব অজ্ঞ লোকদের জবাবে বলতে চাই-

প্রথমত: নামের পরিবর্তনের কারনেই মূল বিষয় পরিবর্তন হয়ে যায় না। মদকে যেরূপ ইসলামিক মদ লেভেল এঁটে দিলেই তা হালাল হয়ে যায় না, তেমনি বাতিল দ্বীন গনতন্ত্র কখনই ইসলামিক লেভেল এঁটে দিলে তা জায়েজ হয়ে যায় না। বরং তারা তাদের এসব বাতিল যুক্তির মাধ্যমে লোকদের প্রতারিত করতে চায়, অথচ আল্লাহ (সুব:) বলেন,

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [البقرة/٩]

"তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।" (সুরা, বাক্বারাহ ২:৯)

দ্বিতীয়ত: গনতন্ত্র ইসলামিক **শুরার** সামঞ্জস্য অবশ্যই নয়, কারন সবাই জানে যে, সংসদীয় সভা হচ্ছে শিরক্ এবং কুফরীর আড্ডাখানা, যেখানে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে নতুন আইন তৈরী করা হয়, আল্লাহর হালাল হারামকে পরিবর্তন করা হয়। অথবা আল্লাহর আইনের কোন তোয়াক্কাই করা হয় না। নিজেরাই আইনদাতা রবের আসনে বসে। এ যেন এরূপ উদাহরন যা আল্লাহ আমাদের বলে দিয়েছেন-

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থ: "ভিন্ন ভিন্ন অনেক মাবুদ ভাল নাকি এক ইলাহ। তাঁর পাশাপাশি যার ইবাদত তোমরা কর কিছু নাম ব্যতীত কিছুই না যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছ, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি।" (সুরা ইউসুফ ১২:৩৯)

সুতরাং গনতন্ত্রকে ইসলামিক শুরার সাথে তুলনা দেয়া হচ্ছে তাওহীদকে শিরকের সাথে, ঈমানকে কুফরীর সাথে তুলনা দেয়ার মত। এটা হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যারোপ। এটা হচ্ছে হক্বের সাথে বাতিলের মিশ্রণ, হেদায়েতের সাথে পথভ্রষ্টতার মিশ্রণ, নুরের সাথে জুলুমাতের মিশ্রন। একজন মুসলিমের অবশ্যই ইসলামিক শুরার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হবে, তাহলে জানতে পারবে এই দু'য়ের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ফারাক।

শুরা হচ্ছে শারয়ী পথ ও পদ্ধতি, অপরদিকে গনতন্ত্র হচ্ছে মানুষের নাফস ও খাহেশাতকে পূরন করার জন্য ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের তৈরীকৃত পদ্ধতি।

আল্লাহ (সুব:) বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى/٢١]

অর্থ: "ওদের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?" (সুরা শুরা ৪২:২১)

ইসলামিক শুরা হচ্ছে আল্লাহর আইনকে, তার শরীয়াকে বাস্তবায়নের জন্য, অপরদিকে গনতন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর শরীয়া ও বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষের উপর মানুষের আইনকে বাস্তবায়নের জন্য।

আল্লাহ (সুব:) বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/٤٠]

অর্থ: "বিধান দিবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি আদেশ দিয়েছেন- তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করার জন্য। ইহাই শ্বাশত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা সম্পর্কে অবগত নহে।" (সুরা ইউসুফ ১২:৪০)

গনতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস, অধিকাংশ জনগন যা চাইবে তাই বাস্তবায়ন হবে, অর্থাৎ গনতন্ত্রে অধিকাংশ জনগন বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিরাই হচ্ছে রব এবং ইলাহ। কিন্তু ইসলামিক শুরার ব্যক্তিরা আদেশের অধীন, তারা বাধ্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য করতে এবং কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে আমীরদের আনুগত্য করতে। ইসলামিক নেতারা অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। বরং অধিকাংশ বা সবাই নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য যতক্ষন না তিনি আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেন। কেননা স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

গনতন্ত্র এবং এর আহবায়করা আল্লাহর আইন ও ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পন করে না। Democracy বা গনতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে কাফেরদের ভূমিতে, এবং বেড়ে চলেছে সেখানে এবং দুনিয়াব্যাপী মানুষদের শিরক, কুফরের দিকে নিয়ে যাচেছ। মদ, জুয়া, সুদ, বেশ্যাবৃত্তি, লটারী, সমকামিতাসহ অনেক অনেক হারাম এবং খারাবীকে অনুমোদন দিয়েছে এই গনতন্ত্র, যেহেতু তা অধিকাংশ জনগন কামনা করে।

সুতরাং যারা এহেন গনতন্ত্রকে ইসলামের সাথে তুলনা দেয়, তাদের লজ্জা করা উচিত, আল্লাহকে ভয় করা উচিত, কিসের সাথে তারা কিসের তুলনা দিচ্ছে? নিজেদের খারাবীকে জায়েজ করার জন্য এরূপ বাতিল উপমা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। যার নুন্যতম সাধারন জ্ঞান আছে সে বুঝতে পারবে কত আকাশ-পাতাল পার্থক্য ইসলাম এবং গনতন্ত্রের মাঝে।

প্রশ্ন: মিশরের তৎকালীন রাজসভায় একজন মন্ত্রী হিসেবে ইফসুফ (আ:) এর যোগদানকে যারা অপব্যাখ্যা করে গনতন্ত্রে যোগদানের দলীল হিসেবে গ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?

উত্তর: মহান আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [يوسف/٥٤-٥٦)

অর্থ: “রাজা বলল ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব। অত:পর রাজা যখন তাঁর সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল বিশ্বাস ভাজন হলে। ইউসুফ বললেন, ‘আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম ও সুবিজ্ঞ রক্ষক।’ এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিফল নষ্ট করি না।” (সুরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৬)

তাই যারা ইউসুফ (আ:)-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে এই আয়াতটি প্রদর্শন করে দলিল হিসাবে তারা বলতে চায় যেহেতু ইউসুফ (আ:) একজন অমুসলিম রাজার রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদে যোগ দিতে পারেন তাহলে কেন আমাদের পক্ষ হয়ে একজন প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবে-এটা গ্রহণযোগ্য হবে না?

যারা এই আয়াতগুলোকে তাদের পক্ষে দলিল হিসাবে ব্যবহার করে তারা হয়তো ভুলে গেছে কারাগারে ইউসুফ (আ:) তাঁর দুই সাথীকে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/٤٠)

অর্থ: “বিধান দিবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার। তিনি আদেশ দিয়েছেন- তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করার জন্য। ইহাই শ্বাশত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা সম্পর্কে অবগত নহে।” (সুরা ইউসুফ ১২:৪০)

তাহলে আমরা কিভাবে বলব যে, ইউসুফ (আ:) ঐ রকম একটা সরকার ব্যবস্থাকে সাহায্য করেছিলেন অথবা তাদের সাথে আপোষ করেছিলেন যারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন করেছিল যখন তিনিই অন্যদেরকে এই বিধান বা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন এই বলে যে: “বিধান দেবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্রই।”

প্রথমত: যারা এই (১২:৫৪-৫৬) আয়াতগুলোকে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে, দলিলের অভাবে তাদের দাবীকে প্রমাণ করার জন্য যে, তৎকালীন সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত ইউসুফ (আ:)-এর শরীআহ্ সম্মত নয় এবং এই উদাহরণের দ্বারা আর কিছুই নির্দেশ করার নেই। বরং এই আয়াতগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রাজা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে:

عن أبي إسحاق الكوفي ، عن مجاهد قال: أسلم الملك الذي كان معه يوسف.

অর্থ: “ইবনে জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহ:) বলেন: “ইউসুফ (আ:) এর সময় যেই রাজা ছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন”। (জামি আল-বাইয়ান আত-তাওয়ীল আই আল-কুরআন, ৯/২১৭)

আল-বাঘাবী বলেন:

قال مجاهد وغيره: فلم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف له حتى أسلم الملك وكثير من الناس.

অর্থ: “মুজাহিদ (রহ:) ও অন্যান্যরা বলেছেন: ইউসুফ (আ:) তাদেরকে অতিবিনয়ের সাথে ইসলামের দিকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত হননি যতক্ষণ পর্যন্ত

না রাজা এবং আরও অনেক লোক ইসলামে প্রবেশ করে।" (তাফসীরে বাঘাবী ৪র্থ খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, সুরা ইউসূফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য) আরও বর্ণিত আছে যে,

وقال ابن زيد: وكان لملك مصر خزائن كثيرة فسلم سلطانه كله إليه وجعل أمره وقضاءه نافذا،

অর্থ: "ইবনে যায়েদ বলেন: মিশরের বাদশাহর অনেক সম্পদ ছিল। তিনি তার সমস্ত ক্ষমতা ইউসূফের হাতে অর্পণ করলেন। এবং ইউসূফের নির্দেশ এবং সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত কার্যকর বলে ঘোষনা দিলেন।" (তাফসীরে বাঘাবী ৪র্থ খন্ড ২৫২ পৃষ্ঠা, সুরা ইউসূফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

এর দ্বারা বুঝা গেল, ইউসুফ (আ:) নিজে একজন শাসকও ছিলেন বটে কেননা মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁর উপর মিশরের শাসন ভারও ন্যস্ত হয়েছিল।

عن السدي قال: استعمله الملك على مصر ، وكان صاحب أمرها ، وكان يلي البيعَ والتجارة وأمرَها كله ، فذلك قوله:(وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء).

অর্থ: "ইবনে জারীর আত-তাবারী, আস-সুদ্দী হতে বর্ণনা করেন: রাজা, ইউসুফ (আ:) কে মিশরের উপর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষেরও একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য যত বিষয় ছিল তা তদারকি করতেন। এর প্রমাণ সুরা ইউসুফ, ৫৬ আয়াতের শেষ অংশে পাওয়া যায়:

{وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ} [يوسف: ٥٦]

এই ভাবে আমি ইউসুফ (আ:)-কে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; যে সেই দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। (সুরা ইউসুফ ১২:৫৬)

"... সেই দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন...", এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ইবনে যায়েদ (রা:) হতে বর্ণনা করেন,

ملكناه فيما يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا ، يصنع فيها ما يشاء ، فُوِّضَتْ إليه . قال: ولو شاء أن يجعَل فرعون من تحت يديه ، ويجعله فوقه لفعل.

অর্থ: 'মিশরের সকল কর্তৃত্ব ইউসুফের (আ:) কাছে হস্তান্তর করা হয়ে ছিল এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এমনকি ফেরআউনকে সে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করতে পারতো।" (তাফসীরে তাবারী ১৬ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা, সুরা ইউসূফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

আল-কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা:) ইউসুফ (আ:) সম্পর্কে বলেন যে,

فجلس على السرير ودانت له الملوك ، ودخل الملك بيته مع نسائه ، وفوض إليه أمر مصر

অর্থ: "তিনি তাঁর বিছানার উপর বসলেন এবং রাজা তার পরিষদবর্গ এবং স্ত্রীগণসহ তাঁর সাথে পরিচয় পর্বের জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং মিশরের সকল কর্তৃত্ব তাঁর (আ:) কাছে হস্তান্তর করলেন।" (আল-জামী'লি আহকাম আল-কুরআন, ৯ম খন্ড ২১৩ পৃষ্ঠা, সুরা ইউসূফের ৫৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

এ সম্পর্কে আল-কুরতুবী বলেন:

ولما فوض الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس ، وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمنوا به ، وأقام فيهم العدل ، فأحبه الرجال والنساء

অর্থ: "যখন রাজা, ইউসুফ (আ:)-এর উপর দায়িত্ব সমর্পন করলেন তখন তিনি (আ:) সাধারণ জনগণের উপর উদার প্রকৃতির মনোভাব পোষণ করলেন এবং তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি তাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ই তাকে ভালোবাসতো। (আল-জামী' লি আহকামিল কুরআন, ৯ম খন্ড ২১৮ পৃষ্ঠা, সুরা ইউসূফের ৫৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

এই একই ধরনের কথা পাওয়া যায় আ: ওয়াহ্হাব, আস-সুদ্দী এবং ইবনে আব্বাস (রা:) ও অন্যান্যদের বর্ণনায় ইউসুফ (আ:) এর প্রতি রাজার উক্তিতে-যখন রাজা, তার পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দেখেছিলেন শাসন কর্তৃত্ব এবং ন্যায়বিচার প্রথা প্রচারের ক্ষেত্রে। রাজা বললেন,

فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت ، وإنما نحن لك تبع

অর্থ: "আমি তোমাকে ক্ষমতা দান করলাম, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পারো। এবং আমরা তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আমি তোমার আনুগত্য করব এবং আমি তোমার কোন বিষয়ের সহযোগীর চেয়ে বেশী কিছু নই। (আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, খন্ড ৯/২১৯, সূরা ইউসূফের ৫৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

তাই এক্ষেত্রে যদি এইরকম কোন সম্ভাবনা থাকে যে, ঐ রাজা ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাহলে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে (১২:৫৪-৫৬) দলিল হিসাবে ব্যবহার করাটা প্রশ্নের সম্মুক্ষীন হবে এবং ভূল হবে। কেননা ইসলামের একটা নীতি হল, **اذا جاء الاحتمال بطـل الاسـتدلال** "যদি কোন বিষয়ে ভিন্ন কোন তাবীল বা ব্যাখার সম্ভাবনা বা সন্দেহের অবকাশ থাকে তাহলে তাকে দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রশ্ন: দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের পক্ষ অবলম্বন করার নীতিতে যারা গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের দলীল গ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?

উত্তর: গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমর্থকরা ইসলামের এই নীতিকে দুইভাবে ব্যবহার করে থাকে:

(১) যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হলো কম খারাপের পক্ষ নেয়া।

(২) অন্য দিকে, কাউকে যদি ভোট না দেয়া হয় তাহলে বেশী খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া।

আসলে ইসলামের বেশীরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তারা সঠিক নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে কিন্তু এর প্রয়োগ করে ভুল অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে চায় যেখানে ঐ নীতি খাঁটে না।

বিশেষ করে এই নীতিটির ক্ষেত্রে তাদের ভুল হলো, তারা এর প্রয়োগ বোঝেনি। শুধুমাত্র সেখানেই এটি প্রয়োগ করা যাবে যেখানে, দুটি পথের একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই। কিন্তু যদি দুটোর কোন একটি না করে বেঁচে থাকার উপায় থাকে অর্থাৎ দুটি পথের একটি গ্রহণ করতে যদি বাধ্য করা না হয়- তাহলে সেখানে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ কাউকে যদি

দুটি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা হয় তা হলে সে কম গুনাহের কাজটি করতে পারে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে নয়- যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়: কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল। সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে ২৫% এলকোহল। সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল। অথচ তাকে ঐ দাওয়াতে যেতে কেউ বাধ্য করেনি। দু'টিকেই বর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থনের নামে একটি শির্‌ক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় এই শির্‌ক (আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে আইন তৈরীর অধিকার দেয়া) অনেক অনেক বেশী ক্ষতিকর।

প্রশ্ন: "ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা" এই নীতি গনতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ভূল কিভাবে?

উত্তর: এই নীতির দোহাই দিয়ে যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে জায়েয করতে চায় তাদের ভাষ্য হলো, এমন একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত করলে, যার কর্মপন্থা মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর এবং একটি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী।

প্রথমেই বলতে হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হলো শির্‌ক। সুতরাং এর সুবিধা আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র তাওহীদকে উপেক্ষা ও অমান্য করে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করাকে কি করে সমর্থন করা যায়? সুতরাং উপরোক্ত কথাগুলো বর্জনীয় এবং এর দ্বারা মুসলিমদের ভোট দানে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল।

আর যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই কোন সুবিধা থেকে থাকে তাহলে তার পরেও এটি হালাল হবে না। কেননা আল্লাহ্‌ (সুব:) বলেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ [البقرة/٢١٩)

অর্থ: "তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন: এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, তবে মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।" (সুরা বাকারা ২:২১৯)

ইবনে কাসির (রহ:) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "এসবের লাভগুলো সবই ইহলৌকিক। যেমন, এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য হজম হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, একপ্রকারের আনন্দ লাভ হয়, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। একইভাবে জুয়া খেলাতেও বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি বা অপকারই বেশী। কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও ধ্বংস হয়ে থাকে।" আর একারণেই আল্লাহ্ (সুব:) বলেছেন: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا "কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।" (সুরা বাকারা:২১৯)

একইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও কিছু সুবিধা বা লাভ থাকতে পারে, কিন্তু এতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় নিজ দ্বীনের জন্য যেকোন লাভের চাইতে অনেক অনেক গুন বেশী ক্ষতিকর। আর একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বেশী বড় গুনাহ হলো আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা এবং এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ।

প্রশ্ন: "আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল" এই ভিত্তিতে যারা বলে আমরা ভাল নিয়্যাতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করি তাদের এ কথা বাতিল কিভাবে?

উত্তর: "আমরা তো এটা মুসলিমদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য করছি; যাতে মুসলিমদের সুবিধা হয়"- এভাবেই অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করায়। তারা বলতে চান যেহেতু, একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়্যতে এ কাজটি করা হচ্ছে তাই

এতে কোন সমস্যা নেই- এটি বরং প্রশংসনীয়। আসলে এই মারাত্মক ভুলটি তারা শুধু এখানেই করছে তা নয়।

প্রথম কথাটি হলো, উত্তম নিয়্যত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সাওয়াবের কাজ হয়ে যায় না। আবু হামিদ আল গাজ্জালী (রহ:) বলেন: "গুনাহের কাজের প্রকৃতি কখনো নিয়্যতের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাদীস (প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) থেকে অজ্ঞ বা জাহিল লোকেরা এভাবেই সাধারণ অর্থে ভুল বুঝ নেয়, তারা মনে করে যে, নিয়্যতের দ্বারা একটি গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের মনকে খুশী করার জন্য কারো গীবত করে, অথবা ঐ ব্যক্তি যে অন্যের টাকায় অভাবীদের আহার করায়, অথবা কেউ যদি হারামের পয়সায় স্কুল, মসজিদ বা সৈন্যদের ক্যাম্প তৈরী করে দেয় উত্তম নিয়্যতে, তখন তাদের গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়! এসবই জাহালাত বা মূর্খতা, এই সীমালংঘনের ও অপরাধের উপর এর নিয়্যতের কোন প্রভাব নেই। বরং ভালো উদ্দেশ্যে খারাপ কাজ করার এই নিয়্যত শরীয়তবিরোধী– যা আরেকটি অন্যায়----।" বরং হারাম কাজে ছাওয়াবের নিয়ত করা আল্লাহর সাথে উপহাস করার শামিল।

ইমাম গাজ্জালী (রহ:) আরও বলেছেন: "সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা:) এই বাণী: "প্রত্যেক আমলই তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল"– তিনটি জিনিসের (ইবাদত, মুবাহ ও গুনাহ) এর মধ্যে শুধুমাত্র ইবাদত ও মুবাহ (অনুমতি প্রাপ্ত আমল)-এর মধ্যে সীমিত। গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, ইবাদত খারাপ নিয়তের কারণে গুনাহতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে, একটি খারাপ কাজ কখনোই নিয়্যতের দ্বারা ইবাদতে পরিণত হয়না।" (ইহ্ইয়াউ উলুম আদ্দীন, ৪/৩৮৮-৩৯১)

শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ, অপর শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ এর ফাতওয়ার সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি (বিন বাজ) সংসদ সদস্য হওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়াকে অনুমতি দিয়েছেন। শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ বলেন: "আমি বলি এই ফাতওয়াটি ভুল। ইমাম গাজ্জালী (রহ:)-র যে উদ্বৃতি আমরা দিয়েছি সেই অনুযায়ী, গুনাহ কখনো নিয়্যতের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহর একটি। আর পার্লামেন্টে অংশ নেয়া হলো

কুফুরী, এটা নিয়্যতের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা এই কারণে যে, পার্লামেন্ট হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের একটি মাধ্যম। সুতরাং এতে অংশ নেয়া বা ভোট দেয়ার রায় জানতে হলে গণতন্ত্র সম্পর্কিত রায়ও জানতে হবে, আর এই রায়ও নির্ভর করে এর বাস্তবতা জানার উপর।" (আল-জামি ফি তালাব আল ইলম আশ শারীফ-১/১৪৭-১৪৮)

সুতরাং উত্তম নিয়্যত দিয়ে একটি গুনাহকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। আর মুসলিমদের যুল্ম থেকে রেহাই দেয়ার নামে কুফর বা শির্ক করাতো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তাই হতো তাহলে আমরা বাইবেল আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করতাম!

প্রশ্ন: "ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার" নামে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ বাতিল কিভাবে?

উত্তর: গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলে তারা এই নীতিটিও ব্যবহার করে থাকে। যে প্রার্থীর আদর্শ মুসলিমদের জন্য কম ক্ষতিকর বা কিছুটা উপকারী তাকে নির্বাচিত করার সাথে তারা এই নীতিটির তুলনা করে। কারণ, এতে ভালো প্রার্থীর ভালো কাজে সহায়তা করে মন্দ প্রার্থীকে বাঁধা দেয়া হচ্ছে। এক শ্রেণীর লেখকরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় না, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য, পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে (নাউযুবিল্লাহ)। শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং মানুষদের এটা থেকে বিরত থাকতে বলে তাঁদেরকে এইসব লেখকরা যালিম বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই হলো শির্ক, আর এটাকেই সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর (সুব:) পাশাপাশি অন্যকে আইন রচনার জন্য স্থাপন করে, যা সুস্পষ্ট শির্ক। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, সে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে, উপরোক্ত নীতিটি কতটা ভুলস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তারা যেভাবে এই নীতিটি ব্যবহার করে, তা একেবারেই উল্টো, এই নীতির সঠিক ব্যবহার বরং তাদেরই বিরুদ্ধে যায়। ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো,

এর পন্থাটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে। এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, ঐ মুনকার (খারাপ) নিষেধ করতে গিয়ে যেন আরো বড় মুনকার (ক্ষতি) না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা। ইবনে কাইয়্যিম (রহ:) বলেন: "সুতরাং যদি কারো মন্দ কাজের নিষেধ করা আরো বড় মন্দের দিকে পরিচালিত করে যা আল্লাহ্ (সুব:) ও রাসূল (সা:) বেশী অপছন্দ করেছেন (প্রথম মন্দের চেয়ে), তাহলে তা নিষেধ করা বৈধ নয়। যদিও আল্লাহ্ (সুব:) এটি (প্রথম মন্দ) অপছন্দ করেন এবং এটি যারা করে তাদের অপছন্দ করেন। (ই'লাম আল মুওয়াক্কিয়ীন, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪)

যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে; তারা এ মন্দ ঠেকাতে শির্ক বা কুফরীর মতো মূল্য দিতে বলে। দুটি জিনিসকে মেপে দেখুন তো, সমান হয় কিনা। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة/٢١٧]

অর্থ: "ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।" (সুরা বাকারা ২:২১৭)

এখানে, ফিৎনা বলতে আল্লাহ্ (সুব:) শির্ক ও কুফরীকে বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ তাফসীরে পাওয়া যায়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন: "যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল।" (আল ফাতওয়া-২৮/৩৫৫)

শেখ আলী আল-খুদাইর তাঁর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এই সাক্ষ্য দানে আহবান" বইটিতে শেখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহ:) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: "আল-ফিৎনাহ হলো কুফর। সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায় তা অনেক কম গুরুতর ঐ জমীনে একটি তাগুতকে নির্বাচন করার চেয়ে যে এমন আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়াত বিরোধী।"

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অজুহাতে শির্ক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না। এটা এই জন্যই যে, মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শির্ক করার মাধ্যমে।

প্রশ্ন: "নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি" এই যুক্তিতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ ভ্রান্ত কিভাবে?

উত্তর: যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন, তারা অজুহাত দেন যে, এখন মুসলিমদের জন্য একটি জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে। অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল তা এই প্রেক্ষাপটে বা পরিস্থিতিতে হালাল!

এই নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ যা তারা করেননি। কারণ, এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয়। বরং এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমত: অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে 'প্রয়োজন' বা 'জরুরী' বলা যায় না। সুতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এর নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি। মানুষের 'প্রয়োজন' বা জরুরী অবস্থা ৫ প্রকারের:

১. ضَرُوْرَةُ حِفْظِ الدِّيْنِ দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয়

২. ضَرُوْرَةُ حِفْظِ النَّفْسِ জীবনের জন্য আবশ্যকীয়

৩. ضَرُوْرَةُ حِفْظِ الْعَقْلِ মানসিক সুস্থতার জন্য আবশ্যকীয়

৪. ضَرُوْرَةُ حِفْظِ النَّسْبِ وَ الْجَاهِ রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্তে আবশ্যকীয়

৫. ضَرُوْرَةُ حِفْظِ الْمَالِ সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়।

এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয়। যেমন, কারো জিনা করা বা কোন মাহরাম মহিলাকে নিকাহ (বিবাহ) করার অজুহাত কখনো এই হতে পারেনা যে, আমার যৌন আকাঙ্খা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে।

দ্বিতীয়ত: শির্ক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শির্ক এবং কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার, মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই

অনুমোদনযোগ্য নয়। শুধুমাত্র ইকরাহ (চুড়ান্ত জোর জবরদস্তি)-এর ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আমরা শির্ক ও কুফরকে হালাল করার জন্য এমন একটি নীতির সাহায্য নেয়ার কথা কিভাবে ভাবতে পারি? শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন: "নিশ্চয় যেসব বস্তু হারাম; এর মধ্যে যেসব বস্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামের শরীয়াতে অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে, (সেগুলো) না আবশ্যকীয়তায় আর না এছাড়া অন্য কোন কারণে অনুমোদনযোগ্য, যেমন, শির্ক, অবৈধ যৌনাচার এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলা এবং স্পষ্ট সীমালংঘন। এই চারটি বিষয় হলো সেইগুলো যার সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুব:) বলেছেন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: "বলুন: আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অসংগত বিরোধীতা, আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছু শরীক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।" (সুরা আরাফ ৭:৩৩)

শেখ আলী আল খুদাইর, শেখ হামাদ বিন আতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة/١٧٣)

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যার উপর জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয় তার কোন পাপ হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।" (সুরা বাকারা ২:১৭৩)

সুতরাং এখানে 'অনন্যোপায়' অবস্থায় থাকাকে শর্ত করা হয়েছে, যেন এগুলো কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা সীমালংঘন থেকে না খায়। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে (প্রয়োজন এবং জোর-জবরদস্তি) পার্থক্য অস্পষ্ট বা গোপন নয়।" তিনি (ইবনে আতিক) আরো বলেছেন: "এবং অনন্যোপায়

ব্যক্তির জন্য মৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা স্বেচ্ছায় দ্বীন ত্যাগ করাকে সমর্থন করে? এ ধরনের তুলনা কি এমন নয় যে, একজন ব্যক্তি তার বোন বা মাকে বিয়ে করল, সেই নীতির ভিত্তিতে যেখানে একজন স্বাধীন মানুষকে একটি দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, অথবা তার বিয়ে করার যোগ্যতা নেই (একজন স্বাধীন নারীকে)? এই বিভ্রান্তি ছড়ানো মানুষগুলো তাদের চেয়েও বেশী (বাড়াবাড়ি) করছে যারা তুলনা করে- { إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا } [البقرة: ٢٧٥] "নিশ্চয়ই ব্যবসা তো সুদের্ই মতো।" (সুরা বাকারা ২:২৭৫)। (হিদায়াত আত-তারিক, পৃ:১৫১)

প্রশ্ন: "জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য" মানুষ কিভাবে এর অপপ্রয়োগ করে গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের ব্যাপারে?

উত্তর: এর আগে আমরা এ ব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছি যে, প্রয়োজনে কুফর বা শির্ক করার কোন অনুমতি নেই। আমরা এখন যে নীতিটি আলোচনা করবো তা হচ্ছে নির্বাচনের পক্ষ অবলম্বনকারীদের শেষ অস্ত্র। তারা যেকোন উপায়ে বলতে চায় যে, এটি একটি ইকরাহ (জোরজবরদস্তি) সংক্রান্ত বিষয়। হ্যাঁ, আমরাও বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই জোরজবরদস্তি নিপীড়নের শিকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু, আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে ইকরাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রথম কথা হলো, এই নীতিমালা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে। এক্ষেত্রে যে তাকে জোর করানো হয়েছে, সেই প্রমাণ থাকতে হবে।

ড: মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ওয়াহাবী বলেন, "এটা সেই প্রকারের যেখানে শুধুমাত্র ঐ নিপীড়িত ব্যক্তিকেই জোর করা হচ্ছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই।" (নাওয়াকিদ আল ঈমান আল ইতিকাদিইয়্যাহ ওয়া যাওয়াবিত আত তাকফির ইনদাস সালাফ, ২/৭)

সুতরাং, যারা এই যুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বৈধ করে তারা কখনোই এই দাবী করতে পারে না যে তাদেরকে এই কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। কারণ, এখানে মুসলিমদেরকে বলা হয় 'স্বতস্ফুর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন'।

'ইক্রাহ'-এর শর্তের ব্যাপারে ইবনে হায্র (রহ:) বলেন: "ইকরাহ'র ৪টি শর্ত রয়েছে:

(১) যে জোর করছে তার ঐ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে সে এটি ঠেকাতে এমনকি এর থেকে পালাতেও অক্ষম।

(২) এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুমকি তার ওপর পড়বে।

(৩) তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে অর্থাৎ যদি বলা হয়, "তুমি যদি এটা না কর, তোমাকে আগামীকাল মারব", তাহলে তাকে নিপীড়িত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, তাহলো যদি নিপীড়নকারী একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় যা অতি অল্প এবং সাধারণত সে এই সময় পরিবর্তন করে না।

(৪) যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে। (ফাতহুল বারী, খন্ড ১২, পৃ: ৩১১)

সুতরাং এই নীতিটি সঠিক যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কাউকে বাধ্য করা হয় তবে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমা যোগ্য। তবে আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা যেটাকে এখন ইকরাহ বা জোর-জবরদস্তি বলছেন তা আসলে ইকরাহ-র শর্তাবলী পূর্ণ করে না।

প্রশ্ন: গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রায় কি? অজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাল নিয়্যাতে যে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে তাকফীর করার পূর্বে করনীয় কি?

উত্তর: যারা এই শির্কী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তারা যে কুফরীতে লিপ্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিছু সন্দেহ-সংশয় ও ভুল ধারণার অজুহাতে তাদের এসব কাজ অনুমোদনযোগ্য নয়, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে এটাও সমানভাবে নিশ্চিত যে অনেক মুসলিম ব্যাপারটির আসল রূপ পুরোপুরি অনুধাবন না করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণে সকলের প্রতি আহবান জানায়। যদিও আমরা বলি না যে, ভাল নিয়্যতে কোন কাজ করলেই তা শিরক ও কুফরী থেকে অব্যাহতি পাওয়া

যাবে। আসলে সঠিক ব্যাপার হল শিরক ও কুফরী করার ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদের ভাল নিয়্যতের কারণে তাদের কুফরীর বাইরে নিয়ে আসে না।

অতএব, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শির্ক বা কুফর করলেই সেটা মাফ হবে এমন কথা আমরা বলতে পারিনা। তবে **"যেহেতু অনেকেই এই বিশেষ (গণতন্ত্র) বিষয়ে অজ্ঞ আর তাছাড়া বিষয়টি আরও জটিল হয় যখন এটি জায়েজ করার লক্ষ্যে একশ্রেণীর আলেমগণ ফিকহের সেই সব নীতির ভিত্তিতে নানান অপব্যাখ্যা করে ফাতওয়া দেন, যেগুলোর আমরা ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং এরকম অবস্থায় যে কাউকে তৎক্ষণাৎ কাফের বলাটা বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা। যতক্ষন না তার কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার তুলে ধরা হচ্ছে এবং এসকল বিভ্রান্তি অপসারণ করা হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত আমরা তাকে তাকফির করতে পারি না।"**

যারা তড়িঘড়ি করে সকল ভোটদানকারীকে তাকফির করে এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসী বলেন: "আর একারণেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদের কর্মকান্ডের বাস্তবতা এবং এর মধ্যে যেসব কাজ কুফর এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিনষ্টকারী সেগুলো ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করার আগে এমন কাউকে (ভোটার) তাকফির করার জন্য ব্যস্ত হওয়া জায়েয নয়। এরপরও যদি সে ভোট দান করে তবে সে কুফরী করল। সুতরাং ভোটারদের ক্ষেত্রে পার্থক্যসমুহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, সবাই আইনপ্রণেতা তৈরীর উদ্দেশ্যে ভোট দেয় না তাদের (অজ্ঞতার কারণে)। অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে তার কাছে সত্য প্রকাশ করার আগে তাকে তাকফির করা যাবেনা, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার নিয়্যত অজনা থাকার করণে তার কাছে মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত আছে। কারণ, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আর তাছাড়া 'গণতন্ত্র', 'পার্লামেন্ট' এ সবই বিদেশী শব্দ। তাই অনেকেই বাস্তবতা না বুঝে এর কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত যে এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলেছে যার অর্থ সে নিজেই জানে না।

সুতরাং যারা গণতন্ত্র ও এতে ভোটদানের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত জানে; তাদের একান্ত দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা এবং এ বিষয়ক বিভ্রান্তি সমূহ দূর করা।

প্রশ্ন: ইসলাম ও গনতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্যগুলো কি কি?

উত্তও: **ইগঔঠএ ও গণতন্ত্রে**ও ডকছত এৌডঔক ঈঠর্থক্য-

গণতন্ত্র	**ইসলাম**
১) গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি জনগণের অভিপ্রায় (জনমত)।	১) ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহ্র অভিপ্রায়।
২) গণতন্ত্র: সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম।	২) ইসলাম: আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম ।
৩) গণতন্ত্র: সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।	৩) ইসলাম: সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ।
৪) গণতন্ত্র: সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ।	৪) ইসলাম: সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্।
৫) গণতন্ত্র: মানব রচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।	৫) ইসলাম: আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।
৬) গণতন্ত্র: মত প্রকাশে, ভোট দানে ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত।	৬) ইসলাম: মানুষ হিসেবে সকলেই সাধারণভাবে এসব অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুণীজনেরা বিশেষভাবে মুল্যায়িত হবেন।
৭) গণতন্ত্র: উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান বিবেচিত।	৭) ইসলাম: উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরষে প্রভেদ বিদ্যমান।
৮) গণতন্ত্র: নারী ও সংখ্যালঘুরা সাধারণ সমাধিকার ভোগ করবে।	৮) ইসলাম: শক্তি ও মেধায় তারতম্যের কারণে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে

	ভোগ করবে বিশেষ অধিকার।
৯) গণতন্ত্র: পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোন বালাই নেই গণতন্ত্রে। যেমন: জরায়ুর স্বাধীনতা বা সমকামিতা কোন মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য নয় গণতন্ত্র।	৯) ইসলাম: শাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মানসম্পন্ন পরমত সমাদৃত। অনৈতিক পরমত ইসলামে বর্জণীয়।
১০) গণতন্ত্র: গরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদন্ড।	১০) ইসলাম: শাশ্বত বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান গরিষ্টের সমর্থন ছাড়াই বৈধ।
১১) গণতন্ত্র: জাগতিক উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত এই অর্থে প্রগতি।	১১) ইসলাম: জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে চেতনা পরিব্যপ্ত, এই অর্থে প্রগতি।
১২) গণতন্ত্র: জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।	১২) ইসলাম: চরম জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।
১৩) গণতন্ত্র: মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত।	১৩) ইসলাম: আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত (যে আল্লাহ্ প্রদ্ত্ত ফায়সালা মোতাবেক বিচার করে না সেই কাফের।)
১৪) গণতন্ত্র: সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।	১৪) ইসলাম: প্রত্যাদিষ্ট বিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।
১৫) গণতন্ত্র: জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।	১৫) ইসলাম: জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক।
১৬) গণতন্ত্র: গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বিবর্জিত।	১৬) ইসলাম: ইসলামী বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধি খলীফা/ প্রতিনিধি, কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য।

মিল্লাতে ইবরাহীম

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ
জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: “এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত (দ্বীন)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন ‘মুসলিম’।”

সুরা হজ্জ ২২:৭৮

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

অর্থ: “যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইব্রাহীম হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে বোকা।”

সূরা বাকারা ২:১৩০

সপ্তম অধ্যায়: মিল্লাতে ইবরাহীম

প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীম কি? মিল্লাতে ইবিরাহীমের মূলকথা কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থ: "ইব্রাহীম ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমরা তোমাদেরকে মানি না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।" (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

শাঈখ হামাদ বিন আতীক (রহ:) বলেন, আল্লাহর বাণী: "وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ অর্থাৎ প্রকাশ পেল ও স্পষ্ট হলো।" 'الْعَدَاوَةُ -শত্রুতা' কে 'الْبَغْضَاءَ -ঘৃণা' এর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ হলো, প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মানুষ মুশরিকদের ঘৃণা করে ঠিকই তবে শত্রুতা পোষণ করে না। তাই তিনি এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে করে শত্রুতা ও ঘৃণা একই সাথে হয়। তবে শত্রুতা ও ঘৃণা স্পষ্ট দু'টি নীতির আওয়ায। জেনে রাখুন, যদি ঘৃণা কেবল অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং তার প্রভাব ও নিদর্শণ প্রকাশ করা না হয় তাহলে তা কোন উপকারেই আসবে না। তেমনিভাবে শত্রুতা, যদি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করা হয় তাহলে তা বুঝা যায় না। তাহলে এমতাবস্থায় শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ্যভাবেই করতে হবে। (আদ্ দুরারাস সানিয়্যাহ)

শাঈখ সোলায়মান বিন সাহমান (রহ:) মুমতাহিনার ৪ নং আয়াত সম্পর্কে বলেন, এই হচ্ছে মিল্লাতে ইব্রাহীম যে সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة : ١٣٠]

অর্থ: "যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইব্রাহীম হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে বোকা।" (সূরা বাকারা ২:১৩০) তাই মুসলিমদের কাজ হলো, আল্লাহর শত্রুদের সাথে

শত্রুতা করা এবং তাদের সাথে শত্রুতাকে প্রকাশ করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব, লেনদেন ও আচার ব্যবহার করা থেকে পূর্ণাঙ্গ দূরে থাকা। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ, ২২১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং মিল্লাতে ইব্রাহীম হচ্ছে:

- এক আল্লাহর জন্যই উপাসনাকে একনিষ্ঠ করা। প্রত্যেক ঐ সকল বিষয় তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হতে হবে, যাকে অর্থবোধকভাবে একবাক্যে ইবাদত তথা উপাসনা বলা যায়।
- শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।
- মুশরিক ও মুশরিকদের বাতিল উপাস্য তথা ত্বাগুতদের সাথে শত্রুতার প্রকাশ। মুশরিকদের, তাদের উপাস্য, মত, বিধানের ও তাদের শিরকী আইন ও বিধানের মৌলিকতা ও সত্যতা অস্বীকারের কথা ঘোষণা করা।
- তাদের সাথে শত্রুতা, ঘৃণা, তাদের কুফরী অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘৃণা করা যতক্ষণ না তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং যে বাতিলের উপর তারা আছে তা পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ না করে, তা থেকে খালাস না হয় এবং সেটাকে অস্বীকার না করে।

মিল্লাত ইবরাহীমের মূলকথা হলো, সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে নিবেদন করা। তাগুতকে প্রকাশ্য এবং নির্ভয়ে প্রত্যাখ্যান করা, মুশরিকদের এবং তারা যাদের ইবাদত করে তাদের সবার সাথে 'বারাআহ' বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করা এগুলোই হলো দ্বীনের ভিত্তি এবং প্রত্যেক নবীর কাছে এই একই বার্তাপাওয়া যায়।

প্রশ্ন: যারা বলে, "আমাদের পথ ও মিল্লাত হলো মুহাম্মাদ (সা:) এর পথ। আর ইব্রাহীম (আ:) এর মিল্লাত বা শরীয়া তো এর পূর্বের শরীয়া। আর যারা পূর্বে এসেছে তাদের শরীয়া তো আমাদের জন্য নয়।" তাদের এ অভিযোগকে কিভাবে খন্ডন করা হবে?

উত্তর: তারা বলে ইব্রাহীম (আ:) এর শরীয়াহ আমাদের পূর্বের উম্মতদের জন্য, আমাদের জন্য ইব্রাহীম (আ:) এর শরীয়াত নয়। আশ্চর্য যুক্তি ! এই যদি তাদের কথা হয় তাহলে আল্লাহর (সুব:) সেই সব আয়াত সম্পর্কে তারা কি বলবে। যেখানে উল্লেখ রয়েছে:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থ: "আর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল।" (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

এই ব্যাপারে সবগুলো আয়াতই স্পষ্ট। অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [الممتحنة/٦]

অর্থ: "তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তাঁদের (ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের) মধ্যে। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৬)

এখানেই শেষ নয়। আল্লাহ (সুব:) আরও ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

অর্থ: "ইব্‌রাহীমের মিল্লাত থেকে কে বিমুখ হতে পারে? সে ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে? (সূরা বাকারা ২:১৩০) অর্থাৎ শুধুমাত্র বোকা এবং নির্বোধরাই মিল্লাতে ইবরাহীমের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আল্লাহ (সুব:) অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থ: "তারপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করুন এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না।" (আন-নাহল ১৬: ১২৩)

কুরআন-সুন্নাহতে এমন অসংখ্য দলীল আছে যা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (সা:) এর দাওয়াহর মাঝে কুফ্‌ফারদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা ও তাদের

বিরোধিতা ছিল এবং শত্রুতা ছিল তাদের উপাস্য ও তাদের আইন বিধানের প্রতি। আর এটাই ছিল আমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আ:) এর মিল্লাতের মূল স্তম্ভ। আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ...وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: নবীরা সবাই পৈত্রিক সম্পর্কে ভাই; তাদের মা ভিন্ন, কিন্তু তাদের দ্বীন একটাই।" (সহীহ বুখারী ৩৪৪৩; সহীহ মুসলিম ৬২৮১; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৪; মুসনাদে আহমদ ৮২৪৮)

যদিও বিভিন্ন নবীর শরীয়াহ শাখা-প্রশাখার মাঝে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ভিত্তি তাওহীদ ও দ্বীন সর্বক্ষেত্রেই অভিন্ন ছিল। তাওহীদের দাবীই হলো শিরকের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। এক্ষেত্রে 'মানসুখ' (একটির আগমনের কারণে আরেকটি বাতিল) হওয়ার মতো কোন বিষয় নেই। কারণ এটা শরীয়াহর বিষয় নয় যে, পূর্বের শরীয়াহ বাতিল হয়ে নতুন শরীয়াহ কার্যকর হয়েছে। বরং এটা সেই অপরিবর্তনীয় তাওহীদের নীতি যা সকল নবী রাসূলগণ অনুসরণ করেছেন। আর তা হলো: শিরক ও মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণের নীতি। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

অর্থ: "আল্লাহর ইবাদত করবার ও ত্বাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দেয়ার জন্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।" (সূরা নাহল ১৬:৩৬)

মহিমাময় আল্লাহ (সুব:) আরো বলেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থ: "আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতিত যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমারই ইবাদাত কর।" (সূরা আম্বিয়া ২১:২৫)

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে শত্রুতা, ঘৃণা করল না এবং তাদের থেকে দূরে থাকল না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার করল না তার ইসলাম ঠিক থাকবে কি?

উত্তর: না! তাদের ইসলাম ঠিক থাকবে না। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١]

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা মা'য়িদা ৫:৫১)

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ:) "ইগাসাতুল লিহফান" গ্রন্থে বলেন, "এই বড় শিরক হতে মুক্তি পাবে না একমাত্র আল্লাহর জন্য তাওহীদকে আলাদা করা, মুশরিকদের সাথে আল্লাহর জন্য শত্রুতা, আল্লাহর কাছে তাদের ঘৃণ্য অবস্থা সৃষ্টি করা ব্যতীত।"

শাঈখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ (রহ:) বলেন, "জেনে রাখুন, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন তিনি যা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন তা করার। কোন বান্দার ইসলাম, আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতাকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ব্যতীত সঠিক হবে না।" (আদ দুরারুস সানিয়্যাহ, জিহাদ অধ্যায়, ২০৮ পৃষ্ঠা)

সুলাইমান বিন সাহমান (রহ:) বলেন, "যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে শত্রুতা, বন্ধুত্ব পরিহার, ঘৃণা করল না এবং তাদের থেকে দূরে থাকল না, তাহলে সে ব্যক্তি নবী আহমাদের অনুসৃত পথে থাকবে না। এমনকি সঠিক পথেও সে থাকবে না।"

প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরনে দ্বীন প্রকাশের স্বরূপ কি? আমাদের প্রতি এ ব্যাপারে হুকুম কি?

উত্তর: প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হচ্ছে তার দ্বীনকে প্রকাশ করা। ইব্রাহীম (আ:) এর মিল্লাত হলো তাগুতকে প্রকাশ্য এবং নির্ভয়ে প্রত্যাখ্যান করা, মুশরিকদের এবং তারা যাদের ইবাদত করে তাদের সবার

সাথে 'বারাআহ' ঘোষণা করা, আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করা। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ [الممتحنة/٤]

অর্থ: "ইব্রাহীম ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের জাতিকে বলল, তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমরা তোমাদেরকে মানি না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা বোধের সূচনা হল যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।" (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

- শায়খ ইসহাক বিন আব্দুর রহমান (রহ:) বলেন, "শুধু অন্তরে কাফিরদের ঘৃণা করলে চলবে না। বরং শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশও করতে হবে। তিনি সূরা মুমতাহিনার আয়াত উল্লেখ করে বলেন, আপনি বক্তব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যার পর আর কোন বক্তব্যের দরকার হবে না। যেমন আল্লাহ (সুব:) বলেছেন: "প্রকাশ পেল, শত্রুতা ও ঘৃণা"। এই হচ্ছে দ্বীনের প্রকাশ। অবশ্যই উচিত হচ্ছে কাফিরদের সাথে স্পষ্টভাবে শত্রুতা করা ও তাদের সাথে প্রকাশ্যভাবে কুফরী করা এবং শারীরিক দূরত্ব সৃষ্টি করা। শত্রুতার অর্থ হচ্ছে শত্রুতার বিপরীতে শত্রুতা করা। যেমন, সম্পর্ক ছিন্নের মৌলিকতা হলো: আন্তরিক ও জিহ্বা ও শারীরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর মু'মিনের অন্তর কখনো কাফিরের শত্রুতা শূন্য হয় না। প্রকৃত দ্বন্দ্ব কেবল প্রকাশ্য শত্রুতার দ্বারাই হয়। (জিহাদ পর্ব, ১৪১ পৃষ্ঠা)
- শায়খ হামাদ বিন আতিক (রহ:) 'দুরারে সানিয়্যাহ'তে বলেন: দ্বীনের প্রকাশ হলো: তাদের দ্বীনকে অস্বীকার করা, তাদের দ্বীনের দোষ বর্ণনা করা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের সাহায্য ও তাদের প্রতি নির্ভরশীলতা হতে নিজেকে রক্ষা করা ও তাদের থেকে আলাদা হওয়া। শুধু সালাত পড়াই দ্বীন প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। (জিহাদ খন্ড ১৯৬ পৃষ্ঠা)

● শায়খ হামাদ বিন আতিক (রহ:) তাঁর 'সাবিল আন-নাজাত ওয়াল ফিকাক' পুস্তিকায় আরও বলেন: জেনে রাখুন! কুফরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে কুফরীকারীদের সংখ্যানুযায়ী। প্রত্যেক কাফের গোষ্ঠীরই কুফরীর একটি ধরন প্রকাশ পেয়েছে আর ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম তার দ্বীন প্রকাশকারী বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ না সে প্রত্যেক কাফের সম্প্রদায়ের কুফরীর বিরোধিতা করবে যা তার নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে শত্রুতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

● শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান বলেন, দ্বীনের প্রকাশ সেটা নয় যেমনটি মূর্খরা ধারণা করে- যে ব্যক্তি কাফিরদের বর্জন করবে, নিজের ও কাফিরদের মধ্যে ফাঁক তৈরী করবে সালাত পড়বে, কুরআন পড়বে, যথা সম্ভব নফল ইবাদাত করবে সে তার দ্বীনের প্রকাশকারী বলে গণ্য হবে। এটা মারাত্মক ভুল। বরং প্রকৃত দ্বীন প্রকাশকারী সেই যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয় এবং তাদের সামনে বলতে কিছুই ছাড়েনা, চাই তাকে হত্যা করুক বা এলাকা হতে বিতাড়িত করুক না কেন। (আদ দুরারুস সানিয়্যাহ, জিহাদ পর্ব, ২০৭ পৃষ্ঠা)

বড় ফিতনা হচ্ছে তাওহীদকে গোপন করা এবং জনগণের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া। ইসলামের অংশ হিসেবে শাহাদাতের প্রচার ও প্রসারে প্রত্যেক ত্বাগুতের সাথে কুফরী করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব। তা ঘোষণা করা, শুরু করা ও প্রকাশ করা বড় ওয়াজিব। অবশ্যই তা মুসলিমদের দাওয়াতে বহুল প্রসার লাভ করবে।

প্রশ্ন: নাবী মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর সাহাবারা মক্কায় দূর্বল অবস্থাতেও মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরন করেছেন এর দৃষ্টান্ত কি?

উত্তর: আমাদের জন্য নবী (সা:) এর মাক্কী জীবনের আদর্শই যথেষ্ট। তিনি কিভাবে কুরাইশদের উপাস্যগুলোর অসারতা ও তার থেকে তাঁর সম্পর্কহীনতা প্রকাশ এবং সেগুলোর সাথে কুফরী করার কাজ সমাধা করতেন। এমনকি তারা নবী (সা:) কে 'বেদ্বীন' হয়ে গেছে বলেও অভিযুক্ত করত। যদি এ ব্যাপারে আরো মজবুত ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে চান

তাহলে মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ আয়াতগুলো পড়ুন। নবী মুহাম্মাদ (সা:) কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরন করার জন্য:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل/١٢٣)

অর্থ: "অত:পর আমি আপনার কাছে একনিষ্ঠ মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করার প্রত্যাদেশ করেছি। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" (সূরা নাহল ১২৩)

নবী (সা:) আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ মেনে সেই পথেই চলেছেন, যদিও মুসলিমরা তখন ছিল খুবই কম সংখ্যক। নবী (সা:) একে প্রচার, প্রকাশ ও ঘোষণা করেছেন এবং কিছুই গোপন করেননি। এজন্য তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। মক্কাতেই তিনি (সা:) কাফিরদের উদ্দেশ্যে সরাসরি বলতেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ– وَلا أَنَا عَابِـــدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

অর্থ: "আপনি বলুন, হে কাফেরগণ! তোমরা যার ইবাদত করছো, আমি তার ইবাদত করি না এবং আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করো না এবং তোমরা যার ইবাদত করছো, আমি তার ইবাদতকারী নই, এবং আমি যাঁর ইবাদত করছি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমারই দ্বীন।" (সুরা কাফিরূন ১০৯:১-৬)

অপর আয়াতে তাগুতের অনসারীদের বর্জণ করার ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে:

تَبَّتْ يَدَا أَبِـــي لَهَـــبٍ وَتَـــبَّ "আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।" (সুরা লাহাব ১১১: ১)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (٢٠) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْـــأُنْثَى (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَـــا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِـــنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى [النجم/١٩–٢٣)

অর্থ: "তোমরা কি ভেবে দেখেছো 'লাত' ও 'উয্‌যা' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে? তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে এবং কন্যা

সন্তান আল্লাহ্‌র জন্যে? এই প্রকার বন্টন তো অসঙ্গত। এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছো, যার সমর্থনে আল্লাহ্‌ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথ-নির্দেশ এসেছে।" (সুরা নাজ্‌ম ১৯-২৩) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ– لَوْ كَانَ هَـٰٓؤُلَآءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থ: "তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা উপাস্য হতো তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে।" (সুরা আম্বিয়া ২১:৯৮-৯৯) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُـمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَافِرُونَ

অর্থ: "কাফিররা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রূপেই গ্রহণ করে; তারা বলে: এই কি সেই, যে তোমাদের দেবতাগুলির সমালোচনা করে? অথচ তারাই তো রহমানের (আল্লাহর) উল্লেখের বিরোধিতা করে।" (সুরা আম্বিয়া ২১: ৩৬)

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, কুরাইশের কাফিরদের ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) এমন এক মানুষ যে কিনা তাদের ইলাহদের ব্যাপারে খারাপ কথা বলে। সত্যিকার অর্থে, রাসূলুল্লাহ (সা:) এই সব ইলাহদের স্বরূপ সবার সামনে তুলে ধরতেন, এদের উপাসনার বিরূদ্ধে কথা বলতেন এবং এদেরকে আলিহা হিসেবে গ্রহণ করা যে কত বড় বোকামী ও অজ্ঞতা তা সবার কাছে স্পষ্ট করে দিতেন। এভাবেই রাসূল (সা:) সেই একই পথের অনুসরণ করেছেন যে পথে এক সময় ইব্‌রাহীম (আ:) চলেছেন- যদিও মক্কায় তিনি ছিলেন দুর্বল।

নবী (সা:) এই আক্বিদার প্রচার, প্রকাশ ও ঘোষণা করেছেন এবং কিছুই গোপন করেননি। এজন্য তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এজন্য তোষামোদ করেননি। তারা তোষামোদি থেকে দূরে ছিলেন। মু'মিনরা তার উপর দৃঢ় ছিলেন। আর নবী (সা:) তাদেরকে

আল্লাহর ওয়াদা ও জান্নাতের কথা বলে এবং পূর্বের ঈমানদারদের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে শান্তনা দিতেন। যেমন হাদীসের ইয়াসিরের পরিবারের কথা উল্লেখ রয়েছে:

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ – صـــلى الله عليـــه وســـلم – بِالْبَطْحَاءِ إِذْ بِعَمَّارٍ وَأَبُوْهُ وَأُمُّه يُعَذَّبُوْنَ فِيْ الشَّمْسِ لِيَرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ فَقَــالَ أَبُــوْ عَمَّارٍ يَا رَسُوْلُ اللهِ اَلدَّهْرُ هكَذَا فَقَالَ صَبْراً يَا آلِ يَاسِرَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِآلِ يَاسِرَ وَقَــدْ فَعَلْتَ

অর্থ: "উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল (সা:) এর সাথে মক্কায় হাটছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আম্মার (রা:), তাঁর পিতা ইয়াসেরকে ও তাঁর মাতা সুমাইয়্যাকে (রা:) সূর্যের তাপে ফেলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে করে তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করে। আম্মার (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) কে উদ্দেশ্য করে বলল, যুগ যুগ ধরে কি এই শাস্তি চলতে থাকবে? তখন আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন, হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর। এরপর আল্লাহর রাসূল (সা:) ইয়াসির পরিবারের জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি ইয়াসিরের পরিবারকে ক্ষমা করে দাও এবং (আমার নিশ্চিত বিশ্বাস) তুমি তা করেছো।" (মুসতাদরাকে হাকেম ৫৬৩৬; বাইহাকী ফি শুআ'বুল ইমান ১৬৩১; কানযুল উম্মাল : ৩৭৩৬৯)

খাব্বাবকে উদ্দেশ্য করে নবী (সা:) এর উক্তি:

عَنْ خَبَّابٍ يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَــنْ قَــبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ

অর্থ: "খাব্বাব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমাদের পূর্বে এমনও ঈমানদার ছিলেন যাকে ধরে এনে মাটিতে গর্ত খোড়া হত। তাতে তাকে ফেলা হত, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হত, এরপর তাকে দু'খন্ড করে ফেলা হত। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস তুলে নেওয়া হত। এতো

অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন। তখন এমন নিরাপত্তা আসবে যে একজন আরোহী সানআ' থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। কিন্তু আল্লাহর ভয় ছাড়া তার আর কোন কিছুর ভয় থাকবে না। আর ছাগলের উপর বাঘের ভয় ছাড়া। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো।" (সহীহ বুখারী ৩৮৫২)

প্রশ্ন: ত্বাগুতদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে দাওয়াতী কাজে হিকমাত বা নম্রতার নামে কালক্ষেপন জায়েজ কি?

উত্তর: আল্লাহদ্রোহী শক্তি ও আল্লাহ ছাড়া সে সকল উপাস্যের ইবাদত করা হয় অর্থাৎ সমস্ত ত্বাগুত, চাই তা পাথরের মূর্তি হোক অথবা সূর্য, চন্দ্র, কবর, গাছ, মানব রচিত শরীয়াত ও আইন কানুন হোক না কেন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, সেগুলোকে অস্বীকার করতে দেরী বা সময় ক্ষেপণ করা যাবে না। দাওয়াতী কাজে নম্রতার নামে সময় ক্ষেপন না করে বরং পথের শুরুতেই তা ঘোষণা করা উচিত। মিল্লাতে ইব্রাহীম ও নবী রাসূলগণের দাওয়াত এ সমস্ত উপাস্যের কুফরী করা, তাদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে বলে। যখন তারা তাদের জাতির জন্য দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করতেন। এ কথা বলতেন: اعْبُدُوا اللَّـــهَ وَاجْتَنِبُـــوا الطَّاغُوتَ "আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগুতকে বর্জন কর।" (সুরা নাহাল ১৬:৩৬) এ ব্যাপারে ইব্রাহীম (আ:) এর একনিষ্ঠ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

অর্থ: "যখন ইব্রাহীম (আ:) তাঁর পিতা ও জাতিকে বললেন, তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি বাদে। তিনি আমাকে অচিরেই সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।" (সুরা যুখরুফ ৪৩:২৬-২৭)

আমাদের জন্য নবী (সা:) এর মাক্কী জীবনের আদর্শই যথেষ্ট। তিনি কিভাবে কুরাইশদের উপাস্যগুলোর অসারতা ও তার থেকে তাঁর সম্পর্কহীনতা প্রকাশ এবং সেগুলোর সাথে কুফরী করার কাজ সমাধা

করতেন। এমনকি তারা নবী (সা:) কে 'বেদ্বীন' হয়ে গেছে বলেও অভিযুক্ত করত।

প্রশ্ন: মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষনা দেয়ার পূর্বে আমরা কি করব? ঐ অবস্থায় তাদের প্রতি ভালবাসা রাখা জায়েজ কি?

উত্তর: আমরা প্রথমে উত্তমভাবে মুশরিকদেরকে আল্লাহর একত্বের দিকে দাওয়াহ দিব। যাদের মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট অথবা যে ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে কিছু কিছু বিষয় গ্রহন করার মাধ্যমে প্যাশাপাশি সে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা করে না, আমরা প্রথমেই তাদের সাথে প্রকাশ্য সমর্কহীনতা ও শত্রুতার ঘোষনা দেই না। আমরা শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ঘোষনা দেই যারা বাতিলের উপর অটল এবং আল্লাহর দ্বীন ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়। এমনকি প্রথমে স্বৈরাচার, অহংকারী ও অত্যাচারীদেরকেও হিকমাহ, নম্রভাবে ও উত্তমভাবে আল্লাহর অনুগত্যের দাওয়াত দিবে। যেমন ইবরাহীম (আ:) তাঁর পিতাকে সম্মোধন করে বলেছেন:

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ

অর্থ: "হে আমার পিতা আমার কাছে জ্ঞান (নবুওয়াত) এসেছে। তাই আমার অনুসরণ করুন ...। (সূরা মারইয়াম ১৯:৪৩) অপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ

অর্থ: "হে আমার আব্বা! আমি ভয় করছি দয়াময়ের শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে ...।" (সূরা মারইয়াম ১৯:৪৫)

এভাবে মুসা (আ:) ফেরাউনকে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ (সুব:) তাকে তার কাছে রাসূল হিসাবে পাঠানোর পর। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

অর্থ: "তোমরা উভয়ে ফিরাউনের সাথে নম্র ভাষায় কথা বল। হয়তো সে আল্লাহকে স্বরণ করবে অথবা ভয় করবে।" (সূরা ত্বাহা ২০:৮৪)

যখন আমরা কাফের-মুশরিকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেই নম্রতা ও হিকমাত প্রয়োগ ও উত্তম বাণী ব্যবহার করে, তখন আমাদের পার্থক্য করতে হবে দুটি অবস্থার মধ্যে আল্লাহর দ্বীনের জন্য ভালবাসা ও ঘৃণা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মধ্যে, আমরা যেন এ দুটি অবস্থাকে এক করে না ফেলি। কেননা অনেকে দুটি অবস্থাকে এক করে ফেলেন। অর্থাৎ যদিও দাওয়ার কারনে এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধীতা না করার কারনে আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতার ঘোষনা দেই না কিন্তু শিরক থেকে মুক্ত না হওয়ার কারনে আমরা তাকে কাফের জানব এবং অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃনা রাখব যদিও বাহ্যিক নম্র ও ভাল ব্যবহার করি। আমরা যেন এই অবস্থায় তাদেরকে অন্তরে ঘৃনার বদলে ভালবেসে না ফেলি, বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করি যতক্ষন না সে পুরোপুরি শিরক্-কুফরী থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামে আসে।

প্রশ্ন: মুসা (আ:) কিভাবে ফিরাউন ও তার গোত্রকে দাওয়াহ দিয়েছিলেন?

উত্তর: মুসা (আ:) ফেরাউনকে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ (সুব:) তাকে তার কাছে রাসূল হিসাবে পাঠানোর পর। আল্লাহ (সুব:) নির্দেশ দিলেন:

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ([طه/٨٤)

অর্থ: "তোমরা উভয়ে ফিরাউনের সাথে নম্র ভাষায় কথা বল। হয়তো সে আল্লাহকে স্বরণ করবে অথবা ভয় করবে।" (সূরা ত্বাহা ২০:৮৪)

আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য মূসা (আ:) তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন:

{فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى}

অর্থ: "আপনার কি পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে? তাহলে আমি আপনাকে আপনার রবের পথ দেখাব। অতএব আপনি তাকে ভয় করুন।" (সূরা নাজি'আত ১৮-১৯)

অত:পর তাকে অনেক নিদর্শন ও প্রমাণ দেখালেন। যখন মূসার (আ:) নিকট ফিরআউনের মিথ্যা, শত্রুতা, বিরোধিতা ও বাতিলের উপর অটল থাকার কথা প্রকাশ পেল। তখন মূসা (আ:) বললেন:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا [الإسراء/١٠٢)

অর্থ: "আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, এগুলো কেবলমাত্র ভুমন্ডল ও নভোমন্ডলের রবই অবতীর্ণ করেছেন তবুও মানলেন না। তবে আমি মনে করি, হে ফিরআউন! আপনি একজন ধ্বংসশীল লোক।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:১০২)

প্রশ্ন: কোন পর্যায়ে মুশরিকদের সাথে এমনকি যদিও তারা আত্মীয় হয় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষনা দেয়া হবে?

উত্তর: তাদের নিকট এ দাওয়াহ সুস্পষ্ট করা উচিত। উত্তম ও নম্রভাবে তাদের সাথে সাক্ষাত করে দাওয়াহ দিবে অথবা চিঠি ও কিতাব দিবে অথবা দায়ীদের মাধ্যমে সম্ভাব্য সমস্ত দলীল প্রমান দিয়ে তাদের নিকট দাওয়াহ স্পষ্ট করবে। দাওয়াতের সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করার পরেও যদি তাদের থেকে বিরেধিতা প্রকাশ পায় বা হাসি-ঠাট্টা করে তখন প্রকাশ্যভাবে সুস্পষ্ট করে শত্রুতার ঘোষনা দিতে হবে।

স্পষ্টভাবে দলিল প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও যদি মানতে অস্বীকার করে এবং অহংকার করে এবং তারা যে বাতিল ও শিরকের উপর ছিল তার উপর অটল থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতায় সক্রিয় হয় তাহলে তাদের সাথে আর সৌহার্দ মূলক আচরণ ও নরম ভাষায় কথা বলা চলবে না। তখন তাদের সাথে প্রকাশ্যে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ইব্রাহীম (আ:) তাঁর অতি নিকট আত্মীয় স্বজনের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তখন যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে তারা শিরক ও কুফরীর উপর অটল থাকবে। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ "যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল সে (তাঁর পিতা) আল্লাহর দুশমন, ইব্রাহীম তার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন।" (সুরা তাওবাহ ১১৪)

প্রশ্ন: আবু তালিবের শ্রেণীর মুশরিকদের সাথে কিরূপ আচরন হবে? এই শ্রেণীর মুশরিকদের কাছে কি নিজে থেকে সাহায্য চাওয়া যাবে?

উত্তর: আবূ তালিব তেমনি একজন ব্যক্তি যদিও সে বাতিলের উপর অটল ছিল তথাপিও হক্ব ও হক্বপন্থীদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করেননি। বরং সে ছিল এর উল্টোটা, বরং সে ছিল হক্বপন্থী ও রাসূল (সা:)-এর সাহায্যকারী। যদিও এটা হয়েছিল স্বজনপ্রীতি ও বংশীয় বন্ধনের কারণে। পাপীষ্ট লোক দ্বারা এবং স্বজনপ্রীতির বন্ধন, বংশীয় টান দ্বারা যদিও এ বন্ধন ও টান মূলত বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও তাদের দ্বারা দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে থাকে। এই সাহায্যকারী পাপী লোক আবূ তালিব, যার হিদায়াতের ও সত্যের আনুগত্যের আশা শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। যদি সে বিরোধী যোদ্ধাদের কাতারে না দাঁড়ায় বরং যদি দাঁড়ায়ও তবে তার কতক অনুসারীকে প্রতিহত করার জন্য যার অবস্থা এমন তাহলে তার ব্যাপারে বিশেষ দাওয়াত দেওয়া স্বাভাবিক। সেজন্য নবী (সা:) কখনো তাঁর চাচা আবূ তালিবকে দাওয়াত দেওয়া হতে নিরাশ হননি।

নবী (সা:) এর চাচার এরূপ প্রতিরোধ অবস্থান গ্রহণ করা সত্ত্বেও দাওয়াতী কাজের হিসাবে ও দ্বীনি নীতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার নম্রতা দেখাননি। বরং তাঁর চাচা তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে জানতেন এবং নবী (সা:) কর্তৃক তাদের বাতিল উপাস্যের শত্রুতা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনার কথা শুনতেন।

সুতরাং আবু তালিব শ্রেণীর মুশরিক যারা এই দ্বীনের ও তার অনুসারী মুসলিমদের বিরোধিতা করে না, বরং পারলে সহযোগিতা করে তাদের আত্মীয়তা বা অন্য কারনে, তাদের সাথে শত্রুতার ঘোষনা দিব না যতক্ষন না সে বিরোধীর কাতারে দাড়ায়। বরং আমরা তাদের সাথে বাহ্যিক ভাল ব্যবহার করব কিন্তু অন্তরে ঘৃনা রাখব যতক্ষন না সে শিরক থেকে পবিত্র হয়। পাশাপাশি আমরা তাদের দাওয়াহ দিতে থাকব, হয়তোবা সে এই দ্বীন গ্রহণ করবে।

এখানে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে যা পর্যালোচনা দরকার। তা হলো, মুসলিমকে কাফিরের আশ্রয় দেওয়া, সহযোগিতা করা, বিপদ থেকে রক্ষা করা, যা কাফির নিজের গরজেই করে থাকে, যা মুসলিম নিজেকে ছোট করে তার নিকট চায়নি। বরং এ কাজ কাফির করে থাকে আত্মীয়তা,

স্বজনপ্রীতি অথবা অন্য কোন কারণে। এ অবস্থার মাঝে মুসলিম নিজে কাফিরের কাছে তা চাওয়া বৈধ নয়। বরং তার এ চাওয়া এক প্রকার লজ্জা ও অপমান, চাটুকারিতা অথবা স্বীকার করা অথবা তার বাতিল সম্পর্কে নিরবতা পালন করা অথবা তার শিরকী কাজকে সমর্থন করার শামীল। মুসলিম কখনই নিজে থেকে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে না।

প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীমের পথে কি ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়?

উত্তর: মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসরনে কাফেরদের সাথে বৈরিতা শুরু করা ও তাদের নিকট তা প্রকাশ করা। তাদের উপাস্য গুলিকে বর্জন করার যে আহবান জানায় তা মানা বড়ই কষ্ট সাধ্য। কেউ যেন মনে না করেন যে, এ পথে গোলাপ ও ফুল বিছিয়ে রাখা আছে অথবা এ কথা মনে না করেন এ পথে সুখ সহনশীলতায় ভরপুর। না, বরং এ পথ দু:খ কষ্ট ও বিপদাপদে ভরপুর। কিন্তু এর ফলাফল হচ্ছে মিসকে আম্বরের ঘ্রাণযুক্ত পানীয়, সুখ শান্তি ও সন্তুষ্টচিত্তে পরকালে রবের সাক্ষাত লাভ। এটা এমন পথ যার উপর প্রবৃত্তির অনুসারী ও বাদশাহরা খুশি হতে পারে না। কেননা, এ হলো তাদের কার্যকলাপের স্পষ্ট প্রতিবন্ধক। তাদের উপাস্য ও শিরক হতে স্পষ্ট বৈরিতা। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ [يس/٣٠)

অর্থ: "আফসোস বান্দাদের উপর! তাদের নিকট কখনও এমন কোন রাসূলই আসেননি, যাকে তারা বিদ্রুপ না করেছে।" (সুরা ইয়াসীন ৩৬: ৩০)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ [إبراهيم/١٣)

অর্থ: "আর সেই কাফেররা নিজেদের রাসূলগণকে বললো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেবো, নতুবা তোমরা আমাদের দ্বীনে ফিরে আসো; তখন সেই রাসূলগণের প্রতি তাদের রব ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি সেই যালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।" (সুরা ইবরাহীম ১৪:১৩) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

অর্থ: "....কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল-তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছে করতো না, তা নিয়ে উপস্থিত হলো তখন তোমরা অহংকার করলে; অবশেষে একদলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে। (সুরা বাকারা: ৮৭) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ [إبراهيم/١٣)

অর্থ: "আর সেই কাফেররা নিজেদের রাসূলগণকে বললো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেবো, নতুবা তোমরা আমাদের দ্বীনে ফিরে আসো; তখন সেই রাসূলগণের প্রতি তাদের রব ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি সেই যালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।" (সুরা ইবরাহীম ১৪:১৩) আসহাবুল উখদুদের ব্যাপারে বলা হয়েছে:

فَأُتِىَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِى أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ يَا أُمَّهِ اصْبِرِى فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ

অর্থ: "........ রাজা তখন একটি গভীর গর্ত খুড়ে তার ভেতরে আগুন জ্বালাতে আদেশ দিলো এবং বললো: যে এই বালকের দ্বীন থেকে সরে না আসবে তাকেই এই আগুনে নিক্ষেপ করো বা তাকেই আগুনে লাফ দিতে আদেশ করো। তারা এমনটাই করতে থাকলো যতক্ষণ না এক মহিলা তার শিশুসন্তান সহ আসলো। সে আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করছিল। কিন্তু শিশুটি বলে উঠলো: মা, সহ্য করো (এই পরীক্ষা), কারণ তুমি সঠিক পথে আছো।" (সহীহ মুসলিম ৭৭০৩)

খাব্বাবকে উদ্দেশ্য করে নবী (সা:) এর উক্তি:

لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ

ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ

অর্থ: "তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হত। তাতে তাকে ফেলা হত, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হত, এরপর তাকে দু'খন্ড করে ফেলা হত। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস তুলে নেওয়া হত। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন। তখন এমন নিরাপত্তা আসবে যে একজন আরোহী সানা থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। আল্লাহর ভয় ছাড়া কোন কিছুর ভয় থাকবে না। আর ছাগলের উপর বাঘের ভয় ছাড়া। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো।" (সহীহ বুখারী ৩৮৫২)

নবী (সা:) এই দ্বীনকে প্রচার, প্রকাশ ও ঘোষণা করেছেন এবং কিছুই গোপন করেননি। এজন্য তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এজন্য তোষামোদ করেননি। তারা তোষামোদি থেকে দূরে ছিলেন। মু'মিনরা তার উপর দৃঢ় ছিলেন। আর নবী (সা:) তাদেরকে আল্লাহর ওয়াদা ও জান্নাতের কথা বলে এবং পূর্বের ঈমানদারদের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে মু'মিনদের শান্তনা দিতেন যেমন তিনি বলেছেন: "হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধর, তোমাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত।" (আল-হাকিম ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন) এগুলো (শত্রুতা, বিদ্রুপ, হুমকি, অত্যাচার, হত্যা, দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি) কোন কিছুই হতো না, যদি না নবীরা এবং তাদের অনুসারী মু'মিনরা তাগুতকে উম্মোচিত না করতেন, যদি না তারা শির্ক এবং মুশরিকদের থেকে 'বারা' ঘোষণা না করতেন।

প্রশ্ন: আল্লাহর রীতি মুতাবিক কারা এই যমীনে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষিত হন?

উত্তর: আল্লাহর রীতি মুতাবিক আল্লাহর নিকট যে যত বেশী প্রিয় সে তত বেশী পরিক্ষার সম্মুখীন হন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ سَعْد قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاس أَشَدُّ بَلَاءً فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَب دينه فَإِنْ كَانَ رَقِيقَ الدِّين ابْتُلِيَ عَلَى حَسَب ذَاكَ وَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّين ابْتُلِيَ عَلَى حَسَب ذَاكَ قَالَ فَمَا تَزَالُ الْبَلَايَا بِالرَّجُل حَتَّى يَمْشِيَ فِي الْأَرْض وَمَا عَلَيْه خَطِيئَةٌ

অর্থ: "সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বললাম: 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানবজাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে?' তিনি (সা:) জবাব দিলেন: 'নবীগণ, অত:পর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের, এবং তারপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের। মানুষ তার দ্বীনের উপর যতটা শক্তিমান হয় সেই হিসেবে তার পরীক্ষা নেয়া হয়। কাজেই যদি সে দ্বীন পালনে কঠোর না হয় তাহলে তার পরিক্ষাও হালকা হবে আর যদি দ্বীন পালনে কঠোর হয় তাহলে তার পরিক্ষাও কঠিন হবে। একজন বিশ্বাসীকে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জমীনের উপর দিয়ে নিষ্পাপ হয়ে হাঁটতে থাকে।" (মুসনাদে আহমদ ১৪৯৪)

এ হাদীস থেকে শিক্ষা হচ্ছে- সবচেয়ে বিপদাপদ সহ্য করেছেন নবীগণ। এরপর নবীদের মত যারা কাজ করেছেন তারা। আর মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের অনুসারীরা মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশী পরীক্ষিত হন। কেননা দাওয়াতী ক্ষেত্রে তারা নবীগণের পদ্ধতির অনুসরণ করে।

প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরন যদিও অনেক কঠিন কিন্তু এর শেষ ফলাফল কি?

উত্তর: মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরন যদিও কঠিন কিন্তু তার শেষ ফল খুবই ভাল। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বন্ধুত্ব অর্জন এবং চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ হয়। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

অর্থ: "তার চাইতে কে ভাল দ্বীনদার, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং সে মুহসিন (একনিষ্ঠ) ছিলেন মিল্লাতে

ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করেছে আর আল্লাহ ইব্‌রাহীমকে একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু করে নিয়েছেন।"(আন-নিসা ৪: ১২৫)

কেউ যেন মনে না করেন যে, এ পথে গোলাপ ও ফুল বিছিয়ে রাখা আছে অথবা এ কথা মনে না করেন এ পথে সুখ সহনশীলতায় ভরপুর। না, বরং এ পথ দু:খ কষ্ট ও বিপদাপদে ভরপুর। কিন্তু এর ফলাফল হচ্ছে মিশ্‌ক আম্বরের ঘ্রাণযুক্ত পানীয়, সুখ শান্তি ও সন্তুষ্টচিত্তে পরকালে রবের সাক্ষাত লাভ। সবর করলে এবং দৃঢ় থাকলে এই পথের শেষ সাফল্য হচ্ছে জান্নাত। যেমন নবী (সা:) বলেছেন: اصبروا يا آل ياسر! فإن موعدكم الجنة.

অর্থ: "হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধর, তোমাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত।" (মুসতাদরাকে হাকেম ৫৬৪৬; বায়হাকী ফি শুআবুল ঈমান ১৬৩১)

প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরনে সবচেয়ে উত্তম ঈমানদারের দৃষ্টান্ত কি? সে কিভাবে বাতিলের সাথে মোকাবিলা করবে?

উত্তর: সবচেয়ে উত্তম ঈমানদারের হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের উপর ও সকল রাসূলদের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর প্রচারক। এই ক্ষেত্রে সে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না। এ ব্যক্তি হচ্ছে প্রকাশ্য ও বিজয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত (আত-তা'য়িফা আল-মানসুরাহ)। সে হচ্ছে এমন সত্যের আহ্বায়ক যে মুসলিমদের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের দু:খ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে। সে ইহকালে ও পরকালে সাফল্য অর্জন করবে। যার সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: "তার কথার চাইতে কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎ কাজ করে এবং বলে আমি মুসলিম।" (সুরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৩৩)

সে বাতিলপন্থীদের সাথে ছাড় দিয়ে কথা বলে না। তাদের উপর নির্ভর করে না ও তাদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে। পদবি, চাকুরি, কাজ, পদ্ধতি যা বাতিলকে সাহায্য করে তা পরিত্যাগ করে।

শায়খ হামাদ বিন আতীক পবিত্র কুরআনের সূরা মুমতাহিনার ৪নং আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : {وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ} [الممتحنـــة: ٤] ... প্রকাশ পেল ও স্পষ্ট হয়ে গেল ... অর্থাৎ যারা আল্লাহর একাত্ববাদকে স্বীকার না করবে তাদের বিরূদ্ধে বিরতিহীন শত্রুতা ও ঘৃণার শুরু হলো। আর যে ব্যক্তি আদর্শকে জ্ঞানে, কাজে ও প্রকাশ্যে বাস্তবায়ন করবে আর তার দেশের লোক তা জানতে পারবে আর তাকে কোন দেশে হিজরত করতে হবে না। (১৯৯ পৃষ্ঠা জিহাদ খণ্ড)

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, ... বরং প্রকৃত দ্বীন প্রকাশকারী সেই ব্যক্তি যে মুশরিকদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয় এবং তাদের সামনে বলতে কিছুই ছাড়েনা, চাই তাকে হত্যা করুক বা এলাকা হতে বিতাড়িত করুক না কেন। (আদ দুরারুস সানিয়্যাহ, জিহাদ পর্ব, ২০৭ পৃষ্ঠা)

এ প্রকারের মানুষ যখন তাদেরকে হক্ব প্রকাশ করার পর হত্যা বা শাস্তির হুমকি দেওয়া হয় এবং তারা হিজরত করার মত তেমন কোন দেশও পায় না। তখন তাদের জন্য তিনটি আদর্শ রয়েছে। প্রথমতঃ তাদের জন্য কাহাফবাসীর পালনীয় আদর্শ। যারা দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য পাহাড়ে পালিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ আরেকটি রয়েছে উখদুদবাসীদের আদর্শ। যারা তাদের আকীদা ও তাওহীদের জন্য অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন, যারা দুর্বল হননি ও নতিও স্বীকার করেননি। তৃতীয়তঃ আরেকটি আদর্শ রয়েছে রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের মধ্যে। যারা হিজরত করেছেন, জিহাদ, যুদ্ধ, হত্যা করেছেন ও নিহত হয়েছেন। আপনাকে হিদায়াত ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

প্রশ্নঃ এ পথে কম প্রভাবশালী ঈমানদার কি করবে, যে দূর্বলতার কারনে মুশরিকদের সাথে শত্রুতার প্রকাশ করতে পারছে না?

উত্তরঃ এমন লোক যে শুরু থেকেই কম প্রভাবশালী এবং বিপদাপদে পূর্ণ। এ দ্বীন সে প্রকাশ্যভাবে পালন করতে পারবে না। এমনকি সে প্রকাশ্যে কাজ করলে হয়তো দ্বীনের কাজ করতেই পারবে না। সে ভয় পায় এবং প্রচার করতে পারে না তাহলে সে তার ছাগলের সাথে পাহাড়ের পাদদেশে

চলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং দ্বীন নিয়ে পালিয়ে যাবে ফিতনার ভয়ে।

প্রশ্নঃ পরিবার-পরিজনের দ্বীন ঠিক রাখার কাজ যাকে আটকে রেখেছে আবার সে ঐ স্থানে দ্বীনকে প্রকাশও করতে পারছে না, ঐ কম প্রভাবশালী ঈমানদারের জন্য তার দ্বীনকে ঠিক রাখার জন্য কি করণীয়?

উত্তরঃ এমন অক্ষম ব্যক্তি যাকে তার বাড়ী আটকে রেখেছে বিশেষ কাজের জন্য। যিনি তার বাকী সদস্যকে শিরক, মুশরিক এবং আগুন থেকে- যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, সেখান থেকে রক্ষা করার চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। সে কাফিরদের সংস্রব থেকে দূরে থাকবে ও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তাদের বাতিলের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে না এবং যে কোন ভাবেই হোক না কেন সহযোগিতা করবে না। অবশ্যই এক্ষেত্রে তার তাওহীদকে নিরাপদ রাখতে হবে। তার অন্তর শিরক ও মুশরিকদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ থাকবে এবং অপেক্ষায় থাকবে প্রতিবন্ধকতা দূর হবার এবং দ্বীন নিয়ে পালানোর ফাঁক খুঁজবে এবং এর চেয়ে কম ঝুঁকি ও বিপদ যেখানে সে দেশে হিজরত করার সুযোগ খুঁজবে যেখানে সে তার দ্বীনকে প্রকাশ করতে পারবে। মুহাজিরদের হাবশাতে হিজরত করার মত।

প্রশ্নঃ মিল্লাতে ইববরাহীম এবং সিক্রেসী গ্রহণ এই দু'য়ের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়তা কোথায় প্রযোজ্য?

উত্তরঃ মিল্লাতে ইব্রাহীম প্রতিষ্ঠা করা ও দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য সতর্কতা স্বরূপ গোপনীয় পদ্ধতি গ্রহণ এবং শত্রুতা গোপন করার মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নয়। আমাদের এ বক্তব্য, সিক্রেসী বা সতর্কতা গ্রহনকে বাদ দিয়ে দেয় না, কেননা নবী (সাঃ) সতর্কতা গ্রহণ করতেন। বরং রাসুল (সাঃ) এর সীরাত থেকে যার অনেক প্রমাণ আছে। তবে এ সম্পর্কে এ কথা বলা যায়, এ গোপন পদ্ধতি সঠিক জায়গায় প্রয়োগ করতে হবে। সেটি হচ্ছে, (মিলিটারী অপারেশন) পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির খবর গোপন করা।

আর মিল্লাতে ইব্রাহীম ও তাদের ত্বাগুতী পদ্ধতি ও বাতিল উপাস্যর সঙ্গে কুফরী করাটা এ গোপন পদ্ধতির আওতা ভুক্ত নয়। বরং দাওয়াত প্রকাশ্যে দিতে হবে। এরই বাস্তব রূপ বলা যায়, নবী (সা:) এর হাদীসটি- আমার উম্মাতের একটি দল সদা-সর্বদা প্রকাশ্য হকের উপর থাকবে (মুসলিম ও অন্যান্য) আর এ দাওয়াত গোপনে বা লুকিয়ে দেওয়ার অর্থই হলো ত্বাগুতের সাথে আপোষে ভাব, তাদের দলে ঢুকে পড়া, তাদের অবস্থানকে আরো উঁচু করা। এটা কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (সা:) এর পদ্ধতি নয়। বরং এটি দুনিয়ার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্বভাব ও পদ্ধতি, যাদের বলা ওয়াজিব:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ [الكافرون/٦]

অর্থ: "তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য প্রযোজ্য আর আমার দ্বীন আমার জন্য।" (সূরা কাফিরূন ১০৯:৬)

বিষয়টির সারকথা হলো, **পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গোপনে গ্রহণ করা আর দাওয়াত ও তাবলীগ প্রকাশ্যে।**

প্রশ্ন: যে সমস্ত লোকেরা বলে: "নিশ্চয় মিল্লাতে ইবরাহীমের এ পথ (প্রকাশ্য ঘোষণার পথ) দাওয়াতকে ধ্বংস করে ও দ্রুত করুণ পরিণতি ডেকে আনে।" তাদের এ কথার জবাব কি?

উত্তর: ঐ সমস্ত লোকেরা বলে: "নিশ্চয় এ পথ দাওয়াতকে ধ্বংস করে ও দ্রুত করুণ পরিণতি ডেকে আনে।" এ ধরনের কথা বলা মূর্খতা ও গুজব ছড়ানো বৈ কি! কেননা এ দাওয়াত হচ্ছে সেই দ্বীনের দাওয়াত যাকে আল্লাহ সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদিও এটা মুশরিকরা অপছন্দ করে এবং এটা তারা করবেই কোন সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি দাওয়াতের সংশোধন ও তার অনুসরণে এ সঠিক পথ থেকে বিমুখ হবে সে ব্যক্তি মুসলিম সমাজের উপর ফিতনা ও বিপদাপদ নিয়ে আসবে। অথবা দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকদের অন্তরে শয়তান যে সকল কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে সেগুলোকে সে বয়ে নিয়ে আসবে। আর এ ব্যক্তিই হচ্ছে বোকা' যে ইব্রাহীম (আ:) এর দাওয়াতী পদ্ধতি হতে আরো ভাল দাওয়াতী পদ্ধতি সম্পর্কে সে অধিক অবগত মনে করে প্রতারণায় নিমজ্জিত। অথচ আল্লাহ (সুব:) তাঁর (ইবরাহীম আ.) পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন।

বড় ফিতনা হচ্ছে তাওহীদকে গোপন করা এবং জনগণের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া। মিল্লাতে ইব্রাহীম প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর দ্বীনের সাথে সুসম্পর্ক প্রকাশ এবং আল্লাহ ছাড়া উপাসনা করা হয় এমন ত্বাগুতের সাথে শত্রুতাপোষণ করার চেয়ে কোন সংস্কার বড় হতে পারে? এ জন্য যদি মুসলমানেরা পরিক্ষিত না হয়, আর এ জন্য যদি কুরবানী না দেয় তাহলে আর কিসের দ্বারা তাদের পরীক্ষা হতে পারে ?

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি সতর্কতার নামে গোপনে বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে কাফেরদের সমর্থন করে ইসলামে তার অবস্থান কোথায়?

উত্তর: এর সাথে জড়িত ব্যক্তি কয়েক প্রকারের-

➢ যে ব্যক্তি প্রকাশ্য ও গোপনে উভয়ভাবে তাদের সমর্থন করে। তাহলে এ ধরনের ব্যক্তি কাফের ও ইসলাম হতে বহিষ্কৃত। চাই এতে সে অপছন্দকারী হোক বা না হোক যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

{مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }

অর্থ: " ... যে ব্যক্তি কুফরীতে নিজের বক্ষ প্রসার করবে তার উপর আল্লাহর গযব ও মহা শাস্তি দেওয়া হবে।" (সূরা নাহাল ১৬:১০৬)

➢ গোপনে তাদের সাথে মিশে ও সমর্থন করে। আর প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে। এ লোকও কাফির এবং মুনাফিক। পবিত্র কুরআনে এ জাতিয় লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة : ١٤]

অর্থ: "আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'।" (সুরা বাকারা ২:১৪)

➢ গোপনে তাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করে। এ লোক আবার দু'ধরনের।

এক. যে গোপনে তাদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করে। সে তাদের রাষ্ট্রের নাগরিক নয়। তাকে এ কাজে প্রভাবিত করেছে

নেতৃত্বের লোভ, সম্পদ, কোন দেশের নাগরিকত্ব লাভের আশায়, পরিবার অথবা এর কারণে সম্পদে যে ক্ষতি হতে পারে সে আশঙ্কায়। সে এই অবস্থায় মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী) হয়ে যাবে। গোপনে তাদের কাজকে অপছন্দ করা তার কোন কাজে আসবে না। সে এমন ব্যক্তি যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}

অর্থ: "তারা এমন লোক, যারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে ভালবাসে। আর আল্লাহ কাফিরদের হিদায়াত করেন না।" (সূরা নাহল ১৬:১০৭)

দুই. সে এ কাজ করে এ জন্য যে এটা না করলে তাদের রাষ্ট্রে অবস্থান করা যাবে না। অথবা তাকে জেল-জুলুম ও নির্যাতনের পাশাপাশি হত্যার হুমকিও দেয়া হয়। তাহলে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তার জন্য সে কাজ করা জায়েয শুধু প্রকাশ্যে তাদের সাদৃশ্যতা বজায় রাখার জন্য, তবে তার অন্তর ঈমানে পূর্ণ অটল থাকে যেমনটি আম্মার (রা:) এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আল্লাহ বলেন :

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل/١٠٦]

অর্থ: "তবে যাকে (কুফুরী কাজে) বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে ..." (সূরা নাহল ১৬:১০৬)

সুতরাং বিল ইক্বরাহ বা জবরদস্তি অবস্থা ব্যতীত তার জন্য বাহ্যিকভাবেও তাদেরকে সমর্থণ করা বৈধ নয়। সতর্কতার সাথে বিল ইক্বরার শর্ত সমূহ দেখে নেয়া প্রয়োজন, যেন সে সাধারন পরীক্ষায় তার ঈমানকে খুইয়ে না বসে।

প্রশ্ন: আল-ইক্বরাহ বা জবরদস্তি পরিস্থিতি কি? যে অবস্থায় অন্তর ঠিক রেখে বাহ্যিক কুফরী কথা বলা বৈধ? তার জন্য শর্ত কি?

উত্তর: আল-ইক্বরাহ বা জবরদস্তি অবস্থা বলা হয় ঐ পরিস্থিতিকে যে অবস্থায় একজন কে হত্যা বা এমন প্রচন্ড শাস্তির হুমকি দেওয়া হয় যা সহ্য করা অসম্ভব। ঐ অবস্থায় সে তার অন্তরে পরিপূর্ন ঈমানকে ঠিক রেখে বাহ্যিক কুফরী কথা বলার অনুমতি দেয়। যেমনটি ঘটেছিল আম্মার বিন

ইয়াসার (রা:) এর ক্ষেত্রে। আল্লাহ (সুব:) এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেন:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অর্থ: "ঈমান আনার পরেও যে আল্লাহর সাথে কুফরী করবে, সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হবে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে। কিন্তু যারা তাদের হৃদয়কে কুফরীর জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আল্লাহর গজব নিপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব" (সূরা নাহল ১৬:১০৭)

আলেমগণ আল-ইকরাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো:

১) বাধ্যকারী তাকে যে হুমকি দেয় তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা তার আছে। আর যাকে হুমকি দেওয়া হয় সে পালিয়ে গিয়েও তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম।

২) তার ধারণার মাত্রা এমন হতে হবে, যদি সে হুমকি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার উপর হুমকির কাজ বাস্তবায়িত হবে।

৩) তাকে যা দিয়ে হুমকি দেওয়া হবে তা তাৎক্ষণিক উপস্থিত থাকতে হবে। যদি বলে তুমি এরূপ না করলে আগামীকাল তোমাকে মারব। তাহলে তাকে অপারগ বলে গণ্য করা হবে না।

৪) আদিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যেন বাড়াবাড়ি প্রকাশ না পায়। অর্থাৎ যেটুকু বললে বা করলে তার বিপদ (হুমকি) দূর হবে তার চাইতে বেশি কিছু করা।

একমাত্র যাকে এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় যা সহ্য করা সম্ভব নয় সে ব্যতিত কারো জন্য এ কাজ করা বৈধ নয়। আলেমগন শাস্তির মধ্যে হত্যা করা, অগ্নিদগ্ধ করা, অঙ্গহানী অথবা যাবত জীবন কারাদন্ডের কথা বলেছেন। আম্মার (রা:) কে কেন্দ্র করে আত্মরক্ষার আয়াত নাযিল হয়েছে। এ কথা সবারই জানা যে, তারা যা বলেছিল তিনি তা বলেননি ততক্ষন পর্যন্ত, যখন তারা তার মাতাপিতাকে হত্যা করে এবং বিভিন্ন

প্রকার কঠিন শাস্তি দেয়। তার পাজরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং আল্লাহর জন্য তিনি কঠিন কষ্ট ভোগ করেছেন।

প্রশ্ন: জবরদস্তি পরিস্থিতিতেও কোন ভূমিকা নেয়া উত্তম? জবরদস্তি পরিস্থিতিতেও যারা নতি স্বীকার করেন নি এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত বর্ননা করুন?

উত্তর: জ্ঞানী সম্প্রদায় কুফরী শব্দ বলতে বাধ্য করার সম্পর্কে বলেছেন, শক্তভাবে তাওহীদকে আঁকড়ে থাকা, কষ্টে ধৈর্য্য ধরা, আল্লাহর কাছে এর পুরস্কারের আশা করা কোন প্রকার নতি স্বীকার না করে, এটা মহত্বের কাজ ও উত্তম। এটিই ছিল সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামদের অবস্থান ও আদর্শ। এ ধরনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দ্বীন প্রকাশ লাভ করে ও এর মর্যাদা ও গাম্ভীর্য ফুটে উঠে। দেখুন সহীহ্ বুখারীর অনুচ্ছেদ- "যে ব্যক্তি প্রহার, হত্যা ও অপমানকে কুফরীর উপর বেছে নেয়"। এর প্রমাণও ভুরিভুরি। তেমনিভাবে ইমামদের অবস্থান যা হিসাব করা সম্ভব নয়।

কিছু দৃষ্টান্ত- আসহাবুল **উখদুদের** ব্যাপারে বলা হয়েছে:

فَأُتِىَ الْمَلكُ فَقيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّه نَزَلَ بكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بالأُخْدُود فى أَفْوَاه السِّكَك فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينه فَأَحْمُوهُ فيهَا. أَوْ قيلَ لَهُ اقْتَحمْ. فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ يَا أُمَّه اصْبِرِى فَإِنَّك عَلَى الْحَقِّ

অর্থ: "........ রাজা তখন একটি গভীর গর্ত খুড়ে তার ভেতরে আগুন জ্বালাতে আদেশ দিলো এবং বললো: যে এই বালকের দ্বীন থেকে সরে না আসবে তাকেই এই আগুনে নিক্ষেপ করো বা তাকেই আগুনে লাফ দিতে আদেশ করো। তারা এমনটাই করতে থাকলো যতক্ষণ না এক মহিলা তার শিশুসন্তান সহ আসলো। সে আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করছিল। কিন্তু শিশুটি বলে উঠলো: মা, সহ্য করো (এই পরীক্ষা), কারণ তুমি সঠিক পথে আছো।" (সহীহ মুসলিম ৭৭০৩)

পূর্ব যুগের ঈমানদারদের অবস্থা যা খাব্বাবকে উদ্দেশ্য করে নবী (সা:) বলেছিলেন :

عَنْ خَبَّابٍ يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمشَاط الْحَديد مَا دُونَ عظَامه منْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلكَ عَنْ دينه وَيُوضَعُ الْمنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِه فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلكَ عَنْ دينه وَلَيُتمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِه

অর্থ: "খাব্বাব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমাদের পূর্বে এমনও ঈমানদার ছিলেন যাকে ধরে এনে মাটিতে গর্ত খোড়া হত। তাতে তাকে ফেলা হত, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হত, এরপর তাকে দু'খন্ড করে ফেলা হত। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস তুলে নেওয়া হত। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারত না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন। তখন এমন নিরাপত্তা আসবে যে একজন আরোহী সানআ' থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। কিন্তু আল্লাহর ভয় ছাড়া তার আর কোন কিছুর ভয় থাকবে না। আর ছাগলের উপর বাঘের ভয় ছাড়া। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো।" (সহীহ বুখারী ৩৮৫২)

প্রশ্ন: হাতিব ইবনে বালতাআ' (রা:) এর মক্কায় কাফিরদের চিঠি লিখে সতর্ক করা কি কারনে কুফরী বলে গন্য হয় নি? আমাদের সময়ে এরূপ কাজ কেউ করলে তার সাথে আমাদের কি আচরন হবে?

উত্তর: হাতিব (রা:) মক্কা বিজয়ের অভিযানের পূর্বে মক্কার কাফেরদের চিঠি লিখে সতর্ক করেছিলেন। তার পরিবার-পরিজন মক্কায় ছিল এবং তাদের সাপোর্ট করার মত কেউ ছিল না। তিনি এই কাজ করেছিলেন এই আশায় যে, আগে থেকে জানালে হয়তো তার পরিবারকে তারা কোন ক্ষতি করবে না। এই ঘটনা প্রকাশিত হলে ওমর (রা:) হতিব (রা:) কে হত্যা করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা:) এর কাছে অনুমতি চান । যে বুঝটি নবী (সা:) এর উপস্থিতিতে ওমর (রা) ব্যক্ত করেছিলেন সেটিকে তিনি অস্বীকার করেননি। সেটিই পূনার্ঙ্গ কথা। তাকে কিন্তু রাসূল (সা:) একথা বলেননি, "যে তার ভাইকে 'হে কাফের' বলবে তখন দুজনের যে কোন একজন এ শব্দের

বাহক হবে।" বরং ওমরের (রা:) হুকুমকে তিনি সমর্থন করেছেন। হাতিবের মত যার কোন مـانع تكفـير প্রতিবন্ধক নেই তার ব্যাপারে ওমর (রা:) এর হুকুমকে বাদ দেননি। রাসুলুল্লাহ (সা:) আমাদেরকে হাতিবের গোপনীয় পবিত্রতার কথা বলে দিয়েছেন তার ভাষায় لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَـدْ غَفَـرْتُ لَكُـمْ "তুমি জান কি হয়তো আল্লাহ (সুব:) বদরবাসীদের প্রতি উকি মেরেছেন আর বলেছেন; 'তোমরা যে কোন আমল করতে পার। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি"। (সহীহ বুখারী ৩০৮১; সহীহ মুসলিম ৬৫৫৭; সুনানে তিরিমিজি ৩৩০৫) হাতিব (রা:) যা বলেছিলেন হাদীসে তা এভাবে এসেছে:

وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِى وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ

অর্থ: "আমি এ কাজ কুফরী, মুরতাদ বা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে করিনি।" (সহীহ মুসলিম ৬৫৫৭) তখন রাসূল (সা:) বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তৎক্ষণাত হাতিব কর্তৃক এ ধরণের কথা বলাই স্পষ্ট দলিল যে সাহাবীগণ ও তিনি নিজেও জানতেন এ ধরনের কাজ করা কুফরী ও দ্বীনত্যাগ করার নামান্তর। যেমন অপর রেওয়াতে এসেছে:

أَمَا إِنِّي لَمْ أَفْعَلْهُ غِشًّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ غِشًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا نِفَاقًا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتِمٌّ لَهُ أَمْرَهُ

অর্থ: "আমি এ কাজ রাসূল (সা:) কে ধোঁকা দেওয়ার জন্য করিনি বা মুনাফেকী বশতও নয়। আমি একথা জেনেই করেছি যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয়ী করবেন ও তাঁর নূরকে পূণার্ঙ্গ করবেন।" (মুসনাদে আহমদ ১৪৭৭৪)

তাদের অপর বর্ণনায় আছে : "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, আমার অন্তর থেকে ঈমান বিকৃত হয়ে যায় নি ....।" (দেখুন 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' ৩০৬/৯) এবং বুখারীতে বর্ণিত নবী (সা:) তার এ কথাকে সত্যায়ন করেছিলেন, "সে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলেছে।"

এই বদরী সাহাবীকে নবী (সা:) বিষেশায়িত ও নির্দোষ ঘোষণা করেছেন এবং তার গোপনীয় ও লুকানো সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, একাজ সে

কুফরী বা দ্বীনত্যাগ করার জন্য করেনি। বরং এটি ছিল তার কবীরা গুনাহ যা বদরী যোদ্ধা হওয়ার কারণে ক্ষমা হয়ে গেছে।

অহী বন্ধ হওয়ার পর আমরা মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করার জন্য আদিষ্ট, মানুষের অন্তর চিরে দেখার জন্য আমরা আদিষ্ট হইনি। এজন্যই যে ব্যক্তি কাফিরের সাথে সামঞ্জস্যতা ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে তার বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে আমরা তাকে কাফির ফতোয়া দিব এবং হত্যা করা হবে। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে গোপন বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ (সুব:) নিয়েছেন। যদি নিয়্যাত ভালই থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে পুনরুত্থানের পর পুরস্কৃত করবেন। যদিও তাকে মুসলিম বাহিনী কাফিরদের কাতারে হত্যা করে থাকে।

প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে দায়ীদের কে সরিয়ে নিতে ত্বাগুত কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়?

উত্তর: আপনি যখন মিল্লাতে ইব্রাহীম ভালভাবে বুঝেছেন এবং জানতে পেরেছেন যে, এটি রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীদের নীতি এবং এটিই হচ্ছে সাহায্য, বিজয় ও উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভের পথ। তাহলে ভালভাবে জেনে রাখুন, প্রত্যেক যুগের আল্লাদ্রোহী শক্তি (ত্বাগুতরা) এটা কোনদিনও মেনে নেয়নি। বরং তারা এ মহান মিল্লাতকে ভয় পায়। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে একে হত্যা করতে ও দা'য়ীদের অন্তর থেকে এই মিল্লাত বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতিতে মুছে ফেলতে।

যেমন আল্লাহ (সুব:) প্রাচীন যুগ থেকেই তাদের এ তৎপরতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ "তারা আশা করে যদি তোমরা নমনীয় হও (আপোষ কর) তবে তারাও নমনীয় হবে।"(সূরা ক্বালাম:৯)

এই পথ থেকে সরিয়ে নিতে ত্বাগুত তার বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়, দায়ীদের বন্দী ও নির্যাতন করে। এর পাশাপাশি এমন কিছু পদক্ষেপ নেয় যেন তাদের পদস্থলন ঘটাতে পারে। বর্তমান সময়ের কিছু পদক্ষেপের উদাহরণ :

▪ অনেক ত্বাগুতরা যে পার্লামেন্ট, জাতীয় সংসদ, কংগ্রেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানে দা'য়ীদের বিতর্ক একত্রিত করে এজন্য যে তারা এদের সাথে মিশে যাবে এবং তাদের মাঝের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে।

▪ কখনো অনেক ত্বাগুত এই ভয়ানক পিচ্ছিল পথে বিনিয়োগ করে বিনিময়ে এ ধরনের অনেক মূর্খ আলেমদের বশ করে ফেলে। ঐ আলেমদের কাছ থেকে হাক্ মুসলিমদের দমন করার জন্য ফতোয়া আদায় করা এবং তাদের ও তাদের দাওয়াতের বিরূদ্ধে এ ফতোয়া এই বলে কাজে লাগানোর জন্য যে, তারা খারেজী অথবা দ্বীনত্যাগী ও পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোক, জঙ্গীবাদী।

▪ কাফের কর্তৃক দা'য়ীদের পথচ্যুতি করার আরো একটি পদ্ধতি হলো মু'মিন ও দা'য়ীদেরকে পদ, কর্মস্থল, চাকুরী, উপাধি প্রভৃতি দ্বারা প্রলুব্ধ করে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ ও বাসস্থান প্রদান করা। তাদের প্রাচুর্য্য দান করা।

▪ আরেকটি পদ্ধতি হলো, কোন কোন ত্বাগুত দ্বীনের শাখা প্রশাখার ও দাওয়াতী কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এর দ্বারা অনেক দা'য়ী ও আলেমদেরকে ধোঁকা দিয়ে ব্যস্ত রাখে যাতে করে এই ত্বাগুতদের শয়তানী ও ফাসিকী কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

▪ তাদের ইসলাম রোধের আরেকটি পদ্ধতি হলো, তারা অনেক দা'য়ীকে দাওয়াত, খুতবা দেওয়ার অনুমোতি ও "সৎ কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ" করার সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে দেয়, যেগুলোর মাধ্যমে তারা ঐসকল আগ্রহী দা'য়ীদেরকে শান্ত ও তাদের বশ করে রাখতে পারে।

▪ আরো একটি পদ্ধতি হলো, কাফির কর্তৃক মুসলিম প্রজন্মের যুবকদের অন্তরেই মিল্লাতে ইব্রাহীমকে ধ্বংস, নষ্ট ও হত্যা করে ফেলা। আর এটা তারা করে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে এই ধরনের কারিকুলাম সরিয়ে দিয়ে তদস্থলে অন্য জিনিস অন্তর্ভূক্ত করে।

আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّـــذِينَ مَعَــهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّـــهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থ: "তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান আন---- ।"

সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪

অষ্টম অধ্যায়ঃ আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ

প্রশ্নঃ আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ কি?

উত্তরঃ الــولاء 'আল ওয়ালা' শব্দের আভিধানিক অর্থ ভালবাসা, সমর্থন করা, সাহায্য করা, অনুসরণ করা। 'আল ওয়ালা' এর শারয়ী সংজ্ঞা হচ্ছে, শুধু আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে ও ভালবেসে কথা, কাজ ও বিশ্বাসে সম্পূর্ণ একমত হওয়া। কিছু জিনিস যা আল্লাহ্‌কে (সুবঃ) সন্তুষ্ট করে সেগুলো হচ্ছে- আল্লাহ্‌র স্মরণ (যিকির), আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করা এবং মু'মিনদের ভালবাসা।

البراءة 'আল বারাআহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘৃণা করা, ত্যাগ করা, দূরে থাকা ইত্যাদি। আল বারাআহ এর শারয়ী সংজ্ঞা হচ্ছে 'আল-ওয়ালা'র সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ঐ সমস্ত কিছুর সাথে বিরোধিতা করা, ভিন্নমত পোষণ করা যা আল্লাহ্ ঘৃণা করেন এবং অপছন্দ করেন। গীবত, যিনা, শির্‌ক এবং কুফর হচ্ছে এমন কতগুলো জিনিষ যা আল্লাহ্ (সুবঃ) ঘৃণা করেন এবং এগুলো মু'মিনদেরও অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে।

'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআ'র বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চারটি বিষয় জড়িত, যথাঃ কথা, কাজ, বিশ্বাস এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বগণ। 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' এমন একটি বিশ্বাস যা মুসলিমদের সকল কাজ ও কথাকে পরিচালিত করে এবং এটার অনুশীলন ও বাস্তবায়নের উপর মু'মিনদের মর্যাদার স্তরের তারতম্য ঘটে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃনা করাই হচ্ছে আল ওয়ালা ওয়াল বারাআর মূলকথা। আল্লাহ বলেনঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

অর্থঃ "মু'মিনরা যেন মু'মিনদের ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন। (সূরা আল ইমরান ৩:২৮)

আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ.

অর্থঃ " বারা বিন আজিব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩৫৪৭৯)

প্রশ্নঃ আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় অংশ তার প্রমান কি?

উত্তরঃ 'ওয়ালা'র উৎস হচ্ছে ভালবাসা এবং 'বারাআ'র উৎস ঘৃণা। অন্তর এবং কাজ এই দুটি দ্বারাই এটি বাস্তবে পরিণত হয়। 'ওয়ালা' অন্তরঙ্গতায়, উদ্বিগ্নতায় এবং সাহায্যের দিকে উৎসাহিত করে। 'বারাআহ' বাধা, প্রতিবন্ধকতা, শত্রুতা এবং অস্বীকারকে ইন্ধন যোগায়। 'ওয়ালা' এবং 'বারাআহ' দুটোই ঈমানের ঘোষণার সাথে জড়িত এবং এর আবশ্যকীয় মূল সূত্রগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। কুরআন এবং হাদীসে এর বহু প্রমান রয়েছে। তার থেকে কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

অর্থঃ "মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন।" (সূরা আল ইমরান ৩:২৮)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رَحِيمٌ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

অর্থ: "বল, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ তো কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।" (সুরা আলি 'ইমরান ৩:৩১-৩২)

আল্লাহ্ তাঁর শত্রুদের উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا [النساء/٨٩)

অর্থ: "তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেরূপ কুফরী করেছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। তাই তোমরা তাদের মধ্যে থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করে।" (সুরা নিসা ৪:৮৯) এবং তিনি আরও বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١)

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সুরা মা'য়িদা ৫:৫১) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١١٩) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ

يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ [آل عمران/١١٨-١٢٠)

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমরা ঈমানদার ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা হলো, যদি তোমরা অনুধাবন কর। দেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবে ঈমান রাখ আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁতে কাটতে থাকে। বল, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর'। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা এতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।" (সূরা আল ইমরান ৩:১১৮-১২০)

আমরা এই বিষয়ে বর্ণিত অনেকগুলো হাদীসের মধ্যে অল্প কয়েকটি হাদীস এবং সাহাবীদের আলোচনা এখানে উল্লেখ করবো।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, "মুহাম্মাদ (সা:) তাদেরকে, প্রত্যেক মুসলিমদের পরামর্শ দেয়ার এবং প্রত্যেক কাফেরকে পরিহার করার শপথ করাতেন।" (মুসনাদে আহমদ ৪/৩৫৭-৮) নবী (সা:) বলেন:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ.

অর্থ: "বারা বিন আজিব (রা:) হতে বর্ণিত যে, নবী (সা:) বলেন: আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য ঘৃণা করা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩৫৪৭৯)

ইবনে আব্বাস (রা:) বলেছেন, "যে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করে, এবং যে আল্লাহ্‌র জন্য বন্ধুত্ব নষ্ট করে অথবা তার জন্য শত্রুতা ঘোষণা করে, সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে। এটা ছাড়া কেউ প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পাবে না, যদিও তার সাওম ও সালাত অনেক হয়। মানুষ দুনিয়াবী বিষয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা তাদেরকে কোন উপকারই করতে পারবে না।" (ইবনে রজব আল হাম্বালী, জামি আল উলূম ওয়াল হাকিম, পৃ:৩০)

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন, "ঈমানের ঘোষণা- 'নাই কোন ইলাহ, ইবাদত যোগ্য আল্লাহ্ ছাড়া'- এর দাবী হচ্ছে তুমি শুধু আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালবাসবে, কাউকে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করবে, নিজেরা বন্ধুত্ব করবে আল্লাহ্‌র জন্য, কারও সাথে শত্রুতা ঘোষণা করবে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য; এর দাবী হচ্ছে তুমি ভালবাসবে যা আল্লাহ্ ভালবাসেন, তুমি ঘৃণা করবে যা আল্লাহ্ ঘৃণা করেন।" (ইবনে তাইমিয়্যাহ, আল-ইহ্‌তিজাল ফিল ক্বদর, পৃ: ৬২)

প্রশ্ন: আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ-তে বিশ্বাসের মর্যাদা কি?

উত্তর: ইসলামী আক্বীদায় 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' এর উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে :

● "কোন ইলাহ নেই" যা হলো "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই"-এর অংশ। যাতে বুঝা যায় আল্লাহ ছাড়া যে সবকিছুর ইবাদত করা হয় সে সব হতে মুক্ত এবং নিরাপদ থাকতে হবে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل/٣٦]

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রাসূল পাঠিয়েছি, এই নির্দেশ প্রচারের জন্য যে, তোমরা কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক...।" (সুরা নাহ্‌ল ১৬: ৩৬)

● 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' অন্যতম প্রধান আক্বীদা যা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ়তম বন্ধন। আল-বারা বিন আজিব (রা:) হতে বর্ণিত যে, নবী (সা:) বলেন:

أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ.

অর্থ: আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩৫৪৭৯)

● এটা হচ্ছে এমন একটা ভিত্তি যেটার দ্বারা অন্তর ঈমানের সৌন্দর্য্য এবং পরম আশ্বস্ততা অনুভব করে। নবী (সা:) বলেন:

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

অর্থ: "যার মধ্যেই নিম্ন লিখিত তিনটি বৈশিষ্ঠ্য থাকবে সে ঈমানের মাধূর্য লাভ করবে। (১) তার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্য যেকোন কিছুর তুলনায় অধিক প্রিয় হবে। (২) যে একজনকে ভালবাসে এবং তাকে ভালবাসে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। (৩) এবং সে কুফরীতে ফেরত যাওয়াকে এমনভাবে ঘৃণা করে যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।" (সহীহ্ বুখারী ১৬, সহীহ মুসলিম ১৭৪)

● এটা হচ্ছে বুনিয়াদ যেটার উপর মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্ত সম্বন্ধ এবং আদান-প্রদান নির্ভর করে, যেমন মুহাম্মাদ (সা:) বলেন:

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

অর্থ: "আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: তোমাদের ঈমান নাই যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাই (মুসলিম) এর জন্য পছন্দ না করে।" (সহীহ বুখারী ১৩: সহীহ মুসলিম ১৭৯)

● তাদের জন্য অনেক বড় ও অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে যাদের বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা যখন কাউকে ভালবাসে শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসে। রাসুল (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ....... وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ .....

"সাত প্রকারের লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র জন্য একে অন্যকে ভালবাসত, তারা আল্লাহ্‌র জন্য

মিলিত হত এবং আল্লাহ্‌র জন্য বিচ্ছিন্ন হত।" (সহীহ বুখারী ১৩২৪; সহীহ মুসলিম ২৪২৭)

● এটা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন বা সম্পর্ক যা মানুষের মধ্যে পরস্পর বন্ধন তৈরী করে। আল্লাহ্ আমরা এটাকে সব ধরনের বন্ধনের উপর প্রাধান্য দিয়ে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة/٢٤)

অর্থ: "বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান (শাস্তি) আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (সুরা তওবা ৯: ২৪)

● এই 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' আক্বীদা হচ্ছে আল্লাহ্‌র 'ওয়ালাহ (আত্মরক্ষা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, রাজত্ব) পাবার একটি মাধ্যম। ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণনা করেছেন: فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من الله "যে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করে যে আল্লাহ্‌র জন্য 'মুয়ালাত'(সাহায্য করা, সমর্থন করা) করে এবং আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা পোষণ করে, সে আল্লাহ্‌র 'ওয়ালায়াহ' অর্জন করবে।" (আহমদ ১৫৫৮৮)

● আল ওয়ালা ওয়াল বা'রার সম্পর্ক কেয়ামতের দিনেও থাকবে যা আল্লাহ (সুব:) আমাদের পূর্বেই জানিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

অর্থ: "যারা অনুসৃত হয়েছে- তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" (সুরা বাকারা ২:১৬৬)

যে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন ছাড়া অন্য কিছুকে ভালবাসে এবং তাকে (আল্লাহকে), তার দ্বীনকে অথবা তার অনুসারীদের ঘৃণা করে, সে নিশ্চিত কাফের। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١)

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সুরা মা'য়িদা ৫: ৫১)

প্রশ্ন: 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র দাবী সমূহ কি কি?

উত্তর: কোন মুসলিম যে ঈমানের দাবী করে তাকে আল ওয়ালার উপযুক্ত হওয়ার জন্য অবশ্যই এর শর্ত ও দাবীসমূহ পূরণ করতে হবে, নি:সন্দেহে 'আল ওয়ালা' এবং 'আল বারা' এর দাবীসমূহ পূরণ একজন মুসলিমের দ্বীনের সাথে লেগে থাকার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। একজন মুসলিমের প্রতি 'আল ওয়ালা' এর দাবীসমূহ:

● দ্বীন রক্ষার্থে অমুসলিম ভূমি থেকে মুসলিম ভূমিতে হিজরত করা, শুধুমাত্র যারা দুর্বল ও অত্যাচারিত এবং যারা ভৌগলিক ও সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে হিজরত করতে পারে না তারা ছাড়া।

● দ্বীন এবং দুনিয়ার যে কোন বিষয়ে, যে কোন মুসলিম সম্প্রদায়কে সমর্থন ও সাহায্য করা, যা কিনা আমাদের কথার মাধ্যমে হোক, অন্তর দিয়ে হোক বা সম্পদের মাধ্যমে হোক। আল্লাহ্ বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [الأنفال/٧٣، ٧٤)

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু-----।" (সুরা আনফাল ৮: ৭২)

● অন্যান্য মুসলিম ভাইদের আনন্দে এবং দুর্দশার সময়ের সাথী হওয়া।

নবী (সা:) বলেন:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى »

অর্থ: "নু'মান ইবনে বশীর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: পারষ্পরিক ভালবাসার দিক দিয়ে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত একটি মানব দেহের মত, যদি এক অঙ্গ পীড়িত হয় তাহলে গোটা শরীর অনিদ্রা এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যায়।" (সহীহ বুখারী ৬০১১; সহীহ মুসলিম ৬৭৫১) মুসলিমদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকা এবং তাদের খবরা-খবর মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

- একজন মুসলিম তার ভাইয়ের ভাল কিছু অর্জন করা এবং খারাপ কিছু থেকে বিরত হওয়া অবশ্যই পছন্দ করবে, যেভাবে সে এগুলো নিজের জন্য পছন্দ করে। নবী (সা:) বলেন:

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

অর্থ: "আনাস (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণনা করেন: তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (সহীহ্ মুসলিম ১৩)

- অন্যান্য মুসলিমদের গালি দেওয়া, ঠাট্টা করা এবং গীবত করা থেকে বিরত থাকা, আল্লাহ্ (সুব:) এটাকে মুসলিমদের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات/١٢]

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি খারাপ। যারা তওবা না করে তারাই যালিম। হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভায়ের গোশত খেতে চাইবে। বস্তুত তোমরা তো তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" (সূরা হুজুরাত ৪৯:১১-১২)

- মুসলিম জামা'আ-র সাথে একতায় থাকা এবং দলাদলি, ভাগাভাগি, মতদ্বৈততা পরিহার করা। যেমন আল্লাহ্ হুকুম করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থ: "তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর : তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎ পথ পেতে পার।" (সূরা আল ইমরান ৩:১০৩) রাসূল (সা:) বলেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ».

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কিছু দেখলো যা সে অপছন্দ করে তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে । আর যে মুসলিম জামা'আ থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যাওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে ।" (সহীহ বুখারী ৭০৫৪; সহীহ্ মুসলিম ৪৭৯৬)

'আল বারাআহ' এর দাবীসমূহ :

মু'মিন হওয়ার জন্য একজন মুসলিমের ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি শুধুমাত্র আল ওয়ালা'র দাবীসমূহ সঠিকভাবে পূরণ করা যথেষ্ট নয়, তাকে কুফর ও কাফেরদের প্রতি 'আল বারাআহ'র দাবীসমূহও আন্তরিকতার সাথে পূরণ করতে হবে । গুরুত্বপূর্ণ দাবীসমূহের মধ্যে রয়েছে:

● কুফর, শির্ক এবং তৎসংলগ্ন লোকদের ঘৃণা করা; তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষন করা । যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থ: "তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ । যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই । আমরা তোমাদেরকে মানি না । তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান আন---- ।" (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

● কাফেরদেরকে আউলিয়া (মদদদানকারী, অভিভাবক, অন্তরঙ্গবন্ধু, সাহায্যকারী ইত্যাদি) হিসাবে গ্রহণ না করা এবং তাদের সাথে স্নেহ, ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে না তোলা । কারণ আল্লাহ্ (সুব:) হুকুম করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ [الممتحنة/١]

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা, তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্তে বিশ্বাস কর------ ।" (সূরা মুমতাহিনা ৬০:১)

● তাদের (কাফের) ভূমি থেকে হিজরত করা এবং বিশেষ কারণ ছাড়া তাদের ভূমিতে ভ্রমন না করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ »

অর্থ: "সামুরা ইবনে জুনদুব (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণনা করেন: যে কেউ মুসলিমদের মধ্যে থেকে মুশরিকদের সাথে সাক্ষাত করে, তাদের মাঝে বাস করে থাকে এবং তাদের জীবনযাত্রাকে সমর্থন করে সেও (সে মুসলিমও) তাদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ মুশরিক) ।" (সুনানে আবু দাউদ ২৭৮৯)

● কাফেরদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবন ব্যবস্থাকে অনুসরণ না করা । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ».

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণনা করেন: যে কেউ অন্য কোন (জাতীর) লোকের সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে তাদেরই একজন হিসেবে গণ্য হবে ।" (সুনানে আবু দাউদ ৪০৩৩)

নবী (সা:) আরও বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:) তোমরা সাদা চুলকে (খিজাব দ্বারা) পরিবর্তণ কর। ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সাথে মিল রেখো না। (সুনানে মুসনাদে আহমদ ৭৫৪৫; সুনানে তিরমিজি ১৭৫২; সুনানে নাসায়ী ৫০৮৮) অর্থাৎ মেহেদী ইত্যাদি দ্বারা সাদা দাড়ি-চুল কালার করার পক্ষে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা এটা করে না। তাই তাদের সাথে অমিল রাখার জন্যই খিজাব লাগানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তবে কালো খিজাব লাগানো নিষেধ রয়েছে।

● আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গ এবং বন্ধুত্ব ত্যাগ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ [هود/١١٣]

অর্থ: "যারা সীমালংঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড় না, তাহলে অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।" (সুরা হূদ ১১:১১৩)

● কাফেরদের সাথে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার এবং সম্মানের খাতিরে দ্বীনের মধ্যে কোন আপোষ-মিমাংসা করা হবে না। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ "তারা (কাফির) চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তা হলে তারাও নমনীয় হবে।" (সুরা কালাম ৬৮: ৯)

অধিকন্তু, মুওয়াহিদরা তাদের কোন কাফের আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ও রহমতের দোয়াও করবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة/١١٣]

অর্থ: "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী।" (সুরা তওবা ৯:১১৩)

কাফেরদের শত্রুতার ধরন

প্রশ্ন: মু'মিদের সাথে কাফিরদের শত্রুতার ধরন কি?

উত্তর: মু'মিদের সাথে কাফিরদের শত্রুতার তাদের এই শত্রুতার রয়েছে নানান রূপ:

■ اَلتَّكْذِيْبُ বা অন্তরের কুফরী (তাকযিব)। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا [الأنعام/٣٤]

অর্থ: "নিশ্চয় তোমার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তারা ধৈর্যধারণ করেন...।" (সুরা আন'আম ৬:৩৪)

■ اَلسُّخْرِيَّةُ ঠাট্টা (সুখরিয়াহ) এবং الاستهزاء বিদ্রুপ (ইসতিহ্জা) করা। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ [المطففين/٢٩]

অর্থ: "যারা অপরাধী তারা তো মু'মিনদেরকে উপহাস করত।" (সুরা মুতাফ্ফিফীন ৮৩:২৯)

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ [يس/٣٠]

অর্থ: "পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে বিদ্রুপ করেছে।"(সুরা ইয়াসীন৩৬:৩০)

■ اَلْجُنُوْنُ মু'মিনদেরকে পাগল (জুনুন) বলে অপবাদ দেয়া। আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা:) কে পাগল বলা হয়েছে। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ [الحجر/٦]

অর্থ: "তারা বলে, 'ওহে যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ।" (সুরা হিজ্র ১৫:৬)

■ طَلَبُ الْحُكُوْمَةِ وَالرِّيَاسَةِ মু'মিনরা কর্তৃত্ব (হুক্মত) ও ক্ষমতালোভী (রিয়াসাহ) বলে অপবাদ দেয়া। মূসা (আ:) এর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ [يونس : ٧٧ ، ٧٨]

অর্থ: “তারা বলতে লাগলো: তুমি কি আমাদের নিকট এইজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরিকা থেকে, যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দুইজনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়?” (সুরা ইউনুস ১০:৭৮)

এ আয়াতে কাফেরগণ মুসা (আ:) কে ক্ষমতা লোভী বলে অপবাদ দিয়ে তার দাওয়াতকে প্রত্যাখান করেছে ।

■ اَلْمُفْــسِدُ বা মু'মিনদের ধর্মত্যাগ ও বিশৃঙ্খলা (ফাসাদ) সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত করা । আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ [غافر/٢٦]

অর্থ: “ফিরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক । আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে (ফাসাদ) বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ।” (সুরা মু'মিন ৪০:২৬)

এ আয়াতে মূসা (আ:) কে ফেরআউন বাপ-দাদার ধর্ম পরিবর্তণকারী ও ফাসাদ সৃষ্টি

■ اَلْــاَرْذَلُوْنَ বা মু'মিনদের দারিদ্র ও অসহায় বলে গালমন্দ করা । আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ [الشعراء/١١١]

অর্থ: “তারা বলল: আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ নিচু শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে ।” (সুরা শূরা ২৬:১১১)

তারা এটি করত যাতে অন্য মানুষেরা মু'মিনদের নিকটে না আসে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا [مريم/٧٣]

অর্থ: “কাফিররা মু'মিনদের বলে: দু'দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসেবে কোনটি উত্তম ।” (সুরা মারইয়াম ১৯:৭৩)

■ اَلتَّطَيُّرُ বা মু'মিনরা অভিশপ্ত এবং মু'মিনদের কারণে তাদের উপর গযব আসবে এমন অভিযোগ । ইরশাদ হচ্ছে:

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ: “তারা বলল: আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি এবং যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব অথবা কঠিন শাস্তি দিব ।” (সুরা ইয়াসীন ৩৬:১৮)

■ اَلْمُجَادَلَــةُ بِالْبَاطِــلِ বা সত্য প্রত্যাখ্যান এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা যুক্তি প্রদর্শন । আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا

অর্থ: “কিন্তু কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে, এর দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সমস্তকে তারা বিদ্রুপের বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করে থাকে ।” (সুরা কাহ্ফ ১৮:৫৬)

■ সাধারণ মানুষকে মু'মিনদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা । আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

অর্থ: “তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বলল: ‘তোমরা যদি শুআ'ইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্থ হবে' ।” (সুরা আ'রাফ ৭: ৯০)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ [غافر/٢٦]

অর্থ: “ফিরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক । আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ।” (সুরা মু'মিন ২৬)

■ মু'মিনরা মুষ্টিমেয় হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ জনগণের উপর তাদের মতবাদ চাঁপিয়ে দিচ্ছে এমন অভিযোগ উত্থাপন । এর উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ (সুব:) বলেন:

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٥٣) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (٥٤) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٥) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ [الشعراء/٥٣-٥٦]

অর্থ: "এরপর ফিরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠালো এই বলে: 'ইহারা তো ক্ষুদ্র একটি দল। ইহারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে এবং আমরা তো সকলেই সদা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সদা সতর্ক।" (সুরা শু'আরা ২৬:৫৩-৫৬)

▪ তারা দাবী করে যে, সত্য দ্বীনের ব্যাপারে তাদের অবস্থান মু'মিনদের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى [طه/٦٣]

অর্থ: "তারা বলল: নিশ্চয় এরা দুইজন যাদুকর, তারা চায় তাদের যাদু দিয়ে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে।" (সুরা ত্বাহা ২০: ৬৩)

▪ নানাবিধ চক্রান্ত ও পরিকল্পনা করে সাধারণ মানুষকে মু'মিনদের অনুসরণ থেকে বিরত রাখা। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [سبأ/٣٣]

অর্থ: "যাদেরকে দুর্বল বলা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে: 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরাব। তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে।" (সুরা সাবা ৩৪:৩৩)

▪ اَلْحِصَارُ বা অর্থনৈতিক অবরোধ। মু'মিনদেরকে সুবিধা বঞ্চিত করে দ্বীন থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ [المنافقون/٦، ٧]

অর্থ: "তারা বলে: আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় কর না যাতে করে তারা তার থেকে সরে পড়ে। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধনভান্ডার তো আল্লাহ্‌রই কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।" (সুরা মুনাফিকূন ৬৩:৭)

▪ মু'মিনরা যদি তাদের দ্বীন থেকে না সরে অথবা কাফিরদের সাহায্য সহযোগীতা না করে তবে তাদেরকে জেল ও মৃত্যুদন্ডের ভয় দেখানো। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا

অর্থ: "কাফিররা তাদের রাসূলগণকে বলেছিল: আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে।" (সুরা ইব্‌রাহীম ১৪:১৩)

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا

অর্থ: "তারা যদি তোমাদের ব্যাপারে জানতে পারে তাহলে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনোই সফলকাম হবে না।" (সুরা কাহ্‌ফ ১৮:২০)

▪ মু'মিনদের উপর অত্যাচার, হত্যা এবং সংঘাত চাঁপিয়ে দেয়া। আলাহ্ (সুব:) বলেন:

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آَلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ [الأنبياء/٦٨]

অর্থ: "তারা বলল: তাকে (ইবরাহীম আ.) পুড়িয়ে দাও এবং সাহায্য কর তোমাদের দেবতাদেরকে যদি তোমরা করতে পার।" (সুরা আম্বিয়া ২১:৬৮)

আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ [الأنفال/٣٠]

অর্থ: "আর স্মরণ কর যখন কাফিররা তোমার বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা নির্বাসিত করবে।" (সুরা আন্‌ফাল ৮:৩০)

আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ [البقرة/٢١٧)

অর্থ: "তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়।" (সুরা বাকারা ২:২১৭)

তাই মু'মিন ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, কাফিরদের শত্রুতা ও বিরোধিতার কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যা কখনো বদলাবে না।

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের বিধান

প্রশ্ন: কফিরদের সাথে ভয়ের ওজর দেখিয়ে বন্ধুত্বের ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: ইমাম সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ (রহ:) বলেন, তুমি জেনে রেখো আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন,

"যদি একজন ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে مُوَافَقَةٌ মুওয়াফাক্বাহ (ঐক্য, সম্মতি, সন্তুষ্টি) দেখায় তাদের থেকে ভয়ে, তাদের প্রতি مُدَارَاةٌ মুদ্বারাহ (বন্ধুত্ব, নম্রতা) দেখায়, অথবা مُدَاهَنَةٌ মুদ্বাহানাহ (আপোস করে, তোষামদ করে) দেখায় তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য, তাহলে সে তাদের মতই কাফের, যদিও তাদের দ্বীনকে সে অবজ্ঞা করে এবং ঘৃনা করে, ইসলাম এবং মুসলিমদের ভালবাসে।" (আদ দালাইল ফি মুওয়ালাত আহলি আল ইশরাক/৭৯)

প্রশ্ন: مُكْرَهْ মুক্বরাহ কে?

উত্তর: মুক্বরাহ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি জবরদস্তি করা হয়, যাকে মুশরিকিনরা বন্দী করে এবং বলে, কুফরী কর না হলে তোমাকে এরূপ এরূপ করব বা হত্যা করব অথবা তাকে তারা নিয়ে যায় এবং ততক্ষন পর্যন্ত নির্যাতন করতে থাকে যতক্ষন না সে তাদের কথায় রাজী হয়। সুতরাং তার জন্য অনুমতি রয়েছে তাদের সাথে মুখের কথায় রাজী হওয়া, যখন তার অন্তর ঈমানে অটল থাকবে। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل/١٠٦)

অর্থ: "ঈমান আনার পরেও যে আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের হৃদয়কে কুফরীর জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আল্লাহর গজব নিপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব। তবে সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হবে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে।" (সূরা নাহল ১৬:১০৭)

প্রশ্ন: ভয়ে বা দুনিয়ার স্বার্থে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে দালীল প্রমান কি?

উত্তর: সালফে সালেহীনগনের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে, যে কৌতুক করে কুফরী কথা বলে সে কুফরী করে। সুতরাং তার ব্যাপারে কি ফায়সালা হবে যে লোভের বশবর্তী হয়ে, দুনিয়াবী বিষয় অর্জন করার জন্য বা ভয়ে কুফরী কথা বলে? নিশ্চয়ই ভয় বা দুনিয়াবী স্বার্থ কোন ওজর নয়। এর প্রমান অনেক। আমরা এখানে কিছুমাত্র উল্লেখ করলাম:

প্রথম প্রমান: আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

অর্থ: "ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।" (সুরা, বাক্বারাহ ২:১২০)

আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থ: "জ্ঞান (কুরআন) আসার পর আপনি যদি তাদের হাওয়ার অনুসরন করেন তাহলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।" (সুরা বাক্বারাহ ২:১৪৫)

সুতরাং রাসুল (সা:) যদি তাদের ভয়ে অন্তরে কোন বিশ্বাস না রেখে তাদের দ্বীনের অনুসরন করতেন বাহ্যিকভাবে, তাহলেও তিনি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হতেন।

দ্বিতীয় প্রমান: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِد

অর্থ: "বস্তুত: তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়।

তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।" (সূরা বাক্বারা ২:২১৭)

আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুফফাররা ততক্ষন যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষন না আমাদেরকে আমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুফরী করবে কাফেররা তাদের সাথে যুদ্ধ করার পর তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তাহলে তার ব্যাপারে ফায়সালা কি যারা মুশরিকরা তাদের সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত ঐক্যমত পোষন করে, তাদের অবস্থা আরও ভয়ংকর।

তৃতীয় প্রমান: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

অর্থ: "মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ্ (সুব:) তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। (সুরা আল ইমরান ৩:২৮)

আল্লাহ নিষেধ করেছেন মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু বানাতে। সতর্ক করেছেন যারা এরূপ করবে তাদের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তারা ব্যতীত যারা তাদের থেকে বিপদের আশংকা করে অর্থাৎ তাদের দ্বারা বশীভূত এবং তাদের সাথে শত্রুতা প্রদর্শন করতে সক্ষম নয়। তাই সে বাহ্যিক বন্ধুতা দেখায়, অথচ তার অন্তরে কাফেরদের প্রতি শত্রুতা এবং ঘৃনা রয়েছে সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে বাধা দূর হবার যেন সে পুনরায় শত্রুতা ও ঘৃনা প্রদর্শন করতে পারে তার ব্যাপার ভিন্ন।

সুতরাং তার ব্যাপারটি কত খারাপ যে দুনিয়াবী স্বার্থে তাদেরকে বন্ধু বানায়, কারণ সে কাফেরদের ভয় করে। অথচ আল্লাহ নিষেধ করেছেন তাদের ভয় করতে- **إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**

"এরাই হলে শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৭৫)

চতুর্থ প্রমান: আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীণ হয়ে পড়বে।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৪৯)

আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন তাদের আনুগত্য করলে নি:সন্দেহে তারা কুফরীতে ফিরিয়ে নেবে, কারণ কুফরীর কমে কোন কিছুতে তারা সন্তুষ্ট নয়।

পঞ্চম প্রমান: আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

অর্থ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুত: যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে: আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই।" (সুরা, মায়িদাহ ৫:৫১-৫২)

সাহাবী আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের ভয় করা উচিত, কারণ সে নিজের অজান্তে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান হয়ে যেতে পারে। অতপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন..(আদ দুররে মানসুর ৩/১০০)

এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনুল হাযম (রহ:) বলেন, এই আয়াতটি শাব্দিক অর্থে নেয়া যথার্থ, অর্থাৎ সে হচ্ছে কাফির, এটাই সত্য। এমনকি দুইজন মুসলিমও এই ব্যাপারে ভিন্নমত পোষন করবে না। (আল মুহাল্লা, ১১/১৩৮)

এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) তাদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে ভীতিকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেন নি, বরং তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তারা দূর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ভয়ে এরূপ করে ।

ষষ্ঠ প্রমান: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

অর্থ: "ঈমান আনার পরেও যে আল্লাহর সাথে কুফরী করবে, সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হবে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে । কিন্তু যারা তাদের হৃদয়কে কুফরীর জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আল্লাহর গজব নিপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব । এটা এ জন্যে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না ।" (সূরা নাহল ১৬:১০৬-১০৭)

সুতরাং আল্লাহ (সুব:) অপরিবর্তনীয় ফায়সালা করেছেন- যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে সে কাফের । তার জীবন, সম্পদ বা পরিবারের ওজর থাকুক বা না থাকুক, সে বাহ্যিকভাবে কুফরী করুক বা অন্তরে, অথবা শুধু বহ্যিকভাবে, অন্তরে নয়, চাই সে কুফরী করুক কথা ও কাজ উভয়ভাবে, অথবা যেকোন একভাবে, অথবা মুশরিকদের থেকে কোন দুনিয়াবী লাভের জন্য- **সকল অবস্থায় সে কাফির**- শুধুমাত্র সে ব্যতীত যে মুক্বরাহ (যাকে জবরদস্তি করা হয়েছে) ।

আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যে কুফরীর জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয় যদিও সে সত্যের ব্যাপারে নিশ্চিত, তারা বলে- আমরা এটা করতে চাইনি তাদের ভয় ব্যতীত- কিন্তু তবুও " তাদের উপর আল্লাহর গজব নিপতিত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব " অত:পর তিনি জানিয়ে দিয়েছেন তাদের এই শাস্তির কারণ এই নয় যে, তারা শিরকে বিশ্বাস করত, এটা নয় যে তারা তাওহীদের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল, এটাও নয় যে দ্বীনকে ঘৃনা করা বা কুফরকে ভালবাসা- বরং কারণ হচ্ছে দুনিয়াকে দ্বীনের উপর, তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থান দেয়া ।

সপ্তম প্রমান: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

অর্থ: "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে । যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় । সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত । এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি ।" (সুরা হাজ্জ ২২:১১)

তাদের অবস্থা হচ্ছে যারা ফিতনায় পড়ে দ্বীনকে ত্যাগ করে তাদের মত । যখন তারা ফিতনায় পড়ে তারা দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং মুশরিকদের সাথে একমত পোষন করে, তাদের আনুগত্য করে এবং তারা মুসলিমদের জাম'আত ত্যাগ করে মুশরিকদের দলে চলে যায় ।

অষ্টম প্রমান: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

অর্থ: "যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরূদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয় ।" (সূরা মুজাদালাহ :২২)

আল্লাহ জনিয়ে দিয়েছেন, যারা ঈমান আনে এমন একজনকেও খুজে পাওয়া যাবে না যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে বিরুদ্ধাচরনকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করছে । সে যেই হোক না কেন । কারণ এই বন্ধুত্ব হচ্ছে ঈমান বিধ্বংসী, কারণ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং ঈমান কখনই এক হতে পারে না, যেমন আগুন পানি এক হতে পারে না ।

এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) পরিষ্কার সতর্কতা জারি করেছেন যে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের জন্য কখনই সম্পদ, পিতা, ভাই, স্ত্রী-সন্তান, গোত্র-গোষ্ঠীর ভয় ওজর হতে পারে না, যাকে অনেকেই ওজর হিসেবে দেখাতে চায় ।

যারা বলে যে, আমাদের ওজর হচ্ছে আমরা তাদের ভয়ে এরূপ করি। তাদের জবাবে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ কারণ ভয় কোন ওজর নয়। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّـــهِ وَلَئِنْ [العنكبوت/١٠]

অর্থ: "কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্‌র আযাবের মত মনে করে।" (সূরা আনকাবুত ২৯:১০)

প্রশ্ন: বিল ইক্বরাহ-র পরিস্থিতিতেও অন্য মুসলিমের ক্ষতি করা জায়েয কিনা?

উত্তর: বিল ইক্বরাহ বা জবরদস্তি পরিস্থিতি যদি সত্যিই হয় তবে অনুমতি আছে অন্তরে ঈমান ঠিক রেখে বাহ্যিক কুফরী কথা বলা বা কাজ করা যতক্ষন না তা অন্যকোন মুসলিমকে ক্ষতি করে। কিন্তু এতে যদি অন্য মুসলিমদের ক্ষতি হয়, তাহলে তা বৈধ নয়, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে- একজন ব্যক্তি নিজের জীবনকে বাঁচানোর জন্য অন্য মুসলিমকে হত্যা করতে পারে না।

আন্ নাববী (রহ:) বলেন, যদি তা হয় কোন মুসলিমকে হত্যা করা, তাহলে তা বৈধ নয় এমনকি ইক্বরাহ-র পরিস্থিতিতেও, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। (আল মিনহাজ শরহে সহীহ মুসলিম ১৮/১৬-১৭)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) তাতারদের দ্বারা জোর করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানোর ব্যাপারে বলেন, "এমনকি যদি তাকে জবরদস্তি করা হয় যুদ্ধ করার জন্য এই ফিতনার সময়ে, তার জন্য বৈধ নয় যুদ্ধ করা। বরং এটা তার জন্য ওয়াজিব তার অস্ত্রকে ধ্বংস করা এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত সবর করা.....নিশ্চয়ই তার জন্য বৈধ নয় অন্য মুসলিমকে হত্যা করা, ইজমা অনুযায়ী। সুতরাং যদি তাকে জবরদস্তি করা হয় এবং হুমকি দেয়া হয় তাকে হত্যা করা হবে যদি অন্য মুসলিমকে হত্যা না করে, তারপরেও তার জন্য বৈধ নয় অন্যকে হত্যা করা তার নিজের জীবনকে রক্ষা করার জন্য। এটা বৈধ নয় অন্যদের উপর যুলুম করা নিজে নিহত না হওয়ার জন্য। (মাজমুউল ফাতওয়া ২৮/৫৩৮-৫৩৯)

প্রশ্ন: মুওয়ালাত এবং তাওয়াল্লী কি?

উত্তর: শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন হুমাইদ রহ. বলেন, প্রত্যেক মুসলিম যে আল্লাহর প্রতি মুখলিস তার উপর ওয়াজিব যে সে জেনে নিবে উলামাগন তাওয়াল্লী এবং মুওয়ালাত এর পার্থক্যের ব্যাপারে কি বলেছেন। মুওয়ালাত হচ্ছে, যেমন কাফেরদের সাথে নরমভাবে কথা বলা, তাদের প্রতি হাসা, তাদের ময়লা পরিষ্কার করে দেয়া এবং অনুরূপ কাজসমূহ। যদিও সে তাদেরকে এবং তাদের দ্বীনকে পরিত্যাগ করে, তথাপিও এ ধরণের কাজ থেকে সতর্ক থাকতে হবে- কারণ এগুলো হচ্ছে কাবায়ের (কবিরা গুনাহ) এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ এবং ঐ ব্যক্তি খুবই বিপদজনক অবস্থায় আছে।

আর তাওয়াল্লী হচ্ছে: কাফেরদের গুন-কীর্তন করা, তোষামদ করা, তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদেরকে স্পষ্টভাবে পরিত্যাগ না করা। যে ব্যক্তি এই কাজগুলো করে তার রিদ্দাহ এবং মুরতাদ হয়ে যাওয়ার (দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া) হুকুম জারি করা ওয়াজিব। যা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা প্রমানিত। (আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ১৫/৪৭৯)

প্রশ্ন: মুওয়ালাত এবং তাওয়াল্লী এর মধ্যে পার্থক্য কি? এই দু'টি জিনিসকে কিভাবে আলাদা করা হবে?

উত্তর: সম্মানিত শায়খ আলী আল খুদাইর কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মুওয়ালাত এবং তাওয়াল্লী এর মধ্যে পার্থক্য কি? এই দু'টি জিনিসকে কিভাবে আলাদা করা হবে?

সম্মানিত শায়খ উত্তরে বলেন, কুফফারদের প্রতি তাওয়াল্লী হচ্ছে কুফরে আকবার বা বড় কুফর (যা ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়) এগুলোর মধ্যে কোন তাফসীল নেই। এগুলো হচ্ছে চার প্রকার-

১। কুফফারদেরকে তাদের দ্বীনের কারনে ভালবাসা বা মুহাব্বাতের মাধ্যমে তাওয়াল্লী।

যেমন: গনতন্ত্রের লোকদের গনতন্ত্রের জন্য ভালবাসা, আইন প্রণয়নকারী সংসদ সদস্যদের ভালবাসা, আধুনিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের

ভালবাসা তাদের উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাসের কারনে। সুতরাং সে ব্যক্তি কাফের, কুফরে তাওয়াল্লী এর কারনে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَـــنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

অর্থ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা, মায়িদাহ ৫:৫১) কারণ ওয়ালী এর এক অর্থ মুহিব (যে ভালবাসে, পছন্দ করে..। (ইবনে আছির রহ. আন্ নিহায়্যাহ ২/২২৮)

২। সাহায্য (নুসরাহ) এবং সহযোগিতার মাধ্যমে তাওয়াল্লী।

যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করে সে কাফির, মুরতাদ। যেমন যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের সাহায্য করছে। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَـــنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

অর্থ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা মায়িদাহ ৫:৫১)

৩। মৈত্রী স্থাপনের মাধ্যমে তাওয়াল্লী।

যে কুফফারদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে, চুক্তি করে বন্ধুত্বের সাহায্য করার জন্য। এমনকি বাস্তবে যদি সাহায্য নাও করে কিন্তু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْـــلِ الْكِتَـــابِ لَـــئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ

অর্থ: "আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলে: তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা

কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।" (সূরা হাশর ৫৯:১১)

এই প্রতিশ্রুতি মুনাফিক্বরা মদীনার কিছু ইয়াহুদীদেরকে করেছিল। এর অনুরূপ হচ্ছে বর্তমানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কোয়ালিশন গড়ে তুলেছে মিথ্যা টেরোরিষ্ট তুহমত দিয়ে।

৪। আপোস করার মাধ্যমে তাওয়াল্লী।

কুফফারদের মত যারা গনতন্ত্রকে তাদের শাসন ব্যবস্থা করে নিয়েছে অথবা তাদের মত সংসদ তৈরী করেছে, আইন প্রণয়নের জন্য আইন কমিটি, যা কুফফারদের কাজের অনুরূপ- তারা কুফফারদের সাথে তাওয়াল্লী করে নিয়েছে।

এই চার প্রকার ওয়ালায়াত বা তাওয়াল্লী হচ্ছে স্বয়ং কুফরী যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

মুওয়ালাত (যা তাওয়াল্লী থেকে ব্যাপক-বিস্তৃত) এর দুই প্রকার-

১। এই মুওয়ালাত যাকে তাওয়াল্লী বলা হয়, যা আমরা পূর্বে তাওয়াল্লী এর ব্যাপারে বর্ননা করেছি, একে মুওয়ালাত কুবরা (বড় মুওয়ালাত), **المـــوالاة العظمي** আল উজমা (প্রধান মুওয়ালাত), আল আম্মা (সাধারন মুওয়ালাত), আল মুতলাক্বাহ (পরম মুওয়ালাত) বলে ও ডাকা হয়, এই সব অর্থ তাওয়াল্লী এর অর্থের অনুরূপ।

২। ছোট বা সীমিত মুওয়ালাত।

এর মধ্যে রয়েছে ঐসব কিছু যাতে কুফফারদের মর্যাদা দেয়া হয়, সম্মান করা হয়, অথবা সমাবেশে অগ্রে স্থান দেয়া, মুসলিমের বদলে তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করা ইত্যাদিকে বুঝায়। এটি অবাধ্যতা এবং কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি অনুভুতি দেখিয়ে..।" (সূরা মুমতাহিনা ৬০:১)

আল্লাহ 'অনুভুতি দেখানো' কে মুওয়ালাত বলেছেন, তিনি একে কুফরী বলে আখ্যা দেন নি, কারণ তিনি এখানে তাদেরকে 'হে মু'মিনগন' বলে ডেকেছেন। (আল হাদ্দুল ফা-সিল লি বায়ানিল মুওয়ালাত ওয়া তাওয়াল্লীল কুফফার)

প্রশ্ন: কাফেরদের সাথে মু'আমালাত বা আচার-ব্যবহার কয় প্রকার?

উত্তর: শায়খ নাসির ইবনে ফাহাদ বলেন, কুফফারদের সাথে মু'আমালাত বা আচার-ব্যবহার তিন প্রকার:

১। প্রথম প্রকার: যে ধরনের আচার-ব্যবহারে কুফরী রয়েছে যা ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়।

কিছু উলামাগন একে 'তাওয়াল্লী' বলেছেন। সুতরাং প্রত্যেক প্রকারের মেলামেশা যার দালীল রয়েছে যে এটি কুফরী এবং দ্বীনত্যাগ সেগুলো এই প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। যেমন, কাফেরদের দ্বীনকে ভালবাসা, তাদেরকে ইসলামের উপর বিজয়ী দেখতে আশা করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয় প্রকার: মেলামেশা যা হারাম, কিন্তু কুফরী নয়।

এবং কিছু উলামাগন একে 'মুওয়ালাত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক প্রকারের মেলামেশা যার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে দালীল রয়েছে, কিন্তু এই হারাম কুফরী পর্যায়ের নয়, তা এই প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। যেমন, তাদেরকে সমাবেশে সামনে স্থান দেয়া, তাদেরকে প্রথমে সালাম দেয়া এবং তাদের সাথে এমন অনুভূতি দেখানো যা তাওয়াল্লী পর্যায়ে পৌছে না ইত্যাদি।

৩। তৃতীয় প্রকার: মেলামেশা যা জায়িজ।

এটি মুওয়ালাতের অন্তর্ভূক্ত নয়, এবং এর জায়েয হওয়ার ব্যাপারে দালীল রয়েছে, যেমন যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি তাদের সাথে ন্যায়পরায়ন হওয়া, কাফের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা ইত্যাদি। (আত তিবয়ান ফি কুফরি মান আ'নাল আমরিকান, পৃ ৪১-৪২)

প্রশ্ন: কাফেরদের সাথে ব্যবসা ও ভ্রমন করার ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন, সুতরাং একজন (মুসলিম) ব্যক্তির তাদের থেকে পশুখাদ্য এবং ঘোড়া কেনা বৈধ যেমন

অন্যদের থেকে কেনা বৈধ....এবং তাদের কাছে খাদ্য, বস্ত্র এবং এই ধরনের জিনিস বিক্রি করা বৈধ। কিন্তু এমন জিনিস বিক্রি করা যা তাদেরকে হারাম কাজে সহায়তা করবে, যেমন ঘোড়া এবং অস্ত্র যা তারা যুদ্ধ এবং অন্যান্য হারাম কাজে ব্যবহার করবে- তাহলে তা অবৈধ। (আস সিয়াসাহ আশ শারীয়াহ-১৫৫)

ইবনু হাজার আসকালানী (রহ:) সালফে-সালেহীনগনের মত বর্ননা করেন, "মুশরিকদের সাথে কেনা-বেচা বৈধ, তা ব্যতীত যা বিক্রি করলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।" (ফাতহুল বারী, ৪/৪১০)

তবে কাফেরদের সাথে বেচা-কেনার কয়েকটি শর্ত রয়েছে:

১. কেনা-বেচা হতে হবে হালাল জিনিসে।

২. এমন কোন জিনিস নয় যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে।

৩. ঐ কেনা-বেচায় কোন জিনিস থাকতে পারবে না যা মুসলিমের সম্মানহানী করে। (ফাতহুল বারী, ৪/৪৫২)

ইবনু হাজার আসকালানী (রহ:) সালফে-সালেহীনগনের মত বর্ননা করেন, "তখনই কুফফারদের কাছে ভ্রমন করা বৈধ যখন এই আশা করা হয় যে, সম্ভবত তারা ইসলামের ডাকে সাড়া দিবে। কিন্তু যদি এই আশা না থাকে, তাহলে তাদের কাছে ভ্রমন কর বৈধ নয়। (ফাতহুল বারী, ১০/১১৯)

অত:পর তিনি আরও বলেন, "তাহলে যা প্রকাশ্য দেখা যাচ্ছে তা হল কুফফারদের কাছে ভ্রমন করার বিষয়টি নিয়্যাত এবং এ থেকে কি উপকার হবে তার উপর নির্ভর করে।" সুতরাং এটি সর্বদা হারাম নয়, আবার সর্বদা বৈধও নয়, এটি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন: তাগুতের ইবাদতকারী কাফির-মুশরিকদের সাথে আমাদের আচরণনীতি কি?

উত্তর: যারা আল্লাহর পাশাপাশি তাগুতের ইবাদত করে তারা মুশরিক এবং কাফের, তাদের বেলায় আল বারাআহ (শত্রুতা, ঘৃনা, বিদ্বেষ) প্রযোজ্য। তাদের সাথে একজন ঈমানদারের আচরণ হবে নিম্নরূপ:

১। তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করা যাবে না। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا [النساء/١٤٤)

অর্থ: "হে ঈমানদারগন! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমান দিতে চাও?" (সুরা নিসা ৪:১৪৪)

২। **তাদের শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেয়া যাবে না।** আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء/١٤١)

অর্থ: "আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের কোন পথ রাখবেন না।" (সূরা নিসা ৪:১৪১)

{وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا}

অথ: "আর তুমি কাফের এবং মুনাফিকদের কথা মানবে না।" (সূরা আহযাব ৩৩:৪৮)

৩। **তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করা যাবে না, তাদের আনুগত্য করা যাবে না যদিও তারা পিতা কিংবা ভাই হয়।** আল্লাহ (সুব:) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [التوبة/٢٣)

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফুরকে ভালবাসে। আর তোমাদের মধ্যথেকে যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।" (সুরা তাওবা ৯:২৩)

৪। **তারা ত্বাগুত প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে কোন নুসরাহ** (দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার ও রক্ষা করার জন্য বস্তুগত সর্মথন) **চাওয়া যাবে না।** আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

.... فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ

".... আমি একজন মুশরিক এর কাছে কখনই সাহায্য চাইবো না" (সহীহ মুসলিম ৪৮০৩; সুনানে তিরমিজি ১৫৫৮; মুসনাদে আহমদ ২৫১৫৮)

তাদের থেকে নুসরাহ নেয়া যাবে না এ জন্য যে যাদের কাছে নুসরাহ চাওয়া হয় তাদের সাথে আউলিয়া (বন্ধুত্বের) সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, আর মু'মিনদের সাথে কাফেরদের কখনই বন্ধুত্ব হতে পারে না।

৫। **মুসলিমরা তাদের নারীদের বিয়ে করতে পারবে না।** আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة/٢٢١)

অর্থ: "তোমরা মুশরিক মেয়েদেরকে কখনো বিয়ে করবে না, যতক্ষন না তারা ঈমান না আনিবে। বস্তুত একজন মু'মিন কৃতদাসী নারী, একজন মুশরিক শরীফজাদি নারী অপেক্ষাও উত্তম, যদিও সে তোমাদের মোহিত করে।" (আল বাক্বারা ২:২২১)

৬। **মুসলিম নারীদেরকেও তাদের সাথে বিয়ে দেওয়া যাবে না।** আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

অর্থ: "আর তোমাদের নিজেদের কন্যাদিগকেও মুশরিক পুরুষদের সহিত বিবাহ দিবে না, যতক্ষন না পর্যন্ত তারা ঈমান আনিবে। কেননা একজন ঈমানদার কৃতদাস একজন উচ্চবংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও প্রথমত লোকটিকে তারা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। কেননা তাহারা তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া নেয়। আর আল্লাহ তাহার নিজের অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান জানান।" (সুরা বাক্বারা ২:২২১)

৭। **মুসলিমরা তাদের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা, তারা মুসলিমদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।** হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

অর্থ: "উসামা ইবনে যায়েদ (রা:) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, একজন মুসলিম একজন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না এবং একজন কাফির একজন মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।" (সহীহ বুখারী ৬৭৬৪; সহীহ মুসলিম ৪২২৫; সুনানে তিরমিজি ২১০৭)

৮। **মুসলিমরা মুশরিকদের জবাই করা গোশত খেতে পারে না**। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام : ١٢١)

অর্থ: "আর তোমরা তা থেকে আহার করো না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি।" (সুরা আনআম ৬:১২১)

৯। **তারা মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া যাবে না**। আল্লাহ (সুব:) মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّـــهِ وَرَسُـــولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة/٨٤)

অর্থ: "আর তাদের কোন লোক মারা গেলে তাদের জানাযা তুমি কখনও পড়বে না, তার কবরের পাশে কখনও দাঁড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অবিশ্বাস করেছে। আর তারা মরেছে এমন অবস্থায় যে তারা ফাসেক ছিল।" (সূরা তাওবা ৯:৮৪)

১০। **মুশরিকরা যখন মারা যায় তখন মুসলিমরা তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে পারবেনা**। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْـــدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة/١١٣)

অর্থ: "নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে শোভা পায়না যে তারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, তারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাদের সামনে একথা স্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামে যাবার উপযুক্ত।" (সূরা তাওবা ৯:১১৩)

১১। **তারা মক্কায় হারাম শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না**। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة : ٢٨)

অর্থ: "হে ঈমানদার ব্যক্তিগন মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এই বৎসরের পর যেন তারা মসজিদে হারামের পাশেও না আসতে পারে।" (সূরা তাওবা ৯:২৮)

১২। **ভ্রাতৃত্বের অধিকার ও কর্তব্য তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।** আল্লাহ (সুব:) বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات/١٠)

অর্থ: "নিশ্চই শুধুমাত্র মুমিনরা পরস্পরের ভাই।" (সূরা হুজরাত ৪৯:১০)

১৩। **তাদের হত্যার জন্য কিসাস নিতে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না**। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَـــأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

অর্থ: "সকল ঈমানদারদের রক্ত সমান, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নীচতম ব্যক্তি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে এবং তারা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এক হাত। একজন মুমিনকে একজন কাফিরের জন্য হত্যা উচিত নয়, অথবা কেউ চুক্তিবদ্ধ থাকলে তার চুক্তি জারি থাকা পর্যন্ত তাকে হত্যা করা যাবে না।" (মুসনাদে আহমদ ৯৯১, সুনানে আবু দাউদ ২৭৫৩, সুনানে নাসায়ী ৪৭৪৮)

১৪। **তাদের ঐসব মজলিশে যোগদান করা যাবে না যেখানে দ্বীন ইসলামের কোন বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করে**। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَـــا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُـــمْ إِذًا مِـــثْلُهُمْ إِنَّ اللَّـــهَ جَـــامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء/١٤٠)

অর্থ: আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্‌র (সুব:) আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ জাহান্নামের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। (সূরা নিসা ৪:১৪০)

প্রশ্ন: কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন প্রমাণ করে এমন নিদর্শনগুলো কি কি, যা থেকে অবশ্যই দূরে থাকা কর্তব্য?

উত্তর: কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন প্রমাণ করে এমন সবকিছু থেকে ঈমানদারদের অবশ্যই দূরে থাকা কর্তব্য। এমন ২০টি নিদর্শন হচ্ছে:

১. কাফিরদের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার প্রথম ধরণটি হল কাফিরদের উপর সন্তুষ্ট থাকা বা তাদের কুফরি কর্মে রাজি-খুশি থাকা–এমনকি তাদের স্বীকৃত কুফরি কর্মকে প্রত্যাখানের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া বা সন্দেহ পোষণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ [المائدة/৮১)

অর্থ: "যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও রাসূলের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তূ তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।" (সূরা মায়িদাহ ৫:৮১)

২. কাফিরদের উপর নির্ভরতা।

কোন ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার জন্য কিংবা নিরাপত্তার খাতিরে কাফিরদের উপর নির্ভর করাও কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার পরিচয় বহন করে। এটি কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার দ্বিতীয় নির্দশন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ (সুব:) বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/৫১)"

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না"। (সূরা মায়িদাহ ৫:৫১)

৩. কুফরির কোন বিষয়ে একমত পোষণ।

কুফুরি কোন বিষয়ের সঙ্গে একমত পোষণ করার অর্থ হল আল্লাহর বক্তব্যের বিরূদ্ধে তাদের বক্তব্য মেনে নেয়া। তাদের বিশ্বাসহীনতা সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুব) বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا [النساء/৫১)

অর্থ: "আপনি কি তাদের দেখেননি যাদের কিতাবের একাংশ দেয়া হয়েছিল; তারা জিব্‌ত ও তাগুতে বিশ্বাস করে ? এরা কাফিরদের সম্পর্কে বলে, এদের পথ মুমিনদের পথ অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর"। (সূরা নিসা ৪:৫১)

মুসলিম উম্মাহর মধ্য থেকে যে বা যারাই কাফিরদের সঙ্গে যোগ দিবে এবং তাদের অপকর্মের সঙ্গী হবে সেই মুনাফিকির কারণে নিজের জন্য ডেকে আনবে দু:সহ যন্ত্রণা ও আযাব। দু:খজনক হলেও সত্য যে, আজ এই উম্মাহর সন্তানদের অবস্থা ঐ তোতাপাখিগুলির মতো যারা কিছু না বুঝেই বুলি আওড়ায়, 'আমি কমিউনিজম কে একটি দর্শন হিসেবে বিশ্বাস করি', কিংবা ' আমি সোশালিজমে বিশ্বাসী' কিংবা বলে , 'গণতন্ত্র একটি সুন্দর রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সংবিধান সেক্যুলার হওয়া উচিত।' কাফিররা কুফুরের এই মূলনীতিগুলো মুসলমানদের আবাসভূমিতে বাস্তবায়নের এজেন্ডা নিয়েছে এবং, এই লক্ষ্যে জনগণকে এরা এ সমস্ত শয়তানি বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [البقرة/১২০)

অর্থ: "ইহুদী এবং খৃষ্টানরা কখনোই আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।" (সূরা বাকারা ২:১২০)

৪. কাফিরদের সান্নিধ্যের অন্বেষণ।

কাফিরদের মমতা-ভালবাসা পাওয়ার চেষ্টা করার অর্থ হল তাদের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করা। আল্লাহ্ (সুব:) এ রকম কাজে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ [المجادلة/২২)

অর্থ: "আপনি এমন কোন সম্প্রদায়কে খুঁজে পাবেন না, যে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের ভয় করে অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, হোক সে তার পিতা, পুত্র, ভ্রাতা কিংবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র ।" (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:২২)

ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন, 'আল্লাহ্ আমাদের সুস্পষ্ট জানিয়েছেন, কোন ঈমানদারই আল্লাহ্ ও রাসূলকে চ্যালেঞ্জকারীদের আনুকূল্য প্রত্যাশী হয় না। দুটি বিপরীত ধর্মী জিনিষ যেমন একে অপরকে তাড়িত করে, মুমিনের ঈমানও তদ্রুপ মুমিনকে এরূপ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং, ঈমান থাকা অবস্থায় আল্লাহর শত্রুদের প্রতি অনুকুল মনোভাব পোষন অসম্ভব। যদি কেউ অনুভব করেন যে তার ভিতর এই মনোভাবের ঘাটতি রয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার ঈমানে গলদ রয়েছে।' আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} [الممتحنة : ١]

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি মমতা পোষণ করছো, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে"। (সূরা মুমতাহিনা ৬০:১)

৫. কাফিরদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ।

কাফিরদের সঙ্গে কেউ একাত্মতা প্রকাশ করলে সন্দেহাতীতভাবে সে কাফিরদের মিত্রে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

{وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ } [هود : ١١٣]

অর্থ: "যারা ভ্রষ্টতা করে তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করোনা, অন্যথায় অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনই রক্ষক নেই, এবং তোমরা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না।" (সুরা হুদ ১১:১১৩)

আল কুরতুবি বলেন, 'কোন কিছুর প্রতি একাত্মতা প্রকাশের অর্থ হল তার ওপর নির্ভর করা এবং সমর্থনের জন্য তার দারস্থ হওয়া এবং এভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরী করা যা তোমাকে তুষ্টি দেয়।' কাতাদাহ্ বলেন, 'এই আয়াতের অর্থ হল, কোন মুসলিমের পক্ষেই কাফিরদের পছন্দ করা কিংবা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা সঙ্গত নয়।' একজন কাফিরের বন্ধু কাফির, এবং একজন মুরতাদ বা অবাধ্যের বন্ধু আরেকজন অবাধ্য। আল্লাহ্ (সুব:) নবীকে (সা:) উদ্দেশ্য করে বলেন :

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا [الإسراء/٧٤، ٧٥]

অর্থ: "আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখলে আপনি তাদের দিকে ঝুঁকেই পড়তেন প্রায়; আর তা হলে অবশ্যই আমি আপনাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ এবং পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমার বিরূদ্ধে আপনি কোন সাহায্যকারী পেতেন না"। (সূরা ইসরা ১৭:৭৪-৭৫)

আমাদের এটি মনে রাখতে হবে যে, এভাবে সৃষ্টির সেরা নবীকে (সা:) যে রকম ধমকের সুরে আল্লাহ্ (সুব) এ ব্যাপারে সম্বোধন করেছেন, সেক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কিরকম হতে পারে। (মুজমুআত তাওহীদ)

৬. কাফিরদের কুফরি বিশ্বাসের প্রশংসা-প্রশস্তি।

কাফিরদের কুফরি বিশ্বাসের প্রশংসা-প্রশস্তি করার মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ (সুব) বলেনঃ

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ([القلم/٩)

অর্থ: "তারা ইচ্ছা পোষণ করে যে, আপনি তাদের সঙ্গে এক ধরণের সমঝোতায় (ধর্মীয় বিষয়ে সৌজন্যতা সহকারে) আসেন, সুতরাং তারাও আপনার সঙ্গে সমঝোতা করবে"। (সূরা ক্বলাম ৬৮:৯)

৭. কাফিরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা।

কাফিরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা তাদের সাথে মৈত্রী বন্ধনের নিদর্শক। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ [آل عمران/١١٨)

অর্থ: "হে মুমিনগণ ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না ; যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে । তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর ।" (সূরা আল ইমরান ৩:১১৮)

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল মুসলিমদের সেই দল সম্পর্কে যারা মুনাফিক এবং ইয়াহুদিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রাখত, কেননা সে সময়ে তারা (মুনাফিক ও ইয়াহুদি) তাদের (মুসলিমদের) প্রতিবেশী ও বন্ধু ছিল । আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে মুসলিমদের কাফির-মোনাফিকদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الرَّجُلُ عَلَى دِيـنِ خَلِيلِـهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ».

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: একজন ব্যক্তির দ্বীন তার সহচর বন্ধুদের মতই হয়ে থাকে, সুতরাং তোমাদের যে কেউ যেন সতর্ক হয় কাকে সে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে ।" (সুনানে আবু দাউদ ৪৮৩৫)

৮. কাফিরদের অনুগত হওয়া:

কাফিরদের ইচ্ছা-আকাঙ্খার আনুগত্য তাদের সঙ্গে মৈত্রীর আরেকটি নিদর্শন । আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا [الكهف/٢٨)

অর্থ: "তুমি তার আনুগত্য করো না – যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি । যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং যার কার্যক্রম হারিয়ে গেছে ।" (সূরা কাহাফ ১৮:২৮) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ [آل عمران/١٤٩)

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে ।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৪৯) আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন:

{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } [الأنعام : ١٢١)

অর্থ: "নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয় । যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে ।" (সূরা আন'আম ৬:১২১)

ইবনে কাছির (র:) এই সর্বশেষ আয়াত সম্পর্কে বলেন:

حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره فهذا هـو الشرك، كما قال تعالى: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ا خ.

অর্থ: "যেহেতু তোমরা আল্লাহর বিধান ও শরিয়াকে বাদ দিয়ে অন্যের কথার দিকে প্রত্যাবর্তণ করেছো সেহেতু তোমরা আল্লাহর উপরে অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছ আর এটাই হচ্ছে শিরক । যেমনটা আল্লাহ (সুব:) বলছেন: "তারা (ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা) তাদের আলেম ও সন্নাসীদের আল্লাহর পরিবর্তে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে ।" (তাফসীরে ইবনে কাছীর সুরা আনআমের ১২১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

৯. কুরআন তাচ্ছিল্যকারীদের সঙ্গে একত্রে বসা:

কাফের-মুশরিকরা যখন কুরআনকে নিয়ে অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তখন তাদের সঙ্গে বসা মানে তাদেরকে সমর্থন করা । আল্লাহ (সুব:) আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন । আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَـا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُـمْ إِذًا مِـثْلُهُمْ إِنَّ اللَّـهَ جَـامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء/١٤٠)

অর্থ: "কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে তোমরা তাদের সাথে বস না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে । মুনাফিক এবং কাফিরদের তো আল্লাহ জাহান্নামে একত্র করবেন ।" (সূরা নিসা ৪:১৪০)

ইবনে জারীর আত তাবারী ব্যাখ্যা করেন যে, এর অর্থ হল এই যে, যদি আপনি তাদের এ কাজ করতে দেখেন এবং এ সম্পর্কে কিছুই না বলেন, তখন এটি সুস্পষ্ট হয় যে, আপনার আনুগত্য তাদের জন্য যা আপনাকে তাদের মত করে দেয় । তিনি আরো বলেন, এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রতি পরিষ্কার ভাবে কাফিরদের ধর্মদ্রোহী যাবতীয় কর্মকান্ডে বসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । (তাফসীরে তাবারী অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

১০. মুসলিমদের উপর কাফিরদের কর্তৃত্ব প্রদান ।

মুসলিমদের উপর কাফিরদের কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে মুসলিমদের কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হতে বাধ্য করা হয় । কেননা কর্তৃত্বশীল কাফিরদের প্রতি আনুগত্যের কারনে তাদের কুফরী কর্মকান্ডের বিরোধিতা করা মুসলিমদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে । আর তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার অর্থ হল তাদের পদ মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যা ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে কোন ক্রমেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় । আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء/١٤١]

অর্থ: "এবং কখনই মু'মিনদের বিরূদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না ।" (সূরা নিসা ৪:১৪১)

১১. কাফিরদের উপর বিশ্বাস স্থাপন: কাফিরদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হল তাদেরকে নিজেদের মিত্র বা বন্ধু মনে করা ।

১২. কাফিরদের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করা: কাফিরদের কার্যক্রমের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা, তাদের পোষাকের অনুসরণ কিংবা তাদের লেবাস ও ফ্যাশনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদের লেবাসের ষ্টাইল পরিবর্তন করা–এই জিনিসগুলি তাদের সঙ্গে মিত্রতার বিষয়টিকে পরিষ্কার করে । (মাজমুআত তাওহীদ)

১৩. কাফিরদের কাছে টানা: কাফিরদের সাহচর্যে আনন্দ অনুভব করা, তাদের কাছে নিজেদের অন্তর্নিহিত অনুভূতি ব্যক্ত করা, তাদেরকে কাছে টানা এবং তাদের সম্মান করা তাদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনেরই পরিচয় বহন করে । (মুজমুআত তাওহীদ)

১৪. কাফিরদের ভ্রষ্টতার কাজে কোন কিছু দিয়ে সহযোগিতা করা ।

তাদের ভ্রষ্টতায় সাহায্য করা কিংবা সাহায্য যুগিয়ে তাদের উৎসাহিত করার অর্থ হল নিজেকে তাদের মিত্রে পরিণত করা । কুরআন দুটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছে, একটি হল লূত (আ:) এর স্ত্রী সংক্রান্ত এবং অপরটি নূহ্ (আ:) এর স্ত্রী সম্পর্কিত । লূত (আ:) এর স্ত্রী তার শহরের লোকদের লূত (আ:) এর বিরূদ্ধে সমর্থন যুগিয়েছিল এবং লূত (আ:) এর লোকদের দুর্দশায় উৎফুল্ল হয়েছিল; এমনকি লূত (আ:) এর অতিথিদের সম্পর্কে গোপনীয় তথ্য সরবরাহ করেছিল । অনুরূপ ঘটনা নূহ্

(আ:) এর স্ত্রীর ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়েছিল । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ} [التحريم : ١٠]

অর্থ: "যারা কুফরি করে তাদের জন্য আল্লাহ নূহের স্ত্রীর ও লূতের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন; তারা আমার বান্দাদের মধ্য হতে দু'জন সৎবান্দার অধীনে ছিল, কিন্তু তারা উভয়ে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, অত:পর আল্লাহর আযাব হতে রক্ষায় নূহ ও লূত তাদের কোন কাজে আসেনি । বলা হল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর ।" (সুরা তাহরীম ৬৬:১০)

১৫. কাফিরদের উপদেশ-পরামর্শ চাওয়া ।

এর স্বরূপ হচ্ছে, কাফিরদের উপদেশ পরামর্শ শ্রবণ করা, তাদের উচ্চ আসনে আসীন করা কিংবা তাদের বন্দনা করা । (মুজমু'আত তাওহীদ) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ ... فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَمَّ بِهِ وَقَالَ : لاَ تُكْرِمُوهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ اللَّهُ وَلاَ تُدْنُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللَّهُ وَلاَ تَأْتَمِنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ: "আবু মূসা আশআরী (রা:) ওমর বিন খাত্তাবের কাছে প্রতিনিধি হয়ে আসলেন । তার সঙ্গে ছিল একজন খৃষ্টান ম্যানেজার । ওমর (রা:) তাকে ধমকালেন এবং কিছু একটা করে ফেলতে উদ্যত হলেন । আর বললেন, তোমরা এদেরকে সম্মান করো না যখন আল্লাহ (সুব:) ওদের অপমান করেছেন । তোমরা ওদের কাছে এনো না যখন আল্লাহ (সুব:) ওদের দূর করে দিয়েছেন । তোমরা ওদের প্রতি আস্থা রেখো না যখন আল্লাহ (সুব:) ওদেরকে খিয়ানতকারী বলে আখ্যায়িত করেছে ।" (সুনানে বায়হাকী ২০৯১০)

১৬. কাফিরদের সম্মান করা ।

কাফিরদের বেশি বেশি সম্মানিত করা এবং নির্বোধের মত বিশাল বিশাল টাইটেলে ভূষিত করা তাদের প্রতি মিত্রতা প্রর্দশনেরই নামান্তর । আমরা

লক্ষ্য করছি, কিছু লোক তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের ভঙ্গি হিসাবে তাদের সঙ্গে দেখা করার সময় তাদের সিনায় হাত রাখে; কেউবা আনুগত্যের নমুনা স্বরপ তাদের মাথার হ্যাট নামিয়ে রাখে (হামুদ আত তুয়াইজারী) আল্লাহ (সুব:) বলেন:

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِــزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا [النساء/١٣٩)

অর্থ: "যারা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের আউলিয়া (রক্ষাকারী, সাহায্যকারী, বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করবে, তারা কি তাদের কাছে ইজ্জাত (সম্মান) অন্বেষণ করে? নি:সন্দেহে সকল ইজ্জত আল্লাহরই ।" (সুরা নিসা ৪:১৩৯)

প্রকৃতপক্ষে এই কাফিররা মুসলিমদের থেকে যা প্রাপ্য তা হল ভয়াবহ সমালোচনা এবং তাচ্ছিল্য । এটা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা:) আমাদেরকে তাদের সংবর্ধিত করার উদ্যোগ নিতেও নিষেধ করেছেন । তিনি বলেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِى طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِه

অর্থ: "তোমরা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের প্রথমে সালাম দিয়ো না এবং যখন তোমরা তাদের সঙ্গে রাস্তায় সাক্ষাৎ কর, তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য কর । (সহীহ মুসলিম ৫৭৮৯; সুনানে তিরমিজি ২৭০০)

১৭. কাফিরদের সঙ্গে বসবাস করা ।

কাফিরদের আবাসস্থলকে বসবাসের জন্য সাব্যস্ত করা, ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধদের বাড়িতে ভাড়া থাকা, তাদেরকে বাড়ি ভাড়া দেয়া এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটানোও তাদের মিত্রে পরিণত হওয়ার শামিল । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ ».

অর্থ: "সামুরা ইবনে জুনদুব (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে-ই কাফিরদের সাথে যোগ দেয় এবং তাদের মাঝে বসবাস

করে সে তাদেরই একজন ।" (সুনানে আবু দাউদ ২৭৮৯) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« لاَ تُــسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلاَ تُجَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا ».

অর্থ: "সামুরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে বর্ণিত, কাফিরদের সঙ্গে বসবাস করনা কিংবা তাদের সঙ্গে যোগ দিও না । যে-ই তাদের সঙ্গে বসবাস করে কিংবা তাদের মাঝে বাস করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় ।" (সুনানে বায়হাকী ১৮৮৮৬; সুনানে তিরমিজি ১৬০৫)

১৮. কাফিরদের সঙ্গে জোগসাজস করা ।

কাফিরদের সঙ্গে জোগসাজস করা, তাদেরকে বিভিন্ন স্কীমে সাহায্য করা, তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, তাদের পক্ষ হয়ে গোয়েন্দাগিরি করা, মুসলিমদের সম্পর্কে তাদের তথ্য দেয়া, কিংবা মুসলিমদেরকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে তুলে দেয়া অথবা তাদের কোন পদে অধিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করা এগুলো সবই তাদের মিত্রদের কাজ । বর্তমান মুসলিম বিশ্ব সব চেয়ে নিকৃষ্ট যে সকল রোগে আক্রান্ত এটি সেগুলোর অন্যতম । এটি পুরো প্রজন্মকে নষ্ট করেছে এবং শিক্ষা, সাংস্কৃতি ও রাজনীতিসহ মুসলিম সমাজের সকল স্তরকে কলুষিত করেছে । মিশরে ইংরেজ দখলদারির শেষে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (র:) বলেছিলেন, "সাদা ইংরেজরা চলে গেছে কিন্তু বাদামী ইংরেজরা এখনো আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান ।"

১৯. মুসলিমদের ঘৃণা এবং কাফিরদের ভালবাসা ।

যারা ইসলামের পবিত্রভূমি (মুসলিম দেশ) থেকে কাফিরদের ভুমিতে গিয়ে বসবাস করে এবং তাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে, তারা মূলত: তাদেরই বন্ধু যাদের কাছে তারা গিয়েছে । (আর রিদ্দাহ বাইনাল আমস ওয়াল ইয়াওম)

২০. কাফিরদের মতাদর্শকে সমর্থন করা ।

যারা সেক্যুলার রাজনীতি, কমিউনিজম, সোশালিজম, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মতাদর্শের পিছে দৌঁড়ায় এবং এই মতাদর্শগুলোর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে, তারাও মূলত: তাদেরই বন্ধু যাদের শরণাপন্ন তারা হয়েছে । (আর রিদ্দাহ বাইনাল আমস ওয়াল ইয়াওম)

কাফেরদের অনুকরণ

প্রশ্ন: একজন লোক কতক্ষন পর্যন্ত নিজেকে মুসলিম দাবী করতে পারে না?

উত্তর: কোন ব্যক্তি ততক্ষন পর্যন্ত মুসলিম দাবী করতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত তাদের বিরূদ্ধে শত্রুতা ঘোষনা করে না যারা ইসলামকে ঘৃণা করে, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আল্লাহ্ (সুব:) এবং নবী (সা:) কে ঘৃণা করে আর ঘৃণা করে মুসলিমদের। এটি আমার কথা নয়। এটি কোন ইমাম, শায়খ কিংবা জ্ঞানীর কথা নয়। এটি পৃথিবীর কোন ব্যক্তির কথাও নয়। এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কথা:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ [المجادلة/٢٢]

অর্থ: "যারা আল্লাহ্র ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে আপনি এমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না; যারা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে । যদিও তারা তাদের পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি হোক না কেন। (সুরা মুজাদিলা ৫৮:২২)

আল্লাহ্ (সুব:) আমাদের বলছেন যে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা:) কে ভালবাসে তাদের মাঝে আমরা এমন কাউকে পাবনা যারা দয়া, সহানুভূতি, ভালবাসা, ক্ষমা প্রদর্শন করে এমন কাউকে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে যদিও সে তার বাবা, সন্তান, ভাই অথবা ঘনিষ্ট আত্মীয় হয়।

প্রশ্ন: কাফেরদের অনুকরন এর ব্যাপারে আমাদের প্রতি কিরূপ সতর্কতা রয়েছে?

উত্তর: আল্লাহ্ (সুব:) আমাদের কাফেরদের কর্মপন্থার অনুসরণ, অনুকরণ ও সাদৃশ্য করতে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। মুহাম্মদ (সা:) এটিকে কেয়ামতের একটি ছোট আলামত বলে চিহ্নিত করেছেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, (ততদিন কেয়ামত আসবে না যতদিন) আমার উম্মত পূর্ববর্তী জাতির কাজগুলো করবে এবং তাদের অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত করে, গজ গজ করে (ইঞ্চি ইঞ্চি করে)। এমনকি যদি তারা গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তা করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:)! আপনি কি ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কথা বলছেন? নবী (সা:) বললেন, তারা ছাড়া আর কেইবা হতে পারে?" (সহীহ বুখারী ৩৪৫৬; সহীহ মুসলিম ৬৯৫২; মুসনাদে আহমদ ১১৮৪৩;)

এ কারণেই আমরা প্রত্যেক সালাতের প্রত্যেক রাকাতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া করি: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ "অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে নয়" এখানে অভিশপ্ত বলতে ইয়াহুদীদেরকে আর পথভ্রষ্ট বলতে খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ আদি বিন হাতিম (রা:) বলেন, আমি নবী (সা:) কে আল্লাহ্র এই আয়াত " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ " সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, فإن اليهود مغضوب عليهم "এরা হল ইয়াহুদী কেননা নিশ্চয় তারা অভিশপ্ত" আর " وَلَا الضَّالِّينَ " সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, وإن النصارى ضلال "এরা হল খ্রীষ্টান কেননা নিশ্চয় তারা হল পথভ্রষ্ট।" (সুনানে তিরমিজি ২৯৫৩)

আমরা প্রত্যেক সালাতে একথা বলছি অথচ এই আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিকরূপে কাফেরদের অনুকরণ, অনুসরণ ও ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের জীবন প্রনালী অনুযায়ী জীবন যাপন করছি। কাফেরদের অনুকরণ করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের থেকে দূরে থাকার আল্লাহ্র এই আদেশের কারণ খুবই পরিস্কার। কারণ যদি আমরা তাদেরকে বাহ্যিক ভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করি তাহলে সময়ের সাথে সাথে আমরা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা শুরু করব। পরিণামে আমরা তাদের কুফর ও শিরকের অনুসরণ করব। আল্লাহ্ (সুব:) এ সম্পর্কে আমাদের

পরিষ্কারভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। আমাদের সে সকল সতর্ক বাণীর দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/٥١]

অর্থ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সুরা মায়িদা ৫:৫১) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

অর্থ: "মু'মিনগন যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না ...।" (সুরা আল ইমরান ৩:২৮)

এবং আমাদের সামনে রয়েছে নবীদের পিতা আল্লাহ্র খলিল ইব্রাহিম (আ:) এর সর্বোত্তম উদাহরণ:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ [الممتحنة/٤]

অর্থ: "তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে... ।" (সুরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

সূতরাং আমরা এই আয়াত থেকে শিখলাম যে, যাকে আল্লাহ্ উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা হল, আমরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব, তাদের অনুকরণ, অনুসরণ ও তাদেরকে ভালবাসতে পারব না । আসুন আমরা ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করি! আসুন আমরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ

উভয় ভাবেই মুসলিম হই! আমাদের খাওয়া, হাটা, ঘুম, কথা-বার্তা, পোষাক, মৃত্যু সবই হোক মুসলিমদের মত। আল্লাহ্র রহমতে আমরা মুসলিম। আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা কাফের নই। সুতরাং আসুন আমরা তাদেরকে অনুকরণ করা থেকে বিরত হই!

প্রশ্ন: কাফেরদের অনুকরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আজকাল মুসলিমদের বাস্তব অবস্থা কি?

উত্তর: আল্লাহ্র শপথ! তথাকথিত সভ্য সমাজে বসবাসরত মুসলিমদের বিশ্বাস এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, তারা এমন আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পরেছে যা একজন বিশ্বাসী মুসলিমের আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তার প্রতি বিদ্বেষমূলক। এটি মুসলিমদের জন্য ভয়াবহ একটি দূর্যোগ। কাফেরদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন, তাদের আচরণে ও রীতি-নীতির অনুকরণ ইসলামের শিক্ষার লঙ্ঘন ।

আমরা আজকে প্রত্যক্ষ করছি যে, সারা পৃথিবীতে এর বিপরীতে কাজ হচ্ছে। মুসলিমরা আজ কাফেরদের সাথে বসবাস করতে এত আারাম ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে যে তারা সে সকল বৈশিষ্ট সম্পর্কে আর মোটেই সচেতন নেই যা মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য তৈরী করে। অনেক মুসলিমই আজ শত্রুদের ফাঁদে পা দিয়েছে। তাদের মাঝে কেউ কেউ আবার তাদের কুফরীকেও গ্রহণ করেছে। কত নামধারী মুসলিম আছে যারা মানবরচিত আইন মেনে নিচ্ছে ও এর মাধ্যমে বিচার ফয়সালা চাচ্ছে, অথচ আল্লাহ্র আইন বাস্তবায়নের কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করছে না? কত তথাকথিত মুসলিম দেশ কাফেরদের সাহায্য করছে সচেতন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যারা নিজেদের বাঁচাতে সংগ্রাম করছে? কত নামধারী মুসলিম কাফেরদের সেনাবাহিনীতে গোলামী করছে?

কত মুসলিম কাফেরদের পোশাক, তাদের আচার-আচরণ নকল করছে? অনেক পুরুষই সোনার মালা, কানে দুল আর ব্রেসলেট ব্যবহার করছে অথচ গর্বের সাথে বলছে যে তারা মুসলিম? (মুসলিম পুরূষদের জন্য সোনার কিছু পরিধান করা হারাম)। কতক নামধারী মুসলিম রয়েছে যারা নবী (সা:) এর আদেশের বিরুদ্ধে যাচ্ছে আর দাঁড়ি কামিয়ে ফেলেছে। আবার এই মানুষগুলোই পশ্চিমা খেলোয়াড় ও তারকাদের নতুন নতুন ফ্যাশন আর

চুলের স্টাইল নকল করছে। তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের “সুন্নাহ” ছেড়ে দিয়ে নিকৃষ্ট জাতির অনুসরণ করছে। তারা মুখে বলে আমরা রাসূল (সা:) কে ভালবাসি, অথচ তাদের কাজ প্রমাণ , করে যে তারা কাফেরদের আরো অনেক বেশি ভালবাসে।

কত মহিলা হিজাব ত্যাগ করে নিজেদের প্রদর্শন করছে? তারা আঁটোশাঁটো ও খোলামেলা পোশাক পড়তে পছন্দ করে। কত মুসলিম নারী রয়েছে যারা বাহিরে যাবার সময় মেকাপ করছে ও সুগন্ধি ব্যবহার করছে? মূলত: এরা কাফেরদের অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই করছে না । তারা নৈতিকতা বিবর্জিত অবিশ্বাসী নারীদের সর্বাত্মকভাবে অনুকরণ করছে ।

কত মুসলিম আছে যারা কথাবার্তায় কাফেরদের অনুকরণ করছে? আপনারা দেখবেন যে তারা পরস্পরের সাথে দেখা হলে জান্নাতের ভাষা “আস্সালামু আলাইকুম” এর পরিবর্তে Yo! man, wazzup (what`s up)? Good morning ইত্যাদি সম্বোধণ করছে। যখন তারা কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয় তখন কিছু নামধারী মুসলিম অদ্ভুত সব শপথ করে যদিও আল্লাহ্ আমাদের অন্য কিছু বলার শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, سُبْحَانَ الله “সুবহানাল্লাহ” বা اِنَّا للّٰه وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” অথবা قَدَّرَاللهُ وَمَاشَاءَ فَعَلَ “ক্বদ্দারাল্লাহু ওয়া মা শাআ‘ ফাআ’ল”। যখন কোন আনন্দজনক ঘটনা ঘটে ও সফলতা প্রাপ্তি ঘটে তখন অনেক তথাকথিত মুসলিম আল্লাহ্র প্রশংসা সূচক اَللّٰهُ اَكْبَــرُ “আল্লাহু আকবর” অথবা اَلْحَمْدُ للّٰــه “আলহামদুলিল্লাহ” না বলে, বলে Yes! অথবা “আমিই এটি করেছি”। কত মুসলিম হাঁচির পরে “আলহামদুলিল্লাহ” বলতে ভুলে যায়। যদিও বা তাদের মনে পড়ে তবুও তারা তা বলতে লজ্জা পায় কিন্তু কাফেরদের অনুকরণে “এক্সকিউজ মি” বলতে দ্বিধা করে না।

কত মুসলিম আছে যারা কাফেরদের অনুসরণ করে তাদের আনন্দ-উৎসবে অংশ গ্রহণ করে আর তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালন করে। এসবের মধ্যে রয়েছে বড় দিন, ভ্যালেন্টাইন ডে, ম্যারেজ ডে, নববর্ষ , হ্যাপী নিউ ইয়ার, জন্মদিন, বাবা দিবস, মা দিবস, বন্ধু দিবস ইত্যাদি।

কত মুসলিম আছে যারা কাফেরদের অনুকরণে কবরের চারপাশে সাজ-সজ্জা করছে এবং কবর পাকা করছে? অথচ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

অর্থ: “জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: আল্লাহ্র রাসুল (সা:) কবর পাকা করতে, বসার স্থান হিসেবে ব্যবহার করতে এবং কবরের উপর দালান বানাতে নিষেধ করেছেন।” (সহীহ মুসলিম ২২৮৯)

কত নামধারী মুসলিম রয়েছে যারা আল্লাহ্র আইন বাদ দিয়ে মানুষের তৈরী আইন দ্বারা মুসলিম দেশগুলোকে শাসন করছে? অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থ: “তবে কি তাহারা জাহেলী যুগের বিধান কামনা করে ? দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য আল্লাহ্র চাইতে বিধান প্রদানে আর কে উত্তম।” (সুরা মায়েদা ৫:৫০)

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ এবং আমরা আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা পেয়েছি ইসলাম থেকে যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য পরিপুর্ণ করে দিয়েছেন। আমরা এর শিক্ষাতে কিছুই যোগ দিতে পারব না বা এর থেকে কিছুই বাদ দিতে পারব না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ ... قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

অর্থ: “ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট দ্বীনের উপর রেখে গেলাম। যার রাত-দিন সমান (কোন অস্পষ্টা নেই) এর থেকে বিমুখ হবে একমাত্র তারাই যারা ধ্বংসশীল। আমার (মৃত্যুর) পর যারা জীবিত থাকবে তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের কাজ হলো, আমার সুন্নাহ ও আমার খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহকে শক্তভাবে ধারণ

করা ।" (মুসনাদে আহমদ ১৭১৪২) অর্থাৎ দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন ধরণের বাড়াবাড়ি ও করা যাবে না আর ছাড়াছাড়িও করা যাবে না ।"

রাসূল (সাঃ) অনেক হাদীসে কাফেরদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন । তিনি বলেন, من تشبه بقوم فهو منــــهم "যে কোন জাতিকে অনুকর করে সে তাদের অর্ন্তগত ।" (সুনানে আবু দাউদ ৪০৩৩)

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল কাফেরদের থেকে পৃথক থাকা । আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্তদের পথ অনুসরণ করা ইসলামের অংশ হতে পারে না । কুরআন-সুন্নাহ্ এর আলোকে যে কেউ এটি অনুধাবন করতে পারে ।

প্রশ্ন: কাফেরদের অনুকরন কয় প্রকার এবং কি কি?

উত্তরঃ কাফেরদের অনুকরণ দুই প্রকার হতে পারে । হারাম জিনিসের অনুসরণ আর হালাল জিনিসের অনুকরণ ।

প্রথম প্রকার হারাম অনুসরনঃ এর অর্থ হল জেনে শুনে কাফেরদের ধর্মের এমন সতন্ত্র বৈশিষ্ট অনুসরণ করা যা আমাদের ধর্মে নেই । এটি করা হারাম এবং বড় গুনাহ্ । কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো করার মাধ্যমে একজন মুসলিম, কাফের হয়ে যেতে পারে ।

দ্বিতীয় প্রকার জায়েজ অনুসরনঃ এর অর্থ হল এমন জিনিস করা যা প্রকৃত পক্ষে কাফেরদের থেকে নেওয়া হয়নি যদিও তাদের কেউ কেউ এটি করে । এটির অর্থ তাদের অনুসরণ করা নয় । নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে দুনিয়াবী বিষয়ে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুকরণ করা বা তাদের সদৃশ হওয়া অনুমোদনযোগ্য ।

(১) তাদের পরিচয় বহন করে এরূপ কোন প্রকার আচার-অনুষ্ঠান বা উপাসনা অনুকরণ করা যাবে না ।

(২) তাদের ধর্মের কোন অংশ পালন করা যাবে না ।

(৩) এমন কাজ যেগুলো সম্পর্কে ইসলামে বিধান রয়েছে । যদি এ সম্পর্কে ইসলামে কোন বিধান পাওয়া যায়, যা এই কাজ অনুমোদন করে বা করে না; তাহলে আমাদের অবশ্যই ইসলামের বিধানের অনুসরণ করতে হবে ।

(৪) এমন কোন কাজ করা যাবে না যা শারিয়াহ্ এর বিপরীতে যায় ।

(৫) তাদের কোন উৎসব পালন করা যাবে না ।

(৬) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না ।

কুফুর
ও
তার প্রকারভেদ

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ
জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ: "তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।"

সুরা বাক্বারা ২:৮৫

নবম অধ্যায়: কুফর ও তার প্রকারভেদ

প্রশ্ন: কুফর কি?

উত্তর: কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন কিছুকে ঢেকে রাখা, গোপন করা। 'কুফর' হচ্ছে এক ধরনের মুর্খতা বরং কুফরই হচ্ছে আসল মুর্খতা। শরীয়তের ভাষায় কুফর বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে- রাসূল (সা:) যে শরীয়ত আল্লাহর (সুব:) তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন তার মূল বিষয় সমূহ যেগুলি অপরিহার্য, অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় হুকুম রূপে মেনে চলার জন্য মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে কুফরী কাজ বা কুফরী বলে। যে ব্যক্তি এই কুফরীতে লিপ্ত হবে সে কাফেরে পরিণত হবে। যেমন: ইসলাম বিরোধী কোন বিধানকে বিশ্বাস করা এবং নবী (সা:) এর আনীত বিধানকে কিংবা বিধানের যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। আবার ইসলামকে মানে এবং সাথে সাথে ইসলাম বিরোধী হুকুম-গুলিকেও মানে এমন ব্যক্তিও মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: কুফর কয় ধরনের ও কি কি?

উত্তর: কুফর দুই ধরনের: ১। কুফরে আকবার বা বড় কুফরী - যে ধরনের বড় কুফর মানুষকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। ২। কুফরে আসগার বা ছোট কুফরী- যে কুফরী মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

বড় কুফরের কিছু উদাহরন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة/٦٥، ٦٦]

অর্থ: "আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।" (সুরা তাওবাহ ৯:৬৫-৬৬)

অন্য আয়াতে আরেকটি উদাহরণ:

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا [الكهف/٣٥

অর্থ: "নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল: আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।" (সুরা কাহাফ ১৮:৩৫)

■ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, কুরআনে আল্লাহ (সুব:) যেখানে কুফর শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটি সর্বদা বড় কুফর বুঝায় যা কাউকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়।

■ কিন্তু যখন সুন্নাহতে (হাদীসে) কুফর শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন আমাদের বুঝতে হবে যেখানে আরবীতে الكفـــر আল্ কুফর (আলিফ লাম সহ) ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে বড় কুফরকে নির্দিষ্ট করার জন্য, কিন্তু যদি সেটি হয় ছোট কুফর তাহলে শুধু كفـــر কুফর (আলিফ লাম বিহীন) ব্যবহার করা হয়।

কুরআনে বর্নিত বড় কুফরের উদাহরন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ [إبراهيم: ٢٨)

অর্থ: "তুমি কি তাদের কে দেখনি, যারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে (আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে) এবং স্ব-জাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে।" (সুরা ইবরাহীম ১৪:২৮)

কখনো (دليل خاص) নির্দিষ্ট দালীল (دليـــل عـــام) সাধারন দালীলের অধীনে আসে, উদাহরন স্বরূপ, কোন নির্দিষ্ট দালীল নেই যে কবরের উদ্দেশ্যে জবাই করা কুফরী অথবা কুরআনকে সৃষ্ট বলে দাবী করা, কিন্তু এগুলো কুফর সম্পর্কীয় আম বা সাধারন দলীলের অধীনে আসে।

প্রশ্ন: বড় কুফর কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর: বড় কুফর যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর তা হল বিশ্বাসের মধ্যে কুফরী। তা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত:

১. كُفْرُ التَّكْذِيبِ মিথ্যার কুফর:

কুরআন ও হাদীস বা এগুলোর কোন অংশকে অস্বীকার করা। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ [العنكبوت/٦٨

অর্থ: "ওর থেকে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ্‌র (সুব:) উপর মিথ্যা কথা বলে অথবা সত্য তার কাছে সমাগত হলে তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। জাহান্নাম কি কাফেরদের থাকার জন্য যথেষ্ট নয়?" (সুরা আনকাবুত ২৯:৬৮)

এ আয়াত থেকে প্রমানিত হলো যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারা কাফের। অনুরূপভাবে যারা কিছু অংশ বিশ্বাস করে আর কিছু অংশ অস্বীকার করে তারাও কাফের। বর্তমানে অনেক নামধারী মুসলিম রয়েছে যারা সালাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদিতে যথেষ্ট অগ্রগামী কিন্তু কোরআনের দণ্ডবিধি যেমন: চোরের হাত কাটার বিধান, সুদ হারাম হওয়ার বিধান, জিহাদ ফরজ হওয়ার বিধান ইত্যাদি মানতে রাজি নয়। পবিত্র কুরআনে তাদেরকেও কাফের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة : ٨٥]

অর্থ: "তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আলাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।" (সুরা বাক্বারা ২:৮৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء : ١٥٠ ، ١٥١]

অর্থ: "নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর

মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব।" (সূরা নিসা ৪:১৫০-১৫১)

২. كُفْرُ الْعِنَاد অস্বীকার ও অহঙ্কারের কুফর: তা হল সত্যকে জেনে-শুনে অহংকার বশত: তার অনুসরণ না করা। ইবলিসের কুফরীটা এই প্রকারেরই ছিল। কেননা ইবলিস জেনে-শুনে অহংকার বশত: সত্যকে অস্বীকার করেছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ [البقرة/٣٤)

অর্থ: "যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সেজদা করার জন্য তখন সকলে সেজদা করল ইবলিস ছাড়া। ইবলিস অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।" (সুরা বাকারা ২: ৩৪)

৩. كُفْرُ الشَّكِّ সন্দেহ জনিত কুফর: কিয়ামতের দিনের সম্বন্ধে সন্দেহ বা মিথ্যা ধারণা পোষণ করা অথবা তাকে অস্বীকার করা এবং তাকে সত্য বলে না মানা। এ জাতীয় কাফেরদের বক্তব্যকে আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا [الكهف/٣٦)

অর্থ: "(তারা বলে) আমার মনে হয় না কেয়ামত ঘটবে এবং যদিও আমি আমার প্রতিপালকের কাছে ফেরত যাই অবশ্যই এর থেকে ভাল জিনিস সেখানে পাব।" (সুরা কাহাফ ১৮: ৩৬-৩৭)

كُفْرُ الْاِعْرَاضِ মুখ ফিরিয়ে নেয়া বা বিমুখতার কুফর: ইসলাম যা দাবি করে তাকে গুরুত্ব না দিয়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তাতে বিশ্বাস না করা। এ জাতীয় কাফের সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুব) বলেন: وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ "যারা অস্বীকার করে ঐ সমস্ত জিনিসকে যে সম্বন্ধে তাদের ভয় দেখান হয় এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (সুরা আহ্‌কাফ ৪৬:৩)

৪. كُفْرُ النِّفَاق নিফাকীর কুফর: তা হল মুখে ইসলামকে প্রকাশ করা এবং অন্তরে ও কাজে তার বিরোধিতা করা। কারণ আল্লাহ্ (সুব) বলেন:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ [المنافقون/٣]

অর্থ: "এটা এজন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল, তারপর কুফরী করেছে ফলে তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ফলে তারা আর বুঝতে পারে না।" (সুরা মুনাফিকুন ৬৩:৩) অন্যত্র বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة/٨]

অর্থ: "মানুষদের ভিতরে অনেকে আছে যারা মুখে বলে- আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর ঈমান এনেছি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা মুমিন নয়।" (সুরা বাকারা ২: ৮)

প্রশ্ন: ছোট কুফর কি?

উত্তর: ছোট কুফর হচ্ছে, এমন কথা বা কাজ যা কুফরী হলেও একজন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। যেমন: নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতার কুফরী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

অর্থ: "আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অত:পর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারনে স্বাদ আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।" (সুরা নাহাল ১৬:১১২)

এ আয়াতে বর্ণিত فَكَفَرَتْ (ফা-কাফারাত) শব্দটি আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ছোট কুফরের আরেকটি উদাহরন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বিদায় হজ্জের সময় (লোকদের উদ্দেশ্য করে) বলেন, لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "আমার পরে একে অন্যের গলায় আঘাত করে (একে অন্যকে হত্যা করে) কুফরীতে ফিরে যেও না।" (সহীহ বুখারী ১২১)

এই বর্ননায় পরিষ্কারভাবে রাসুল (সা:) থেকে বর্ননা করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পরে মুসলিমরা একে অন্যকে হত্যা করে কুফরীতে ফিরে যাবে না। যাইহোক, বিষয়টি ঐ কুফরী নয় যা একজনকে ইসলামের বাহিরে নিয়ে যায়, কেননা কুরআনে বলা হয়েছে,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

অর্থ: "যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অত:পর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।" (সুরা হুজরাত ৪৯:৯)

আল্লাহ এই আয়াতে দুইটি দল যারা পরস্পর যুদ্ধ করে তাদেরকে ঈমানদার ও পরস্পরের ভাই বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন আক্রমনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সংশোধনের উদ্দেশ্যে। সুতরাং এই দলীল থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে অন্য মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার কাজটি ছোট কুফর।

যে কোন কুফরের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই বিভিন্ন দলীল এনে সুস্পষ্ট হতে হবে কাজটি বড় কুফর নাকি ছোট কুফর।

তাকফীর

প্রশ্ন: তাকফীর কি?

উত্তর: তাকফীর মানে হচ্ছে কুফরী আরোপ করা, কাউকে কাফের বলে ঘোষনা দেয়া। তাকফীর হচ্ছে, একজন মুসলিম যে কথা বা কাজের মাধ্যমে কুফরী করে তার ব্যাপারে ফয়সালা করা। তাকফীর করার জন্য অনেকগুলো শর্ত ও মূলনীতি রয়েছে যা একজনকে অবশ্যই জানতে হবে।

প্রশ্ন: তাকফীরের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি কি?

উত্তর: 'আহলে কিবলা' অর্থাৎ যারা মক্কায় অবস্থিত কাবা শরীফকে কিবলা হিসাবে মানে তাদের কাউকে আমরা পাপের কারনে তাকফীর করি না, যদি না সে এই পাপকাজকে হালাল মনে করে। সুতরাং পাপী, সীমালংঘনকারীদের আমরা তাকফীর করি না।

আমাদের কিবলার অনুসারী লোকদেরকে আমরা মুসলিম এবং ইমানদার হিসেবে গ্রহণ করি যতক্ষন না তার থেকে نَـــوَاقِضُ الْإِيْمَـــانِ দ্বীন ধ্বংসকারী কোন বিষয় প্রকাশিত না হয় এবং مَوَانِعُ التَّكْفِيْرِ বা তাকে তাকফীর করতে বাধা দেয় এমন কোন জিনিস বা কারণ বিদ্যমান থাকে।

আমরা বিশ্বাস করি যদি তাওহীদ সহ কোন বান্দা মারা যায় তার কবীরাহ গুনাহ থেকে তাওবাহ না করলেও তা যতই হোক যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তখন সে তার শাস্তি ভোগ করার পর, অথবা শাফায়াতের মাধ্যমে, অথবা আল্লাহর ক্ষমার মাধ্যমে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবে। সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। খাওয়ারিজদের[৯] মত কবীরাহ গুনাহের কারনে আমরা কাউকে চিরকালীন জাহান্নামী বলি না। আমরা আল্লাহর রহমাত থেকে হতাশও হই না আবার গাফেলও হই না, বরং ভয় এবং আশার সাথে মধ্যম পন্থা অনুসরন করি। (আমাদের আক্বীদাহ, শাইখ মাক্বদিসী)

[৯] একটি বাতিল ফেরক্বা। যারা গুনাহে কাবীরা করলে মানুষ কাফের হয়ে যায় বলে আক্বিদা রাখে।

প্রশ্ন: তাকফীর কিসের উপর ভিত্তি করে করা হয়?

উত্তর: বাহ্যিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই ফায়সালা করা হয়, যেহেতু গায়েবের ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কারো জানা নেই, আমরা শুধু ফায়সালা করতে পারি যা আমরা চোখে দেখি বা কানে শুনি এর উপর ভিত্তি করে। অন্তরের খবর আমরা জানি না। তা জানেন কেবল মাত্র আল্লাহ (সুবঃ)। ইরশাদ হচ্ছে: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ অর্থ: "অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁরই নিকট সংরক্ষিত। তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না।" (সুরা আন'আম ৬:৫৯)

এটা সুস্পষ্ট যে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না। আমরা কোনভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না কার অন্তরে কি আছে। এই জন্যই আমাদের ফায়সালা করতে হবে বাহ্যিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে, কথা এবং কাজের উপর। অন্তরের ব্যাপারে ফায়সালা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এই ব্যাপারটি আল্লাহর ইখতিয়ারে। এর একটি উদাহরন হচ্ছে মুনাফিক্বরা, যেহেতু তাদের অন্তরে কি আছে তা দেখা যায় না, এই জন্য বাহ্যিকভাবে তারা মুসলিম। তাদের অন্তরের বিষয়টি আখিরাতে আল্লাহ ফায়সালা করবেন, এই ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার নেই। সুতরাং একজন তিনভাবে ইসলামের বাইরে যেতে পারে, তার বিশ্বাসের মাধ্যমে, তার কথার মাধ্যমে এবং তার কাজের মাধ্যমে। যেহেতু একজনের অন্তরে কি আছে তা জানা নেই এই জন্য ফায়সালা করা হয় বাহ্যিক বিষয়ের উপর, এবং তা হচ্ছে কথা এবং কাজ। যদি একটি কুফরী কাজ করা হয় অথবা কুফরী কথা বলা হয় এবং কুরআন সুন্নাহর দালীল থেকে কুফরীর বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাহলে অবশ্যই এর বিরুদ্ধে আমাদের কথা বলতে হবে। সেই ক্ষেত্রে তাকফীর করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন: বড় কুফরী এবং ছোট কুফরী কিভাবে সাব্যস্ত করতে হবে?

উত্তর: দুই শ্রেনীর কুফর রয়েছে যা বুঝা প্রয়োজন:

১. اَلْكُفْرُ الْمُطْلَقُ কুফর মুতলাক্ব: স্বয়ং ঐ কাজটি যা কুফর, যা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে জড়িত নয়। যেমন, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া করার কাজটি।

২. اَلْكُفْــرُ الْبَــوَّاحُ কুফর বাউওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরী। এটি হচ্ছে কারো বিরুদ্ধে নিশ্চিত ফায়সালা করা যে সে এ কাজটি করার কারণে কাফের। যেমন: যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া প্রার্থনা করে তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করা।

অবশ্যই ফায়সালার ক্ষেত্রে অন্য দলীল দেখতে হবে যে কাজটি বড় কুফর কিনা, যা কাউকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন: তাকফীরের শর্তগুলো কি কি?

উত্তর: তাকফীরের শর্ত সমূহ-

১. কথা বা কাজটি প্রমানের জন্য সুনির্দিষ্ট দলীল থাকতে হবে, সাথে অন্যান্য দলীল-প্রমান দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে কাজটি কি বড় কুফর নাকি ছোট কুফর।

২. কথা বা কাজটি পরিষ্কার কুফরী হতে হবে এবং কোন প্রকার তাবীল বা অন্য কোন ব্যাখ্যার অবকাশ না থাকতে হবে।

প্রশ্ন: যাকে তাকফীর করা হবে তার কুফরী প্রমান করার জন্য তার বিরুদ্ধে কি কি শরয়ী জিনিস প্রয়োজন?

উত্তর: শারয়ীভাবে যাকে তাকফীর করা হবে তার কুফরী প্রমান করার জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন-

১. অপরাধী ব্যক্তি তার অপরাধ স্বীকার করা। এটা হচ্ছে শক্ত প্রমান।

২. স্বাক্ষী, অপরাধ/অবস্থার আলোকে।

স্বাক্ষীর জন্য যেসব শর্ত তা পূরন করা প্রয়োজন, যেমন প্রাপ্তবয়স্ক, ন্যায় পরায়ন, অবাধ্য বা ফাসিক্ব নয় ইত্যাদি।

যদি প্রমানসমূহ পূর্ন না হয় তাহলে কোন কাজকে গ্রহণ করা যাবে না। বিস্তারিত প্রমানের ভিত্তিতে স্বাক্ষী দিতে হবে, তার নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে নয় (যেমন স্বাক্ষী যদি তার ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে কাউকে কাফের মনে করে)।

যদি স্বাক্ষীর অভাব থাকে অথবা স্বাক্ষী দিল কিন্তু স্বাক্ষী গ্রহণ করা হল না। উদাহরন স্বরূপ, যদি জ্বিনাকারকের বিরুদ্ধে চারজন স্বাক্ষীকে একত্রিত করা হয়, একজন স্বাক্ষী অনিশ্চিত হয় তাহলে সব স্বাক্ষী বাতিল হয়ে যাবে।

যদি কুফরীর ঘোষনা জনসম্মুখে হয় তবে অনেক আলেমরাই এটাকে প্রমান হিসেবে গ্রহণ করবেন, কিন্তু আমাদের এই সময়ে যখন রয়েছে প্রচুর প্রপাগান্ডা ইত্যাদি তখন বিষয়টি স্বাক্ষীর মাধ্যমে যাচাই করার ব্যাপারে পারদর্শী হতে হবে।

বাস্তবে হতে পারে একজন ব্যক্তি তার কথা বা কাজের কারনে কাফের কিন্তু শারয়ী প্রয়োজনীয় জিনিস পূরন না করার কারনে তার কুফরী প্রমান করা যায়নি এই ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে মুসলিম হিসেবে গন্য করতে হবে এবং আল্লাহ আখিরাতে তার ফায়সালা করবেন।

একজন ব্যক্তি তার বিশ্বাসের কারনে কাফের হয়ে গেছে কিন্তু তার কুফরী কথায় ও কাজে প্রকাশ্য নয় এক্ষেত্রে তার হিসাব হবে আল্লাহর নিকট আখিরাতে। এই দুনিয়ায় আমরা তাকে মুসলিম হিসেবে গন্য করব যদিও সে কাফের। আল্লাহ মুনাফিক্বদের ব্যাপারে বলেন:

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّــهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ [التوبة/٦٤)

অর্থ: "মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলিমদের উপর না এমন কোন সুরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক; আল্লাহ্ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ।" (সুরা তাওবাহ ৯:৬৪)

একজন ব্যক্তি তার বিশ্বাসের কারনে কাফের হয়ে গেছে কিন্তু তার কুফরীর কোন স্বাক্ষী নেই এক্ষেত্রে তার হিসাব হবে আল্লাহর নিকট আখিরাতে। এই দুনিয়ায় আমরা তাকে মুসলিম হিসেবে গন্য করব যদিও সে কাফের। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ [التوبة/١٠١)

অর্থ: "আর কিছু কিছু তোমার আশ-পাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে অনঢ়। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব দু'বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহান আযাবের দিকে।" (সুরা তাওবাহ ৯:১০১)

একজন ব্যক্তি কুফরী করে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কুফরী প্রমান করার প্রয়োজনীয় সব জিনিস না থাকলে (যেমন স্বাক্ষীর অভাব) তাকে কাফের বলে ডাকা যাবে না এবং পার্থিব জীবনে তাকে মুসলিম এর মত আচরন করা হবে যাইহোক আখিরাতে আল্লাহ তার হিসাব নিবেন। রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুনাফিক্বদের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি যতক্ষন না তাদের কথা বা কাজ দ্বারা তা প্রকাশ হয়েছে এবং শারয়ী প্রয়োজনীয় সব জিনিস পূরন হয়েছে।
একজন ব্যক্তি কুফরী করল, সে তার কুফরী স্বীকার করল এবং প্রয়োজনীয় স্বাক্ষী রয়েছে অথবা এটা জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে গেছে, তবুও তাকে ততক্ষন কাফের বলা উচিত নয় যতক্ষন না তাকফীর করার সকল শর্ত ও পর্যায় অতিক্রম না করে এবং তাকফীর করতে বাধা দেয় এমন কোন বিষয়ও না থাকে।

প্রশ্ন: তাকফীরের জন্য তিন প্রকারের শর্তাবলী কি কি?
উত্তর: তাকফীরের ৩ প্রকারের শর্তাবলী হচ্ছে:
১. **ব্যক্তি**- যে ব্যক্তি কর্ম সম্পাদন করে।
২. **কাজ**- স্বয়ং কাজটি।
৩. **প্রমান**- ঐ ব্যক্তি কাজটি করেছে তার প্রমান।
ব্যক্তি: ঐসব শর্তাবলী যা একজনকে তাকফীর করা বৈধ করে,
(১) মুসলিম। (২) পরিণত বয়স্ক। (৩) সুস্থ মস্তিস্ক। (৪) সে জানতে হবে তার কাজটি কুফর (যেমন নও মুসলিম, তবে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, শরীক করার ক্ষেত্রে কোন ওজর চলবে না।) (৫) স্বেচ্ছায় কাজটি করা।

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب/٥]

অর্থ: "এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা আহযাব ৩৩:৫)
কাজটি: স্বয়ং কাজটি,

(১) সুনিশ্চিত কুফরী। (২) কোন প্রকার সন্দেহ ব্যতীত সুনির্দিষ্ট প্রমান থাকা।
প্রমান- ঐ ব্যক্তি কাজটি করেছে তার প্রমান থাকতে হবে এবং শারয়ী সব প্রয়োজনীয় জিনিস পূরন করতে হবে। যেমন: স্বীকৃতি, স্বাক্ষী ইত্যাদি।

প্রশ্ন: কি কি কারণ তাকফীর থেকে বাধা দেয় বা নিবারন করে?
উত্তর: ঐ পরিস্থিতি যা একজনকে তাকফীর থেকে বাধা দেয় সেগুলো নিম্নরূপ:
১. **ব্যক্তি**- ঐসব শর্তাবলী যা একজনকে তাকফীর করা অবৈধ করে তা হচ্ছে:
(১) শিশু হওয়া। (২) পাগল হওয়া। (৩) অজ্ঞতা বা ইলম না থাকা। (৪) অক্ষম হওয়া। (৫) 'মুকরাহ' বা কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করা হলে। (৬) ভূল/ মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া। (৭) ভূল বুঝার কারণে। নির্দিষ্ট শর্তের সাথে যদি দালীল এর ব্যাপারে ভূল বুঝ থাকে সেক্ষেত্রেও তাকফীর করা যাবে না। যেমন আয়াতের ব্যাপারে ভূল বুঝ।
২. **কাজ:** স্বয়ং কাজটি।
- ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমান না থাকা।
- কথা বা কাজটির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রমান না থাকা।

৩. **প্রমান:** স্বাক্ষীর স্বল্পতা ইত্যাদি...।
কিছু পরিস্থিতি রয়েছে যা প্রাকৃতিক এবং আল্লাহর তরফ থেকে। কোন অপবাদ বা গুনাহ নেই ঐ ব্যক্তির উপর যে এরূপ পরিস্থিতিতে পড়ে। যেমন: নাবালেগ, পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তি এবং যে ভুলে গেছে। যদি ঐ ব্যক্তি কারও অধিকারের কোন বস্তু নিয়ে নেয় তাহলে ঐ ব্যক্তির পিতা-মাতা অথবা তার অভিভাবক মূল্য পরিশোধ করবে। যেমন: কোন পাগল কাউকে হত্যা করলে তার পিতামাতা তার দিয়াত (রক্তপন) আদায় করবে। হুদুদ প্রতিষ্ঠিত হবে ঠিকই কিন্তু ঐ ব্যক্তির কোন গুনাহ নেই।
যখন কোন কাহিনী পড়া অবস্থায় অথবা কারো কথা নকল করতে গিয়ে কুফরী কথা উচ্চারণ করে তখন তাকে তাকফীর করা যাবে না। কেননা:

نقل کفر کفر نه باشد

কুফরী কথা নকল করা কুফরী না।
(তবে কৌতুক করে বা উপহাস করে অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কুফরী কথা বলে তাহলে অবশ্যই তাকে তাকফীর করতে হবে।)
এমনি ভাবে যে তাওবাহ করে তার উপর নির্দেশ বা হুকুমটি কার্যকর হবে না।
১. যদি ঐ ব্যক্তিটি তাওবাহ করে তবে সে ইসলামে পুনরায় প্রবেশ করবে।
২. যদি ব্যক্তিটি তাওবাহ করতে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের এবং তাকে হত্যা করা হবে।
৩. যদি ঐ ব্যক্তি কোন আয়াত বা হাদীসের ব্যাপারে ভূল বুঝার কারণে কুফরী করে থাকে তাহলে তাকে তার ভূল ধরিয়ে দিয়ে তাওবাহ করতে বলা হবে, যদি সে তাওবাহ করে তাহলে তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যদি তাওবাহ না করে তাহলে তাকে কাফের হিসেবে হত্যা করা হবে।

প্রশ্ন: কুফরীর ক্ষেত্রে ইচ্ছা শর্ত কিনা? মানুষ ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কুফরীতে লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে কিভাবে বের হয়ে যায়?

উত্তর: মানুষের এমন কিছু কথা ও কাজ রয়েছে যেগুলো দ্বারা সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, যদিও তার মাঝে ইসলাম ত্যাগ করার বা কুফরী করার কোন ইচ্ছা ছিলনা এবং সে যা বলেছে তা সে নিজে বিশ্বাসও করেনা।
ইবনে হাজার আসকালানি (রহ:) বলেছেন:

أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام

অর্থ: "মুসলিমীনদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা দ্বীন ত্যাগ করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ না করা সত্ত্বেও দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়।" (ফাতহুল বারি ১২/৩৩০১)
ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন:

وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله

অর্থ: "বাস্তব এটাই যে, কেউ যদি এমন কিছু বলে বা করে, যেটা কুফরী, সে সেই কথা বা কাজের দ্বারা কাফের হয়ে গেল, যদিও তার কাফের হওয়ার ইচ্ছা ছিল না (লাম ইয়াকসুদ) কারণ কেউই কাফের হওয়ার ইচ্ছা রাখেনা, আল্লাহ্‌র যার ব্যাপারে ফয়সালা করেছেন সে ব্যতীত। (আস-সারিমুল মাসলূল ৩/১৭৬)
একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে: একজন ব্যক্তি যদি একটি মুর্তির সামনে সিজদা করে, তাহলে এই কাজটিই কুফর হিসেবে যথেষ্ট যা দ্বারা একজন ব্যক্তি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়, অবশ্য সে যদি তাকফিরের অযোগ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা (যেমন ইকরাহ বা যবরদস্তি বা ভুলে যাওয়া)। কিন্তু তাকফিরের ক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই যে, সেই ব্যক্তির মনে এই কাজ দ্বারা কুফরী করার বা কাফির হওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে। কারণ যেসব মুশরিকীন তাদের রিযক ও নিরাপত্তার জন্য মৃতদেরকে ইবাদাত দেয় এবং তাদের কাছে দোয়া করে তারা কোনদিন এইসব (শির্কী) কাজ দ্বারা কাফির হতে চায় না; বরং তারা একে আল্লাহর নিকটস্থ হওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। তার পরও তাদের কাজ গুলো ভয়াবহ শিরক এবং রিদ্দার অন্তর্ভূক্ত (দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার কাজ) অর্থাৎ তাকে মুশরিক হিসাবে গণ্য করা হবে।
আরেকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য: যে ব্যক্তি আল্লাহ (সুব:) অথবা তাঁর রাসূল (সা:) সম্বন্ধে ঠাট্টা করে বা খারাপ মন্তব্য করে, তার উপর তাকফির করার জন্য এটা জানার প্রয়োজন নেই যে সে কুফরী করতে চেয়েছিল না চায়নি; এবং (তার ওপর তাকফির করার জন্য) এটাও শর্ত নয় যে সে তার (কুফরী) কথার উপর বিশ্বাস এনেছে বরং সে যদি ইচ্ছা সহকারে সেই বাক্য গুলো উচ্চারণ করে, (অর্থাৎ ভুল উচ্চারণের কারণে সেই কথা গুলো তার মুখ থেকে বের হয় নি), তাহলে শুধুমাত্র এই কথাগুলোই কুফর হিসেবে যথেষ্ট যা তাকে দ্বীন থেকে বহিস্কার করে দেয়।
আসলে, 'কথা বা কাজটি করতে ইচ্ছা না থাকা' এবং 'কুফরী করার ইচ্ছা না থাকা'-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। দ্বিতীয়টা- 'কুফরী করার ইচ্ছা'-এর কোন গুরুত্ব নেই (সেই ব্যক্তির উপর তাকফিরের ক্ষেত্রে) এবং 'কুফরী করার ইচ্ছা'র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি তাকফিরের উপর কোন প্রভাব রাখে

না, (যখন কোন কথা বা কাজ কুফর আল আক্বার হয় যার দ্বারা একজন দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত হয়)।

কিন্তু প্রথমটা- 'কথা বা কাজটি করার ইচ্ছা'- যার অর্থ হল যে সেই ব্যক্তি ইচ্ছা সহকারে কথাটি বলেছে বা কাজটি করেছে- এই বিষয়টির উপর তাকফীর নির্ভরশীল, এক্ষেত্রে পরিস্থিতি যাচাই না করে তাকফীর করা নিষেধ। এবং এই ক্ষেত্রে তাকফির করার পূর্বে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে এই কাজটি বা কথাটি মৃত্যুর মুখে জোর করে করানো অথবা বলানো হয়নি; অথবা উচ্চারণের ভুলে বা জ্ঞান না থাকার কারণে বলা হয়নি।

ইবনুল কাইয়ুম বলেছেন: যে ঘটনাটি ঘটেছিল, যে একজন লোক তার হারিয়ে যাওয়া উট ফিরে পেয়ে অতিরিক্ত খুশিতে বলে ফেলেছিল: "ও আল্লাহ্! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার রব।" যদিও সে স্পষ্ট কুফর উচ্চারণ করেছিল, সে তার এই কথা দ্বারা কাফির হয়ে যায়নি। এর কারণ হচ্ছে তার সেই কথাগুলো উচ্চারণ করার ইচ্ছা ছিল না। এবং (ঠিক তেমনিই) যাকে জোর করে কুফরী কথা বলানো হয়েছে, সে অবশ্যই এমন কথা বলেছে যা কুফরী, কিন্তু সে কাফির হয়ে যায়নি কারণ তার এই কথাটি উচ্চারণ করার ইচ্ছা ছিল না। (এবং) এই ব্যক্তি তার মত নয় যে ঠাট্টা করেছে (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:) অথবা দ্বীন সম্পর্কে) কারণ যে ঠাট্টা করেছে, সে স্বেচ্ছায় কুফরী কথা উচ্চারণ করেছে, যদিও সেই কথা দ্বারা হয়তবা তার কাফের হওয়ার ইচ্ছা ছিল না। এই ক্ষেত্রে তার কথার দ্বারা যখন সে ঠাট্টা করে সে অবশ্যই কুফরী এবং রিদ্দাহ করল, যদিও সে শুধু ঠাট্টা করছিল; এর কারণ হল যে তার সেই কথাগুলো উচ্চারণ করার ইচ্ছা ছিল এবং যদিও সে শুধু ঠাট্টা করছিল, তার জন্য কোন ওজর নেই যেমন ওজর আছে সেই ব্যক্তির যাকে (কুফরী করতে) বাধ্য করা হয়, অথবা যার মুখ থেকে ভূল উচ্চারণের কারণে কুফরী কথা বেরিয়েছে, অথবা যে ভূলে গিয়েছিল। (ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ৩/৬৩)

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করল, কোন প্রয়োজন (ইক্‌রাহ) ছাড়া এবং সে ইচ্ছা করে এটা উচ্চারণ করল (অর্থাৎ তার মুখ থেকে ভূলে এইকথা বেরিয়ে যায়নি) তাহলে সে ব্যক্তি এই (কুফরী) কথা দ্বারা যাহিরান বা প্রকাশ্যে এবং বাতিনান বা গোপনে

কাফের হয়ে গেল। এবং আমরা তার ব্যাপারে এই কথা বলা জায়েয মনে করিনা যে, "হয়তবা সে অন্তরে মুমিন" (আস সারিমুল মাসলুল পৃ:৫২৪)

পূর্বোক্ত কথার সাথে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (র:) সুরা নাহলের ১০৬ নং আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, "এটা জানা বিষয় যে তিনি (আল্লাহ) এই আয়াতে কুফরী দ্বারা (ই'তিক্বাদ) বিশ্বাসের কুফরীর কথা শুধু বুঝাননি। কারণ অন্তরের ব্যাপারে কাউকে জোর করা সম্ভব নয়, (শুধু কথা বা কাজের ক্ষেত্রে সম্ভব) বলেছেন 'ইক্‌রাহ' এর অর্থ হল যে শুধু তার ক্ষেত্রে ওজর আছে যাকে কুফরী কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছে, শারিরিক অত্যাচার করে এবং জানের ভয় দেখিয়ে। কিন্তু ইক্‌রাহর পরিস্থিতি (অথবা ভূল উচ্চারণ বা ভূলে যাওয়া) ছাড়া যে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করল, সে কাফের হয়ে গেল সে তার বাক্যে (অন্তর থেকে) বিশ্বাস করুক বা না করুক। কারণ যদিও একজন ব্যাক্তিকে একটি কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা সম্ভব, তাকে সেটা অন্তর থেকে কবুল এবং বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়, এবং তাই পূর্বোক্ত আয়াতে (১৬:১০৬) সেই (ইক্‌রাহ) বাধ্য করার কথা বলা হয়েছে, সেটা কথার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

এটাই প্রমাণ করে যে ইক্‌রাহর পরিস্থিতি ছাড়া এবং ভূল উচ্চারণ বা ভূলে যাওয়ার পরিস্থিতি ছাড়া, একজন ব্যক্তি তার কথা দ্বারা কাফের হয়ে যেতে পারে। তাই, তার কথাকে কুফরী (এবং সেই ব্যাক্তিকে কাফির) হিসেবে গণ্য করার জন্য এটা শর্ত নয় যে, সেই ব্যক্তি তার (কুফরী) কথার উপর (অন্তর থেকে) বিশ্বাস রাখে।

প্রশ্ন: যারা কুফরী সরকারী সিষ্টেমে কাজ করে তারা সবাই কি কুফরীর মধ্যে আছে?

উত্তর: কুফরী সরকার ব্যবস্থায় যারা কাজ করে তাদের সবাইকে আমরা ঢালাওভাবে তাকফীর করি না, তাদের কাজের শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। আমরা শুধু তাদেরকে তাকফীর করি যারা শিরক এবং কুফরী কাজে জড়িত আছে। যেমন যারা আইন প্রণয়ন করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে, তাদের বাহিনীগুলো যারা তাদের আইন বাস্তবায়ন করে, মানুষকে কুফরী আইন মানতে বাধ্য করে, তাদেরকে রক্ষা করে।

যখন কুফরী সরকার ব্যবস্থায় কাজ করার প্রসংগ আসে আমরা বিস্তারিত দেখে নিব, কারণ এর মধ্যে রয়েছে এমন কাজ যা কুফরী, রয়েছে এমন কাজ যা হারাম এবং রয়েছে এমন কাজ যা এর চেয়ে ছোট। [হাযিহী আক্বীদাতুনা, শাইখ মাক্দিসী)

প্রশ্ন: মুরতাদ কাকে বলে? মুরতাদের হুকুম কি?

উত্তর: 'মুরতাদ' শব্দটি আরবী 'রিদ্দাহ' শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ: 'ফিরে যাওয়া, 'ঘুরে যাওয়া', 'ধর্ম ত্যাগ করা'। ইসলামের পরিভাষায় মুরতাদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে যায় অথবা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে। ইসলামে মুরতাদের হুকুম হলো: হত্যা। মুরতাদ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة/٢١٧)

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যে সব লোক নিজের দীন থেকে সরে যাবে আর দীনত্যাগী অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাদের সব নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা জাহান্নামবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা বাকারা ২:২১৭) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا [النساء/١٣٧)

অর্থ: "নিশ্চয় যারা ঈমান আনলো, অত:পর কুফরী করল, পুনরায় ঈমান গ্রহণ করল, পুনরায় আবার কুফরী করল, অত:পর কুফরী আক্বীদা বিশ্বাস ও কর্মকান্ড বাড়তেই থাকলো। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করবেন না এবং কখনো তাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখাবেন না।" (সূরা নিসা ৪:১৩৭) হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبَهْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ

অর্থ: "হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রা:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ (সুব:) সেই বান্দার

তাওবাহ কবুল করেন না, যে ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী প্রকাশ করে।" (মুসনাদে আহমাদ ২০০১১) রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ».

অর্থ: "অন্ধকার রাতের মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকেলে কাফির হয়ে যাবে। বিকেলে মু'মিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে বসবে।" (সহীহ মুসলিম ৩২৮; সুনানে তিরমিজি ২১৯৫)

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়। আবার মুসলিম হবার পর কুফরী করলে সে কাফির হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তার দীন ও ঈমানকে প্রত্যাহার করে কাফির হয় শরীয়তের পরিভাষায় তাকেই মুরতাদ বলা হয়।

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত, অপরিহার্যভাবে মেনে চলার জন্য নির্ধারিত এক বা একাধিক বিষয়কে অস্বীকার করলে মুসলিম ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। যে মুসলিম ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক অপরিহার্যরূপে মেনে চলার জন্য নির্ধারিত কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করলো বস্তুত: সে আল্লাহর কিতাবের অংশ বিশেষের প্রতি ঈমান আনলো আর অংশ বিশেষকে অস্বীকার করলো এমতাবস্থায় সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত বলেই গন্য হবে অর্থাৎ সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাবে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা করা, যদি না সে তাওবাহ করে ফিরে আসে। রাসুল (সা:) বলেছেন:

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

অর্থ: "ইকরামা (রা:) থেকে বর্ণিত, আলী (রা:) এর নিকট কতগুলো 'যিনদিক' ধরে আনা হলো। তিনি তাদেরকে আগুনে পুরিয়ে মারলেন।

ইবনে আব্বাস (রা:) এই সংবাদ জানার পর বললেন, (আলীর স্থানে) আমি হলে তাদেরকে আগুনে পোড়াতাম না কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) আল্লাহর শাস্তি (আগুনের) মাধ্যমে কাউকে শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা করে ফেল।" (সহীহ বুখারী ৬৯২২; সুনানে তিরমিজি ১৪৫৮; সুনানে আবু দাউদ ৪৩৫৩; সুনানে নাসায়ী ৪০৭০)

তাওহীদের সংশয় নিরসন

প্রশ্ন: যারা বলে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট, বাস্তবে তার বিপরীত কিছু করলে ক্ষতি নেই - তাদের এ সংশয়ের জবাব কি?

উত্তরঃ মানুষের মনে একটা সংশয় বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাহলো এই যে, তারা বলে থাকে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা পাঠ করার পর উসামা (রা:) যাকে হত্যা করেছিলেন, নবী (সা:) সেই হত্যাকান্ডটাকে সমর্থন করেননি। এইরূপ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর এই হাদীসটিও তারা পেশ করে থাকে যেখানে তিনি বলেছেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন "আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) হলেন আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। অত:পর যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে তাহলে তা ভিন্ন। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ (সুবঃ) এর নিকট।" (সহীহ বুখারী ২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, সহীহ মুসলিম ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮; সুনানে তিরমিযী ৩৩৪১; সুনানে নাসাঈ ২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১, ৩০৯৫; সুনানে আবু দাউদ ১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮; সুনানে ইবন মাযাহ ৭১, ৭২, ৩৯২৭, ৩৯২৯)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর উচ্চারণকারীদের হত্যা করা সম্বন্ধেও আরও অনেক হাদীস তারা তাদের মতের সমর্থনে পেশ করে থাকে। এই মূর্খদের এসব প্রমান পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যারা মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করবে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না এবং তারা যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদেরকে হত্যা করাও চলবে না।

এই সব জাহেল মুশরিকদের বলে দিতে হবে যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইয়াহুদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদেরকে কয়েদ করেছেন যদিও তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত।

আর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাহাবাগণ বানূ হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যদিও তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল; তারা সালাতও পড়তো এবং ইসলামেরও দাবী করত, শুধুমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করার কারনে।

ঐ একই অবস্থা তাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য যাদেরকে হযরত আলী (রা:) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া ঐ সব জাহেলরা স্বীকার করে যে, যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফের হয়ে যায় এবং হত্যারও যোগ্য হয়ে যায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সত্ত্বেও। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের যে কোন একটিকে অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যায় এবং সে হত্যার যোগ্য হয় যদিও সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। তা হলে ইসলামের একটি অঙ্গ অস্বীকার করার কারণে যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ তার কোন উপকারে না আসে, তবে রাসূলগণের দ্বীনের মূল ভিত্তি যে তাওহীদ এবং যা হচ্ছে ইসলামের মুখ্য বস্তু, যে ব্যক্তি সেই তাওহীদকেই অস্বীকার করল তাকে ঐ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ কেমন করে বাঁচাতে সক্ষম হবে?

আল্লাহর দুশমনরা হাদীস সমূহের তাৎপর্যও হৃদয়ঙ্গম করে না। হযরত ওসামা (রা:) হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ইসলামের দাবীদারকে হত্যা করেছিলেন এই ধারণায় যে, সে তার জান ও মালের ভয়েই ইসলামের দাবী জানিয়েছিল। কোন মানুষ যখন ইসলামের দাবী করবে তার থেকে ইসলামবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। এ সম্বন্ধে কুরআনের ঘোষণা এই যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا [النساء/٩٤]

অর্থ: "হে মু'মিন সমাজ! যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন (কাউকে হত্যা করার পূর্বে) সব বিষয় তদন্ত করে দেখে নাও।" (সুরা নিসা ৪:৯৪)

অর্থাৎ তার সম্বন্ধে তথ্যাদি নিয়ে দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত হও। আল্লাহ (সুব:) বলেছেন, (ফাতাবাইয়ানূ) অর্থাৎ তদন্ত করে দেখ। তদন্ত করার পর দোষী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে হবে।

এইভাবে অনুরূপ হাদীসগুলোর অর্থ বুঝে নিতে হবে। ঐগুলোর অর্থ হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে তাওহীদ ও ইসলাম প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে- যে পর্যন্ত বিপরীত কোন কিছু প্রকাশিত না হবে। এ কথার দলীল হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) কৈফিয়তের ভাষায় ওসামা (রা:) কে বলেছিলেন: তুমি তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও হত্যা করেছ? এবং তিনি আরও বলেছিলেন:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

"আমি লোকদেরকে হত্যা করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলবে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।" সেই রাসূলই কিন্তু খারেজীদের সম্বন্ধে বলেছেন:

لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

"আমি যদি তাদের পেয়ে যাই তবে তাদেরকে হত্যা করব 'আদ জাতির মত সার্বিক হত্যা।" (সহীহ বুখারী ৩৩৪৪; সহীহ মুসলিম ২৪৯৯) যদিও তারা ছিল লোকদের মধ্যে অধিক ইবাদতগুযার, অধিক মাত্রায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সুবাহানাল্লাহ উচ্চারণকারী।

খারেজীরা এমন বিনয়-নম্রতার সঙ্গে সালাত আদায় করত যে, সাহাবাগণ পর্যন্ত নিজেদের সালাতকে তাদের সালাতের তুলানায় তুচ্ছ মনে করতেন। তারা কিন্তু ইলম শিক্ষা করেছিল সাহাবাগণের নিকট হতেই। কিন্তু কোনই উপকারে আসল না তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, তাদের অধিক পরিমাণ ইবাদত করা এবং তাদের ইসলামের দাবী করা, যখন তাদের থেকে শরী'আতের বিরোধী বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেল।

ঐ একই পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে ইয়াহুদদের হত্যা এবং বানু হানীফার বিরুদ্ধে সাহাবাদের যুদ্ধ ও হত্যাকান্ড। ঐ একই কারণে নবী (সা:) বানু মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যখন তাঁকে একজন লোক এসে খবর দিল যে, তারা যাকাত দিবে না। এইরূপে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যে সমস্ত হাদীসকে তারা হুজ্জত রূপে পেশ করে থাকে তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য্য তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

প্রশ্ন: 'যে ব্যক্তি দ্বীনের কতিপয় ফরয-ওয়াজিব পালন করে, সে তাওহীদ বিরোধী কোন কাজ করে ফেললেও কাফের হয়ে যায় না' যারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের ভ্রান্তির জবাব কি?

উত্তর: যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা:) জিহাদ করেছেন তারা এদের (আজকের দিনে শিরকী কাজে লিপ্ত- নামধারী মুসলমানদের) চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান ছিল এবং তাদের শিরক অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল। একথা তুমি জেনে রাখো যে, এদের মনে আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে যে ভ্রান্তি ও সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেটাই তাদের সব চাইতে বড় ও গুরুতর ভ্রান্তি। অতএব এই ভ্রান্তির অপনোদন ও সন্দেহের অবসান কল্পে নিম্নের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুন। তারা বলে থাকে: যাদের প্রতি সাক্ষাৎভাবে কুরআন নাযিল হয়েছিল (অর্থাৎ মক্কার কাফির-মুশরিকগণ) তারা আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই একথার সাক্ষ্য প্রদান করে নাই, তারা রাসূল (সা:) কে মিথ্যা বলেছিল, তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, তারা কুরআনকে মিথ্যা বলেছিল এবং বলেছিল এটাও একটি যাদু মন্ত্র। কিন্তু আমরা তো সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং (এ সাক্ষ্যও দেই যে) নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা:) তাঁর রাসূল, আমরা কুরআনকে সত্য বলে জানি ও মানি, আর পুনরুত্থান এর বিশ্বাস রাখি, আমরা সালাত পড়ি এবং সিয়ামও রাখি তবু আমাদেরকে এদের (উক্ত বিষয়ে অবিশ্বাসী কাফেরদের) মত মনে কর কেন?

এর জওয়াব হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ে সমগ্র আলেম সমাজ তথা শরীআতের বিদ্বান মন্ডলী একমত যে, একজন লোক যদি কোন কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে সত্য বলে মানে আর কোন কোন বিষয়ে তাকে মিথ্যা বলে ভাবে, তবে সে নির্ঘাত কাফের, সে ইসলামে প্রবিষ্টই হতে পারে না।

এই একই কথা প্রযোজ্য হবে তার উপরেও যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করল, আর কতক অংশকে অস্বীকার করল, তাওহীদকে স্বীকার করল কিন্তু সালাত যে ফরয তা মেনে নিল না। অথবা তাওহীদও স্বীকার করল, সালাতও পড়ল কিন্তু যাকাত যে ফরয তা মানল না। অথবা এগুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু সিয়ামকে অস্বীকার করে বসল কিংবা ঐ গুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু একমাত্র হজ্বকে অস্বীকার করল এরা সবাই হবে কাফের।

কোন ব্যক্তি যদি এগুলো সমস্তই অর্থাৎ তাওহীদ, সালাত, যাকাত, রামাদানের সিয়াম, হজ্জ মেনে নেয় কিন্তু পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে। তার রক্ত এবং তার ধন-দৌলত সব হালাল হবে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করা এবং তার ধন-মাল লুট করা সিদ্ধ হবে) যেমন আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا } [النساء : ١٥٠ ، ١٥١)

অর্থ: "নিশ্চয় যারা অমান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদেরকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের (আনুগত্যের) মধ্যে পার্থক্য করতে চায় আর বলে কতককে আমরা বিশ্বাস করি আর কতককে অমান্য করি এবং তারা ঈমানের ও কুফরের মাঝামাঝি একটা পথ আবিষ্কার করে নিতে চায় এরাই হলো প্রকৃত কাফের। বস্তুত: কাফেরদিগের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি এক লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তি।" (সূরা নিসা ৪:১৫০)

আল্লাহ (সুব:) যখন তাঁর কালাম পাকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের কিছু অংশকে মানবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে, সে সত্যিকারের কাফের এবং তার প্রাপ্য হবে সেই বস্তু (শাস্তি) যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এতদ্বারা এ সম্পর্কিত ভ্রান্তিও অপনোদন ঘটছে।

যখন মানুষেরা নবী (সা:) কর্তৃক আনীত ফরয, ওয়াজিব সমূহের সবগুলোকে মেনে নিয়ে ঐগুলোর একটি মাত্র অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায় তখন কি করে সে কাফের না হয়ে পারে যদি সমস্ত দ্বীনের মূল বস্তু

তাওহীদকেই সে অস্বীকার করে বসে? সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর এই মূর্খতা!

আর এ কথাও বলা যেতে পারে যে, যে বানু ওবায়দ আল কান্দাহ বানু আব্বাসের শাসন কালে মরক্কো প্রভৃতি দেশে ও মিসরে রাজত্ব করেছিল, তারা সকলেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কালেমার সাক্ষ্য দিত। ইসলামকেই তাদের ধর্ম বলে দাবী করত। জুমুআ ও জামাআতে সালাতও আদায় করত। কিন্তু যখন তারা কোন কোন বিষয়ে শরী'আতের বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণের কথা প্রকাশ করল, তখন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর আলেম সমাজ একমত হলেন। আর তাদের দেশকে 'দারুল হরব' বা যুদ্ধের দেশ বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যুদ্ধ করলেন। আর মুসলিমদের শহরগুলোর মধ্যে যেগুলো তাদের হস্তগত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করে নিলেন। তাদের এ কথাও বলা যেতে পারে যে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন:

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ [التوبة/٧٤)

অর্থ: "তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলছে: কিছুই তো আমরা বলিনি" অথচ তারা নিশ্চয় কুফুরি কথা বলছে, ফলে ইসলামকে স্বীকার করার পর তারা কাফের হয়ে গিয়েছে।" (সূরা তওবা ৯:৭৪)

তুমি কি শুননি মাত্র একটি কথার জন্য আল্লাহ এক দল লোককে কাফের বলছেন, অথচ তারা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সমসাময়িক কালের লোক এবং তারা তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছে, সালাত পড়েছে, যাকাত দিয়েছে, হজ্বব্রত পালন করেছে এবং তাওহীদের উপর বিশ্বাস রেখেছে? আর তারা হলো নিম্নের আয়াতে বর্ণিত লোকসমূহ:

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

অর্থ: "তুমি বল: তোমরা কি ঠাট্টা তামাশা করছিলে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতগুলো নিয়ে এবং তাঁর রাসূলের সম্বন্ধে? এখন আর কৈফিয়ত পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ।" (সূরা তওবা ৯:৬৫-৬৬)

এই লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ (সুব:) স্পষ্টভাবে বলেছেন: তারা ঈমান আনার পর কাফের হয়েছে। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সঙ্গে

তাবুকের যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তারা তো মাত্র একটি কথাই বলেছিল এবং সেটা হাসি ও ঠাট্টার ছলে।

অতএব, তুমি এ সংশয় ও ধোঁকাগুলোর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। সেটা হল: তারা বলে, তোমরা মুসলমানদের মধ্যে এমন লোককে কাফের বলছ যারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা নামায পড়ছে, রোযা রাখছে। তারপর তাদের এ সংশয়ের জওয়াবও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ।

কুফর দুনা কুফর

প্রশ্ন: কুফর দুনা কুফর কি?

উত্তর: কুফর দুনা কুফর হচ্ছে: এমন কিছু কাজ যা মূলত: কুফুরী কাজ। কিন্তু যে এই কাজে লিপ্ত হয় তাকে কাফের বলা হয় না। এখানে دون 'দুনা' শব্দটি 'ছোট' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন একটি কুফুর যা বড় কুফুরের চেয়ে ছোট। অথবা এখানে دُوْنَ 'দুনা' শব্দটি غَيْــرَ 'গায়র' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ كُفْــرٌ غَيْــرَ كُفْــرٍ বা এমন একটি কুফুর যেটি বড় কুফুরের গায়ের বা ভিন্ন। ইমাম বুখারী (র:) এই নামে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন بَابُ كُفْــرٌ دُوْنَ كُفْــرٍ এর অধিনে একটি হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা:) মহিলাদের প্রসঙ্গে বললেন, يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْــسَانَ "তারা স্বামীর কুফুরী করে এবং দয়া ও অনুগ্রহের কুফুরী করে... ।"(সহীহ বুখারী ২৯; সহীহ মুসলিম ২১৪৭; সুনানে নাসায়ী ১৪৯২) এ হাদীসে যদিও স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়াকে কুফুরী বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও, যে এ কাজটি করে তাকে কাফের বলা হয় না। এ জাতিয় কাজগুলোকে 'কুফর দুনা কুফর'। কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণীর দরবারী আলেমগণ মুসলিম নামধারী কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী শাসক ও বিচারকদেরকে বাঁচানোর জন্য এবং তাদের পক্ষে ওকালতি করার জন্য এর অপব্যাখ্যা করে থাকে। কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে সালাফে সালেহীনগনের একটি সু প্রতিষ্ঠিত আক্বীদাহ হচ্ছে- আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফির। এটি বড় কুফরী এই বিষয়ে তাদের মধ্যে

কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু আমাদের সময়ের কিছু বাতিল আলেমরা দাবী করে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আইন দ্বারা বিচার-ফায়সালা করা ছোট কুফরী। তারা মিথ্যা বলে এবং এর স্বপক্ষে তারা মহান সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা) এর দূর্বল সনদের একটি উক্তিকে ব্যবহার করে, যা তার ব্যাপারে বলা হয়, সুরা মায়িদার ৪৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন- কুফর দুনা কুফর অর্থাৎ বিষয়টি বড় কুফরী নয় বরং ছোট কুফরী।

প্রশ্ন: কুফর দুনা কুফর এর ব্যাপারে ইবনে আব্বাস থেকে বর্নিত আছরগুলোর সনদ কি? প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে তাঁর থেকে বর্নিত সহীহ বর্ননা কি?

উত্তর: আল্লাহর বানী: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থ: "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফির।" (সূরা মায়িদাহ ৫:৪৪) এই আয়াতে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফের। এখানে যে কাফের বলা হয়েছে এটা কি উপরে বর্ণিত কুফুর দুনা কুফর নাকি বড় কুফুর। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত একটি তাফসীর নিয়ে বিভ্রান্তির জাল তৈরী হয়েছে। সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা:) এর কথা অনুযায়ী এটি বড় কুফুর নাকি ছোট কুফুর বিষয়টি প্রমান করার জন্য দেখতে হবে তিনি এ ব্যাপারে কি বলেছেন। এবং যা তার নামে বর্ননা করা হয়ে থাকে তার সত্যতা কতটুকু। চলুন আমরা দেখি, এ ব্যাপারে কি কি বর্ননা রয়েছে, এগুলোর সনদ কি? আছার (সাহাবীর বর্ননা):

প্রথম আছার:

حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي عن سفيان، عــن معمر بن راشد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرن"، قال: هي به كفر، وليس كفرًا بــالله وملائكتــه وكتبــه ورسله.

ইবনে জারীর বলেন আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন হান্নাদ, তিনি বলেন আমাকে হাদীসটি শুনিয়েছে ওয়াকী' এবং ইবনে ওয়াকী', ইবনে ওয়াকী' বলেন আমাকে হাদীসটি শুনিয়েছেন আমার পিতা (ওয়াকী') সুফিয়ান

থেকে, তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মা'মার ইবনে রাশেদ থেকে, তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে তাওস থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা তাওস থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে: "তাঁর (আল্লাহর) বানী, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِكَ هُـمُ الْكَـافِرُون "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফির" এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'এর মধ্যে কুফর রয়েছে, কিন্তু এই কুফরী ফিরিশতা, কিতাব এবং রাসুলদের অস্বীকার করার মত কুফরী নয়' ।" (তাফসীরে ইবনে জারীর সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতের তাফসীর)

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক এই হাদীসটি এভাবে বর্ননা করেন,

نا عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : سئل ابن عباس ، عن قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (١)) ، قال : « هي كفر » ، قال ابن طاوس : « وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله »

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমাদের কাছে বর্ননা করেছেন মা'মার তিনি ইবন তাউস থেকে, তিনি তার পিতা (তাউস) থেকে, তিনি (তাউস) বলেন, ইবনে আব্বাসকে তাঁর বানীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির ।" তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, 'এর মধ্যে কুফর রয়েছে (হিয়া বিহি কুফরুন)' । ইবনে তাওস বলেন, 'কিন্তু এই কুফরী ফিরিশতা, কিতাব এবং রাসুলদের অস্বীকার করার মত কুফরী নয় ।'

আল বারাকাওয়ী বলেন, 'আব্দুর রাজ্জাক অধিক বিশ্বস্ত এবং উত্তম মা'মার থেকে, যদি বিরোধ হয় তবে তার কথাই গ্রহনযোগ্য ।'

ইবনে আসাকীর বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বল কে বলতে শুনেছি, 'যদি তুমি দেখ মা'মার এর সাথীরা বিরোধ করছে, তবে হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক এর জন্য (তার থেকে গ্রহণযোগ্য)' (শারহ ইলাল আত্ তিরমিজি ইবনে রজব কর্তৃক, ভলি ২/৬৯২)

তাহলে বুঝা গেল, وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله **"কিন্তু এই কুফরী ফিরিশতা, কিতাব এবং রাসুলদের অস্বীকার করার মত কুফরী নয় ।" এই কথাটি ইবনে আব্বাস (রা:) এর নয় । কথাটি তাউসের এবং ইবনে**

জারীর বর্নিত আছারে এটি ইদরাজ বা ইবনে আব্বাসের নামে অতিরিক্ত সংযোজন, যা তিনি বলেননি । বরং তিনি শুধু বলেছেন, هي به كفر **' হিয়া বিহি কুফরুন' অর্থাৎ 'এর মধ্যে কুফর রয়েছে' ।**

খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, ইবনে কাসীর ইদরাজ সহ ইবনে জারীর এর এই আসারটি উল্লেখ করেননি ।

আছার দুই:

حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن رجل، عن طاوس:"فأولئك هم الكافرون"، قال: كفر لا ينقل عن الملة

আল হাফিয ইবন নাসর আল মারাওয়ী বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বর্ননা করেন, তিনি বলেন আমাদেরকে আব্দুল রাজ্জাক বর্ননা করেন, তিনি বলেন আমাদেরকে সুফিয়ান বর্ননা করেন, তিনি একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি তাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন: فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَـافِرُون ... তারাই কাফির" তিনি বলেন, 'কুফর, যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না ।' (তাফসীরুল কুরআন লি আবদির রাজ্জাক সুরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য) এই সনদে একজন 'মাজহুল' বা অপরিচিত ব্যক্তির কারনে ইসনাদ টি যয়ীফ (দূর্বল) ।

আছার তিন:

আল হাফিয ইবন নাসর বলেন, আমাদেরকে বর্ননা করেন, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ আমাদেরকে বর্ননা করেন, তিনি হিশাম (বিন হুজাইর) থেকে, তিনি তাউস থেকে, ইবনে আব্বাস রা. তাঁর বানীর ব্যাপারে বলেন, فَأُولَئِكَ هُـمُ الْكَـافِرُون ... তারাই কাফির" তিনি বলেন, 'এটা ঐ কুফরী নয় যা তোমরা মনে করছ ।'

মন্তব্য- এই সনদে সব ব্যক্তিরাই বিশ্বস্ত হিশাম বিন হুজাইর ব্যতীত, তাকে যায়ীফ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সালাফগন: তাদের মধ্যে রয়েছেন আলী বিন মাদীনি, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (আল জারহ ওয়া তা'দীল, ভলি. ৯ পৃ:৫৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতা (ইমাম আহমাদ) কে বলতে শুনেছি, 'আমি ইয়াহইয়াকে হিশাম বিন হুজাইর এর ব্যাপারে

জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি তাকে অনেক দূর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেন'। (আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাত আর রিজাল, ভলি ২ পৃ৩০)

তিনি আরও বলেন, আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমাদ) বলতে শুনেছি, 'হিশাম বিন হুজাইর হচ্ছে মাক্কী এবং সে হাদীসের ব্যাপারে দূর্বল'। (আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাত আর রিজাল, ভলি ১ পৃ ২০৪)

আল উক্বাইলি তাকে ডাকতেন আদ্ দুয়াফা বা দূর্বল রাবী হিসেবে।

আছার চারঃ

আল হাকিম বর্ননা করেন, আলী বিন হারব থেকে, তিনি সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ থেকে, তিনি হিশাম বিন হুজাইর থেকে, তিনি তাউস থেকে বর্ননা করে যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'এটা ঐ কুফর নয় যেদিকে তোমরা ঝুকে পড়ছ (বুঝাতে চাচ্ছ), "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির" হচ্ছে ছোট কুফর (বড়) কুফর না (কুফর দুনা কুফর)। (আল মুস্তাদারক, ভলি.২, পৃ; ৩১৩)

এই আছারটি অনেক বিখ্যাত, কিন্তু এটিও দূর্বল হিশাম বিন হুজাইর এর কারনে, হাদীস বিশারদগন তাকে দূর্বল ঘোষনা করেছেন।

আছার পাঁচঃ

ইবনে জারীর আত তাবারী বলেন, আমাদেরকে মুসান্না বর্ননা করেন, আব্দুল্লাহ বিন সালেহ বলেন, মুওয়াবিয়াহ বিন সালেহ আমাদেরকে বর্ননা করেন, আলী বিন আবি তালহা থেকে, ইবনে আব্বাস তাঁর বানীঃ , وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَـافِرُون "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির" এ ব্যাপারে বলেন, 'যে অস্বীকার করে যা (তিনি) নাজিল করেছেন তাহলে সে কাফির, এবং যে এটি স্বীকার করে ও এর দ্বারা বিচার ফায়সালা না করে সে জালিম এবং ফাসিক্ব।' (তাফসীরে ইবনে জারীর, ভলি. ৪, পৃ.২৫৬)

এই বর্ননাটিও অনেক বিখ্যাত, এবং অনেক তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। সনদে আব্দুল্লাহ বিন সালেহ হচ্ছে, ইবনে মুহাম্মদ বিন মুসলিম আল জুহনী আল মিসরী, আল লাইস বিন সা'দ এর লেখক, এবং সে দূর্বল রাবী। আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতাকে আব্দুল্লাহ বিন সালেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন 'প্রথমে সে দৃঢ় ছিল, পরবর্তীতে তার পতন ঘটে এবং সে কিছুই না।' আলী ইবনুল মাদীনী বলেনে, 'আমি

তার থেকে কিছুই বর্ননা করব না'। (আল ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল, ভলি.২, পৃ:২১৩)

আন নাসায়ী বলেন, 'সে বিশ্বস্ত ছিল না।' আহমদ বিন সালেহ বলেন, 'সে অভিযুক্ত, এবং কিছুই না।' সালেহ জাররাহ বলেন, 'ইবনে মুয়ীন তাকে বিশ্বস্ত হিসেবে গ্রহন করতেন কিন্তু আমার কাছে সে হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।' (আল মিযান-আয-যাহাবী, ভলি. ৪, পৃঃ ৪১১)

আপরদিকে বর্ননাটি মুনক্বাতে (বিচ্ছিন্ন সনদ বিশিষ্ট) এবং অগ্রহণযোগ্য। কারণ আলি বিন আবি তালহা কোন সাহাবীর সময় পর্যন্ত পৌছে নি, না ইবনে আব্বাস বা অন্য কেউ।

ইবনে আবি হতিম বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আলী বিন আবি তালহা ইবনে আব্বাস থেকে তাফসীর শুনেননি। (আল মারাসীল পৃ. ১১৭) এবং ইবনে হিব্বান বলেন, 'সে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ননা করে এবং (অথচ) উনাকে কখনই দেখে নি।' (আয্-ছিক্বাত, ভলি. ৭, পৃঃ ২১১)

হাফিয আত্-তাক্বরীবে বলেন, 'সত্যবাদী কিন্তু তার বর্ননা বিচ্ছিন্ন।'

মুয়ায বিন সালিহ ইবনে হুদাইফ, আন্দালুসিয়ার কাযী-হাফিয তার থেকে বর্ননা করেন, 'সত্যবাদী কিন্তু ভুল করেন।' সুতরাং তিনি নিজে একাকী যথেষ্ট নন (রাবী হিসেবে)।

সুতরাং সনদটি দূর্বল এবং দালীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ রাবী আব্দুল্লাহ বিন সালিহ দূর্বল, সনদে মুওয়াবিয়াহ বিন সালিহ রয়েছেন যে শক্তিশালী নয়, সনদে আলী বিন আবি তালহা রয়েছেন যার সত্যতা শক্তিশালী নয়, অপরদিকে ইবনে আব্বাস পর্যন্ত সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

তাছাড়া আত্ তাবারী তার শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম থেকে বর্ননা করেন যে, সে অজানা, কেউই তার থেকে বর্ননা করেননি, ইমাম তাবারী ছাড়া। আমরা অনুরূপ সনদের একটি দূর্বল হাদীস বর্ননা করে দেখাচ্ছি যে, এই সনদ থেকে বর্ননা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইবনে জারীর আত তাবারী বলেন, আমাদেরকে মুসান্না বর্ননা করেন, আব্দুল্লাহ বিন সালেহ বলেন, মুওয়াবিয়াহ বিন সালেহ আমাদেরকে বর্ননা করেন, আলী বিন আবি তালহা থেকে, 'আলিফ লাম ছোয়াদ যা সুরা আ'রাফের শুরু, ক্বাফ হা আইন ইয়া ছোয়াদ যা সুরা মারইয়ামের শুরু, তা হা ইয়া সীন ছোয়াদ তা সীন মীম নুন এবং এর অনুরূপ এবং রাসুল (সা:)

বলেন এটি একটি ক্বাসাম যা আল্লাহ করেছেন এবং আল্লাহর একটি নাম।’ (তাফসীর আত তাবারী খণ্ড: ৮, পৃ: ১১৫)

আলী বিন আবি তালহা মধ্যবর্তী কোন রাবী ব্যতীত হঠাৎ করে রাসুল (সা:) থেকে বর্ননা করেন, এটা নিশ্চিত রাসুল (সা:) এরূপ কখনই বলেননি, এবং এটা সুনিশ্চিত যে এগুলো আল্লাহর নাম নয়। এই সনদটি যে দূর্বল, মুনকার তা যথেষ্টভাবে দেখানো হয়েছে।

এইসব বর্ননার পর আমরা বলতে পারি এই ব্যাপারে একমাত্র সহীহ বর্ননাটি হচ্ছে, যা আব্দুল রাজ্জাকে বর্ননা করেছেন, ইবনে আব্বাসকে তাঁর বানীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّـهُ فَأُولَئِكَ هُـمُ الْكَـافِرُون “আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির” তিনি বলেন, ‘এর মধ্যে কুফর রয়েছে (হিয়া বিহি কুফরুন)’।

নিফাক্ব
ও
মুনাফিক্ব

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ
জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

অর্থ: "নি:সন্দেহে এ সব মুনাফেক জাহান্নামের সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবে।"

সূরা নিসা ৪:১৪৫

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে অবাক করে এবং সে তার অন্তরে যা রয়েছে, তার উপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। আর সে কঠিন ঝগড়াকারী।"

সূরা বাকারা ২:২০৪

দশম অধ্যায়: নিফাক্ব ও মুনাফিক্ব

প্রশ্ন: নিফাক্ব ও মুনাফিক্ব বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: নিফাক্ব শব্দটি আরবী نفق ধাতু হতে নির্গত। যেমন–نفــق শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'এমন একটি সুড়ঙ্গপথ যার একদিক হতে প্রবেশ করার এবং অপরদিক হতে বের হবার রাস্তা রয়েছে'। শরীয়তের পরিভাষায় নিফাক্ব হচ্ছে: "দ্বীন ইসলামের এক দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরওয়াজা দিয়ে বের হয়ে আসা।" (মুফরাদাতে ইমাম রাগেব)

ঈমানের বিপরীত হচেছ নিফাক্ব। যে নিফাক্বী করে তাকে মুনাফিক্ব বলা হয়। মুনাফিক্বরা জাহান্নামের সর্বনিন্ম স্তরে অবস্থান করবে।

প্রশ্ন: নিফাক্বের কারণ এবং ধরনসমূহ কি কি?

উত্তর: দ্বীন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার পর তা থেকে আবার ফিরে আসা দু'টি কারণে হতে পারে:

প্রথমত: এ প্রবেশ হয়েছে শুধু লোক দেখানোর জন্য। আন্তরিকভাবে সে ইসলামকে গ্রহণ করেনি বরং মন আত্মা তার কুফরের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এ প্রবেশ ইসলামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস-অনুরাগ ও মহব্বত নিয়েই হয়েছে। লোক দেখানোর জন্য সে ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। কিন্তু এ সম্পর্কটি এত দুর্বল যে অন্যান্য সম্পর্ক তার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।

প্রথম শ্রেণীর নিফাক্বকে "নিফাক্ব ফিল আক্বীদা" (বা বিশ্বাসগত নিফাক্বী)। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নিফাক্বকে "নিফাক্ব ফিল আমাল" (বা চরিত্রগত নিফাক্বী) বলা হয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবী (র:) তাঁর স্বলিখিত "ফওযুল কবীর" কিতাবে লিখেছেন: –"নবুয়াতী যুগে দু'ধরনের মুনাফিক ছিল, (১) এক ধরনের মুনাফিক ছিল যারা মুখে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতো বটে, কিন্তু তাদের অন্ত:করণ সম্পূর্ণরূপে কুফর, নাস্তিকতা ও বেঈমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা হচ্ছে সেই মুনাফিক যাদের পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেছে:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا [النساء/١٤٥]

অর্থ: "নি:সন্দেহে এ সব মুনাফেক জাহান্নামের সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবে।" (সূরা নিসা ৪:১৪৫)

(২) আর দ্বিতীয় ধরনের হলো ঐ সকল লোক যারা আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের ঈমানে দৃঢ়তা ছিল না। নানারূপ দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। এ দ্বিতীয় শ্রেণীর নেফাককেই নেফাকে আমলী বা চরিত্রগত মুনাফেকী বলা হয়।

প্রশ্ন: নিফাক্বের প্রকারভেদগুলো কি কি?

উত্তর: আকিদাহ্গত নিফাক্ব ছয় প্রকার। এ শ্রেণীর মুনাফিক জাহান্নামের অতল তলের অধিবাসী :

প্রথম: রাসূল (সা:) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

দ্বিতীয়: রাসুল (সা:)-এর আনীত অহীর কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

তৃতীয়: রাসূল (সা:) এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা।

চতুর্থ: রাসূল (সা:) আনীত বিধানের কিছু অংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা।

পঞ্চম: রাসূল (সা:) এর দ্বীনের অবনতিতে খুশী হওয়া।

ষষ্ঠ: রাসূলের (সা:) দ্বীনের বিজয়কে অপছন্দ করা।

আমলগত নিফাক্ব পাঁচ প্রকার :

এক: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে।

দুই: যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে।

তিন: যখন তাকে বিশ্বাস করা হয়, খিয়ানত করে।

চার: যখন ঝগড়া করে গালি দেয়।

পাঁচ: যখন সে চুক্তি করে, তা ভঙ্গ করে।

এর প্রমাণ রাসূলের (সা:) বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَــاثٌ إِذَا حَــدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: মুনাফিকের (কপটের) লক্ষণ তিনটি: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে। যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় সেটির খেয়ানত করে।" (সহীহ বুখারী ৩৩; সুহীহ মুসলিম ২২০)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَـــانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, চারটি বৈশিষ্ট যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে নিশ্চিত মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে নিফাকির একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল যতক্ষন না সে উহা ত্যাগ করবে। চারটি বৈশিষ্ট্য হলো: তার নিকট আমানত রাখা হয় খেয়ানত করে, কথা বলে মিথ্যা বলে, চুক্তি করলে ভঙ্গ করে আর ঝগড়া করলে অশ্লিল কথা বলে।" (সহীহ বুখারী ৩৪; সহীহ মুসলিম ২১৯; সুনানে তিরমিজি ২৬৩২)

প্রশ্ন: মুনাফিক বনাম গুনাহগার এর পার্থক্য কি?

উত্তর: মুনাফেকীর কোন একটি নিদর্শন ও আলামত কোন লোকের মধ্যে পরিদৃষ্ট হলে তাকে বিনা চিন্তায় মুনাফেক ধারণা করা উচিত নয়। মুনাফেকের যতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার অধিকাংশের উৎসমূল হচ্ছে মানুষের আত্মিক দুর্বলতা ও সীমাহীন পার্থিব লোভ-লালসা। আর এ আত্মিক দুর্বলতা ও সীমাহীন পার্থিব লোভ-লালসা সমস্ত পাপেরও উৎসমূল। এ কারণেই একজন খাঁটি মুসলিমের থেকে এ সব কার্যাবলী প্রকাশ পাওয়া অসম্ভবের কিছুই নয়। সুতরাং এখানে মুনাফেক ও গুনাহগার মুসলিমের মর্যাদা এবং তাদের উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য ভালরূপে বুঝে নেয়া উচিত।

কোন মুনাফেক যখন ইসলামের পরিপন্থী কোন কাজ সাফল্যের সাথে করে, তখন তার অন্তর এ খারাপ কাজের জন্য কোন প্রকার অনুতাপ করার পরিবর্তে সাফল্যজনক কূটনৈতিকতার জন্য গর্ববোধ করে। কিন্তু একজন

মুসলিমের দ্বারা কি এমন কাজ কখনো হতে পারে? যদি অলক্ষ্যে হয়ে যায়, তখন তার অন্তর ও মন–প্রাণের অবস্থা কি হতে পারে? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) তাদের অবস্থা তুলে ধরেছেন:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَـــنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران/١٣٥)

অর্থ: "(আর জান্নাত হচ্ছে সেই সকল মোত্তাকী লোকদের জন্য) যারা ভুলবশত: যদিও কোন অশ্লীল কাজ করে বা পাপের মাধ্যমে স্বীয় আত্মার উপর যুলুম করে, সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনে আল্লাহর (সুব:) খেয়াল ও স্মরণ এসে যায়। আর তারা নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আল্লাহ (সুব:) ব্যতীত আর এমন কে আছে যে, গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? কেহই নেই। আর এ সকল মোত্তাকী লোকেরা বুঝে শুনে জ্ঞাতস্বারে ঐ সকল কৃত গুনাহর কাজ আর দ্বিতীয়বার করে না।" (সূরা আল-ইমরাণ ৩:১৩৫)

উল্লেখিত আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কয়েকটি বিষয় আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়:

প্রথমত: একজন মুসলিম থেকে পাপের কাজ হওয়া সম্ভব এবং হয়েও থাকে।

দ্বিতীয়ত: মুসলিমদের থেকে গুনাহর কাজ প্রকাশ হয়ে পড়লে তা বুঝে-শুনে হয় না বরং অজ্ঞতা ও নফসের আকস্মিক আবেগ-উচ্ছাসের দ্বারা পরাজিত ও প্রভাবিত হবার দরুনই হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত: কোন মুসলিম পাপের কাজ করার পর তাদের অন্ত:করণ আল্লাহর ভয়ে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠে। আর প্রার্থনা করতে থাকে তাঁর নিকট ক্ষমা ও মাগফেরাতের জন্য। সংশোধন হয়ে যায় ভবিষ্যতের আগত দিনগুলোর জন্য।

চতুর্থত: তারা নিজেদের কোন পাপের কাজের উপর স্থির হয়ে থাকে না। বরং তা পরিহার করে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় এবং এ জন্য তাদের মন-মগজ লজ্জা ও অবমাননার ব্যাথায় ব্যাথিত হয়ে উঠে।

কিন্তু মুনাফিকদের মধ্যে এই গুণাবলীগুলো আদৌ বর্তমান থাকে না। তারা শরীয়তের বিপরীত কাজগুলো নফসের কোন আকস্মিক আবেগ উচ্ছাসের বশবর্তী হয়ে করে না। বরং জেনে বুঝে ও সজাগ অনুভূতি নিয়ে দ্বিধাহীন

চিত্তে করে। শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নেয়। তাদের কলবে তখন তওবা ও ইস্তিগফার দূরের কথা আল্লাহর ভয়-ভীতির নাম-গন্ধও বিদ্যমান থাকে না।

একজন মুনাফিক ও একজন গুনাহগার মুসলিমের মধ্যে এ হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য। মুনাফিকী হচ্ছেঃ সম্পূর্ণরূপে একটি বিপরীতধর্মী বিষ। তার মধ্যে আদৌ ঈমানের কোন চিহ্ন নেই। পক্ষান্তরে গুনাহ করার পর যদি মানুষ লজ্জিত না হয় এবং নিজের সংশোধনের জন্য ব্যাকুল হয়ে না উঠে, তবে এ গুনাহই শেষ পর্যন্ত মুনাফিকীর বীজ বপন করে।

সুন্নাহ
ও
বিদআত

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

“ওদের কি এমন কতগুলি মা‘বুদ আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?”

সুরা শূরা ৪২:২১

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ: “কেউ যদি এমন কাজ করে যা আমাদের এই দ্বীনে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যান হবে।”

সহীহ বুখারী ২৬৯৭

একাদশ অধ্যায়: সুন্নাত ও বিদআত

প্রশ্ন: সুন্নাত কি?

উত্তর: 'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ: اَلطَّرِيْقُ 'পথ'। কুরআন মজিদে এই 'সুন্নাত' শব্দটি বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

{سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} (الفتح: ٢٣)

অর্থ: "আল্লাহর সুন্নাত, যা পূর্ব থেকেই কার্যকর হয়ে রয়েছে। আর আল্লাহর এ সুন্নাতে কোনরূপ পরিবর্তন দেখবে না কখনো।" (সূরা ফাতাহ ৪৮:২৩)

এ আয়াতে ব্যবহৃত 'সুন্নাত' শব্দের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ طَرِيْقَةٌ পথ, পন্থা এবং পদ্ধতি। এভাবে দেখা যায় যে, 'সুন্নাত' শব্দটি যেমন আল্লাহর ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়েছে, তেমনি করা হয়েছে নবী ও রাসূলদের ক্ষেত্রেও।

আল্লাহর সুন্নাত ও নবীর সুন্নাত: ইমাম রাগেব ইসফাহানী বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার সুন্নাত বলা হয় তাঁর কর্মকুশলতার বাস্তব পন্থাকে, তাঁর আনুগত্যকারীর নিয়ম পদ্ধতিকে। আর নবীর সুন্নাত হচ্ছে সেই নিয়ম, পন্থা ও পদ্ধতি, যা তিনি বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করে চলতেন।

عن الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

অর্থ:" ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে যারা আমার মৃত্যুর পরে জীবিত থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো আমার সুন্নাত (তরিকা) ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত (তরিকা) ধারণ করা। তোমরা উহাকে শক্তভাবে ধারণ করো এবং তোমাদের মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর। খবরদার! ইবাদতের নামে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তৈরী করা সকল নবউদ্ভাবিত কাজ থেকে বিরত থাক। কেননা সকল নবউদ্ভাবিত ইবাদত বিদআত। আর সকল বিদআত গোমরাহি। (সহীহ মুসলিম ৪৬০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২; মুসনাদে আহমদ ১৭১৪৫) এই হাদীসে বর্ণিত সুন্নাত শব্দটি

নিয়ম, পদ্ধতি ও তরিকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা শুধু এখানেই নয় কুরআন ও হাদীসে যত জায়গায় 'সুন্নত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সব জায়গায়ই শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা পারিভাষিক 'সুন্নত' মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় এক রকম। আর ফুকাহায়ে কিরামদের পরিভাষায় অন্যরকম। আর এসকল পরিভাষা পরবর্তীতে তৈরী করা হয়েছে।

হাদীস বিশারদ বা মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় 'সুন্নাত' হচ্ছে রাসূলে করীম (সা:) এর মুখের কথা, কাজ ও সমর্থন। অনুমোদনের বর্ণনা যাকে প্রচলিত কথায় বলা হয় 'হাদীস'। আর ফিকাহ্শাস্ত্রবীদ বা ফুকাহাদের পরিভাষায় 'সুন্নাত' বলা হয় এমন কাজকে, যা ফরজ বা ওয়াজিব নয় বটে; কিন্তু নবী করীম (সা:) তা প্রায়ই করেছেন।

আমাদের আলোচ্য সুন্নাত হল সেই মূল আদর্শ, যা আল্লাহ্ (সুব:) বিশ্ব-মানবের জন্যে নাযিল করেছেন, যা রাসূলে করীম (সা:) নিজে তাঁর জীবনে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের বিশাল ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন; কেননা নবী করীম (সা:) যা বাস্তবভাবে অনুসরণ করেছেন, তার উৎস হল অহী, যা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তিনি লাভ করেছেন। এ 'অহী' দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন মজীদ, যাকে 'অহীয়ে মাতলূ' বলা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'অহীয়ে খফী' বা 'অহীয়ে গায়রে মাতলূ', বিশেষ পন্থায় আল্লাহ্‌র জানিয়ে দেয়া বিধান ও নির্দেশ। রাসূলে করীম (সা:) এর কর্মজীবনে এ দুটোরই সমন্বয় ঘটেছে পুরোপুরিভাবে। অহীর সূত্রে নাযিল হওয়া আদর্শই রাসূলে করীম (সা:) বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করেছেন, তা-ই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য 'সুন্নাত'। এই সুন্নাতেরই অপর নাম ইসলাম।

প্রশ্ন: البدعة বিদআত কি?

উত্তর: সুন্নাতের বিপরীতই হচ্ছে বিদআত। ইমাম রাগেব 'বিদআত' শব্দের অর্থ লিখেছেন: কোনরূপ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুসরণ না করেই কোন কাজ নতুনভাবে সৃষ্টি করা।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় বিদআত বলা হয়- كُلُّ مَا اَحْدَثَ فِي الدِّيْنِ مَا لَا اَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ অর্থ: "শরীয়াতে ভিত্তিহীনভাবে নব আবিস্কৃত সকল ইবাদতকেই বিদআত বলা হয়।"

বিদআতের আরেকটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

البدعة شرعًا ضابطها "التعبد لله بما لم يشرعه الله"، وإن شئت فقل: "التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خُلفاؤه الراشدون" ...(الخ)

অর্থ: "শরিয়তের পরিভাষায় 'বিদআতের' অর্থ হলো: 'এমন জিনিষের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করা যা তিনি অনুমোদন করেন নাই। অথবা বলা যায়, এমন জিনিষের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করা যার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল (সা:) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনগণ করেন নাই। প্রথম সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে:

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:٢١]

"ওদের কি এমন কতগুলি মা'বুদ আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?" (সুরা শূরা ৪২:২১) আর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা হয়েছে, নিম্নোক্ত হাদীস থেকে:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

"তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো আমার সুন্নাত (তরিকা) ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত (তরিকা) ধারণ করা। তোমরা উহাকে শক্তভাবে ধারণ করো এবং তোমাদের মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর। খবরদার! ইবাদতের নামে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তৈরী করা সকল নবউদ্ভাবিত কাজ থেকে বিরত থাক।" (সহীহ মুসলিম ৪৬০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২; মুসনাদে আহমদ ১৭১৪৫) সুতরাং যে সকল ইবাদত আল্লাহ (সুব:) অনুমোদন করেন নাই। এবং যে সকল ইবাদত রাসূলুল্লাহ (সা:) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনগণ ইবাদাত আকারে করেন নাই সেগুলোই বিদআত। চাই তা আল্লাহর নাম ও গুনাবলীল ক্ষেত্রে হোক অথবা আল্লাহ বিধান ও শরিয়তের ক্ষেত্রে হোক।"

ইমাম শাত্বেবী (র:) বলেন:

البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليهما يقصد بالطريقة الشريعة

অর্থ: "ইসলামের ভিতরে নব উদ্ভাবিত এমন সব ইবাদত যা শরীয়তে স্বীকৃত ইবাদতের মতই সওয়াবের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।"

শরীয়াত প্রবর্তক যে কথা বলেন নি সে কথা বলা এবং তিনি যা করেন নি এমন কাজকে আদর্শরূপে গ্রহণ করাই হচ্ছে বিদআত। এমন সব কাজ করা বিদআত, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। 'দ্বীনের মধ্যে রাসূল সা. ও সাহাবা কর্তৃক প্রবর্তিত আক্বিদা ও আমল পরিপন্থী নতুন আক্বিদা ও আমলের প্রচলন ঘটানোও বিদআত।

সুরা কাহাফের এক আয়াতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় 'বিদআত' শব্দের এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) [الكهف/١٠٣-١٠٥]

অর্থ: "বল (হে নবী!) আমি আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কথা কি তোমাদের বলব? তারা হচ্ছে এমন লোক, যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনাই দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর তারা মনে মনে ধারনা করে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করেছে।" (সূরা কাহাফ ১৮:১০৩-১০৪)

বিদয়াতপন্থীরাও ঠিক এমনি। তারা যেসব কাজ করে, আসলে তা আল্লাহ্র দেয়া নীতির ভিত্তিতে নয়। তা সত্ত্বেও তারা তাকেই নেক আমল এবং বড় সওয়াবের কাজ বলে মনে করে। অথচ তা আল্লাহ (সুব:) কর্তৃক অনুমোদিত ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরিকা অনুসৃত না হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখাত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ: "আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: যে আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু সংযোজন ও সৃষ্টি করবে যা মূলত তাতে নেই সেটি পরিত্যাজ্য।' (সহীহ বুখারী ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম ৪৫৭৯; সুনানে আবু দাউদ ৪৬০৭) কেননা আল্লাহ (সুব:) স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: "আজকের দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ-পরিণত করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম-মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়েদা ৫:৩)

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ। তাতে নেই কোন অসম্পূর্ণতা, কোন কিছুর অভাব। না তাতে কোন জিনিস বৃদ্ধি করা যেতে পারে, না পারা যায় তা থেকে কোন কিছু বাদ দিতে। এ দুটোই দ্বীনের পরিপূর্ণতার বিপরীত এবং আল্লাহ্‌র উপরোক্ত ঘোষণার স্পষ্ট বিরোধী। ইসলামী ইবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াবের কাজ বলে এমন সব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা, যা নবী করীম (সা:) ও সাহাবায়ে কিরামের জামানায় চালু হয়নি এবং তা দেখতে যতই চাকচিক্যময় হোক না কেন তা স্পষ্টই বিদয়াত, তা দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতার কুরআনী ঘোষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

প্রশ্ন: দ্বীনের ভিতর বেদআতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি ?

উত্তর: দ্বীনের ভিতর সকল বিদআতই হারাম। যারা বেদআতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ বলে বিভক্ত করে, তারা ভুল করে থাকেন এবং রাসূল (সা:) এর হাদীসের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে থাকেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থ: "নিশ্চয়ই প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি" (মুসনাদে আহমদ ১৭১৪৪; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২)

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) বেদআত প্রসঙ্গে রায় দিতে গিয়ে বলেছেন প্রত্যেক বেদআতই গোমরাহি আর এরা বলছে, না প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি নয় বরং কিছু বেদআত আছে হাসানাহ (ভাল)।

আল্লামা হফেয ইবনে রজব বলেন: নবী আকরাম সা.-এর বাণী (প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি) ব্যাপক অর্থ বোধক বাক্য। কোন কিছুই তার বহির্ভূত নয়। সকল প্রকারই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটি দ্বীনের একটি বিশেষ মূলনীতি। এটি রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য। আল্লাহর রাসূল বলেন (যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি পরিত্যাজ্য হবে)

সুতরাং যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করবে এবং তাকে দ্বীনের দিকে নিসবত (সম্বন্ধযুক্ত) করবে অথচ দ্বীনে তার কোন মূল ভিত্তি নেই যার দিকে সে ফিরতে পারে, সেটিই গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা। দ্বীন এ সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

বিদআতকে যারা ভাগ করে তাদের যুক্তি প্রমাণ ও তার খণ্ডন:

বিদআতীগণ নিজেদের নব উদ্ভাবিত বিদআতকে বৈধতা দেয়ার জন্য কিছু হাদীস ও কিছু উদাহরণ পেশ করে থাকে। আমরা এখানে সেগুলো উল্লেখ করে তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো।

বিদআতীদের প্রথম দলীল: ওমর (রা:) একবার সালাতে তারাবীহ সম্পর্কে বলেছিলেন : **قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِه** (কত না সুন্দর বেদআত এটি) বেদআতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ দ্বারা বিভক্তকারীদের নিকট ওমর (রা:) এ উক্তিটি ব্যতীত তাদের মতের স্বপক্ষে আর কোন দলিল নেই।

খন্ডন: ওমর রা. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য বিদআতে শারয়ী নয়। বরং শাব্দিক অর্থে বিদআত বলেছেন। ইমাম আবূ শামা বলেন:

وأما قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة هذه"[رواه البخاري في "صحيحه" (٢٥٢/٢) من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري]؛ فالمراد بذلك البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية؛ لأن عمر قال ذلك بمناسبة جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وصلاة التراويح جماعة قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ حيث

صلاها بأصحابه ليالي، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم[انظـر: "صـحيح البخاري" (٢/٢٥٢) من حديث عائشة رضي الله عنها]، وبقي النـاس يـصلونها فرادى وجماعات متفرقة، فجمعهم عمر على إمام واحد كما كان على عهد الـنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي التي صلاها بهم، فأحيا عمر تلك السنة، فيكون قد أعاد شيئًا قد انقطع، فيعتبر فعله هذا بدعة لغوية لا شرعية؛ لأن البدعة الشرعية محرمة، لا يمكن لعمر ولا لغيره أن يفعلها، وهم يعلمون تحذير النبي صلى الله عليـه وسلم من البدع

[للفائدة: انظر: كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة (ص ٩٣ ـ ٩٥) مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبـد الله الفوزان، ١/١٧١، رقم الفتوى في مصدرها: ٩٤.

অর্থ: "ওমর (রা:) এর কথা **نعمت البدعة هذه** 'এটি কতই না সুন্দর একটি বিদআত' দ্বারা কুরআন-হাদীস তথা ইসলামের পরিভাষায় যে বিদআত তা নয়। বরং এখানে শাব্দিক অর্থে বিদআত বলা হয়েছে। কেননা ইসলামের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় 'ভিত্তিহীনভাবে সওয়াবের আশায় নবউদ্ভাবিত ইবাদতকে' সুতরাং যে সকল বিষয়ের একটি শরয়ী ভিত্তি থাকবে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়, সে গুলো সম্পর্কে যখন বিদয়াত বলে মন্তব্য করা হবে তখন শাব্দিক বেদআত বুঝতে হবে শরয়ী বিদআত নয়। আর সালাতে তারাবীহ তো রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেই সাহাবিদের নিয়ে পড়ে ছিলেন। শেষ দিকে এসে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তিনি তার থেকে পিছিয়ে গেছেন। তবে সাহাবারা বিক্ষিপ্ত ভাবে রাসূলের জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর ধারাবাহিক ভাবে পড়েছেন। এক পর্যায়ে এসে ওমর রা. সকলকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করে দিয়েছেন যেমন তারা রাসূলের পিছনে পড়ে ছিলেন। সুতরাং এটি দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন বেদআত ছিল না। বরং একটি বিলুপ্ত সুন্নাতকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কেননা শরিয়তের পরিভাষায় যাকে বিদআত বলা হয় তা তৈরী করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যা ওমর (রা:) বা অন্য কোন সাহাবীর পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়। কেননা বিদআতের বিরূদ্ধে যে সকল সতর্কবাণী রাসূলুল্লাহ (সা:) করেছেন তা

তাদের ভাল করেই জানা ছিল।" (আল বায়েস আলা ইনকারিল বিদায়ি ওয়াল হাওয়াদেস, পৃষ্ঠা ৯৫)

বিদআতীদের দ্বিতীয় দলীল: তারা নিজেদের বিদআতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরেকটি হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করার অপচেষ্টা করে তাকে। সেটি হলো:

عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَـنَّ فِـي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْـتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

অর্থ: "জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে একটি ভাল সুন্নত চালু করলো, সে ওটার সওয়াব পাবে এবং পরবর্তীতে যারা তার উপর আমল করবে সে তাদের সাওয়াবও পাবে এবং আমলকারীদের তাতে কোন কমতি হবে না।" (সহীহ মুসলিম ২৩৯৮; সুনানে নাসায়ী ২৫৫৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ২০৩; মুসনাদে আহমদ ১৯১৫৬)

খন্ডন: বিদআতীদের এই হাদীসে দিয়ে দলীল পেশ করা সঠিক নয়। কেননা এখানে বিদআতে হাসানা চালু করার কথা বলা হয় নাই। বরং সুন্নাতে হাসানা চালু করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া এই হাদীসটি যেই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে সেটি হলো একদল অসহায় সাহাবীদেরকে সাহায্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) সাহাবায়ে কিরামদের নিকট আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আহবানে সাড়া দিয়ে প্রথমে একব্যক্তি কিছু সাহায্য করলো তাকে দেখা দেখি অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামগণও সাহায্য করতে লাগলেন। এবং এক পর্যায়ে এই সাহায্যের পরিমান একটি বড় স্তূপে পরিণত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) খুশি হয়ে উপরোক্ত হাদীসটি বলেন। সুতরাং এ হাদীসকে বিদআতে হাসানা প্রমান করার জন্য পেশ করা আরেকটি গোমরাহী। যেমন গোমরাহী খোদ বিদআতে হাসানা।

বিদআতীদের তৃতীয় দলীল: অত:পর তারা বিদআতে হাসানা প্রমান করার জন্য কিছু উদাহরণ পেশ করে থাকে। তারা বলে যে, এরূপ আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন হয়েছিল কিন্তু সালাফের কেউ সে গুলোকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন কুরআনুল কারীমকে এক মাসহাফে একত্রিত করা, (যা রাসূলের যুগে ছিল না) হাদিস লেখা ও

সংকলন করা এটিও রাসূল (সা:) নিজে করে যাননি, মাদরাসা ঘর তৈরী করা।

খন্ডন: বিদআতীদের উপরোক্ত যুক্তি ও উদাহরণের জবাব দিতে গিয়ে ইমাম আবু শামা বলেন:

أما ما ذكروه من بعض الأمثلة وأنها بدعة حسنة؛ مثل جمع القرآن ونسخ القرآن فهذه ليست بدعة، هذه كلها تابعة لكتابة القرآن، والقرآن كان يكتب ويجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه متممات للمشروع الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فهي داخلة فيما شرعه .

"তারা যে সকল উদাহরণ পেশ করে 'বিদআতে হাসানা' বলে দাবী করেছে। যেমন: কুরআনকে একই মাসহাফে জমা করা, কুরআনকে লিপিবদ্ধ করা, মাদরাসা ঘর তৈরী করা, হাদীস সংকলন করা ইত্যাদি এগুলোর কোনটিই বিদআন নয় বরং এসব গুলোই সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত কেননা কুরআন জমা করা, কুরআনকে বিভিন্ন নুসখায় ছাপানো, এক মাসহাফে কোরআন শরীফ একত্রিত করারও শরিয়তের একটি ভিত্তি আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. নিজে কোরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তাকারে ছিল পরে সাহাবায়ে কেরাম সংরক্ষণের নিমিত্তে সবগুলোকে এক মাসহাফে জমা করেছেন। এমনকি বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এ কাজে নিয়োগ করেছিলেন। যাদেরকে 'কাতেবে অহী' বা অহীর লিখক বলা হতো। এমনিভাবে হাদীস সংকলন করা এটিও কোন বিদআত নয় বরং সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগে হাদীস লেখার প্রমান আছে। রাসূল সা. কতিপয় সাহাবিকে অনুমতি প্রার্থনা করার পর কোন কোন হাদিস লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে তার জীবদ্দশায় কুরআনের সাথে গায়রে কুরআন মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যাপক হারে লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু তার ওফাতের পর উক্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। কেননা তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই কোরআন পূর্ণতা লাভ করে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে সম্পূর্ণ হয়। এরপর মুসলমানগণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য হাদিস সংকলনে হাত দেন।

كذلك ما قالوه من بناء المدارس، هذا كله في تعليم العلم، والله أمر بتعليم العلم، وإعداد العدة له، والرسول أمر بذلك؛ فهذا من توابع ما أمر الله به .

অনুরপভাবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, লিল্লাহ বোর্ডিং চালু করা ইত্যাদিও কোন বিদআত নয়। কেননা এসব কিছুই ইলমে দ্বীন শিক্ষাদানের অন্তর্ভূক্ত আর ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ (সুব:) ও রাসূলুল্লাহ (সা:) দান করেছেন। সুতরাং এসব কিছু আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা:) এর আদেশের অন্তর্ভূক্ত। বিদআতে হাসানা নয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) যেখানে স্পষ্ট বলেছেন, 'সকল বিদআত-ই গোমরাহী'। সেখানে বিদআতকে হাসানা (ভাল বিদআত) আর সাইয়িয়্যা (মন্দ বিদআত) এই দুইভাগে ভাগ করে আল্লাহর রাসূল (সা:) এর বিরূদ্ধে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর রাসূল (সা:) এর উপরে কোন ব্যাপারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে আল্লাহ (সুব:) নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রনী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।" (সুরা হুজরাত ৪৯:১)

যারা বিদআতকে হাসানা ও সাইয়িয়্যা এই দুই প্রকারে ভাগ করে তারা পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানতকারী বলে আখ্যায়িত করে। কেননা আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা ৫:৩)

সুতরাং যে দ্বীনকে আল্লাহ (সুব:) স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তার ভিতরে নতুন কিছু সংযোজন করার অধিকার কারও নেই। যদি করা হয় তার অর্থ দাড়াঁয় এই যে, আল্লাহ (সুব:) যদিও দ্বীন পরিপূর্ণ

করে দিয়েছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা:) সেগুলো ঠিকমত পৌঁছান নাই। বিধায় কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। বিদআতী আলেমগণ বিদআতে হাসান তৈরী করে সেই অংশ পূরণ করছেন। এটার বাস্তব উদাহরণ এরকম, মনে করুন! একজন এম. পি তার অধিনস্ত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়্যারম্যানদেরকে নির্দিষ্ট পরিমান গম, টাকা-পয়সা বরাদ্দ দিলেন জনগনের মাঝে তা বিতরন করার জন্য। পরবর্তীতে জনগনকে তিনি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন জনগণ তা ঠিকমত পায়নি। তাহলে এখানে খেয়ানত করলো চেয়্যারম্যান। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ (সুব:) একটি পরিপূর্ণ দ্বীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা:) কে দান করেছেন। বান্দার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}

অর্থ: "হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না।" (সুরা মায়েদা ৫:৬৭)

কিন্তু এখন এক শ্রেণীর বান্দা মনে করে দ্বীন পরিপূর্ণ নয় কিছু নব উদ্ভাবিত 'বিদআতে হাসানা' ইসলামের ভিতরে সংযোজন করার অবকাশ আছে। এর অর্থ দাড়ায়, রাসূলুল্লাহ (সা:) রিসালাতের দায়িত্ব আল্লাহর বান্দাদের নিকট ঠিকমত পৌঁছান নাই। অথচ এরকম ধারণা করা হারাম। এক শ্রেণীর বিদআতীরা আল্লাহর রাসূল (সা:) এর বিরূদ্ধে এরকম অভিযোগ তুলতে পারে, এ আশংকা থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা:) বিদায় হজ্জের ভাষণের এক পর্যায়ে লাখো জনতাকে সাক্ষী রেখে প্রশ্ন করলেন:

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ .

অর্থ: "তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (আমি আমার দায়িত্ব ঠিকমত আদায় করলাম কিনা?) তখন তোমরা (আমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে) কি উত্তর দিবে? (সহীহ মুসলিম ৩০০৯)

সাহাবাগণ উত্তর দিলেন:

قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ « اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

অর্থ: "হ্যাঁ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহর দেওয়া রেসালাত আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আল্লাহর দেয়া আমানত আপনি ঠিকমত আদায় করেছেন এবং উম্মতের জন্য কল্যাণ কামনা করেছেন। একথা শুনে তিনি শাহাদাৎ আঙ্গুলকে আসমানের দিকে উঠাচ্ছিলেন আবার লোকদের দিকে ইঙ্গীত করছিলেন আর বলছিলেন, **اللَّهُمَّ اشْهَدِ** হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থাক! একথা তিনি তিনবার বললেন।" (সহীহ মুসলিম ৩০০৯)

এরপরই আল্লাহ (সুব:) সীল-মোহর স্বরূপ উপরোক্ত আয়াতটি নাজিল করলেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা ৫:৩) সুতরাং দিন পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে যারা বিদআতে হাসানা নামক ইবাদতকে ইসলামে ভিতরে ঢুকাতে চায় তারা মূলত: পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খিয়ানতকারী হিসাবে আখ্যায়িত করছে। একারণেই ইমাম মালেক (রহ:) বলেছেন:

من ابتدع بدعة فيراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان فى الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا (الاعتصام)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন বিদআ'ত আবিস্কার করে আবার সেটাকে বিদআ'তে হাসানাহ বা ভালো বিদআ'ত মনে করে সে যেনো দাবী করলো যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের ভিতরে খিয়ানত করেছেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ **اليوم اكملت لكم دينكم** "আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। সুতরাং যে সব কাজ তখন দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত ছিল না তা বর্তমানেও দ্বীন নয়।" (মুহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ি ওয়াল ইবতিদায়ী' ১/২৮৪)

প্রশ্ন: বিদ্আ'ত থেকে সতর্ক থাকার অপরিহার্যতা কি?

উত্তর: দ্বীনে ইসলামী একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। আল্লাহ (সুব:) স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন তা স্বয়ং-সম্পুর্ন বিধায় আমাদেরকে

তা অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিদ'আত বা নতুন কোন প্রথার সংযোজন থেকে নিষেধ করা হয়েছে। নবী করীম (সা:) বলেছেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ: "আমাদের এই ধর্মে (দ্বীনে) যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যান হবে।" (সহীহ বুখারী ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম ৪৫৭৯; সুনানে আবু দাউদ ৪৬০৭) অন্যত্র এরশাদ করেছেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

অর্থ: "তোমরা সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খেলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর, তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! কখনও ধর্মে (দ্বীনে) নব প্রবর্তিত কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদআ'ত এবং প্রত্যেক বিদআ'তই পথভ্রষ্টাত।" (সহীহ মুসলিম ৪৬০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২; মুসনাদে আহমদ ১৭১৪৫)

রাসূল (সা:) জুম'আর দিন খুৎবায় বলতেন

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا خَطَبَ ...يَقُولُ « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

অর্থ: "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো মুহাম্মদ (সা:)-এর হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয় বিদআ'ত এবং এরূপ প্রতিটি বিদাআ'ত-ই পথভ্রষ্টতা।" (সহীহ মুসলিম ২০৪২; সুনানে নাসায়ী ১৫৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪৫)

وعن حسان قال : " ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة . " رواه الدارمي

অর্থ:- হাস্সান (রাযি:) বলেন, যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটায় তখন আল্লাহ (সুব:) ঐ পরিমাণ সুন্নাত তাদের থেকে তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না। (সুনানে দারেমী ৯৮; মিশকাতুল মাসাবীহ ১৮৮, হাদীসটি সহীহ)

প্রশ্ন: বিদআত সনাক্ত করার উপায় কি?

উত্তর: যে কোন কিছু পরিমাপের জন্য একটি মাপকাঠি বা স্কেল রয়েছে। যেমন ঘরের মেঝের লম্বা মাপার জন্য মিটার এবং গজের ফিতা রয়েছে। রোগীর জ্বর পরিমাপের জন্য থার্মোমিটার রয়েছে। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ (সুব:) দ্বীনে ইসলামের মধ্যে নতুন সংযোগ করা যে কোন বিষয় (বিদ'আত) সনাক্ত করার জন্য একটি মাপকাঠি বা স্কেল দিয়েছেন। আর এই মাপকাঠি হল কুরআন ও সহীহ হাদীস। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء : ٥٩]

অর্থ: "কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।" (সুরা নিসা ৪:৫৯)

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

অর্থ: "মালেক (র:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে এই সংবাদ পৌঁছেছে, তিনি (সা:) বলেছেন: আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিষ ছেড়ে গিয়েছি, যতক্ষন তোমরা সেদুটি আকড়ে ধরবে ততক্ষন পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটি হচ্ছে: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।" (মুয়াত্তায়ে মালেক ১৫৯৪; মিশকাতুল মাসাবীহ ১৮৬)

সুতরাং বড় আলেম, বুযুর্গ, পীর বাবা, মুরুব্বী যা কিছু বলল বা করলো বা করতে উপদেশ দিল আমার কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে যে মাপকাঠি বা স্কেল (কুরআন ও সুন্নাহ) দেয়া আছে তাতে যাচাই করে দেখবো। যদি তা কুরআন ও সুন্নাহতে কোথাও না পাওয়া যায় , যদি কোন দলিল না থাকে তবে আমি নিশ্চিত হতে পারি এগুলো সব বিদ'আত। কারণ বুযুর্গ, আলেম, পীরবাবা যা বলে তা দলিল না। তারা যা বলছে বা করছে বা করতে বলছে তা প্রমাণের জন্য কোরআন আর সুন্নাহর দলিল দরকার।

প্রশ্ন: প্রচলিত কিছু বিদআতের উদাহরন কি কি?

উত্তর: প্রচলিত বিদআত সম্পর্কে সামান্য আলোচন নিম্নে পেশ করা হলো:

(১) ঈদে মিলাদুন্নবী সা. উদযাপন: এসব অনুষ্ঠানাদি বিদআত ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যাবলম্বন। এই মিলাদুন্নবী রাসুল (সা:) নিজে করেন নাই, কোন সাহাবী করেন নাই, তাবেঈ করেন নাই, কোন ইমামগণ করেন নাই, কোন মুহাদ্দিসীন করেন নাই।

(২) মৃত বা জীবিত ব্যক্তিবর্গ, পুণ্যভূমি ও নিদর্শন থেকো বরকত লাভ করা: নব প্রবর্তিত বিদআতের একটি হচ্ছে মাখলুক দ্বারা বরকত প্রার্থনা করা, এটি পৌত্তলিকতার একটি ধরন। মাজার, পীর, ফকিরদের সাথে জড়িত এই ধরনের অসংখ্য বিদআতের ছড়াছড়ি আমাদের মধ্যে।

(৩) ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যার্জনের ক্ষেত্রে বিদআত: বর্তমান যুগে ইবাদতের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত বিদআতের সংখ্যা অনেক। যেমন (১) উচ্চ কণ্ঠে সালাতের নিয়্যত করা। (২) সালাতের পর জামাতবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চস্বরে জিকির করা। (৩) বিভিন্ন উপলক্ষে, দোয়ার পূর্বে পরে এবং মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সুরা ফাতেহা পড়তে বলা। (৪) মৃতদের জন্য তাজিয়া ও মাতম অনুষ্ঠান করা, খাবার দাবার ও ভোজের আয়োজন করা, পয়সার বিনিময়ে কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করা। (৫) ধর্মের নামে, বিভিন্ন উপলক্ষে, বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপন করা। (৬) রকমারি বেশে, নানাবিধ ঢংয়ে বহুবিধ আওয়াজে সুরে সুর মিলিয়ে তালে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন জিকির আযকার করা, যা আজকালকার সুফীরা করে থাকে। (৭) শাবান মাসের মধ্য রজনীকে রাত জাগরণ এবং দিনকে রোজা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। (৮) প্রচলিত বিদআতের আরও একটি হচ্ছে কবরের উপর সৌধ জাতীয় কিছু নির্মাণ করা, তাকে সেজদার স্থান বানানো, বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে জিয়ারত করা, মৃত ব্যক্তিদের ওসীলা দেয়াসহ এজাতীয় শিরকী কাজ-কারবার। (৯) খতমে খাজেগান। (১০) দুরুদে হাজারী। (১১) ৩১৩ বদরী সাহবীদের নামে চাঁদা কমিটি। (১২) বোখারী শরীফের খতম পড়া। (১৩) ফরজ সালাতের পড় ইমাম মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে দু-হাত তুলে প্রচলিত মুনাজাত করা। (১৪) তাবিজ-কবজ, তাগা-সুঁতা ইত্যাদি।

সংশয় নিরসন:

বিদআতপন্থীরা বলে যে, বিদআতে হাসানা যদি না থাকে তাহলে মোবাইল ব্যাবহার করা, মাইক ব্যাবহার করা, প্লেনে হজ্জ্ব করা ইত্যাদিও বিদআত হওয়া উচিৎ। কারণ এগুলো নবীর যুগে ছিল না।

উত্তর:- এরা মূলত: বিদআত কাকে বলে তাই জানে না। বিদআত হলো "সওয়াবের উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন ভাবে নতুন কোন ইবাদত তৈরী করা।" মোবাইল, মাইক ইত্যাদি তো কোন সওয়াবের জন্য ইবাদত আকারে ব্যাবহার করা হয় না। আর এগুলোকে যদি বিদআত বলতে হয় তাহলে আপনিও বিদআত, আমিও বিদআত। কারণ আমরা কেউ নবীর যুগে ছিলাম না।

কবিরাহ গুনাহ

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ
জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَـــنْكُمْ سَـــيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

অর্থ: “তোমরা যদি সেসব কবীরা গুনাহ পরিহার কর, যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব সম্মানজনক প্রবেশস্থলে।”

সূরা নিসা ৪:৩১

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّـــكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ [النجم/٣٢)

অর্থ: “যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীলকার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত।”

সুরা নাজম ৫৩:৩২

দ্বাদশ অধ্যায়: কবিরাহ্ গুনাহ

প্রশ্ন: কবিরাহ গুনাহ কাকে বলে?

উত্তর: ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ. বলেন, কবীরা গুনাহ হল: যে সব গুনাহের কারণে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শাস্তির বিধান আছে এবং আখিরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যে সব গুনাহের কারণে কুরআন ও হাদীসে ঈমান চলে যাওয়ার হুমকি বা অভিশাপ ইত্যাদি এসেছে তাকেও কবীরা গুনাহ বলে। (কিতাবুল কাবায়ের, সামুসুদ্দীন আয যাহাবী)

ইমাম আবু বকর আল জাযায়েরী (র:) তার রচিত 'আইসারুত তাফাসীরে' সূরা নিসার ৩১ নং আয়াতের তাফসীরে কবীরা গুনাহের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন:

فالكبيرة ما توعد الله ورسوله عليها ، أو لعن الله ورسوله فاعلها أو شرع لها حــدّ يقام على صاحبها

অর্থ: "কবিরা গুনাহ হচ্ছে ঐ সমস্ত গুনাহ যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:) বা তাঁর রাসূল (সা:) ধমকি দিয়েছেন অথবা এই গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে লানত করেছেন অথবা কোন শস্তির ঘোষণা করেছেন।"

তাফসীরে বায়যাবীতে সূরা নিসার ৩১ নং আয়াতের তাফসীরে গুনাহে কবীরার সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে:

أن الكبير كل ذنب رتب الشارع عليه حداً أو صرح بالوعيد فيه . وقيل ما علــم حرمته بقاطع

অর্থ: "কবিরা গুনাহ হচ্ছে প্রত্যেক ঐ গুনাহ যার উপর শরিয়ত কোন শাস্তির ঘোষণা করেছে অথবা স্পষ্টভাবে কোন ধমকি দিয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কবিরা গুনাহ হচ্ছে, ঐ সমস্ত গুনাহ যেগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল প্রমান রয়েছে।"

প্রশ্ন: কবিরাহ গুনাহগুলো কি কি?

উত্তর: কবিরাহ গুনাহগুলো হচ্ছে-

(১) আল্লাহর সাথে শরীক করা। (২) নর হত্যা করা। (৩) যাদুটোনা করা। (৪) সালাত পরিত্যাগ করা। (৫) যাকাত না দেওয়া। (৬) বিনা

ওযরে রমযানের সিয়াম ভঙ্গ করা। (৭) হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা। (৮) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। (৯) আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করা। (১০) ব্যাভিচার করা। (১১) সমকামিতা। (১২) সুদ। (১৩) ইয়াতিম এর মাল আত্মসাৎ করা এবং তার উপর জুলুম করা। (১৪) মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা:)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা। (১৫) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। (১৬) ইমাম বা নেতা কর্তৃক প্রজাদের ধোঁকা দেওয়া এবং তাদের উপর জুলুম করা। (১৭) অহংকার ও বড়াই করা। (১৮) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (১৯) মদ্যপান। (২০) জুয়াখেলা। (২১) সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়া। (২২) গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা। (২৩) চুরি করা। (২৪) ডাকাতি এবং ছিনতাই করা। (২৫) মিথ্যা কসম খাওয়া। (২৬) জুলুম বা অত্যাচার। (২৭) বিক্রয়কর বা অন্যায়ভাবে টোল আদায় করা। (২৮) হারাম খাওয়া, তা যেভাবেই হোক। (২৯) আত্মহত্যা করা। (৩০) কথায় কথায় মিথ্যা বলা। (৩১) দুর্নীতিপরায়ণ বিচারক। (৩২) বিচারের জন্য (বিচারকের) ঘুষ গ্রহন। (৩৩) পোশাক-পরিচ্ছদে নারী ও পুরুষের মাঝে সাদৃশ্য সৃষ্টি। (৩৪) দাইয়ুস (নারীদের বেপর্দা ঘুরাফেরা করা) এবং যে দুজনের মধ্যে বিবাদ ঘটাবার চেষ্টা করে। (৩৫) হিলার উদ্দেশ্যে বিবাহকারী এবং যার জন্য বিবাহ করা হয়। (৩৬) পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা যা খৃষ্টানদের স্বভাব। (৩৭) রিয়া (লোক দেখানো কাজ)। (৩৮) পার্থিব উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন এবং ইল্‌ম গোপন করা। (৩৯) খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা। (৪০) উপকার করে খোঁটা দেওয়া। (৪১) তাকদিরকে অবিশ্বাস করা। (৪২) কান পেতে অন্য লোকের গোপন কথা শোনা। (৪৩) চোখলখোরী করা। (৪৪) লা'নত করা বা অভিশাপ দেয়া। (৪৫) ওয়াদা করে তা রক্ষা না করা। (৪৬) গণক বা জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা। (৪৭) স্বামীর অবাধ্য হওয়া। (৪৮) প্রতিকৃতি বা চিত্রাংকন করা। (৪৯) বিপদে অধৈর্য হওয়া। (৫০) সীমালংঘন করা। (৫১) দুর্বল, দাস-দাসী, স্ত্রী এবং পশুর প্রতি কঠোর হওয়া। (৫২) প্রতিবেশীকে কষ্ট ও গালি দেওয়া। (৫৩) মুসলিমদের কষ্ট ও গালি দেওয়া। (৫৪) আল্লাহ্‌র (সুব:) বান্দাদের কষ্ট দেওয়া এবং তাদের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা। (৫৫) অহংকার ও গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি, জামা ইত্যাদি পোশাক পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া।

(৫৬) পুরুষের স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পরিধান করা। (৫৭) ক্রীতদাসের পলায়ন করা। (৫৮) মহান আল্লাহ্ (সুবঃ) ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা। (৫৯) নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে জেনেশুনে পিতা বলে পরিচয় দেয়া। (৬০) ঝগড়া, আত্মম্ভরিতা ও বিতন্ডা। (৬১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে না দেওয়া। (৬২) মাপে এবং ওজনে কম দেওয়া। (৬৩) আল্লাহর দেয়া অবকাশকে নিরাপদ মনে করা (একান্ত প্রয়োজনে যেসকল কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে প্রয়োজন ছাড়াও ঢালাও ভাবে করা। (৬৪) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। (৬৫) বিনা ওজরে জামা'আত তরক করে একা একা সালাত আদায় করা। (৬৬) ওজর ছাড়া জুমু'আ এবং জামা'আত তরক করার ওপর অটল থাকা। (৬৭) ওসীয়ত দ্বারা কারো ক্ষতি করা। (৬৮) প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজি করা। (৬৯) কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করা এবং তা ফাঁস করে দেয়া। (৭০) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কে গালমন্দ করা। (কিতাবুল কাবায়ের, ইমাম সামুসুদ্দীন আয যাহাবী)

প্রশ্নঃ কবিরাহ গুনাহ থেকে কিভাবে পরিত্রান লাভ করা যায়? কবিরাহ গুনাহ মুক্ত জীবনের সুফল কি?

উত্তরঃ তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার ফলে কোন কবীরা গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّــهَ يَغْفِــرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر/٥٣)

অর্থঃ "বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা যুমার ৩৯:৫৩)

মূলতঃ একনিষ্ঠ তাওবার মাধ্যমে গুনাহ থেকে পরিত্রান লাভ করা যায়। তবে এর জন্য চারটি শর্ত রয়েছেঃ

১। আন্তরিকভাবে খালিস নিয়্যাতের সাথে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

২। ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর না করার সংকল্প করা।

৩। অবিলম্বে উক্ত গুনাহ একেবারেই পরিত্যাগ করা।

৪। গুনাহের সাথে মানুষের অধিকার জড়িত থাকলে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জীবিত থাকে তাহলে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়া, প্রয়োজনে তাকে বা তার উত্তরাধিকারকে সন্তোষজনক ক্ষতিপূরন দেয়া।

এ চারটি শর্ত পূরণ করে মাফ চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ (সুবঃ) কবীরাহ গুনাহ মুক্ত জীবন-যাপনকারীদের সম্পর্কে বলেনঃ

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّــا اللَّمَــمَ إِنَّ رَبَّــكَ وَاسِــعُ الْمَغْفِــرَةِ [النجم/٣٢)

অর্থঃ "যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীলকার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত।" (সুরা আন নাজম ৫৩:৩২)

(কিতাবুল কাবায়ের, সামুসুদ্দীন আয যাহাবী)

বাতিল ফিরকাসমূহ

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ
জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّـذِينَ ضَـلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُـمْ يُحْـسِنُونَ صُنْعًا

অর্থ: "বল (হে নবী!) আমি আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কথা কি তোমাদের বলব? তারা হচ্ছে এমন লোক, যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনাই দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর তারা মনে মনে ধারনা করে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করেছে।"

সূরা কাহাফ ১৮:১০৩-১০৪

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: "আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।"

সুরা আনআম ৬:১৫৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়: বাতিল ফিরকাসমূহ

ইফতিরাক বা মুসলিম উম্মাহর আক্বিদাগত বিভাজন ইসলামী আক্বিদার অন্যতম বিষয়। সুন্নত থেকে বিচ্যুতি ও বিদ'আতের উদ্ভাবনই ইফতিরাকের মূল কারণ। ইফতিরাক বা বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বিদাহ হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর।

اَلْافْتِرَاقُ (আল ইফতিরাক) শব্দটি فَرْقٌ (ফারক) শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ পার্থক্য করা, বিভক্ত করা, বিছিন্ন করা ইত্যাদি। আল ইফতিরাক অর্থ বিছিন্ন হওয়া, দলাদলী করা, বিভক্ত হওয়া ইত্যাদি। اَلْفِرْقَـــةُ (আল ফিরকা) অর্থ হলো দল, সংগঠন ইত্যাদি। আল ইফতিরাক শব্দটি اَلْاجْتِمَـــاعُ (আল ইজতিমা) শব্দটির বিপরীত। আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

অর্থ: "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সুরা আল ইমরান ৩:১০৩)

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) **اَلْاجْتِمَـــاعُ** বা **اَلْجَمَاعَـــةُ** (আল জামাআত) (আল ইজতিমা) এর বিপরীতে **اَلْـــافْتِرَاقُ** (আল ইফতিরাক) ও **اَلتَّفَـــرُّقُ** (আত তাফাররুক) উল্লেখ করেছেন। **اَلْاجْتِمَـــاعُ** (আল ইজতিমা) অর্থ: ঐক্যবদ্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া, দল বিহীন হওয়া।

ইখতিলাফ বনাম ইফতিরাক:

ইফতিরাকের নিকটবর্তী আরেকটি শব্দ হলো ইফতিলাফ। ইফতিরাক অর্থ বিছিন্ন হওয়া বা দলে দলে বিভক্ত হওয়া। আর ইখতিলাফ হলো মতভেদ করা। ইখতিলাফ ও ইফতিরাক এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। মতভেদ বা মতবিরোধ সাধারনভাবে বিছিন্নতা বা দলা-দলি নয়। কিন্তু মতভেদকারী ব্যক্তিগণ যখন নিজের মতকেই একমাত্র হক ও অন্যমতকে বাতিল মনে করেন এবং অন্যমতের অনুসারীদের অন্যদল মনে করেন তখনই তা ইফতিরাক বা বিছিন্নতায় পরিণত হয়। সকল ইফতিরাকই ইখতিলাফ তবে সকল ইখতিলাফ ইফতিরাক নয়। ইখতিলাফ ছাড়া ইফতিরাকের অস্তিত্ব হয় না। তবে ইফতিরাক ছাড়াও ইখতিলাফ থাকতে পারে। ইখতিলাফ

সাহাবীদের যুগেও ছিল। তবে তা ইফতিরাক পর্যন্ত যায় নি। ইসলামে ইখতিলাফ বা মতভেদ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু ইফতিরাক অবশ্যই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। ইখতিলাফ সাধারণত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর মুজতাহিদ ভুল করলেও একটি পুরুস্কার প্রাপ্ত হন। আর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালে দুটি পরুস্কার লাভ করেন। ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইলম বা জ্ঞান ও দলীল। আর ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ। ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আলেমগন প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতকে সঠিক বা অধিক বিশুদ্ধ মনে করলেও অন্য মতটিকে বিভ্রান্তি ও বাতিল বলেন না। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজের মতকে একমাত্র সঠিক, সত্য এবং অন্যমতকে বাতিল ও বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেন। ইখতিলাফ সাধারণত ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর ইফতিরাক সাধারণত: আক্বিদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মুসলিম জাতির মধ্যে ইলম-ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে। কিন্তু এগুলোর সাথে ইফতিরাক থাকতে পারে না। বরং ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসা ইত্যাদির অনুপুস্থিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইফতিরাকের ভয়াবহ পরিণতি

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আমরা জানি যুগে যুগে আসমানী হিদায়াত প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে দলাদলী ও বিভক্তি দেখা দিয়েছে। এর মূল কারণ ছিল: অহীর শিক্ষার ব্যতিক্রম করা বা অহীর কিছু অংশ ভুলে যাওয়া। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, হিংসা ইত্যাদির বশবর্তী হওয়া। ব্যক্তিগত পছন্দ, অপছন্দের প্রতি নির্ভর করা। অতিভক্তি, পূর্ববর্তী গুরুজনদের অন্ধভক্তি ইত্যাদি। ইয়াহুদী, খৃষ্টানদের দলাদলি সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [المائدة : ١٤]

অর্থ: "আর যারা বলে, 'আমরা নাসারা', আমি তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তার

একটি অংশ ভুলে গিয়েছে। ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা উসকে দিয়েছি এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করবেন।" (সুরা মায়েদা ৫:১৪)

এই আয়াতে দেখা গেল খৃষ্টানদের বিভক্তির মূল কারণ ছিল, তাদের উপর নাযিলকৃত অহীর কিছু অংশ ভূলে যাওয়া। অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

{وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ} [المائدة : ٦٤]

অর্থ: "আর আমি তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা ঢেলে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন।" (সুরা মায়েদা ৫:৬৪)

এ আয়াতে ইফতিরাকের মূল কারণ হিসাবে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের অভাব, মতভেদকে শত্রুতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে ইফতিরাক বা দলাদলির কারণ অজ্ঞতা ছিল না। বরং জ্ঞান আসার পরে জিদ, হিংসা, ঔদ্ধত্য নিজমত পরিত্যাগকে অপমান বলে গণ্য করা এবং সর্বোপোরী ইখলাস ও তাকওয়ার অনুপস্থিতিই ছিল ইফতিরাক বা দলাদলির মূল কারণ। মহান আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ } [الشورى : ١٤]

অর্থ: "আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তারা কেবল নিজদের মধ্যকার বিদ্বেষের কারণে মতভেদ করেছে।" (সুরা শুরা ৪২:১৪) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

{كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون : ٥٣]

অর্থ: "প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল।" (সুরা মুমিনূন ২৩:৫৩)

আহলূল কিতাবদের বিভক্তির অন্যতম কারণ অতিভক্তির কারণে অহীর অতিরিক্ত মতামত উদ্ভাবন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} [النساء : ١٧١]

অর্থ: "হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, 'তিন'। তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। আসমানসমূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে যমীনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সুরা নিসা ৪:১৭১)

ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের বিভ্রান্তের আরেকটি কারণ ছিল, এক শ্রেণীর ধমীয় পন্ডিতদের প্রতি পরবর্তীদের অন্ধভক্তি ও বাড়াবাড়ি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة : ٧٧]

অর্থ: "বল, 'হে কিতাবীরা, সত্য ছাড়া তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না এবং এমন কওমের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ বিচ্যুত হয়েছে।" (সুরা মায়েদা ৫:৭৭)

মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক:

আল্লাহ (সুব:) বারংবার এই উম্মতকে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মতো ইফতিরাক বা দলাদলি করতে নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য দলীল রয়েছে। আমরা ধারাবহিকভাবে কয়েকটি দলীল পেশ করছি।

এক:

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُواْ

অর্থ: "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সুরা আল ইমরান ৩:১০৩)

দুই:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

তোমরা তাদের মতো হবে না, যাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ও নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে ।" (সুরা আল ইমরান ৩:১০৫)

তিন:

{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام : ١٥٩]

অর্থ: "নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই ।" (সুরা আনআম ৬:১৫৯)

চার:

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام : ١٥٣]

অর্থ: "আর এটি তো আমার সোজা পথ । সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর ।" (সুরা আনআম ৬:১৫৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطا ثم قال : " هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " ثم قرأ (إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) আমাদের সামনে একটি দাগ টানলেন এবং বললেন এটি আল্লাহর রাস্তা । এরপর এই দাগের ডানে ও বামে আরো অনেকগুলো রেখা টানলেন এবং বললেন এ হচ্ছে অনেকগুলো রাস্তা যার প্রতিটি রাস্তার মুখে মুখে একেকটি শয়তান বসে আছে, যারা ঐ রাস্তায় প্রবেশ করার জন্য আহবান করে । এর পরে তিনি প্রমাণ স্বরূপ উপরোক্ত কুরআনের আয়াতটি

তেলাওয়াত করলেন ।" (সুনানে দারেমী ২০২; মুসনাদে আহমদ ৪১৪২; সুনানে বাইহাকী ৬২৯৭)

এই হাদীসে পরিষ্কার হয়ে গেল আল্লাহর রাস্তা একটাই । শয়তানের রাস্তা অনেক । সরল রেখা একটাই হয় । বক্র রেখা অনেক হয় । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

{ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [النحل: ٩]

অর্থ: "আর সঠিক পথ বাতলে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, এবং **<u>পথের মধ্যে কিছু আছে বক্র</u>** । আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন ।" (সুরা আন নাহাল ১৬:৯) সুতরাং কোন বক্র পথের অনুসরন করা যাবে না । আরেকটি হাদীসে আরও সুন্দরভাবে বলা হয়েছে:

عن أنس بن مالك ،قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة . وإن أمتى ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة .كلها في النار ، إلا واحدة . وهى الجماعة "

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, বনি ইসরাইল একত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছিল । আমার উম্মত বাহাত্তুর দলে বিভক্ত হবে । সকল দলই জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ব্যতিত । তারা হচ্ছে 'আল জামাআহ' । (সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৯৩) অন্য আরেকটি হাদীসে আরেকটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে ।

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমার উম্মতের উপর ঐসকল অবস্থা অতিক্রম করবে যা বনি ইসরাইলদের উপর আবর্তিত হয়েছিল । যেভাবে (উভয় পায়ের) একটি জুতা আরেকটি জুতার সঙ্গে বরাবর হয় । এমনকি তাদের মধ্যে যদি কেউ নিজের মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে যিনায় লিপ্ত হয়ে থাকে । তাহলে আমার

উম্মতের মধ্যেও এমন লোক পাওয়া যাবে যে ঐ কাজ করবে। আর নিশ্চয়ই বনি ইসরাইল বাহত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তিহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে শুধুমাত্র একটি মিল্লাত (জামাআহ) ব্যতিত। আর তা হচ্ছে আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। এই পথে ও মতে যারা থাকবে কেবলমাত্র তারাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।[১০]

এই হাদীসে আমাদের প্রতি পূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে। যে বিভিন্ন দল, বিভিন্ন ফেরকা, বিভিন্ন তরীকা যখন জন্ম হবে তখন এই সমস্ত সকল ফিরকাহ বর্জণ করে রাসূলুল্লাহ (সা:) ও সাহাবায়ে কেরামদের তরীকার অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে যারা বিভিন্ন তরীকা, বিভিন্ন ফেরকা ও বিভিন্ন দলের অনুসরণ করছেন তাদের এই তরীকা, ফেরকাহ ও দল সমূহ কি রাসূল (সা:) এর যুগে ছিল? এগুলো যাদের নামে তৈরী করা হয়েছে যেমন: চিশতী, কাদেরী, নকশাবন্দী, মুজাদ্দেদী ইত্যাদি তাদেরকি জন্ম হয়েছিল? না! অবশ্যই না। তাহলে এগুলো বর্জণ করতে হবে।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

অর্থ: "আবু সাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, (ততদিন কেয়ামত আসবে না যতদিন) আমার উম্মত পূর্ববর্তী জাতির কাজগুলো করবে এবং তাদের অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত করে, গজ গজ করে (ইঞ্চি ইঞ্চি করে)। এমনকি যদি তারা গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তা করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:)! আপনি কি ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কথা বলছেন? নবী (সা:) বললেন, তারা ছাড়া আর কেইবা হতে পারে?" (সহীহ বুখারী ৩৪৫৬; সহীহ মুসলিম ৬৯৫২; মুসনাদে আহমদ ১১৮৪৩;)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

[১০] মুসতাদরাকে হাকেম ৪৪৪; সুনানে তিরমিজি ২৬৪১।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنْ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষন পর্যন্ত আমার উম্মত পূর্ববর্তী জাতিগুলির রীতিনীতি অনুসরণ করবে না বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! পারস্যবাসী এবং রোমবাসীদের মতো? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: তারা ছাড়া আর কারা? (সহীহ বুখারী ৭৩১৯)

যে ব্যধির কারণে বিভক্তি ঘটে তা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ الدِّينِ لَا حَالِقَةُ الشَّعَرِ

অর্থ: "যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: পূর্ববর্তী উম্মতগণের ব্যধি তোমাদের মধ্যে ধিরে ধিরে প্রবেশ করছে। সে ব্যধি হলো হিংসা, বিদ্বেষ। বিদ্বেষ মুন্ডনকারী। আমি বলি না যে তা মাথার চুল মুন্ডন করে বরং তা দিল মুন্ডন করে।" (সুনানে তিরমিজি ২৫১০; মুসনাদে আহমদ ১৪১২)

অন্য হাদীসে বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের প্রকৃতি ও বিভক্তির সময় উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ »

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমার পূর্বে যেই উম্মতের মধ্যেই আল্লাহ

(সুব:) কোন নবী প্রেরণ করেছেন সে নবীর উম্মতের মধ্যে তার ঘনিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তারা তার সুন্নত আঁকড়ে ধরতেন এবং তার নির্দেশ অনুসরণ করতেন। অত:পর তাদের পরে এমন একদল উত্তরসূরীর আবির্ভাব ঘটে যারা যা বলে তা করে না আর যা তাদের করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি তা তারা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এদের সাথে হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মুমিন। যে ব্যক্তি তাদের সাথে মুখ দিয়ে জিহাদ করবে সে মুমিন। এবং যে ব্যক্তি তাদের সাথে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে সে মুমিন। এরপরে আর সরিষা পরিমান ঈমানও অবশিষ্ট থাকবে না।" (সহীহ মুসলিম ১৮৮)

এখানে রাসূলুল্লাহ (সা:) জানিয়ে দিলেন যে, সাহাবীগণের পরের যুগে বিভক্তি আসবে। তাছাড়া তিনি সাহাবীগণের দুটি বৈশিষ্ট ও বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের দুটি বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন। বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের কিছু বৈশিষ্ট আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: "আলী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে যারা বয়সে তরুন এবং বুদ্ধিজ্ঞানে অপরিপক্ক হবে। বোকামী ও প্রগভতায় পূর্ণ হবে। মানুষ যতকথা বলে তার মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। তারা সত্য ন্যায়ের কথা বলবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কন্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা সত্য ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেড়িয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কন্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে। কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরষ্কার থাকবে।" (সহীহ বুখারী ৫০৫৭; সহীহ মুসলিম ২৫১১; সুনানে তিরমিজি ২১৮৮; সুনানে আবু দাউদ ৪৭৬৯; মুসনাদে আহমদ ৯১২)

ইফতিরাকের কারণ:

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, পর্ববর্তী উম্মত এবং এ উম্মতের মধ্যে ইফতিরাকের কারণ নিম্নরূপ:

ক. অহী ভুলে যাওয়া। এ ব্যাপারে একটি আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ } [المائدة : ١٣]

অর্থ: "সুতরাং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা'নত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর। তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে।" (সুরা মায়েদা ৫:১৩)

অহী ভুলে যাওয়া বিভিন্ন দিক রয়েছে:

১. অবহেলার মাধ্যমে কিছু অংশ বিলুপ্ত হওয়া।

২. ব্যাখ্যার নামে মূল অহী বাদ দিয়ে ব্যাখ্যাকেই অহীর স্থলাভিষিক্ত করা।

৩. আহবার ও রুহবান (ধর্মীয় নেতাদের) মা'সূম, নিষ্পাপ ও নির্ভূল বলে বিশ্বাস করে তাদের মতামতকে অহীর সমতুল্য বলে বিশ্বাস করা।

৪.অহীর নামে বানোয়াট ও মিথ্যা কথা প্রচার করা।

৫. দর্শন, যুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে অহীর কিছু অংশ বাদ দেওয়া।

৬. জাগতিক স্বার্থের কারণে অহীর নির্দেশনা বিকৃত করা।

৭. অহী বা কুরআন-হাদীস সাধারন মানুষ বুঝতে পারবে না এটা বুঝতে হলে পনেরটি ইলমের প্রয়োজন এই বলে জনগনকে কুরআন-হাদীস অনুধাবন থেকে সরিয়ে রাখা।

৮. তাবীল ও ব্যাখ্যার নামে অহীর কিছু বিষয় বাতিল করে তার একটি বিশেষ অর্থ আক্বিদার মধ্যে গন্য করা। এতে অহীর মূল ভাষা আক্বিদার থেকে ভূলে যাওয়া হয়।

৯. বানোয়াট কথা বানিয়ে অহীর নামে চালানো বা জাল হাদীস তৈরী করে অথবা জাল হাদীস বা অনির্ভর যোগ্য হাদীস, তাফসীর বা ঘটনার উপরে আক্বিদার ভিত্তি স্থাপন করা।

খ. اتباع الهواء মনগড়া মতামতের অনুসরণ। কুরআনে বারংবার উল্লেক করা হয়েছে যে, ব্যক্তি মনের পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণ করা বিভ্রান্তি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। হাদীস শরিফে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তিকে (اهواء) 'আহওয়া' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى عن رسول الله صلي الله عليه وسلم « وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ ». وَقَالَ عَمْرٌو « الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ ».

অর্থ: "মুআবিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু দল বের হবে যাদের মধে মনগড়া মত বা পছন্দের অনুসরণ এমনভাবে প্রবেশ করবে। যেমনভাবে জলাতঙ্গ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে তার রোগ প্রবেশ করে। তার দেহের সকল শিরা-উপশিরা ও অস্থিসন্ধিতে তা প্রবেশ করে।" (সুনানে আবু দাউদ ৪৫৯৯)

গ. হিংসা বিদ্বেষ।

ঘ. সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি।

ঙ. যা করতে আদেশ করা হয়নি তা করা।

চ. অন্য জাতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

ছ. মুহকাম আয়াত (যারা অর্থ স্পষ্ট) রেখে মুতাশাবিহ আয়াতের (যারা আয়াত স্পষ্ট না) অনুসরণ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران : ٧]

অর্থ: "তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ্। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আলাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে

পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" (সুরা আল ইমরান ৩:৭)

জ. তাত্ত্বিক বিতর্ক ও অহীর মধ্যে বৈপরিত্ব সন্ধান। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمًا – قَالَ – فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِى آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُعْرَفُ فِى وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ « إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِى الْكِتَابِ ».

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন দুপুরের আগেভাগে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট আগমন করি, তিনি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে মতভেদ ও বিতর্কে রত দুব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তখন তিনি আমাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে ক্রোধ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষেরা কিতাবের বিষয়ে মতভেদ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম ৬৯৪৭)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نَفَرًا كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ بِهَذَا بُعِثْتُمْ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِنَّمَا ضَلَّتْ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِمَّا هَاهُنَا فِي شَيْءٍ انْظُرُوا الَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ وَالَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থ: "আমর ইবনে শুআইব (রা:) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দরজায় বসে ছিলেন। তাদের কেউ বলেন, আল্লাহ কি একথা বলেননি? আবার কেউ বলেন, আল্লাহ কি একথা বলেন নি? রাসূলুল্লাহ (সা:) একথা শুনতে পান। তিনি বেরিয়ে আসেন। তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল ক্রোধে লাল হয়ে যায় যেন তার

মুখমন্ডলে বেদানার রস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তোমাদের কি এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর কিতাবের একাংশকে অন্যাংশের বিপরীতে দাঁড় করাবে? তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলি এরূপ করার কারণেই বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমাদের কাজ এটি নয়। তোমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা দেখ এবং তা পালন করো। যা তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন করো।" (মুসনাদে আহমদ ৬৮৫৪)

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْـــدَ هُـــدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرَأَ { مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

অর্থ: "আবু উমামা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, কোন জাতি হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ তা হলো তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা:) এ আয়াতটি পাঠ করলেন: 'তারা কেবল কূটতর্কের খাতিরেই তাকে তোমার সামনে পেশ করে। বরং এরাই এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়।" (মুসনাদে আহমদ ২২২০৪)

এতক্ষন পর্যন্ত আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের ভিতরে বিভিন্ন ফিরকা তৈরী করার কারণ ও তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এখন আমরা উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে কিছু ভ্রান্ত দল ও তাদের মৌলিক আক্বিদাহ, বিশ্বাসগুলো আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ !

ভ্রান্ত মতবাদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকার হলো: যা অনেক পূর্বেই তৈরী হয়েছে এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সমস্ত ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে তারা ভ্রান্ত ও বাতিল। যেমন: শীআ, মু'তাযিলা, মুরজিয়া, জাহমিয়া, কাররামিয়া, জাবরিয়্যা, কাদারিয়্যাহ ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো: নব উদ্ভাবিত যা পীর-সূফীদের বিভিন্ন তরিকার কারণে তৈরী হয়েছে। যেমন: আটরশী, এনায়েতপুরী, চন্দ্রপুরী, দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, কুতুববাগী, চরমোনাই, ছারসিনা, মানিকগঞ্জ, ফুলপুরী আরও অসংখ্য পীর-ফকীর যারা চিশতিয়া, সাবেরীয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়াসহ বিভিন্ন তরিকার নামে ইসলামের ভিতরে বহু ফেরকা তৈরী করেছে। এছাড়া আরও কিছু মারাত্মক ফেরকা রয়েছে

যেমন: কাদিয়ানী, বাহাঈ, আহলে কুরআন, কোয়ান্টাম মেথড ইত্যাদি। আমরা সংক্ষিপ্তাকারে মৌলিক ফেরকাগুলোর আক্বিদাগুলো এখানে আলোচনা করবো। আর পীর-সূফীদের যদিও অনেক দরগাহ ও দরবার রয়েছে তা স্বত্তেও মৌলিকভাবে তারা সকলেই পীর-মুরিদী ও সূফীবাদে বিশ্বাসী। তাদের পরস্পরে যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে তথাপিও মৌলিক আক্বিদায় কোন পার্থক্য নেই। তাদের সকলের কাছেই কুরআন ও হাদীসের চেয়ে বড় দলীল মাছনবী শরীফ (একটি সূফীবাদী কবিতার বই)। তাই পীর-সূফীদেরকে একসুতোয় গেঁথে তাদের মৌলিক আক্বিদাহগুলো আলোচনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ!

প্রশ্ন: শীয়া সম্প্রদায় এবং তাদের আক্বিদাহ কি?

উত্তর: শীয়া (اَلشِّيْعَةُ) শব্দের অর্থ হল দল, অনুসারী, সাহায্যকারী ইত্যাদি। পারিভাষিকভাবে শীয়া বলতে শীয়াতু আলী (شِيْعَةُ عَلِـــيٍّ) বা আলীর (রা:) দল, আলীর অনুসারী বা আলীর সাহায্যকারী বুঝানো হয়। শীয়া ফিরকার মূল ভিত্তি আলী (রা:) তাঁর বংশধরদের জন্য রাষ্ট্রিয় নেতৃত্বের দাবী। এ দাবীকে কেন্দ্র করে অগণিত আকীদা তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

হিজরীর পয়ত্রিশ সনে ওসমান (রা:) এর শাহাদতের পর আলী (রা:) এর বায়আত সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মুসলিম জাতির মধ্যে দলীয় কোন্দল ও ঘরোয়া বিবাদের সুত্রপাত হয়। ঐ সময় মুসলিম সমাজে দলীয় কোন্দলের ইন্ধন যোগানোর জন্য এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য যে দুষ্ট শ্রেণীর লোক ইসলামে অনুপ্রবেশ করে উহাদের অধিকাংশ অগ্নিপূজক ও ইয়ামানের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল।

ইসলামে অনুপ্রবেশকারীগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের আকীদা, সাহাবাগণ (রা:) সম্পর্কে এবং তাওহীদী আকিদায় গন্ডগোল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতামত যাহির করে এক কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। এরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মতে- আলী (রা:) হচ্ছেন স্বয়ং খোদা (নাউযু বিল্লাহ)। এরা আলীর (রা:) আমলেই আত্মপ্রকাশ করে।

আলী (রা:) এদের মুখচেনা পান্ডাগুলিকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। কিন্তু আবর্জনা শেষ হয়নি। এই দলের সদস্যরা যুগ যুগ ধরে এই ধরনের

বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করে আসছিল। সে সময় হিন্দুদেরকে বুঝানোর জন্য এরা বলেছিল যে, আলী হলেন বিষ্ণুর দশম অবতার। এরা আলীর নামে একখানা কিতাব রচনা করে নেয়। উহার নাম রাখা হয় 'মাহদী পুরান'। উহাতে উমাচারী বুদ্ধমত এমন কতগুলি শ্লোক, মন্ত্র ও টীকা লিখানো হয় যা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দুদেরকে উহা গ্রহণে আগ্রহী করা।

অপর দলের মতে আলী (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর রিসালাতের অংশীদার। আলীর নিকট এমন অনেক গোপন ইলম বা তথ্য ছিল যা রাসূল (সা:) কেবল মাত্র তাকে দিয়ে গেছেন। এই সংবাদ প্রমাণ করার জন্য তারা নিম্নের তথ্য রচনা করেছে।

"আমি ও আলী একই নূরে সৃজিত হয়েছি"। এই হাদিসটি জাফর ইবনে আহম্মদ ইবনে আলী নামক ব্যক্তির তৈরীকৃত। হারুন (আ:) মুসা (আ:) এর যেমন নবুয়তের অংশীদার ছিলেন, এই হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সমস্ত গোপন কথা আলী (রা:) নিকট বা মাধ্যমে বলেছেন। তারা এই প্রসঙ্গে কুরআন চল্লিশ পারা বলে দাবী করে তম্মধ্যে দশ পারা আলীর (রা:) নিকট অহী হয় অথবা রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে দিয়ে যান। এই সুবাদে তারা একটি বিতর্কীত হাদীস পেশ করেন যা বহুল প্রচারিত:

أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه

অর্থ: "আমি ইলমের শহর, আলী উহার দরজা। অতএব ইলমের ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশপ্রার্থী যেন তার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে।" অর্থাৎ আলীর (রা:) মাধ্যমে উহা অর্জন করে এবং উক্ত ইলম কেবলমাত্র আলীর (রা:) ভক্ত শীয়াদের নিকটই আছে।

এই হাদীস সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রের পন্ডিতগণ বলেন:

(رواه الترمذي في المناقب من جامعه وقال إنه منكر وكذا قال البخاري إنه ليس له وجه صحيح وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث لم يثبتوه وقيل إنه باطل لكن قال الحافظ أبو سعيد العلائي الصواب أنــه حــسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف فضلا عن أن يكون موضوعا ذكره الزركشي

وسئل الحافظ العسقلاني عنه فقال إنه حسن لا صحيح كمـــا قـــال الحـــاكم ولا موضوع كما قال ابن الجوزي

অর্থ: "ইমাম তিরমিযী (রহ:) বলেন: উহা প্রত্যাখ্যাত কথা, ইমাম বুখারী (রা:) বলেন: উহার কোনও সঠিক সূত্রই নেই, ইমাম ইবনুল জাওযী এই হাদীসটিকে জাল হাদীসের অন্তর্ভূক্ত করেছেন, ইবনে দাকীক আল ঈদ বলেন, এই হাদীস প্রামানিত নয়, আবার কেউ বলেছেন, এটি বাতিল হাদীস।

পক্ষান্তরে হাফেজ আবু সাঈদ আল আলাঈ বলেন: সঠিক কথা হলো এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদের বিবেচনায় হাসান স্তরের। একেবারে সহীহও নয় আবার একেবারে দূর্বলও নয়। জাল হওয়ারতো প্রশ্নই ওঠেনা। ইবনে হাজার আসকালানী (র:) কে এই হাদীসের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এই হাদীসটি হাসান এটাকে হাকেম যেভাবে সহীহ বলেছেন তাও ঠিক নয় আবার ইবনুল জাওযী যেভাবে জাল বলেছেন তাও ঠিক নয়।" (মিরক্বাত ফি শরহে মিশকাত: ১৭/৪৪৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ:) বলেছেন: যে ব্যক্তি শীয়া মতবাদের আবিস্কার করেছে, তার ধর্মীয় মনোভাবের ভিত্তি আদৌ ছিল না, বরং তার উদ্দেশ্য বড়ই অসৎ ছিল। বলা হয়, সে যিনদীক ও মোনাফেক ছিল। উপরে ইসলাম স্বীকার করে ভিতরে কুফরী মত প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। এদের মাযহাবের ভিত্তি হল মিথ্যা কথার উপর। অর্থাৎ নবী (সা:) এর নাম দিয়ে মিথ্যা কথা শরীয়তের বাণী বলে প্রচার করা এবং সহীহ হাদীস সমূহকে অস্বীকার করা। (মাজমু আতুল ফাতাওয়া ১৩ খন্ড ৩১ পৃষ্ঠা)

শীয়াদের বদনীতির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক নীতি হল, ব্যক্তি বিশেষকে বাড়াতে বাড়াতে এতদূর পৌঁছানো যে, যেন তারা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এজেন্ট বা মাধ্যম স্বরূপ। তাই এরা এদের বোযর্গ নামীয় শ্রেণীকে এমন সব উপাধিতে উল্লেখ করে যা কেবল অতিরঞ্জিতই নয়, বরং ইসলামী রীতির বর্হিভূত।

এ পরিপেক্ষিতে শীয়ারা তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে বাবুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহ আয়াতুল্লাহ ইত্যাদি খেতাবে ভুষিত করে অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পৌছানোর জন্য এরা সোপন স্বরূপ। আল্লাহ (সুব:) কে পাবার জন্য এদের দরজায় ধর্ণা দিতে হবে; পরিত্রাণ পাওয়া; হক না হক পথের সবকিছুর এরাই

মাধ্যম; এমনকি জগতের সবাই এদের মুখাপেক্ষী, তাই এদের কতিপয় লোককে গাউস উপাধী দেয় কাউকে কুতুব বলে থাকে। শীয়ারা মুসলিমদের আকীদা লন্ডভন্ড করার জন্য বিভিন্ন কথা জাল করেছে এবং হাদীসের নামে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে যার ফলে সাধারণ লোক তো দূরের কথা, অনেক আলেমও ধোঁকা খাচ্ছে।

শীয়া আক্বিদার সারমর্মঃ

ক. ইমামত সংক্রান্ত আক্বিদা। শীআদের আক্বিদা হলো আল্লাহ (সুবঃ) যেভাবে মানুষের হেদায়াত, পথ প্রদর্শণ ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যুগে যুগে নাবী রাসূলু গণকে মেনোনীত করে এসেছেন তদ্রুপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ওফাতের পর ইমাম মনোনীত করা শুরু করেন। কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তিনি এরূপ ইমাম মনোনীত করেছেন। তাদের প্রথম ইমাম আলী (রাঃ) এবং শেষ ইমাম মুহাম্মদ আল মাহদী আল মুনতাযার। যিনি শীয়া আক্বিদা মতে ২৫৫ অথবা ২৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে চার অথবা পাঁচ বছর বয়সে গায়েব হয়ে যান। তিনি 'সুররা মান রাই' নামক গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। শেষ যমানায় তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

১. শীয়াদের ইমামদের জন্ম সম্পর্কে আক্বিদা হলো তাদের গর্ভ ও জন্ম হয় অদ্ভূত প্রক্রিয়ায়।

২. ইমামগণ নবীর ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হন।

৩. পবিত্র কুরআনে ইমামদের বর্ণনা ছিল। কিন্তু খলীফাগণ তা মুছে ফেলেন।

৪. ইমাম গণ নবীদের মতই আল্লাহর প্রমান, নিষ্পাপ ও অনুগত্যশীল।

৫. ইমামগনের মর্তবা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সমান আর অন্য সকল নবী-রাসূলদের উর্দ্ধে।

৬. ইমামগন যা ইচ্ছা হালাল বা হারাম কারা ক্ষমতা রাখেন।

৭. ইমাম ব্যতিত দুনিয়া কায়েম থাকতে পারে না।

৮. ইমাম গনের জন্য কুরআন-হাদীস ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য জিনিষ রয়েছে।

৯. ইমাম গনের এমন ইলম ও জ্ঞান রয়েছে যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জণকারী মালায়েকা বা নবী-রাসূলগণের নেই।

১০. প্রত্যেক জুমুআর রাত্রিতে ইমামগনের মেরাজ হয় তারা আরশ পর্যন্ত পৌছে।

১১. ইমাম গনের প্রতি প্রতি বছর শবে কদরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা ও রুহ নিয়ে আসেন।

১২. ইমাম গণ তাদের মৃত্যুর সময় জানেন এবং তাদের মৃত্যু তাদের ইচ্ছাধীন।

১৩. ইমামগনের সামনে তাদের দিবা-রাত্রির আমল পেশ হয়।

১৪. ইমামগণ কিয়ামতের দিন সমসাময়িক লোকদের জন্য সাক্ষ্য দিবেন।

১৫. ইমামগণের আনুগত্য করা ফরজ।

১৬. ইমামগণ দুনিয়া আখেরাতের মালিক তারা যাকে ইচ্ছা দেন ও ক্ষমা করেন।

১৭. ইমামগণ মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রেরণ কারী।

১৮. যে ইমামকে মানে না সে কাফের।

১৯. জান্নাতে যাওয়া না যাওয়া ইমামদের মান্য করা না করার উপর নির্ভরশীল।

খ. সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আক্বিদাঃ শীয়াদের দ্বিতীয় প্রধান আক্বিদা হলো সাহাবা বিদ্বেষমূলক আক্বিদা। আলী (রাঃ) ইমামত না মানার কারণে, প্রথম তিন খলীফা ও তাদের আনুগত্যশীল সকল সাহাবায়ে কিরাম কাফের ও মুরতাদ হয়ে গেছে।

গ. কুরআন বিকৃতের আক্বিদাঃ শীয়াদের তৃতীয় প্রধান আক্বিদা হলো কুরআন বিকৃতি সংক্রান্ত আক্বিদা। তাদের মতে কুরআনে 'পাকপঞ্জতন' তথা আলী ও আহলে বাইতের ফজিলত মূলক বর্ণনা সমূহ পরিকল্পিতভাবে কুরআন থেকে বাতিল করা হয়। কুরআনে একটি সূরা ছিল 'সূরাতুল বিলায়াত'। যা বর্তমান কুরআনে নাই।

ঘ. তাকিয়া সংক্রান্ত আক্বিদা। অর্থাৎ মানুষ তার মান-মর্যাদা, জান-মাল, শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাস্তবতাকে অন্তরে লুকিয়ে রেখে মুখে তার বিপরীত প্রকাশ করা। শীয়াদের মতে তাকিয়া কেবল জায়েজ না বরং ওয়াজীব ও জরুরী।

ঙ. কিতমান। আসল আক্বিদা, মাযহাব ও মত গোপন করা ও অন্যের কাছে প্রকাশ না করা।

চ. প্রায়শ্চিত্ত। শীয়াগণ খৃষ্টানদের মত প্রায়শ্চিত্ত আকিদায় বিশ্বাসী।

শীয়াদের ব্যাপারে ফাতওয়া:

শীয়াদের উপরোক্ত আকীদার কারণে বেশীরভাগ ওলামায়ে হক এদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য কিছু কিছু আলেমগণ সতর্কতামূলকভাবে শিয়াদেরকে কাফের না বললেও চূড়ান্ত পর্যায়ের আক্বিদাগত বিদআতী, বিভ্রান্ত, বাতিল ও গোমরাহ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।

প্রশ্ন: خَوَارِجٌ খারেজী কারা, এই সম্প্রদায়ের আক্বিদাহ কি?

উত্তর: শীআ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতবাদের অধিকারী দলটি ছিল খারেজী। এরা ইসলামে সর্বপ্রথম বিদআতী দল এদের বক্তব্যের মধ্যে ছিল। মু'মিন হবে নিখুত খাটি। যে ব্যক্তি ঐরূপ না হবে সে কাফির-চিরজাহান্নামী। তাদের মতে পাপ কুফরীর সমার্থক। সকল কবীরা গুণাহকারীকে এরা কাফের বলে আখ্যায়িত করে (যদি তারা তওবা করে গুণাহ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে) উপরন্তু সাধারণ মুসলমানকেও এরা কাফের বলতো। কারণ, প্রথমত, তারা পাপমুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত সাহাবীদেরকে তারা কেবল মুমিনই স্বীকার করতো না, বরং নিজেদের নেতা বলেও গ্রহণ করতো।

কুরআনকে তারা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হিসেবে মানতো। কিন্তু হাদীস এবং ইজমার ক্ষেত্রে তাদের মত সাধারণ মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

এদের সবচেয়ে বড় দল আযারেকা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক বলতো। এদের মতে নিজেদের ছাড়া আর কারো আযানে সাড়া দেয়া খারেজীদের জন্য জায়েজ নয়। অন্য কারো জবাই করা পশু তাদের জন্য হালাল নয়; কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও জায়েয নয়। খারেজী আর অ-খারেজী একে অন্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরা অন্য সব মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরযে আইন মনে করতো। তাদের স্ত্রী-পুত্র হত্যা করা এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাকে 'মোবাহ' মনে করতো। তাদের নিজেদের মধ্যকার যেসব লোক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না, তাদেরকেও কাফের মনে করতো। তারা তাদের বিরোধীদের ধন-সম্পদ

আত্মসাত করাকে হালাল মনে করতো। মুসলমানদের প্রতি তাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করতো।

উপরোক্ত আলোচন থেকে আমরা খারিজীগণের আকীদা বুঝতে পেরেছি। বস্তুত তারা সর্বদা ইসলাম সম্পর্কে নিজের বুঝ বা মতকেই একমাত্র সঠিক মত বলে মনে করত। এতে কিছু দিনের মধ্যেই তারা কয়েক ডজন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানেও সেই ধারা অব্যাহত আছে। তবে সকল উপদল মোটামুটিভাবে নিম্নের বিষয়গুলিতে একমত ছিল:

১. কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের।

২. উসমান, আলী, জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মু'আবিয়া, সিফফীনের যুদ্ধের দুই সালিস আমর ইবনু আস ও আবু মূসা আশ'আরী (রা:) এবং তাদের দুজনের বা একজনের বিচারকে যে ব্যক্তি সঠিক বলে মনে করে তারা সকলেই কাফির।

এছাড়া তাদের অনেক মতামত রয়েছে এবং এ সকল বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও বিভক্তি রয়েছে।

প্রশ্ন: اَلْمُرْجِئَةُ মুর্জিয়া কারা, এই সম্প্রদায়ের আক্বিদাহ কি? জাহমিয়াদের সাথে এদের মিল কোন দিক থেকে?

উত্তর: মুর্জিয়া (اَلْمُرْجِئَةُ) আরবী আরজাআ (اَرْجَأَ) থেকে গৃহীত 'ইসমু ফাইল'। মূল শব্দ বা ধাতুমূল রা, জিম ও হামযা; রাজাআ (رَجَأَ)। আরজাআ (اَرْجَأَ) অর্থ: বিলম্বিত করা, পিছিয়ে দেওয়া, স্থগিত রাখা ইত্যাদি। মুরজিউন (مُرْجِيٌّ) অর্থ: বিলম্বিতকারী বা স্থগিতকারী। বহুবচন বা ফিরকা অর্থে মুর্জিয়া বলা হয়, বিলম্বিতকারীগণ বা স্থগিতকারীগন।

শিআ এবং খারেজীদের চরম পরস্পর-বিরোধী মতবাদের প্রতিক্রিয়া একটি তৃতীয় দলের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এ দলটিকে মুর্জিয়া বলে অভিহিত করা হয়।

এক: কেবল আল্লাহ এবং রাসূলের تَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ (তাসদীক্ব) অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাসের নামই ঈমান। আমল ঈমানের মূলতত্ত্বের পর্যায়ভূক্ত

নয়। তাই, ফরয পরিত্যাগ এবং কবিরা গুণাহ করা সত্ত্বেও একজন লোক মুসলমান থাকে। তারা বলে **المعصية لا تضرمع الايمان كما ان الطاعة لا تنفـــع مـــع الكفـــر** অর্থাৎ ঈমান থাকলে পাপ করা কোন ক্ষতি নাই। যেমনভাবে কাফের অবস্থায় ইবাদত করলে কোন লাভ নাই। আমাদের দেশে যারা বলে "নামাজ না পড়লে কি হবে ঈমান ঠিক আছে" তারাও আধুনিক মুর্জিয়া।

দুই: নাজাত কেবল ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। ঈমানের সাথে কোন পাপাচার মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। কেবল শিরক থেকে বিরত থেকে তাওহীদ বিশ্বাসের ওপর মৃত্যু বরণই মানুষের নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

কোন কোন মূর্জিয়া আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলে যে, শিরক থেকে নিকৃষ্ট যতবড় পাপই করা হোক না কেন, অবশ্যই তা ক্ষমা করা হবে।

এসব চিন্তাধারা পাপাচার ফাসেকী ও অশালীন কার্যকলাপ এবং যুলুম নির্যাতনকে বিরাট উৎসাহ যুগিয়েছে। মানুষকে আল্লাহর ক্ষমার আশ্বাস দিয়ে পাপাচারে উৎসাহী করে তুলেছে। এ চিন্তাধারার কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, আমর বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার-ভাল কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ-এর জন্য যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়-তা হলে এটা একটা ফেতনা। সরকার ছাড়া অন্যদের খারাপ কাজে বাধা দেয়া নি:সন্দেহে জায়েয-কিন্তু সরকারের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা জায়েয নয়। যেমন বর্তমানেও অনেক আলেমগণ বলেন, "দেশের আইন মানা ফরজ জিহাদ করা জায়েয নাই"। আল্লামা আবুবকর জাসসাস এ জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বলেন, এসব চিন্তা যালেমের হস্ত সুদৃঢ় করেছে। অন্যায় এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

মুরজিয়া ও জাহমিয়া মতবাদ তারা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। মুরজিয়ারা 'আমলের দিক দিয়ে ইসলামকে পঙ্গু করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে প্রকাশ করল যে, নামায, যাকাত, রোযা ইত্যাদি ইসলামী আদেশ সংক্রান্ত আমল সমূহের সাথে ঈমানের কোনই সম্পর্ক নেই। ফলে নামায, যাকাত বা রোযা আদায় করলে ঈমানের কোনও উন্নতি সাধিত হয় না বা এসব পুন্য কর্মের দ্বারা ঈমান বাড়ে না। অনুরূপ ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, চুরি

ইত্যাদি অন্যায় কাজ ঈমানের জন্য ঈমান কমে যায় না। অতএব আমল সমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করার পর কোন গোনাহই মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। মুরজিয়ারা এভাবে শরীয়াতের অনুশাসন বাতিল করে ঈমান কেবল মুখে মুখে উচ্চারণ ও মনে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট বলে প্রচার করল। অতএব যদি কেহ নামাযও পড়ে তার ফজিলত হবে ঈমানের সাথে সম্পর্কহীন পৃথক। অর্থাৎ নামায না পড়লে বা মদ্যপান করলে ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না। এভাবে এরা ইসলামের বিধিনিষেধ পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিথিলতা ও সুবিধার আমদানী করল।

এদের পর জাহমিয়া গোত্ররা বলল: ঈমান মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না, অন্তরে **اَلْمَعْرِفَـــةُ** মারেফত হাসিল হলেই চলবে। মারেফতের চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে আর কোন ইবাদত বন্দেগীর প্রয়োজন হয় না। দলিল পেশ করে:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [الحجر/٩٩)

"আর ইয়াকীন আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।" (সুরা আল হিজর ১৫:৯৯)

তারা এখানে **الْـــيَقِينُ** "ইয়াক্বীন" শব্দের অর্থ করে 'মারেফতের শীর্ষস্তর' অথচ এখানে রাসুল (সা:) "ইয়াক্বীন" অর্থ করেছেন, "মৃত্যু"।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ:) তাদের আক্বীদা প্রসঙ্গে বলেছেন: তাদের বিশ্বাস কালেমা শাহাদাত একবার পাঠ করার পর যত প্রকার অন্যায় করুক ঐ অন্যায়ের শাস্তি ভোগের জন্য আদৌ জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে না।

প্রশ্ন: (اَلْقَدْرِيَّةُ) 'কাদারিয়্যাহ' কারা এবং এদের আক্বিদাহ কি?

উত্তর: কাদারিয়্যাহ (اَلْقَدْرِيَّـــةُ) শব্দটি 'কাদার' (اَلْقَـــدَرُ) শব্দ থেকে গৃহীত। কাদার অর্থ নির্ধারণ। ইসলামের পরিভাষায় কাদার অর্থ আল্লাহর নির্ধারণ, পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর। কাদারী অর্থ তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত। দল বা ফিরকা অর্থে 'কাদারিয়্যাহ' বলা হয়। অর্থাৎ তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত দল বা ফিরকা অর্থে 'কাদারিয়্যাহ' বলা হয়। অর্থাৎ তাকদীরের সাথে সম্পর্কীত দল বা তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ। যারা আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর অস্বীকার করেন তাদেরকে কাদারিয়্যাহ বলা হয়।

প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ থেকে এ মতের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা প্রসার লাভ করে।

আমারা দেখেছি যে, তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ আল্লাহর অনাদি-অনন্ত সর্বব্যাপী ইলম বা জ্ঞানে বিশ্বাস। অর্থাৎ এ কথা বিশ্বাস করা যে, অনাদি কাল থেকে মহান আল্লাহ বিশ্বের কে, কখন, কোথায়, কিভাবে কি করবে, কি ঘটবে সবই জানেন। তাকদীরে অবিশ্বাস করলে আল্লাহর জ্ঞানেও অবিশ্বাস করতে হয়। এজন্য কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ (সুব:) পূর্ব থেকে কিছু জানেন না, বরং যখন যা ঘটে তখন তিনি তা জানেন।

উল্লেখ্য যে, মুতাযিলাগণ কাদারিয়্যাহ ফিরকার সকল মূলনীতি গ্রহণ করে। এজন্য অনেকেই মুতাযিলা ও কাদারিয়্যাহ এক ফিরকা বলেই গণ্য করেছেন। পরে আমরা মুতাযিলাদের বিষয়ে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ!

প্রশ্ন: জাবারিয়া (اَلْجَبْرِيَّةُ) কারা এবং তাদের আক্বিদাহ কি?

উত্তর: জাবার (اَلْجَبْــرُ) শব্দের অর্থ, জবরদস্তি, বাধ্য করা, ক্ষমতা প্রয়োগ ইত্যাদি। জাবারিয়্যাহ সম্প্রদায় কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বিপরীত বিশ্বাস পোষন করে। এরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি বা কর্মশক্তি বলে কিছুই নেই। মানুষ যা করে তা করতে সে বাধ্য। মানুষ চাবি দেওয়া কলের পুতুলের মতই। কাদারিয়্যাহগণ বিশ্বাস করে যে, ভাগ্য বলে কিছু নেই, কর্মই সব। আর জাবারিয়্যাহগণ বিশ্বাস করে যে, কর্ম বলে কিছুই নেই, ভাগ্যই সব। আমরা দেখেছি যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সকল শিক্ষা সমানভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, ভাগ্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কর্ম। আল্লাহ যেহেতু দুটি বিষয়ই উল্লেখ করেছেন সেহেতু দুটি বিষয়ই সত্য। এ দুটির সমন্বয়ে আশা ও ভয়ের মধ্যে ঈমান। জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের গুরু জাহমই জাবারিয়্যা আকীদার প্রথম প্রবক্তা বলে গণ্য।

প্রশ্ন: জাহমিয়্যাহ (اَلْجَهْمِيَّةُ) কারা এবং এদের আক্বিদাহ কি?

উত্তর: জাহমিয়্যাহ অর্থ জাহমের সাথে সম্পর্কিত। জাহম ইবনু সাফওয়ান (মৃত্যু ১২৮ হি:) পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এ ব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রীক দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয়। সে একদিকে 'জাবারিয়া' মতে প্রচারক ও প্রবর্তক ছিল। সে প্রচার করত সে, মানুষের কোনরূপ ক্ষমতা নেই। চাঁদ, সূর্য, ইত্যাদি যেমন ইচ্ছাহীনভাবে আবর্তণ করে, মানুষও তেমনি ইচ্ছাহীন ক্ষমতাহীনভাবে কলের পুতুলের মত চলমান। পাশাপাশি সে মুরজিয়া মতের প্রচারক ছিল। সে বলত যে, হৃদয়ের জ্ঞান বা মারিফাতই ঈমান এবং অজ্ঞতাই কুফুরী।

সে আরো প্রচার করতো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এছাড়া সে আল্লাহর বিশেষণগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করত। সে বলত, যে বিশেষনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিশেষিত করা যায় সে বিশেষণ আমি আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে রাযি নই। কাজেই আল্লাহকে বিদ্যমান, জ্ঞানী, ইচ্ছাকরী ইত্যাদি কিছুই বলা যাবে না। তবে যে বিশেষণগুলি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, যেমন স্রষ্টা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা.. ইত্যাদি। সে আল্লাহর কালাম বা কথার অনাদিত্ব অস্বীকার করত। সে দাবি করত যে, আল্লাহর কালাম আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই কখনোই বলা যাবে না যে আল্লাহ বলেছেন বা কথা বলেছেন, বরং বলতে হবে যে, আল্লাহ কথা সৃষ্টি করেছেন। এরূপ সকল প্রকারের বিভ্রান্তি সে একত্রিত করে। সে এত বেশী সুস্পষ্টভাবে যুক্তির নামে কুরআনের আয়াতসমূহ অস্বীকার করত যে, তেমন কোন ব্যাখ্যারও ধার ধারত না। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (র:) ও অন্যান্য অনেকে ইমাম জাহাম ও তার অনুসারীদের সুস্পষ্টরূপে কাফের বলে গন্য করেছেন। তাঁরা 'জাহমিয়্যাদের মুসলিম ফিরকাদের অন্তর্ভূক্ত না করে অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছেন। পরবর্তীকালে আল্লাহর বিশেষণকে বিকৃত করা বা ব্যাখ্যা করার প্রবণতাকে সাধারণভাবে জাহমিয়্যা' মতবাদ বলে গণ্য করা হয়। উল্লেখ্য যে, মুতাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে জাহমী মতবাদের অনুসারী।

প্রশ্ন: মুতাযিলা কারা, এই সম্প্রদায়ের আক্বিদাহ কি?

উত্তর: মু'তাযিলা (اَلْمُعْتَزِلَةُ) শব্দটি ই'তাযালা (اِعْتَـــزَلَ) থেকে গৃহীত। যার অর্থ: বিচ্ছিন্ন হওয়া, নিঃসঙ্গ হওয়া, একাকী হওয়া ইত্যাদি। প্রথম হিজরীর শেষভাবে এবং দ্বিতীয় হিজরীর প্রথমভাগে বিশ্বাসের বিষয়ে দার্শনিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে মু'তাযিলা মতবাদের সৃষ্টি হয়।

এ সংঘাত মুখর যুগে একটি চতুর্থ মতবাদও জন্ম নেয়। খারেজী এবং মুর্জিয়াদের মধ্যে কুফর এবং ঈমানের ব্যাপারে যে বিরোধ চলে আসছিল, সে ব্যাপারে এদের নিজস্ব ফায়সালা এই ছিল যে, পাপী মুসলিম মুমিনও নয়, কাফেরও নয়, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। منزلـــة بـــين منزلتين এরা কুরআনের ভাষায়; مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَـــاءِ অর্থ:- তারা এর মধ্যে দোদুল্যমান, না এদের দিকে আর না ওদের দিকে। (সুরা নিসা: ১৪৩)

এছাড়াও অনেক মু'তাযিলা ইসলামী আইনের উৎসের মধ্য থেকে হাদীস এবং ইজমাকে প্রায় বাতিলই করে। বর্তমানে এরা আহলে কুরআন নামে কাজ করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেছেন, খাওয়ারেজ ও মুতাযেলী উভয়ের বক্তব্য হল- "আমি নিশ্চিতরূপে স্বীকার করছি যে, ধর্মীয় অনুশাসনগুলি সমস্তই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যখন ধর্মীয় অনুশাসনগুলি কিয়দংশ ছেড়ে দেয়া হল তখন ঈমানের কিছু অংশ চলে গেল। অতএব যখন কিছু অংশ নষ্ট হল তখন তার ঈমান সম্পূর্ণভাবে চলে গেল। যেহেতু ঈমান অংশযুক্ত বস্ত নয়; উহার কিছু অংশ পরিত্যাগ করলে অন্যান্য অংশগুলি পালন সত্ত্বেও সে মু'মিন থাকবে না, কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে; বিধায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ হবে" মু'তাযিলীদের মতে সে মু'মিনও নয়, কাফিরও নয়। এই মাসআলায় মু'তাযিলীদের সাথে খারেজীদের মতপার্থক্য হয়েছে।

মুতাযেলীগণ আবূ বকর (রা:), ওমর (রা:), ওসমান (রা:) ও আলী (রা:) এই ৪ জন খলিফার খিলাফত স্বীকার করে থাকে। খারেজীগণ আবূ বকর ও ওমরের (রা:) খিলাফত স্বীকার করে। ওসমান ও আলীর (রা:) খিলাফত স্বীকার করে না। রাফেযীগণ কেবল মাত্র আলী (রা:) ছাড়া প্রথম তিনজন খলীফার খেলাফত আদৌ স্বীকার করে না।

মুতাযিলাদের কয়েকটি আক্বিদা:

১. আল্লাহর সিফাত ও বিশেষণ অস্বীকার করা। যেমন:

ক. العلم বা আল্লাহর জ্ঞান।

খ. الحي বা আল্লাহর হায়াত বা জীবন।

গ. الارادة আল্লাহর ইচ্ছা।

ঘ. السمع আল্লাহর শ্রবন।

ঙ. البصر আল্লাহর দর্শন।

চ. الكلام আল্লাহর কথা।

এর ব্যাখ্যায় তারা বলেন যে, মহান আল্লাহ জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবন, দর্শন ইত্যাদি অনাদি বিশেষন আছে বলে বিশ্বাস করলে অনাদি সত্তার সংখ্যা হয়ে যায়। এতে আল্লাহর এককত্ব নষ্ট হয়ে যায়। একারণে তার নিজেদেরকে একত্ববাদী বলে দাবী করত। এছাড়া সৃষ্টির সাথে তুলনা হবে এ যুক্তিতে তারা কুরআন হাদীসে উল্লেখিত মহান আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ ও কর্মগুলিকে অস্বীকার করতো। এবং সেগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করতো।

২. মহান আল্লাহ (সুব:) কে আখেরাতে দেখা যাবে না।

৩. আল্লাহর কালাম বা কথা কাদীম বা অনাদি নয় বরং তা মাখলূক বা সৃষ্ট।

৪. তাকদীর বলে কোন কিছুই নাই। মহান আল্লাহ (সুব:) মানুষের কর্মের স্রষ্টা নন। মানুষই মানুষের কর্মের স্রষ্টা।

৫. পাপী মুসলিম কাফেরও নয় মুসলিমও নয়। আখেরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী।

প্রশ্ন: মুশাব্বিহা (اَلْمُشَبِّهَةُ) কারা এবং তাদের আক্বিদাহ কি?

উত্তর: (اَلْمُـــشَبِّهَةُ) মুশাব্বিহা শব্দটি (اَلتَّـــشْبِيْهُ) 'তাশবীহ' ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। তাশবীহ অর্থ তুলনা করা, উপমা দেয়া, সমান বানানো ইত্যাদি। মুশাব্বিহা অর্থ তুলনাকারীগণ। যারা আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণকে মানবীয় সিফাত বা বিশেষনের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে বা মহান

আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে ‘মুশাব্বিহা’ বা তুলনাকারী ফিরকা বলে। যেমন: আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মত, আল্লাহর পা আমাদের পায়ের মত, আল্লাহর চেহারা আমাদের চেহারার মত, আল্লাহর উঠা-বসা আমাদের উঠাবসার মত, আল্লাহর দেহ আমাদের দেহের মত। অথচ মহান আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে বার বার বলেছেন, মহান আল্লাহর কোন তুলনা দিও না। কোন কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু মুসলিম সমাজের কিছু বিভ্রান্ত মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মহান আল্লাহকে মানবাকৃতির বলে কল্পনা করেছে। অথবা আল্লাহর সকল বা কিছু কর্ম বা বিশেষণকে মানুষের কর্ম বিশেষণের মত তুলনীয় বলে মনে করেছে।

প্রশ্ন: কাদিয়ানী ধর্ম এবং এর আক্বিদাহ কি?

উত্তর: পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নতুন ধর্মকে ‘কাদিয়ানী ধর্ম’ বলা হয়। এরা নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বলে দাবী করে। তিনি প্রথমে নিজেকে একজন সূফী সাধক ও মুজাদ্দেদ বলে দাবী করেন। পর্যায়ক্রমে ইমাম মাহদী, অত:পর মাসীহে মাওয়ূদ (প্রতিশ্রুত ঈসা মাসীহ) অত:পর মুহাম্মদ (সা:) এর অধিনে জিল্লি নবী (ছায়া নবী), বুরুজী নবী ও উম্মতি নবী বলে দাবী করেন। অত:পর ১৯০১ সালে তিনি স্পষ্টভাবে শরিয়তের অধিকারী পূর্ণ নবী বলে দাবী করেন। এরপর থেকে তার মৃর্তু পর্যন্ত এই দাবীর উপর অটল ছিলেন। বরং মাঝে মধ্যে অন্য সকল নবী-রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবীও করেছেন।

মির্জা গোলাম আহমদের দাবীসমূহ:

তার দাবীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০টি। এসব দাবীর অনেকটা পরস্পর বিরোধীও ছিল আবার বিচিত্রও ছিল। যেমন তার কয়েকটি দাবীর কথা নিম্নে তুলে ধরা হল:

১. মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী। ২. ইমাম হওয়ার দাবী। ৩. খলীফা হওয়ার দাবী। ৪. ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী। ৫. ঈসা ইবনে মারইয়াম হওয়ার দাবী। ৬. ঈসা ইবনে মারইয়ামের অবতার হওয়ার দাবী। ৭. মসীহে মাওউদ (প্রতিশ্রুত মাসীহ) হওয়ার দাবী। ৮. যিল্লী নবী বা বুরূজী নবী

অর্থাৎ ছায়া নবী হওয়ার দাবী। ৯. উম্মতী নবী হওয়ার দাবী। ১০. এলহামী নবী হওয়ার দাবী। ১১. নবী হওয়ার দাবী। ১২. রাসূল হওয়ার দাবী। ১৩. তার নিকট ওহী আসার দাবী। ১৪. তার উপর ২০ পারার মত কুরআন নাযিল হওয়ার দাবী। ১৫. ঈসা (আ:) থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী। ১৬. সকল নবীর সমকক্ষ হওয়ার দাবী। ১৭. তিনি আদম, শীষ, নূহ, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইউসূফ, মূসা, দাউদ, ঈসা প্রমুখ বিভিন্ন নবী হওয়ার দাবী করেছেন। ১৮. কোন কোন নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী। ১৯. সমস্ত নবী রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী। ২০. আহমদ হওয়ার দাবী। ২১. মুহাম্মদ হওয়ার দাবী। ২২. মুহাম্মদ বরং মুহাম্মাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী। ২৩. তিনি জগতবাসীর জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ। ২৪. তাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান-যমিন কিছুই সৃষ্টি করা হত না। ২৫. আল্লাহর প্রকাশ হওয়ার দাবী। ২৬. শ্রী কৃষ্ণের অবতার হওয়ার দাবী। ২৭. তিনি আল্লাহর পুত্র হওয়ার দাবী। ২৮. শ্রী কৃষ্ণ হওয়ার দাবী। ২৯. যুলকারনাইন হওয়ার দাবী।

এছাড়াও তার দাবীর শেষ ছিল না। একপর্যায়ে তিনি তার মধ্যে আল্লাহর অবতারিত হওয়ার কথা এবং অন্যত্র (স্বপ্নযোগে) আল্লাহ হওয়ার দাবী করেছেন।

কাদিয়ানীদের আক্বিদা-বিশ্বাস:

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পূর্বে উল্লেখিত দাবীসমূহ থেকে কাদিয়ানীদের আকিদা-বিশ্বাস কি তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা থেকে তাদের যে আক্বিদা বিশ্বাস ফুটে ওঠে সংক্ষেপে তা হলো নিম্নরূপ:

১. ইমাম মাহদী সম্পর্কিত মুসলিমদের ধারণা ভুল। ২. ঈসা মাসীহ সম্পর্কীত মুসলিমদের ধারনা ভূল। ৩. খতমে মুসলিমদের ধারণা ভুল। ৪. মুহাম্মাদ (সা:) এর পরে আরও নবী-রাসূল হতে পারে। ৫. গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবী তার নিকট অহী আসত, তার উপর ২০ পারার মত কুরআন নাযীল হয়েছিল। ৬. আল্লাহর পুত্র হতে পারে। ৭. গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মুহাম্মদ (সা:) এর প্রকাশ (ظُهُوْرٌ) ছিলেন। ৮. গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আল্লাহর প্রকাশ (ظُهُوْرٌ) ছিলেন। ৯. গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন আহমদ এবং মুহাম্মদ। ১০. গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

ছিলেন আল্লাহর অবতার। **১১.** গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন কৃষ্ণের অবতার। এছাড়াও তারা রাম-চন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যরদাশত, কনফুসিয়াস ও গুরুনানককে নবী ও রাসূল বলে বিশ্বাস করে। তারা পূর্ণজন্মবাদে বিশ্বাসী। মির্জা গোলাম আহমদ খাতামুন্নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী। তার পরে আর কোন নবী আসবেন না।

ফাতওয়া: উপরোক্ত আক্বিদার ভিত্তিতে কাদিয়ানীদেরকে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের বলে ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে। **১৯৭৪** সালে রাবেতা আলমে ইসলামীর উদ্যোগে পবিত্র মক্কা-মুকাররমার কনফারেন্স **১৪৪**টি মুসলিম রাষ্ট্র ও সংগঠনের অংশ গ্রহনে ঘোষনা করা হয় যে, কাদিয়ানীরা কাফের এবং তাদের প্রচারিত কুরআন শরীফের তাফসীর বিকৃত। তারা মুসলিম জাতিকে ধোঁকা দিচ্ছে এবং পথভ্রষ্ট করছে। **১৯৮৮** সালে ও.আই.সির উদ্যোগে ইরাকে সকল মুসলিম দেশের ধর্মমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে প্রত্যেক মুসলিম দেশে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষনা দেওয়ার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়। সে মতে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মুসলিম দেশই যথা: সাউদি আরব, ইরাক, ইরান, কুয়েত, মালয়েশিয়া কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষনা করেছে। পাকিস্তান গণপরিষদ **১৯৭৪** সালে আইনগত এবং শাসনতান্ত্রিক ভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানে **১৯৭৪** সালে কাদিয়ানীগণ অমুসলিম ঘোষিত হওয়ার পর কাদিয়ানী ধর্মমতের সুতিকাগার লন্ডনে তাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে। বৃটেন ও বর্তমান বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান নেতা আমেরিকা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

প্রশ্ন: বাউল সম্প্রদায় এবং তাদের আক্বিদাহ কি?

উত্তর: বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের লালন ও তার অনুসারী ফকীরদেরকে বাউল, বেশরা ফকীর, ন্যাড়া ফকীর ইত্যাদি নামে অবিহিত করা হয়। তবে বাউল নামেই তারা বেশী পরিচিত। বাউলদের মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ক. হিন্দু জাতির বাউল তথা বৈষ্ণব, বৈষ্ণব বাউল, বাউল মহান্ত, বৈষ্ণব রসিক প্রভৃতি। খ. মুসলিম জাতির বাউল তথা পীর-সূফী, গাউছ-কুতুব, সাঁই, ফকীর প্রভৃতি। বিস্তারিত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাউলগণ নির্দিষ্টভাবে হিন্দু বা মুসলিম কোন সম্প্রদায়েরই

আচার-আচারণ বা দর্শনের অনুসারী নয় বরং বাউলদের অনেকগুলি নিজস্ব বিশেষ দর্শন রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি দর্শন নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. চারচন্দ্র ভোজন: চারচন্দ্র বলতে বুঝায় শুক্র, রজ:, বিষ্ঠা ও মুত্র। বাউলদের মতে সিদ্ধি অর্জন করার জন্য এই চারচন্দ্র সাধনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাউলদের দাবী হলো: চারচন্দ্র সাধনায় কামজয় হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাযোগে বাউলগণ প্রকৃতি আশ্রয়ী হয়ে সাধনা করতে গিয়ে তারা পানক্রিয়া অনুষ্ঠান করে এসব পান করে থাকে। বাউলগন শুক্র বা বীর্যকে ইশ্বরের বীজ বলে আখ্যায়িত করে থাকে। বাউল গবেষক ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহ তথা বাউল ধর্মমত সর্ম্পকে বলেন, বাউলগন পুরুষদের বীজরূপী সত্তাকে ইশ্বর বলেন। বাউলদের মতে এই বীজ সত্তা বা ইশ্বররস ভোক্তা লীলাময় ও কামক্রিয়াশীল। বীজকে ইশ্বর আখ্যায়িত করার কারণে অনেকে বাউলদের বীজেশ্বর বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এদের অনেকেই বলে থাকে বিসমিল্লাহর অর্থ হলো 'বীজ মে আল্লাহ'।

২. মনের মানুষ তত্ত্ব: বাউলগন আল্লাহ, অচিন পাখি, মনের মানুষ, আলেক সাঁই ইত্যাদিকে সমার্থবোধক মনে করে থাকে।

৩. আল্লাহ ও রাসূল এক হওয়ার তত্ত্ব: বাউলদের মতে আল্লাহ ও রাসূলদের মতে কোন পার্থক্য নেই। যিনি আল্লাহ তিনিই রাসূল। এ প্রসঙ্গে লালন বলেন:

আছে আল্লাহ আছে রাসূল#এতে কোন ভুল নাই।
আল্লাহ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা#এই এক সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করে সার।
যে নিরঞ্জন সেই নূর নবী নামটি ধরে#কে পারে সে মকর উল্লাহর মকর বুঝিতে।
আহাদে আহমদ নাম হয় জগতে#আত্মতত্ত্বে ফাযিল যে জনা
জানতে পায় নিগুঢ় কারখানা#হল রাসূল রূপে প্রকাশ রাব্বানা।

৪. মুরশিদ তত্ত্ব: যেহি মুরশিদ সেহি খোদা। বাউলদের একটি প্রসিদ্ধ তত্ত্ব হলো মুরশিদ তত্ত্ব। একে পীর তত্ত্ব ও গুরু তত্ত্বও বলা হয়। তারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য করেন না। তেমন আল্লাহ ও মুরশিদের

মধ্যেও কোন পার্থক্য করেন না। এ প্রসঙ্গে তাদের প্রসিদ্ধ উক্তি হলো: যেহি মুরশিদ সেহি খোদা। লালন ফকীর মুরশিদকে লক্ষ্য করে বলেন,

আপনি খোদা আপনি নবী#আপনি সেই আদম ছবি
অনন্ত রূপ ধরে ধারণ#কে বোঝে তার নিরাকারণ
নিরাকার হাকীম নিরঞ্জন#মুর্শিদ রূপ ভজন পথে

তিনি আরো বলেন:

মুরশিদ বিনে কি মন ধন আছে রে এ জগতে
মুরশিদের চরন সুধা#পান করলে হবে ক্ষুধা
করনা আর দিলে দ্বিধা#যেহি মুরশিদ সেহি খোদা

এরা মূলত: সূফীদের 'ফানা ফিল্লাহ'র আক্বিদায় বিশ্বাসী। যা মনসূর হাল্লাজ থেকে পীর-সূফীদের আক্বিদায় ছড়িয়ে পরে। ফানা ফিল্লাহর অর্থ হলো, বান্দা আল্লাহর ইবাদত করতে করতে আল্লাহর মধ্যে নিজ অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে। আর এটা পীর-সূফীদের সকল তরীকার মধ্যেই স্বীকৃত। অথচ আল্লাহ হলেন খালেক সৃষ্টিকর্তা আর বান্দা হলো মাখলূক বা সৃষ্টি। আল্লাহর সাথে বান্দার কোন বিষয়ে সাদৃশ্যতা নেই। তাই বান্দা আল্লাহর সাথে একাকার হয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এসব ভ্রান্ত আক্বিদা পীর-সূফী, বৈরাগী-সন্যাসী ও বাউলদের তৈরী করা মনগড়া মতবাদ। যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

৫. সর্বধর্ম সমন্বয়ের দর্শন:

'বাংলার বাউল দর্শন' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বাউল ধর্মের লক্ষ্য হলো সকল ধর্মের সার সমন্বয় সাধন। সর্ব ধর্মের মূল লক্ষ্য আত্মার মুক্তি। আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভের মূল বানী সমূহ ও মতাদর্শের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে বাউল মতবাদ। এই মতবাদের কারণেই বাউলগণ একদিকে আল্লাহর রাসূলের বিশ্বাসের কথাও বলে আবার রাম, নারায়ন প্রমূখকে ইশ্বর বা ইশ্বরের অবতার হিসাবেও স্বীকার করে। একারণেই বাউল রচিত সংগীত বা গানে হিন্দু-মুসলমান উভয় দলের মতবাদই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বাংলার বাউল দর্শন গ্রন্থে বলা হয়েছে। হিন্দু বাউল যেমন সূফী ভাবধারাকে মেনে নেয় তেমনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব মুসলমান জাতির বাউল তথা সূফী-দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায় এড়িয়ে থাকে নি।

৬. অহী ভিত্তিক কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার: বাউলরা ঐশী শাস্ত্র বা জিবরাইল মারফত কোন নবীর প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কোন শাস্ত্র ভিত্তিক কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা মানে না। কারণ এ সবের ভিত্তি হলো চেতনা। বাউলরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম চেতনাকে স্বীকার করেনা। দেশ, জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কেবল মানুষকে জানতে মানতে ও শ্রদ্ধা জানাতে চায়। মানুষের ভিতর মনের মানুষকে খুজে পেতে চায়। তারা অহী ভিত্তিক ধর্মকে অস্বীকার করে।

৭. সংসার ত্যাগ: বাউলগণ সংসার বিরাগী হয়ে থাকেন। নিষ্ক্রিয়তা, জীবন বিমুখতা ও আত্মসন্ধানের মাধ্যমে তাদের কথিত 'মনের মানুষ'কে সন্ধানই তাদের প্রধান লক্ষ্য। অথচ এরকম বৈরাগ্য বাদ ইসলাম সমর্থন করে না। হাদীসে বর্নিত হয়েছে:

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ دَخَلَتْ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ أَحْسَبُ اسْمَهَا خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ فَسَأَلَتْهَا مَا شَأْنُكِ فَقَالَتْ زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لَهُ فَلَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ فَوَاللَّهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ

অর্থ: "উরওয়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উসমান ইবনে মাযউন (রা:) এর স্ত্রী যার নাম সম্ভবত খাওলা বিনতে হাকীম মলিন অবস্থায় আয়শা (রা:) এর নিকটে আসলেন। আয়েশা (রা:) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি তোমার কি হয়েছে? মহিলা উত্তর দিল, আমার স্বামী সারা রাত্রি জাগরণ করে আর দিনে সাওম রাখে। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা:) ঘরে প্রবেশ করলে আয়শা (রা:) এ কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা:) কে জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) ওসমানের সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হে ওসমান! আমাদেরকে 'সন্ন্যাস বাদে'র বিধান দেওয়া হয় নাই। আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নেই। জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে আমি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি এবং আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর বিধান মেনে চলি।" (মুসনাদে আহমদ ২৫৮৯৩; সহীহ ইবনে হিব্বান ৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা)

৮. সংগীত সাধনা: সংগীত বাউলদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। বাউলদের গানগুলো ‘মারফতি গান’, ‘মুর্শেদী গান’ নামে প্রসিদ্ধ। উত্তর বঙ্গে বাউল গান সাধারণত ‘দেহ তত্ত্বের গান’ নামে এবং ‘বাউল গান’ নামে পরিচিত। এসব গানের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সবধর্মের মতামতই প্রাধাণ্য পেয়ে থাকে। কারণ তারা নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অনুসারী নয় বরং তারা সর্বধর্মের সমন্বয়ের প্রবক্তা। ফকীর লালন শাহ তার গীতের জন্যই খ্যাতি অর্জন করেন। বাউলদের উপরোক্ত দর্শন ছাড়াও ‘প্রেমতত্ত্ব’ ‘রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব’ ‘আত্মিক বিবর্তণবাদ’ প্রভৃতি দর্শন রয়েছে।

প্রশ্ন: “আহলে কুরআন কারা এবং এদের আক্বিদা কি?

উত্তর: আহলে কুরআন নামটি খুবই সুন্দর। যার অর্থ আল কুরআনের অনুসারী দল। কিন্তু এই সুন্দর নামের সুবাদে তারা হাদীসকে অস্বীকার করে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতে এদের প্রচুর অনুসারী রয়েছে। এরা হাদীস অস্বীকারের ব্যাপারে চালাকীর আশ্রয় নিয়ে থাকে।

হাদীস অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে যেসব কারণ এখন পর্যন্ত সামনে এসেছে সেগুলো চার ধরণের:

১। রাসূলে কারীম (সা:) এর দায়িত্ব ছিল শুধু কুরআন পৌছানো। আনুগত্য ওয়াজিব শুধু কুরআনের। রাসূল হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আনুগত্য না আমাদের উপর ওয়াজিব না সাহাবায়ে কিরামের উপর ওয়াজিব ছিল। এবং অহী মাতলূ (প্রত্যক্ষ অহী বা কুরআন) এবং অহী গায়রে মাতলূ (অপ্রত্যক্ষ অহী বা হাদীস) বলতে কোন কিছু নেই। তাছাড়া কুরআনুল কারীম বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজন নেই।

২। রাসূল (সা:) এর বানীগুলো সাহাবীদের জন্য তো প্রমান ছিল কিন্তু আমাদের জন্য তা প্রমান নয়।

৩। রাসূল (সা:) এর হাদীস সমূহ সমস্ত মানুষের জন্য হুজ্জাত বা প্রমান। কিন্তু বর্তমানে হাদীসগুলো আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌছেনি। এজন্য আমাদের উপর এগুলো মানার দায়িত্ব বর্তায় না।

৪। রাসূল (সা:) এর হাদীস হুজ্জাত। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ জন্নী বা ধরণামূলক (নিশ্চিত অর্থবোধক নয়) বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

আহলে কুরআনদের কিছু আক্বিদা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। কুরআন কর্তৃক শিখানো সালাত পড়াই ফরজ। এছাড়া অন্য কোন সালাত পড়া কুফুর ও শিরক। তাদের মতে ফরজ সালাত মোট তিন ওয়াক্ত। ফজর, যোহর ও মাগরীব। আর নফল সালাত এক ওয়াক্ত অর্থাৎ তাহাজ্জুদ। এই মোট চার ওয়াক্ত সালাতের সময়। এছাড়া সালাতের কোন ওয়াক্ত নেই। দলীল হিসাবে তারা কুরআনের নিম্নের আয়াতটি পেশ করে:

{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا }[الإسراء : ٧٨ ، ٧٩]

অর্থ: “সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম কর এবং ফজরের কুরআন[১১]। নিশ্চয় ফজরের কুরআন (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।[১২] আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় কর তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৭৮-৭৯)

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকটে একমাত্র কুরআনই অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া শেষ নবীর উপর আর কোন কিছু অহী যোগে অবতীর্ণ হয়নি।

৩. আসমানী কিতাব ব্যতিত অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে কোন ধমীয় কাজ করা শিরক ও কুফর। এরূপ কেউ করলে সে মুশরিক হয়ে যাবে। (অর্থাৎ হাদীস অনুযায়ী কোন আমল করা যাবে না)

৪. আল্লাহ (সুব:) ব্যতিত অন্য কারো হুকুম মান্য করাও আমলকে নষ্ট করে দেয়। এটা অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি পাওয়ার কারণ এবং শিরক ফিল আমল বা আমলের ক্ষেত্রে শিরক। (অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সা:) এর কোন আনুগত্য করা যাবে না)

৫. **الرحمن علم القران** দয়াময় আল্লাহ (সুব:) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এই আয়াত অনুযায়ী যা শিক্ষা দেয়ার তা আল্লাহ (সুব:) নিজেই কুরআনুল

---

[১১] ‘ফজরের কুরআন’ দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের সালাত।

[১২] সহীহ হাদীস অনুসারে এই সময়ে রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ একত্রিত হয়ে তাতে উপস্থিত হন।

কারীমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। অন্য কোন পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষা দেননি।

৬. কুরআনে যে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কুরআন মাজিদেই আছে। যা ওয়াজিবুল ইত্তিবা বা অবশ্যই পালনীয়, তা দুই জিনিষ নয় একই জিনিষ।

৭. আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই সব কিতাবই সমমর্যাদার। কারণ যেসকল বীজ আদী থেকে বপন করা হয়েছে। অনন্তকাল পর্যন্ত সেটা থাকবে। তাতে কোন পরিবর্তনের সম্ভবনা নেই। তদুপুরি এ সমস্ত কিতাব একই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। কাজেই সব কিতাব সমান মর্যাদা হবে। দলীল হিসাবে কুরআনের নিম্নের আয়াতটি পেশ করেন:

{لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

অর্থ: "আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (সুরা রূম ৩০:৩০)

৮. নবীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সব নবী একই স্তরের এবং একই মর্যাদার। নবুওয়াতের ধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এক্ষেত্রে তারা দলীল পেশ করে:

{لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة : ٢٨٥]

অর্থ: "আমরা আল্লাহর রাসূলদের মাঝে কোন পার্থক্য করি না।" (সুরা বাকারা ২:২৮৫) (অথচ এই আয়াতে 'পার্থক্য না করা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য না করা। অর্থাৎ সকলের প্রতি ঈমান আনা) এ জাতিয় আরো অনেক আক্বিদা ও বিশ্বাস আহলে কুরআনগণ তৈরী করেছেন। যারা মাধ্যমে মূলত: শুধু হাদীসকেই নয়। বরং কুরআনকেও অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ (সুব:) রাসূলুল্লাহ (সা:) কে কুরআনের শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [الجمعة : ٢]

অর্থ: "তিনিই উম্মীদের[১৩] মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতি:পূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।" (সুরা জুমুআ ৬২:২)

এ আয়াত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা:) ছিলেন কুরআনের শিক্ষক, তিনি মৌখিকভাবে যা শিক্ষা দিয়েছেন অথবা যেগুলো বাস্তব আমলে মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা সমর্থণ করেছেন সেগুলোই হাদীস। যার উপরে কুরআন অবতীর্ণ হলো এবং যিনি কুরআনের শিক্ষক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত আদায় করেছেন। ইমামতি করেছেন। অন্যদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যারা এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে অস্বীকার করে তাদের ভন্ড এবং বাতিল হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এজন্য তাদের আক্বিদা সমূহের জবাব দিতে গিয়ে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করা নিস্প্রয়োজন মনে করি।

প্রশ্ন: "পীর-সূফীদের মৌলিক আক্বিদাগুলো কি? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তার ভিত্তি কতটুকু?

উত্তর: আমাদের রচিত 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ' নামক কিতাবের **৫৩১** থেকে **৫৯১** পৃষ্ঠা পর্যন্ত পীর-সূফীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে সেখান থেকে দেখে নিবেন। এখানে অতি সংক্ষেপে তাদের কিছু আক্বিদা পেশ করা হলো।

এক. পীর-সূফীদের প্রথম আক্বিদা। আল্লাহকে পেতে হলে পীরের অসীলা একান্ত জরুরী। পীর ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নয়। তারা যুক্তি দেন যে, পৃথিবীতে যেমন রাজা-বাদশাহর দরবারে যেতে মন্ত্রী বা আমলাদের সুপারিশ, মধ্যস্থতা ও রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন। তেমনিভাবে আল্লাহর দরবারেও পীর বা অলীগণের রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন। পীর বা অলীগণের রিকমেন্ডেশন ছাড়া কোন দোয়া আল্লাহ (সুব:) কবুল করেন না। বান্দা যতই আল্লাহকে ডাকুক বা ইবাদত করুক, যতক্ষণ না তা 'যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে' অর্থাৎ পীরের রিকমেন্ডেশন সহ তাঁর দরবারে যাবে

[১৩] উম্মী দ্বারা আরবের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ততক্ষণ তা গ্রহণ করা হবে না। অথবা পৃথিবীর বিচারালয়ে যেমন: উকিল-ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন হয়, তেমনি আল্লাহর দরবারে পীর ও অলীগণ উকিল-ব্যরিষ্টারি করে মুরিদ-ভক্তদের পার করে দিবেন। এ জাতীয় ধারণাগুলো সবই আরবের মুশরিকদের বিশ্বাসের অনুরূপ এবং সুস্পষ্ট শিরক। এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা আমরা আমাদের 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ' নামক বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

ক. সুবহানাল্লাহ! মক্কার কাফের-মুশরিক তথা মূর্তিপূজারীদের সাথে হুবহু মিল। কেননা মক্কার তৎকালীন মুশরিকরাও মূর্তিপূজা করতো ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}

অর্থ: "আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।" (সুরা যুমার ৩৯:৩)

অপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

অর্থ: "আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'।" (সুরা ইউনুস ১০:১৮)

বুঝা গেল, পীর-অলীদেরকে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থকারী মনে করা শুধু শিরকই নয় বরং সকল শিরকের মূল। পীর বলে কোন বিশেষ পদমর্যাদা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। বরং আলেম, সত্যবাদী, মুত্তাকী, নেককার, সৎকর্মশীল, ফরজ ও নফল ইবাদত পালনকারী, সুন্নাতের অনুসারী ইত্যাদি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে এসকল বাহ্যিক গুন বিদ্যমান না থাকে তবে তার সাহচার্য গ্রহণ আল্লাহর নৈকট্য নয়, বরং শয়তানের নৈকট্যের জন্য অন্যতম উসিলা।

খ. এসকল চিন্তা সবই মহান আল্লাহর নামে মিথ্যাচার। মহান আল্লাহ (সুব:) কোথাও ঘুণরাক্ষরেও বলেন নি যে, তার কাছে যেতে বা সুপারিশ

করতে কোন ভায়া-মাধ্যম লাগবে। বরং তিনি বারংবার বলেছেন তিনি বান্দার সবচেয়ে কাছের এবং বান্দা ডাকলেই তিনি শুনেন ও সাড়া হয়।

গ. জাগতিক রাজা-বাদশার দরবারে বাইরের অপরিচিত কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ দরকার হয়। কিন্তু তার নিজের দরবারের বা চাকরদের কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ বা অনুমতির দরকার হয় না। কারণ তিনি নিজেই তাকে ভালভাবে চিনেন না। আল্লাহর সকল বান্দাই তাঁর দরবারে আপন জন। কাজেই এক চাকরকে দরবারে যেতে আরেক চাকরের অনুমতি বা সুপারিশ লাগবে কেন।

ঘ. জাগতিক রাজা-বাদশাহ তার দেশের কাউকে চেনেন না। যে ব্যক্তি তার দরবারে কিছু প্রার্থণা করতে গিয়েছে সে কি প্রতারক মিথ্যাবাদী না সত্যবাদী তা তিনি জানেন না। এজন্য তাকে আমলাদের সুপারিশের উপর নির্ভর করতে হয়। মহান আল্লাহ (সুব:) কি এরূপ? কোন বান্দার বিষয়ে কোন পীর-অলী কি মহান আল্লাহর চেয়ে বেশী জানেন?

ঙ. জাগতিক রাজা-বাদশা ক্রোধ বশত: হয়তো প্রজার উপর কঠোরতা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রী-আমলাদের সুপারিশ তার ক্রোধ সম্বরণ করতে সাহায্য করে। মহান আল্লাহ কি তদ্রুপ? মহান আল্লাহর দয়া বেশী না পীর-অলীদের দয়া বেশী?

চ. জাগতিক বিচারালয়ে বিচারক জানেন না যে, সম্পত্তিটি কার পাওনা? উকিল-ব্যারিষ্টার সত্য বা মিথ্যার যুক্তি-তর্ক ও আইনের ধারা দেখিয়ে বিচারকরে বুঝাতে চেষ্টা করেন মহান আল্লাহ কি তদ্রুপ? উকিল সাহেবরা কি মহান আল্লাহকে অজানা কিছু জানাবেন? নাকি তাঁকে ভুল বুঝিয়ে মামলা খারিজ করে আনবেন। কুরআন কারীমে আল্লাহ (সুব:) বারংবার বলেছেন যে, উকিল হিসাবে তিনিই যথেষ্ট। পবিত্র কুরআনে ইরমাদ হয়েছে: **{وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} [النساء : ٨١]** অর্থাৎ উকিল হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সুরা নিসা ৪:৮১) এবং তাকে ছাড়া অন্য কাউকে উকিল ধরতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا} [الإسراء : ٢]

অর্থ: "তোমরা আমাকে ছাড়া অন্যকাউকে উকিল হিসাবে গ্রহণ করো না।" (সুরা বনি ইসরাঈল ১৭:২)

এর পরও কি তাঁর কাছে অন্য কাউকে উকিল ধরার দরকার আছে?

ছ. মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে বা মানবীয় রাজা বাদশাদের সাথে তুলনা করা সকল শিরকের মূল। মহান আল্লাহর প্রতি কুধারণা ছাড়া এগুলো আর কিছুই নয়। মূলতঃ এ জাতিয় বিষয়গুলো আল্লাহর সম্পর্কে কুধারণা বা খারাপ আক্বিদার থেকেই জন্ম হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

{ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ } [الفتح : ٦]

অর্থঃ "যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে; তাদের উপরই অনিষ্টতা আপতিত হয়।" (সুরা ফাতাহ ৪৮:৬)

আমাদের রচিত 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ' নামক কিতাবের ৫৩১ থেকে ৫৯১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পীর-সূফীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে সেখান থেকে দেখে নিবেন।

প্রশ্নঃ কোয়ান্টাম মেথড কি এবং এদের স্বরূপ কি?

উত্তরঃ একজন মুসলিম এই দুনিয়ায় তার ক্ষণস্থায়ী আবাসকালে সবকিছু হারাতে পারে-অর্থ, খ্যাতি, সন্তান, সংসার। কিন্তু যা কখনো হারায় না, তা হল জীবনের উদ্দেশ্য। কি করছি, কেন করছি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা থাকায় যে কোন পরিস্থিতিতেই সে থাকতে পারে অবিচল। এই অবিচলতা তাকে এনে দেয় অনাবিল মানসিক প্রশান্তি। 'শান্তি'র এই বিষয়টি ইসলামের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। অপরপক্ষে যখন ঐশী জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সাথে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে, তখন নানা অতৃপ্তি, হাহাকার তাকে পেয়ে বসে। শান্তির খোঁজে যে কোন কিছুকেই অবলম্বন করতে সে দ্বিধাবোধ করেনা। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের অবস্থাই এখন এমন। আমাদের মানসিক এই ক্রান্তিলগ্নে তাই তথাকথিত শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে 'কোয়ান্টাম মেডিটেশন'। আমাদের চারপাশের বহু ডুবন্ত মানুষ একে খড়কুটো ভেবে আঁকড়ে ধরছেন। অথচ এটি একটি শিরক-বিদআতে পরিপূর্ণ হিন্দুদের সন্ন্যাসবাদ আর খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদ আর বাউলদের সংসারত্যাগ ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদে পরিপূর্ণ একটি শয়তানী চক্রান্ত। বিষয়টি যেহেতু আক্বিদার সাথে জড়িত তাই সরলমনা মুসলিম জাতিকে সর্তক করার জন্যই আমাদের এই লেখা।

কোয়ান্টাম মেথড বলতে তারা কি বুঝাচ্ছেন তা জানার জন্য তাদের বই সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড 'মহাজাতক' এর বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের উপর আলোকপাত করবো। ইনশাআল্লাহ!

তাদের ভাষ্যমতে এটি science of living বা আশ্রম ও খানকার চৌহদ্দি থেকে বের করে 'ধ্যান'কে গণমানুষের আত্মউন্নয়ন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রয়োগ করা তাদের উদ্দেশ্য।

'কোয়ান্টম মেথড' বলতে আসলে ওনারা কি বুঝাচ্ছেন তা জানার উদ্দেশ্যে আমরা তাদের লিখিত বই 'সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড-মহাজাতক' বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের উপর আলোকপাত করবো। প্রথমেই দেখা যাক ভূমিকায় কি বলা হয়েছে।

মেডিটেশন শৃঙ্খলা মুক্তির পথঃ

আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে মানুষ অপার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ভ্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার তথা মনোজাগতিক শিকল তাকে পরিণত করে কর্মবিমুখ, ব্যর্থ কাপুরুষে। অন্য দিকে মুক্ত মানুষের বিশ্বাসই হচ্ছে সকল সাফল্য অর্জনের ভিত্তি। বিশ্বাসই রোগ নিরাময় করে। ব্যর্থতাকে সাফল্যে ও অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করে। দৈনন্দিন জীবন বেশিরভাগ চিন্তাশীল মানুষের জন্য যুগে যুগে ছিল এক ক্লান্তিকর বিড়ম্বনা। ভাত খাওয়া, গোসল করা, কাপড় পরা, সংসার করা, প্রার্থণা করা-র একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি চেয়েছেন তারা। ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে মেডিটেশন। তখন প্রতি বারের প্রার্থণাতেই আপনি পুলকিত হবেন। প্রতিটি সেজদাই পরিণত হবে মিরাজে। মেডিটেশনের মাধ্যমেই আপনি সংযোগ সাধণ করতে পারেন আপনার 'অন্তরের-আমি'র সাথে, আপনার শক্তির মূল উৎসের সাথে। মেডিটেশন পথ ধরেই আপনি অতিক্রম করতে পারেন আপনার জৈবিক শক্তির সীমাবদ্ধতা।

এরপর অধ্যায়ের ১,২ তে মন সকল শক্তির উৎস, চেতনা অবিনশ্বর, প্রাণ রহস্যের চাবিকাঠি যে বিশ্বাস তা এক নতুন বিশ্বদৃষ্টি উন্মোচন (যাতে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা যায় 'কোয়ান্টা ফিজিক্সে'র মাধ্যমে), বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং নানা সফল ব্যক্তিদের (যার মাঝে রয়েছে বিশিষ্ট ব্যালে নর্তকী, আত্মসীকৃত নাস্তিক স্টিফেন হকিং) জীবন কনিকা থেকে প্রমান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত উদাহরন দেয়া হয়েছে

বাংলাদেশের ফলিত মনো বিজ্ঞানের পথিকৃত এবং আত্মউন্নয়নে ধ্যান পদ্ধতির প্রবর্তক প্রফেসর এম, ইউ আহমেদের। তিনি ক্লিনিক্যালি মৃত্যুবরণ করার পরও পুনরায় জীবন লাভ করেন শুধু তাকে বাঁচতে হবে, তিনি ছাড়া দেশে নির্ভরযোগ্য মনোচিকিৎসক নেই---তার এই দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে।

অধ্যায় ৩ এ ব্রেনকে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করে সকল প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অধ্যায় ৪ অনুযায়ী ব্রেনকে সুসংহতভাবে ব্যবহার করার নেপথ্য নায়ক হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। প্রো অ্যাকটিভ হতে উৎসাহিত করা হয়েছে পবিত্র বাইবেল এবং কুরআনে উল্লেখিত ইউসূফের কাহিনী থেকে।

অধ্যায় ৫ এ ধ্যান অবস্থার প্রথম পদক্ষেপ শিরোনামে ব্রেন ওয়েভ প্যাটার্ণ সার্নী দেওয়া হয়েছে যেখানে থিটা লেভেল সর্ম্পকে বলা হয়েছে, মেডিটেশন কালে সাধকরা এই স্তরে প্রবেশ করেই মহাচৈতন্যের (super consciousness) সাথে সংযোগ স্থাপন করতেন। এর পরবর্তী লেভেল 'ডেলটা'তে দরবেশ ঋষিরা এই স্তরেও সজাগ থাকেন, আবার মহা চৈতন্যে লীনও হতে পারেন। তবে এই মহা চৈতন্যের সংজ্ঞা বইটির কোথাও সুস্পষ্টভাবে দেওয়া নেই।

মেডিটেশনের প্রথম ধাপ হচ্ছে 'শিথিলায়ন'। যার মাধ্যমে ব্রেন ওয়েভকে আলফা লেভেলে নিয়ে মনের ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। তাদের ভাষ্য, 'শিথিলায়ন' পুরোপুরি আয়ত্ব হলেই আপনি মনের শক্তি বলয় নিয়ন্ত্রনের চাবিকাঠি হাতে পারেন। ধ্যানাবস্থায় মন হয় ত্রিকালদর্শী, চেতনা অতিক্রম করে সকল বস্তুগত সীমারেখা। মনের এই ধ্যানাবস্থায় শক্তিকে প্রয়োগ করেই প্রাচ্যের সাধক-দরবেশ ঋষিরা একদিন আপাতঃ দৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। ইচ্ছা করেছেন আর ঘটনা ঘটে গেছে। ইচ্ছা করেছেন আর মানুষ রোগ মুক্ত হয়েছেন। আপনিও এ চাবিকাঠিকে কাজে লাগিয়ে অর্জণ করতে পারেন অতি চেতনা। এই চাবিকাঠি দিয়েই দৃশ্যমান সব কিছুর পিছনে যে নেপথ্য স্পন্দন ও নিয়ম কাজ করছে তার সবটাকেই আপনি নিজের ও মানবতার কল্যানে সক্রিয় করে তুলতে পারবেন।

এরপর অধ্যায় ৬ এ 'শিথিলায়ন' প্রক্রিয়া অর্জণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় ৭,৮ এ নানা আত্মবিনাশী প্রোগ্রাম, যেমন নেতিবাচক

চিন্তা, হতাশা, অনুশোচনা, রাগ, হীনমন্যতা ইত্যাদি মোকাবেলা করার অব্যর্থ কৌশল হিসাবে 'শিথিলায়ন'কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অধ্যায় ৯, ১০ এ আত্মবিকাশি প্রোগাম হিসাবে অটো সাজেশন এবং 'মন ছবি'র বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ১১, ১২ ও ১৩ তে যথাক্রমে কল্পনা শক্তির মনোযোগ বাড়ানোর কৌশল জানানো হয়েছে।

অধ্যায় ১৪ তে কোয়ান্টা সংকেত। অধ্যায় ১৫ তে জাগৃতি ও ঘুম নিয়ন্ত্রনের উপায়, অধ্যায় ১৬ তে স্বপ্নের সৃজনশীল প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে, যেখানে ইস্তিখারা সালাতকে স্বপ্ন চর্চা ও এর সৃজনশীল প্রয়োগের একটি বিশেষ মাত্রা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বইয়ের অধ্যায় ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ গুলোতে যথাক্রমে ছাত্র জীবনে সফল হবার উপায়, কোয়ান্টাম নিরাময়, ওজন নিয়ন্ত্রনের উপায়, ড্রাগ এবং নেশা থেকে বিরত থাকার উপায় এবং সুস্বাস্থ্যে কোয়ান্টাম ভিত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এতক্ষণ ধরে বইটিতে ধ্যানের প্রথম ধাপের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীতে বাকি ধাপগুলোর ব্যাপারে শুধু আভাস দেওয়া হয়েছে। যাকে বলা হয়েছে অতিচেতনার পথে যাত্রা। এই পথ ধরেই কোয়ান্টাম গ্র্যাজুয়েটরা 'কমান্ড সেন্টার' এবং প্রকৃতির সাথে একাত্মতার অনুভূতি লাভ করেন। নিচে আমরা বাছাই করা কিছু বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করবো।

১. মনছবিঃ শিথিলায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে এমন এক ক্ষমতা তৈরী হয় যার ফলে সে তার কল্পনা শক্তি দ্বারাই নিজের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করে ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এক ইঞ্জিনিয়ার সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার মনছবি দেখতে লাগল। ডিভি ভিসা পেয়ে গেল। ভিসা পাওয়ার পর মনছবি দেখতে লাগলো সমমানের চাকরির যাতে নিজের প্রকৌশল, জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারেন। দেশে তিনি কাজ করতেন বিদেশী প্রতিষ্ঠানে। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার দেরমাসের মধ্যে আগের চেয়েও উচ্চপদে চাকরি হয়ে গেল তার।

২. কোয়ান্টাম নিরাময়ঃ রোগের মূল কারণকে মাসসিক আখ্যায়িত করে নেগিটেশনের মাধ্যমে সকল রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মনছবি বা ইমেজ থেরাপী ছাড়াও রয়েছে 'দেহের ভিতরে ভ্রমন'

নামক পদ্ধতি যেখানে রুগীকে প্রথমে শিথিলায়ন করতে বলা হয় তারপর শরীরের নানা অঙ্গের মধ্য দিয়ে কাল্পনিক ভ্রমন করতে বলা হয়। এতে সে তার সমস্যার স্বরূপ সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি লাভ করে এবং নিজেই কমান্ড সেন্টারের মাধ্যমে সমাধান করতে পারে। যেমন: বলা হয়েছে একজন ক্যান্সারের রোগী তার ক্যান্সারের কোষগুলোকে কল্পনা করে শর্ষের দানারূপে আর দেখে অসংখ্য ছোট ছোট পাখি ঐ শর্ষের দানা গুলো খাচ্ছে। আর শর্ষের দানার পরিমান ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। আস্তে আস্তে শর্ষের দানা নি:শেষ হয়ে আসছে। শর্ষের দানাও শেষ নিরাময়ও সম্পূর্ণ।

৩. মাটির ব্যাংক: মাটির ব্যাংকের কার্যকারিতার জ্বলন্ত উদাহরণে ভর্তি এ সংক্রান্ত লিফলেটটি। একটি মাত্র ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হল:

ছেলের সামান্য জ্বর হয়েছে। সারাদিন ভালোই ছিল। তখন রাত প্রায় ১টা, বাসার সবাই ঘুমে। হঠাৎ গোঙ্গানির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখি ওর পুরো শরীর মৃগী রোগীর মত খিঁচছে। বুকটা ধক করে উঠল। এই মধ্যরাতে কোতায় ডাক্তার পাব, কি করব ভাবছি আর আল্লাহকে ডাকছি। হঠাৎ চোখ পড়ল ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাকা মাটির ব্যাংকে। তাড়াতাড়ি মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে মানিব্যাগ থেকে ৫০০ টাকার নোট ব্যাংকে রাখলাম। স্রষ্টার কি করুনা! মিনিট পাঁচেকের মধ্যে খিঁচুনি বন্ধ হল, সে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে উঠে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করল যেন কিছুই হয়নি।

৪. কোয়ান্টা ভঙ্গি: আপনি মহামতি বুদ্ধসহ প্রাচীন ঋষিদের যে ভাস্কর্য দেখতে পান, তার বেশিরভাগই অভয়মুদ্রা করে সিদ্ধাসনে বসা। আর এই অভয়মুদ্রার আধুনিক নামই কোয়ান্টা ভঙ্গি। কোয়ান্টা ভঙ্গির জ্যোতিষ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল: হাতের বুড়া আঙ্গুলের ক্ষেত্র হল শুক্র বা ভেনাসের ক্ষেত্র। আর তর্জনীর ক্ষেত্র হচ্ছে বৃহস্পতির ক্ষেত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানে শুক্র ও বৃহস্পতি কল্যাণ ও সাফল্যের প্রতীকরূপে গণ্য। আর মধ্যমার ক্ষেত্র শনির ক্ষেত্র রূপে পরিচিত। শনি বিলম্ব ও বাধার প্রতীক। প্রাচীন ঋষিরা এ কারণেই ভেনাস ও জুপিটারের প্রবৃদ্ধিকেই সংযুক্ত করেছেন, এর সাথে শনির প্রভাবকে যুক্ত করতে চাননি।

৫. কমান্ড সেন্টার: কমান্ড সেন্টারকে এক কথায় বলা যায় মনের বাড়ির শক্তি ও কল্যাণ কেন্দ্র। মানব অস্তিত্বের যে অংশ স্থান কালে আবদ্ধ নয় সে অংশ এই কমান্ড লেবেলে প্রকৃতির নেপথ্য নিয়ম ও স্পন্দনের সাথে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করে। যাকে তারা জীবনে কখনো দেখেননি, যার কথা জীবনে কখনো শুনেননি শুধু তার নাম, বয়স ও ঠিকানা বলার সাথে সাথে এমন এক হুবহু বর্নণা দিতে সক্ষম হন কোয়ান্টাম গ্র্যাজুয়েটরা যে প্রশ্নকর্তা নিজেই অবাক হয়ে যান।

কমান্ড সেন্টারের প্রয়োগ: ছেলে কলকাতায় গিয়েছে, যাওয়ার পরে দুই দিন কোন খবর নাই। বাবার কোয়ান্টাম গ্র্যাজুয়েট। মাগরিবের সালাতের পরে মেডিটেশন কমান্ড সেন্টারে গিয়ে ছেলের বর্তমান অবস্থা দেখার চেষ্টা করতেই কলকাতার একটি সিনেমা হলের গেট ভেসে এল। ছেলে সিনেমা হলের গেটে ঢুকছে। বাবা ছেলেকে তার উদ্বেগের কথা জানালেন। বললেন শিগগিরই ফোন করতে।

৬. অন্তরগুরু: অধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হতে হলে একজন আলোকিত গুরুর কাছে বাইআত বা দিক্ষা প্রয়োজন। এছাড়া আধ্যাত্মিকতা সাধনা এক পিচ্ছিল পথ। যেকোন সময়েই পা পিছলে পাহাড় থেকে একে বারে গিরিপথে পড়ে যেতে পারেন। কমান্ড সেন্টার নির্মান করে সবকিছু ঠিকমত সাজানোর পর ধ্যানের বিশেষ স্থরে অন্তরগুরুর আগমন ঘটে। অন্তরগুরু প্রথমে সকল অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য 'সাইকিক বর্ম' প্রদান করেন। যা অতীতের সকল অশুভ প্রভাব নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং ভবিষ্যতের এ ধরনের প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখেন। অন্তরগুরুকে পাওয়ার আকাংক্ষা যত তিব্র হবে তত সহজে আপনি তার দর্শন লাভ করবেন। এ ব্যাপারে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে কোয়ান্টাম গ্র্যাজুয়েটদের।

ইসলামের দৃষ্টিতে কোয়ান্টাম মেথডের নানাদিক:

এতক্ষনে আমরা তথাকথিত সাইন্টিফিক মেথড বা Science of living যে আসলে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের একটি Ritual ছাড়া আর কিছুই নয় এ বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। কেন এটি পরিত্যাজ্য তার ব্যাপারে কোন প্রমাণ দাখিলেরও বোধহয় প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে এটি মাত্র শুরু:

ক. কোয়ান্টাম মেথড সকল ধর্মই সত্য এই মতবাদ প্রচার করে। [১৪]
কোয়ান্টাম মেডিটেশন করার জন্য ধর্ম বিশ্বাস কোন জরুরী বিষয় নয়। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সকল কার্যাবলীতে তাদের এই চিন্তাধারার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। যেমন: 'এখন কোয়ান্টাম শিশুকাননে রয়েছে **১৫টি** জাতিগোষ্ঠির চারশতাধিক শিশু। মুসলিম, হিন্দু, ক্রামা, খৃষ্টান, বৌদ্ধ এবং প্রকৃতি পূজারী সকল ধর্মের শিশুরাই যার যার ধর্ম পালন করছে। আর একসাথে গড়ে উঠছে আলোকিত মানুষ হিসাবে।'
আমাদের দ্বীনের মূলমন্ত্র বা সারকথা একটি বাক্যে সংকুচিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই একটা ব্যাপারে কোন সংলাপ বা সমঝোতা হবার নয়। এ কথাটা বলতেই বিখ্যাত আয়াত 'লাকুম দ্বীনুকুম অলিয়া দ্বীনী' অথচ অজ্ঞতা বশত আমাদের দেশের মূর্খ রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে তথাকথিত সুশীল সমাজের অনেকেই এই আয়াতটিকে উল্টোভাবে ব্যবহার করে আন্ত:ধর্ম প্রেমের বাণী ছড়ানোর চেষ্টা করতে দেখা যায়। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনও এর ব্যতিক্রম নয়।
খ. এটি একটি জঘন্য বিদআত। তারা নিজেরাই প্রচার করছে যে, মেডিটেশন এক ধরনেই ইবাদত আর এটা একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার যে, এমন কিছু সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং সাহাবীদের মাঝে প্রচলন ছিল না। অনেকে দাবী করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) হেরাগুহায় ধ্যান করতেন। তাদের জানা উচিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) হেরাগুহায় ধ্যান করেননি। বরং তিনি সেখানে ইবাদত করেছেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। বুখারী শরীফে আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে: **وَكَانَ يَخْلُو بِغَــارِ حِــرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِــهِ** "তিনি গারে হেরায় নির্জনতা অবলম্বন করতেন এবং একাধারে কয়েক রাত পর্যন্ত পরিবারের কাছে না এসে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।" (সহীহ বুখারী ৩) সুতরাং এটিকে ধ্যান করা বলে সূফীবাদী, বৈরাগ্যবাদী, সন্যাসী আর কোয়ান্টাম ওয়ালাদের ধ্যান করার স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমান।

[১৪] http://quantummethod.org.bd/bn/shishukanon

গ. বিদআতপন্থী দলগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোয়ান্টাম মেথডের মাঝে বিদ্যমান। যেমন: কুরআনের ভূল ব্যাখ্যা। জ্যোতিষশাস্ত্র যে কুরআনের অনুমোদিত তা প্রমান করার জন্য কুরআন অপব্যাখ্যা করার এক হীন প্রচেষ্টা তারা চালিয়েছে। তাদের বক্তব্য: পবিত্র কুরআনের ২৬-২৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেছেন: 'গায়েব বা ভবিষ্যত শুধুমাত্র তিনিই জানেন। যদি না তিনি কাউকে জানান। যেমন তিনি রাসূলদের জানিয়েছেন।' অর্থাৎ জানার পথ খোলা আছে। তিনি যে কাউকে ইচ্ছা ভবিষৎ জানাতে পারেন। যে কাউকে ইচ্ছা গায়েব জানাতে পারেন। এটা তাঁর ইখতিয়ার। আর এটা আল্লাহ্‌র একটি আশ্বাসও যে, যে যা জানতে চান সেই জ্ঞান আল্লাহ (সুব:) তাকে দিয়ে দেন।
অথচ কুরআনের সেই আয়াতটি এবং তার সঠিক অনুবাদ হলো:

{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجــن : ٢٦ ، ٢٧]

অর্থ: "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া।" (সুরা জ্বীন ৭২:২৬-২৭)
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র:) একটি চমৎকার অভিমত দান করেছেন। তিনি বলেন: 'বিভ্রান্ত দলগুলি যে আয়াতকে তাদের দলীল হিসাবে পেশ করে সেই একই আয়াতে থেকে তাদের ভুল তুলে ধরা যায়। কুরআনের এই অনুপম বৈশিষ্ট্যটি এক্ষেত্রে আবারও প্রমানিত হলো। কারণ আল্লাহ (সুব:) বলে দিচ্ছেন যে, মনোনীত রাসূল ছাড়া আর কেউ গায়েবের জ্ঞান জানেন না।
জাল হাদীসের ব্যবহার: তাদের বইয়ে বলা হয়েছে, আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা:) বলেছেন, 'সৃষ্টি সর্ম্পকে একঘন্টা ধ্যান সত্তর বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।' (মিশকাত) অথচ এই হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ জাল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন।
ঘ. কোয়ান্টাম মেথড শিরকের দিকে ডাকে: আমরা আগেই বলেছি যে, বিদআত কয়েক প্রজন্মের মাঝে শিরকে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে, কোয়ান্টাম মেথড কিভাবে শিরকের দিকে ডাকে তা বুঝার জন্য আপনাকে কয়েক প্রজন্ম অপেক্ষা করতে হবে না। উপরে কোয়ান্টাম

মেথডের নানা দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি যাতে এর মাঝে শিরকের যে সব ধরনের উপাদনই রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। কমান্ড সেন্টার, মনের শক্তি, মাটির ব্যাংক, অন্তর গুরু, কোয়ান্টা ভঙ্গি ইত্যাদির প্রত্যেকটি বিষয়ই ছোট এবং ক্ষেত্র বিশেষে বড় শিরকে লিপ্ত করছে আমাদের সমাজকে।

কোয়ান্টাম মেথডের নানা দিক: আসলে তা কিভাবে ঘটে?

কমান্ড সেন্টার অর্ন্তগুরু এই যে বিষয় গুলো কোয়ান্টাম মেথডের সাথে জড়িত। তার বাস্তব সংঘটনের কথা তো অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আসলে কিভাবে এগুলো ঘটে তা ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি যদি পর্যালোচনা করি তাহলে জানতে হবে জ্বীনদের সম্পর্কে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ». قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ ».

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে একজন জ্বীন সঙ্গী নিয়োগ করে দেয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন: আপনার সঙ্গেও কি? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: হ্যা! তবে আল্লাহ আমাকে তার বিরূদ্ধে সাহায্য করেছেন ফলে সে আমার আনুগত্যশীল। কাজেই সে আমাকে শুধুমাত্র ভাল কাজেরই আদেশ করে।" (সহীহ মুসলিম ৭২৮৬)

তাহলে বুঝা গেল, মেডিটেশনের ধাপগুলো আসলে জ্বীনদের সাহায্য অর্জনের প্রক্রিয়া মাত্র। এই বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পড়াশুনা থাকলেই কমান্ড সেন্টারে অপরিচিত মানুষদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যাবে। যাকে অন্তরগুরু হিসাবে চাওয়া হচ্ছে তাকে কিভাবে দেখা যাবে তাও বোঝা যাবে। সব ক্ষেত্রে আসলে গুরু 'শয়তান'।

সালাত ও মেডিটেশনের তুলনা: আমরা লক্ষ্য করছি যে, তাদের বই-পুস্তকে এবং কথা বার্তায় বারবার সালাতের (নামাজের) সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। এমনকি তাদের ওয়েব সাইডটিতে এমনও প্রশ্ন করা হয়েছে যে, মেডিটেশনের আগে অজু করতে হবে কিনা। যারা এর কোন

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তারাও জ্ঞাতসরে বা অজ্ঞাতসরে একে সালাতের সাথে তুলনা করেন। কিন্তু এই তুলনা ইসলামের জন্য অবমাননাকর। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

- আমরা সালাত আদায় করি মূলত: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করা হবে সালাত সম্পর্কে।
- সালাত দ্বীন ইসলামের একটি রুকন।
- সালাত কোন শরীর চর্চার পদ্ধতি নয়। যদিও তা দৈহিক সুস্থতার জন্য সহায়ক। মোটকথা: সালাতের সাথে মেডিটেশনের মৌলিক পার্থক্য, উদ্দেশ্য ও উৎসে।

কোয়ান্টাম মেডিটেশন বাংলাদেশে কেন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে?

আমরা মুসলিমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে দেখা হলেই সম্ভাষণ জানাই 'আস সালামু আলাইকুম' 'আল্লাহ আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুন' এই বলে। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনের মাঝে যেই শান্তি তার ছোয়া আমাদের জীবনে পরে না বলেই আমরা শান্তির খোঁজে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করছি। শান্তির খোঁজ পেতে মরিয়া হয়ে যাওয়া আর ইসলামি জ্ঞানের ব্যাপারে অসীম অজ্ঞতার সুযোগেই কোয়ান্টাম মেথড আমাদের দেশে এতটা প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে।

প্রতিকার: এসকল কুসংস্কার থেকে বাঁচতে হলে দ্বীনি ইলম অর্জন করা জরুরী। কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ইলম যাদের নেই তারাই কেবল মাত্র এসকল বিধর্মীদের চক্রান্তের শিকার হয়। আল্লাহ (সুব:) আমাদের হিফাযত করুন।

ইসলামী আক্বীদার কতিপয় গুরুত্বপূর্ন দিক

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

عَنْ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

অর্থঃ "মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমার উম্মতের মধ্য হতে একটি দল সর্বদা আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সহযোগীতা করবে না এবং যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই তারা আল্লাহর আদেশ (কেয়ামত) আসা পর্যন্ত অবিচল থাকবে।"

সহীহ বুখারী ৩৬৪১

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ইসলামী আক্বীদার কতিপয় গুরুত্বপূর্ন দিক

প্রশ্নঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত কারা? আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র পরিচয় এবং প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তরঃ اَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের যারা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ পথের অনুসারী। তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ বলা হয় এ কারণে যে, তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর হাদীসের অনুসারী ও তাঁর সুন্নাতের অনুগত এবং তাদেরকে আল জামায়াত বলা হয় এ কারণে যে, তারা রাসূলের সুন্নাহকে অনুসরণ করেন সাহাবায়ে কিরামদের জামাআতের মত। এ অর্থে الْجَمَاعَةِ এর পূর্বের و অক্ষরটি مَعَ 'মাআ' বা 'সাথে' অর্থে ব্যবহৃত হবে। তাহলে পূর্ণ অর্থ হবে اَهْلُ السُّنَّةِ مَعَ جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ বা সাহাবায়ে কিরামদের জামাআতের সাথে মিল রেখে রাসূলের সুন্নাহর অনুসারী দল।

আরেকটি অর্থ হতে পারেঃ اَهْلُ السُّنَّةِ مَعَ جَمَاعَةِ اَلْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ যারা দ্বীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে কুরআন-সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিমদের জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহকে অনুরসরণ করেন। এ অর্থে الْجَمَاعَةُ শব্দের শুরুর اَلْ (আল) শব্দটি اَلْمُسْلِمِيْنَ (আল মুসলিমীন) এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর পরিচয় এবং প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য :

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতকে الفرقة الناجية বা মুক্তিপ্রাপ্তদল ও الطائفة المنصورة বা সাহায্যপ্রাপ্ত দলও বলা হয়। এ দুই জামাআতের লোকদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে তাদের কিছু নিদর্শন আছে যা দিয়ে তাদেরকে চিহ্নিত করা যায়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলঃ

১. তারা কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যায়ন ও গবেষণার মধ্য দিয়ে ইহার গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এমনিভাবে রাসূল (সাঃ) এর হাদীসকে জেনে বুঝে এবং

সহীহ হাদীসকে দুর্বল হাদীস হতে চিহ্নিত করে হাদীসের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর কারণ হলো কুরআন ও সুন্নাহই তাদের জ্ঞানের মূল উৎস। এছাড়া তারা জ্ঞান অর্জন করে উহাকে আমলে পরিণত করেন।

২. পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করা এবং পুরো কুরআনের উপর বিশ্বাস করা অর্থাৎ তারা কুরআনে আলোচিত শাস্তি, পুরস্কার এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনাকারী সমস্ত আয়াতের উপর বিশ্বাস রাখেন। তারা সমন্বয় সাধন করেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্য ও বান্দার ইচ্ছা এবং কর্মের মধ্যে তেমনি সমন্বয় বজায় রাখেন ইলম, ইবাদত, শক্তি, রহমত, উপায় অবলম্বন ও উহার বর্জনের মধ্যে।

৩. তারা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করেন এবং বিদ'আতকে পরিহার করেন, সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করেন এবং ইসলামের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী সকল পথ বর্জন করেন।

৪. তারা হেদায়েত পাওয়ার জন্য সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের পথকে অনুসরণ করেন, যারা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও হেদায়েতের ধারক-বাহক এবং যারা সাহাবায়ে কেরামদের বিরোধিতা করে তাদেরকে পরিহার করেন।

৫. তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারীঃ অর্থাৎ আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়ে না তারা অতিরঞ্জিতকারীদের মত না এ বিষয়কে তুচ্ছ ও অনীহা পোষণকারীদের মত। এভাবে সমস্ত কাজকর্ম এবং আচার ব্যবহারে তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী।

৬. সব সময় তারা মুসলিমদের সত্য পথে এবং তাওহীদের উপর একত্রিত করার জন্য এবং তাদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টিকারী সমস্ত কিছুকে দূরীভূত করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। কাজেই দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলিতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্য শুধু সুন্নাত ও সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে। আর তারা শুধুমাত্র ইসলাম ও সুন্নাতের ভিত্তিতেই শক্রতা বা বন্ধুত্ব করেন।

৭. তাদের আরো বৈশিষ্ট্য হলো তারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেন। আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। রাসূলের সুন্নাতকে জীবিত করেন, দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত

করার জন্য কাজ করেন এছাড়া ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

৮. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা: তারা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের চাইতে আল্লাহর অধিকারকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তারা না কারো ভালোবাসায় অতিরঞ্জিত করেন এবং না কারো দুশমনিতে সীমালঙ্ঘন করত: তাদের সাথে অশুভ আচরণ করেন এবং না কোন মহৎ ব্যক্তির মহত্বকে অস্বীকার করেন।

৯. জ্ঞান আহরণের মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহ হওয়ার কারণে তাদের চিন্তা-চেতনা এবং প্রত্যেক অবস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে, যদিও তাদের যুগ বা ভুখন্ড ভিন্ন হোক।

১০. সকল মানুষের সাথে অনুগ্রহ, দয়া এবং উত্তম আচরণ করা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১১. আল্লাহ তাঁর কিতাব কুরআন, রাসূল (সা:), মুসলিমদের নেতাগণ এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য নসীহত[১৫] করাও তাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

১২. মুসলিমদের সমস্যাদির গুরুত্ব দেয়া, তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাও তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন: তাইফাহ আল মানসুরাহ কারা ? তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর: আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) বলেছেন:

عَنْ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

(৫) আল্লাহর জন্য নসীহতের অর্থ হলো তাঁর জন্য শিরকমুক্ত ইবাদত করা, তাঁর নাম ও গুণবাচক নামসমূহের উপর বিশ্বাস রাখা, কুরআনের জন্য নসীহতের অর্থ কুরআনের পথ ধরে চলা রাসূলের জন্য নসীহতের অর্থ তাঁর রিসালাতের স্বীকার করে তাঁর দেয়া সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গঠন করা।

অর্থ: "মুআবিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমার উম্মতের মধ্য হতে একটি দল সর্বদা আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সহযোগীতা করবে না এবং যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই তারা আল্লাহর আদেশ (কেয়ামত) আসা পর্যন্ত অবিচল থাকবে।" **(সহীহ বুখারী ৩৬৪১)**

অধিকাংশ সালাফগণের মতে এই 'সফলকাম দল (আত্-তাইফাহ্ আল-মানসুরাহ)' হল সকল উলামাহ এবং হাদীসের অনুসরণকারী (সুন্নাহর অনুসরণকারী যেরূপ আল-বুখারী এবং আহমেদ বিন হাম্বল বর্ণনা করেছেন)। এ সংক্রান্ত "..এই দ্বীন, প্রতিষ্ঠা হবে এর ওপর যুদ্ধ করার মাধ্যমে.. " রাসুলুল্লাহর (সা:) এই বাণী ঠিক অন্যান্য বর্ণনার মতই যুদ্ধের কথা (আল–কিতাল) স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছে; যা তাদের জন্য একটি সমস্যার কারণ। জাবীর বিন আব্দুল্লাহ এবং ইমরান বিন হুসায়ন এবং ইয়াজীদ বিন আল-আসলাম এবং মুআবীয়া এবং উক্ববা বিন আমর (রা.) প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই কিতালই হলো সাহায্যপ্রাপ্ত দলের অন্যতম সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। কেননা অপর হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ»

অর্থ: "ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমার উম্মতের একটি দল হকের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে। যারা তাদের বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদেরই সর্বশেষ দলটি মসিহে দাজ্জালের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবে।" **(সুনানে আবূ দাউদ ২৪৮৬)**

অপর একটি হাদীসেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ – قَالَ – فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ –صلى الله عليه وسلم– فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ لاَ. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ

অর্থ: "জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর যুদ্ধ করতে থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত তারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতপর ইসা ইবনে মারইয়াম (আ:) অবতীর্ণ হবেন। মুসলিমদের আমীর বলবেন, সামনে আসুন এবং ইমামতি করুন। ইসা আ: বলবেন, না! বরং তোমরা একে অপরের ইমাম হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য সম্মান স্বরূপ।" **(সহীহ মুসলিম ৪১২; সুনানে বাইহাকী ১৮৩৯৬; ইবনে হিব্বান ৬৮১৯)**

উপরোক্ত হাদীস দু'টি থেকে পরিষ্কারভাবে 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। আর তা হচ্ছে, তারা কিতাল করবে, যুদ্ধ করবে এবং এরাই শেষ পর্যন্ত ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হবে। সুতরাং যারা যুদ্ধ করে না বা যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনা যাদের নেই তারা 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ' হতে পারে না। বর্তমানে যারা নিজেদেরকে এই 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র অনুসারী বলে দাবী করে অথচ জিহাদের নাম শুনলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায় তাদের জানা উচিৎ যে, ঈসা (আ:) যুদ্ধ করবেন। ইমাম মাহদীও যুদ্ধ করবেন।

সুতরাং যাঁরা বর্তমানেও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তারাই ইমাম মাহদীর সঙ্গে এবং ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হবেন। আর যারা বর্তমানে জিহাদের বিরোধিতা করছে, জিহাদের অপব্যাখ্যা করছে, মুজাহিদীনদের সমালোচনা করছে এবং তাদেরকে জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করছে। যারা ইহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের খুশি করছে তারা অচিরেই দাজ্জালের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে।

সুতরাং এই দলকে শুধুমাত্র উলামাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বরং তারা উলামা এবং মুজাহদিদের সমন্বিত একটি গোষ্ঠী। এবং এ ব্যাপারে ইমাম আন-নব্বী (র:) ইমাম বুখারী, আহমাদ এবং অন্যদের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং বলেন, "এটা হতে পারে যে, বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাসীদের মাঝে এই দল ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী যোদ্ধা এবং তাদের মাঝে রয়েছে ন্যায় বিচারকগণ এবং তাদের মধ্যে আরো রয়েছে হাদীস বিশারদগণ এবং তাদের মাঝে আরো একদল রয়েছে যারা গভীর ইবাদতে মগ্ন এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তারা

নিজেদেরকে পার্থিব জীবনের সামগ্রী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এবং তাদের মাঝে অন্যান্য ভাল প্রকৃতির মানুষও রয়েছে। এবং এটা আবশ্যক নয় যে, তাদেরকে একসাথে থাকতে হবে বরং হতে পারে যে, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়েও থাকতে পারে। **(ইকমালুল মু'লিম শরহে সহীহুল মুসলিম ১/৩১১)**

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ (র:) তাঁতারদের সাথে যুদ্ধ বিষয়ক ফাতাওয়ায় বর্ণনা করেন যে, যারা ঈমাণের দু'টি বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য দেয় (আশ–শাহাদাতাইন), তারপরও ইসলামের শরীয়া ছাড়া অন্য বিধান দ্বারা শাসন করে সেই (তাঁতারদের বিরুদ্ধে) জিহাদরত গোষ্ঠীরা **الطائفة المنصورة** "আত্ তাইফাতুল মানুসরা"-য় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিক উপযুক্ত। যেমন তিনি বলেন, উদাহরণস্বরূপ, শাম ও মিসরের তাইফা এবং তাদের মত অন্যরা; তারা এ সময়ের দ্বীন ইসলামের জন্য জিহাদরত যোদ্ধা এবং 'আত্ তাইফাহ্ আল মানসুরাতে' অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তারাই সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত, যা রাসূল (সা:) তাঁর বর্ণনাতে তুলে ধরেছেন, যা বিশুদ্ধ এবং প্রায়ই বর্ণিত হত এবং তিনি বর্ণনা করতেন- আমার উম্মাহ্র মধ্যে একটি দল যারা সত্যের ওপর অবিচল থাকবে, (এ থেকে) তারা কখনই বিরত হবে না। যারা তাদের (তাইফাহ্) সাথে প্রতারণা করবে বা তাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা যতক্ষণ না (শেষ) সময় আসবে। এবং মুসলিমের বর্ণনাতে রয়েছে- পশ্চিমের গোষ্ঠী কখনই থামবে না। (মাজমুআ আল-ফাতাওয়া, খন্ড ২৮/৫৩১)

এবং এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, যেসব উলামা (ইলম অনুযায়ী) আমল (জিহাদ) করে, তারাই প্রথম যারা এই দলে (সফলকাম দল) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরবর্তীতে মুজাহিদিনদের মধ্যে হতে অবশিষ্টরা, এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করে। (এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়)।

এবং সালাফগণ 'তাইফাহ্' বলতে উলামাহ্দের বুঝিয়েছেন এই কারণে যে, জিহাদ এমনই একটা বিষয় ছিল যা সম্পর্কে মুসলিমদের কোনই দ্বিমত ছিল না এবং সীমান্তগুলো সিপাহী এবং যোদ্ধা দ্বারা সুসজ্জিত ছিল, যারা শত্রুভূমির অভিমুখী ছিল এবং তাদের সময়ে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল এতে নতুন বিষয়ের অনুপ্রবেশ এবং ধর্ম বিমুখ বিপথগামীরা এবং এই যুদ্ধক্ষেত্রের (বিদআত বিরোধী যুদ্ধ) সৈনিক ছিলেন ওলামাগণ।

কিন্তু আজ যুদ্ধক্ষেত্রে উলামা এবং মুজাহিদীন উভয়ের প্রচেষ্টা আমাদের বড়ই প্রয়োজন। যেহেতু শুধুমাত্র জ্ঞান দ্বারা অথবা শুধুমাত্র জিহাদ দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন প্রতিটির সম্মিলিত প্রয়োগ। আল্লাহ (সুব:) সুরা হাদীদ-এ বর্ণনা করেন:

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّـــاسُ بِالْقِـــسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [الحديد/٢٥)

অর্থ: "নিশ্চয়ই, আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" (সুরা হাদীদ ৫৭:২৫)

এই আয়াতের আলোকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, "আল্লাহ্র কিতাব, ইনসাফ এবং লৌহ ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে না" কিতাব পথ প্রদর্শনের জন্য এবং লৌহ তা বজায় রাখার জন্য। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ (সুব:) বলেছেন: নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ প্রেরণ করেছি। সুতরাং কিতাব এর জ্ঞান দ্বারা এবং লৌহ এর শক্তি দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে ও আইনের শাস্তি (আল-হুদুদ) প্রতিষ্ঠিত হবে । আর ইনসাফের দ্বারা চুক্তি বাস্তবায়ন, অর্থ ও সম্পদ আদায়করণ প্রভৃতি সম্পাদিত হবে (হক আদায় হবে)। (মাযমুওয়া আল-ফাতাওয়া, খন্ড ৩৫/৩৬)

তিনি আরো বলেছেন: "নিশ্চয়ই, পথ প্রদর্শনকারী কিতাব এবং বিজয় দানকারী লৌহের দ্বারাই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। যেরূপ আল্লাহ্ (সুব:) উক্ত আয়াতে বলেছেন।" (মাযমুওয়া আল-ফাতাওয়া ২৮/৩৯৬)

এটা ছাড়াও বিভিন্ন অধ্যায়ে ইবনে তাইমিয়্যা (র:) এর আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, 'সফলকাম দল' হল সেই দল যারা জিহাদ পালন করে এবং সেই সকল শরীয়া ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে, যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন

করেছিলেন- আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআ'। [Al Bayah Wal Imarah, ইমাম আ: ক্বাদির ইবনে আ: আযিয)

প্রশ্ন: সালফে সালেহীন কাকে বলে?

উত্তর: সালফে সালেহীন বলতে বুঝায় প্রথম তিন সোনালী যুগের লোকদের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিজের যুগ, সাহাবায়ে কেরামদের যুগ এবং তাবেয়ীনদের যুগ। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

অর্থ: "ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমার যুগ, অত:পর যারা তাদের পরবতী যুগে অত:পর যারা তাদের পরবর্তী যুগে।" (সহীহ বুখারী ২৬৫১; সহীহ মুসলিম ৬৬৩৫; সুনানে তিরমিজি ২২২১)

ইসলাম আমাদের জাতীয়তা!

প্রশ্ন: আমাদের পরিচয় এবং জাতীয়তা কি?

উত্তর: নিশ্চয়ই এটা আমাদের রব আল্লাহর (সুব:) পক্ষ থেকে আমাদেরকে প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত যা দিয়ে তিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন যে, 'তিনি আমাদেরকে একটি অবিচ্ছেদ্য জাতিতে পরিণত করেছেন এবং আমাদের জন্য একটি নাম পছন্দ করেছেন'। একটি নাম যা এই জাতির প্রতিটি মানুষের পরিচয় বহন করে, কারো ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম নেই। এ ব্যাপারে শায়খ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল লতিফ বলেন, "তোমার পরিচয় মুসলিম এবং তুমি অন্য সমস্ত ধর্মের মানুষদের মধ্যে এই নামে আখ্যায়িত। আর এটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ রহমতসমুহের একটি। যেভাবে আল্লাহ্ (সুব:) বলেছেন, هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِـــنْ قَبْـــلُ "তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম....." (সূরা হজ্জ ২২:৭৮)" (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ ৮/৫২)

সুতরাং যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে এই আখ্যায় সম্মানিত করেন এবং আমাদেরকে বিশেষভাবে এই নামের জন্য পছন্দ করে থাকেন, তবে এটা পরিবর্তন অথবা পরিত্যাগ করা আমাদের জন্য অবৈধ। আমাদের জন্য

এটাও বৈধ নয় যে, এটি ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তির উপর আমাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা স্থাপিত হবে। বরং এসব হবে এই পরিচয়ের দাবী অনুসারে অর্থাৎ মুসলিম ভাই হিসাবে।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (র:) বলেন: "মহিমান্বিত আল্লাহ্ (সুব:) কুরআনে আমাদেরকে আখ্যায়িত করেছেন 'মুসলিমিন', মু'মিনীন' (বিশ্বাসীগণ) এবং 'ই'বাদুল্লাহ'" (আল্লাহ্র দাস) হিসেবে। সুতরাং আল্লাহ্ যে নামে আমাদের আখ্যায়িত করেছেন তা আমরা পরিবর্তন করিনা ঐ সকল আখ্যার বিনিময়ে যা মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত, যা দ্বারা তারা তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের পূর্বপরুষদের আখ্যায়িত করেছে, যার কোন অধিকার আল্লাহ্ দেননি এবং যেটার উপর তারা তাদের বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা স্থাপন করে থাকে। শুধু তাই না, বরং আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ন্যায়পরায়ণ, তারা যে দলেরই হোক না কেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেছেন:

{ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات : ١٣]

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।" (সুরা হুজুরাত ৪৯:১৩) (মাজমুল ফাতাওয়া ৩/৪১৫)

প্রশ্ন: শত্রু এবং মিত্রতার মানদণ্ড কি?

উত্তর: 'কে শত্রু আর কে মিত্র' তা যাচাই করার জন্য আমরা যে মানদণ্ড ব্যবহার করি, তার ভিত্তি হলো ইসলাম। এবং এই মানদন্ড ব্যতীত অন্য যে কোন মানদন্ড হল জাহিলী (মূর্খ-পৌত্তলিক) মানদন্ড এবং কোনভাবেই তা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এবং এই কারণে, একজন আমেরিকান মুসলিম যে ইসলামের আন্তর্গত সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ত্বাগুত বর্জন করে- সে আমাদের আপন ভাই। আমরা সম্প্রীতির একই বন্ধনে আবদ্ধ এবং তার সাহায্য এগিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব। পক্ষান্তরে, যে প্রকৃত মুসলিম নয় সে আমাদের শত্রু, যদিও সে সাওদী আরব বা অন্য কোন মুসলিম দেশের নামধারী মুসলিম হোক না কেন। নিশ্চয়ই, শুধুমাত্র একটি জাতীয়তাই এই উম্মাহর শরীরকে এক করতে পারে, তা হল ইসলাম, ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন: একজন থেকে আরেকজন কিসের ভিত্তিতে উত্তম হতে পারে জাতীয়তা নাকি অন্য কিছু?

উত্তর: জাতীয়তা কখনই ব্যক্তির সম্মান বা মর্যাদার তারতম্য করে না, মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া। একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই একজন মানুষ অপরজনের চেয়ে উত্তম হতে পারে। আল্লাহর হক্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিথীলতার কোন সুযোগ নেই, এমনকি রাসূলর (সা:) ক্ষেত্রেও নয়, যখন উসামা ইবন যায়েদ (রা:) একজন চোর মহিলার হাত না কাটার ব্যাপারে সুপারিশ করতে আসেন তখন আল্লাহ্র রাসূল (সা:) তাকে বললেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

অর্থ: "আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বনু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে বিষয়টি কুরাইশদের অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে দিল। তারা বলল এই মহিলার ব্যাপারে কে আল্লাহর রাসুল (সা.) এর কছে সুপারিশ করবে? এরপর তারা বলল আল্লাহর রাসুল (সা:) এর প্রিয় পালক নাতি উসামা বিন যায়েদ ছাড়া অন্য কেউ এই দু:সাহস করতে পারে না। তখন উসামা (রা:) রাসুল (সা:) এর নিকটে সুপারিশ করলে প্রিয়নবী সা. বললেন তুমি কি আল্লাহর (সুব:) নির্ধরিত শাস্তির ব্যপারে সুপারিশ করছ? অতপর তিনি খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধবংস হয়েছে এজন্য যে, যখন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন গরীব দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তখন তার উপর আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন করত। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" (সহীহ বুখারী ৩৪৭৫; সহীহ মুসলিম ৪৫০৫)

আল্লাহ (সুব:) কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর নিকট সেই সম্মানিত, যে বেশী তাকওয়াবান।

প্রশ্নঃ মুসলিম জাতীয়তা বোধের বিপরীতে বর্তমানে কিরূপ কুফরী জাতীয়তা বোধের চিত্র মুসলিম বিশ্বে দেখা যাচ্ছে?

উত্তরঃ আজকে মুসলিম দুনিয়ায় মুসলিম জাতীয়াতাবোধের বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। ইয়াহুদী, খৃষ্টানরা মুসলিম ভূমিগুলো দখল করে নিয়েছে, মুসলিমদের উপর চালাচ্ছে অত্যাচারের স্টীম রোলার, তাদেরকে হত্যা করছে, বন্দী করছে, মুসলিম শিশু-নারীদের হত্যা করছে, বোনদের ইজ্জত নষ্ট করছে, মুসলিমদের দ্বীন ভুলণ্ঠিত করছে। অথচ অধিকাংশ মুসলিমরা নিশ্চুপ। তারা তাদের দায়িত্ব কর্তব্য অবহেলা করে দুনিয়ার বিলাসিতার পেছনে ছুটছে। কেউবা ইয়াহুদী, খৃষ্টানদের গোলামে পরিণত হয়েছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করছে। তাদের পরস্পরের সম্পর্কের মানদণ্ড ইসলামকে ভূলে, মুসলিম জাতীয়তাবোধের বিপরীত কুফরী জাতীয়তাবোধ দানা বেঁধেছে। আমি বাংলাদেশী, আমি পাকিস্তানী, আমি ইরাকী, আমি আফগানী এসব আওড়াচ্ছে।

আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, আমরা এমন অনেক মানুষ দেখতে পাই যারা দাবী করে যে, তারা আলেম এবং সুন্নাহর অনুসারী অথচ তারা মুরতাদদের রক্তকে পবিত্র ঘোষণা করে যারা আর্মি ও পুলিশের সদস্য। যারা ক্রুসেডারদের (খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধা) পাশাপাশি অস্ত্র তুলে নিয়েছে এবং তাদেরকে তাওহীদের মানুষ ও মুজাহিদীনের বিরূদ্ধে সাহায্য করছে। তর্কের জন্য তারা শুধু এতটুকুই বলতে পারে যে তারা হল "ইরাকী', তারা 'আফগানী' তারা 'ফিলিস্তিনী' এবং তাদের রক্ত হল "ইরাকী/ আফগানী" সুতরাং পবিত্র। এমনকি কাফিররাও এ বিষয়ে তাদের সাথে একমত নয়; কারণ আশেপাশে তাকালে দেখা যায় **পৃথিবীর সকল দেশেই শত্রু ও আগ্রাসী বাহিনীকে সহায়তা করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড**।

রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "মুসলিমদের রক্তপাত হালাল নয় (তাদের হত্যা করা যাবে না) তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া; বিবাহিত যেনাকারী, হত্যাকারী এবং সেই মুরতাদ যে তার দ্বীন ত্যাগ করে জামা'আ থেকে আলাদা হয়ে যায়।" সুতরাং এই তিনটি প্রকার ছাড়া তিনি (সাঃ) মুসলিমদের রক্তের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। তিনি (সাঃ) "ইরাকী, আফগানী ইত্যাদিদের" জন্য কোন বিশেষ রায় দেননি; এমনকি তিনি ঐ রায় কোন রাষ্ট্র , কোন গোত্র, অথবা জাহিলী (মূর্খ পৌত্তলিক) দেশাত্ববোধের ভিত্তিতে দেননি।

এতদনুসারে, কোন বিবাহিত ব্যক্তি যেনা (ব্যাভিচার) করলে, তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয় যদিও সে "ইরাকী" হয়ে থাকে অথবা অন্য কোন দেশের এবং যে ব্যক্তি কোন যথার্থ (শরীয়া অনুমোদিত) কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করে, তার বিধান হল হত্যা যদিও সে একজন "ইরাকী বা অন্য কোন দেশের" হয়ে থাকে এবং যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিত্যাগ করে মুসলিমদের দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রেও তার রক্তপাত বৈধ এবং এক্ষেত্রে একজন ইরাকী অথবা অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হবে না। "দেশের সন্তান" বলে কেউ পার পাবে না।

এবং যদি এই সকল মুরতাদদের নূন্যতম চরিত্র, নৈতিকতা এবং ফিতরাহ্ থাকত (ইসলামের কথা না হয় দূরেই থাকল) তবে তারা কখনই তাদের নিজেদের ভূমির মানুষদের বিরূদ্ধে নাস্তিক ক্রুসেডারদের (ধর্মযোদ্ধা) পতাকার নিচে যুদ্ধ করত না, তাদের পরিখার উপর দাঁড়িয়ে অস্ত্র তুলে ধরত না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষেঃ তারা জাতীয়তাবাদের চেতনারও বরখেলাফকারী, যাকে তারা ইসলামের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সুতরাং কেমন পবিত্রতার (রক্তের) যোগ্য তারা?

সুতরাং ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য, যারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। 'ইরাকীদের রক্তপাত হারাম' এই চেতনা তাদের আরেকটি কৌশল এবং ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা মাত্র। যেহেতু ক্রুসেডাররা (ধর্মযোদ্ধা) দুই নদের এই দেশে (ইরাক) নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তারা এই সকল মুরতাদদের এই আর্মি ও পুলিশের সহায়তা চাচ্ছে এবং যখন তারা দেখল যে মুজাহিদীন ভাইদের হাতে মুরতাদরা ভেড়ার মত নিহত হচ্ছে, তখন তারা সত্যের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য এই সকল এজেন্ট ও তাদের মিত্রের জন্য রক্ষক খুঁজতে লাগল- ফলে তারা তাদের রক্তপাত যে হারাম- তা দাবী করল। তাদের এই দাবীর ভিত্তি হলো যে, তারা একই ভূমির অধিবাসীঃ "ইরাকী"।

শাইখ 'আব্দুল লাতিফ ইবন আবদির-রাহমান বলেন, "নিশ্চয়ই, সকল নীতির (একজনের ইসলাম) ভিত্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং এর কোন দৃঢ়তা থাকে না যদি না আল্লাহ্র শত্রুদের বর্জন করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়, তাদেরকে অস্বীকার করা

হয় এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রার্থণা করা হয়। তাদেরকে ঘৃণার সাথে পরিহার করে প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতার মাধ্যমে।" (আর-রাসায়ীল আল-মুফীদাহ পৃ ৬০)

প্রশ্ন: জাতীয়তাবাদের ধারণাকে মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্য কাফেররা কিরূপ তৎপর? জাতীয়তাবাদের কুফলগুলো কি কি?

উত্তর: শরীয়া মোতাবেক প্রত্যেক মুসলিমই যে বাঁধনে আবদ্ধ তা হলো ইসলামের বাঁধন এবং এই বাঁধনের কিছু দায়িত্ব আছে, যেমন: সাহায্য করা, অপরের দু:খে দু:খিত হওয়া, অন্যের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি। এই সুদৃঢ় বাঁধনকে ধ্বংস করার জন্য কাফিররা সবসময় তৎপর। তাই তারা মুসলিমদের মধ্যে অন্যান্য কিছু ভ্রান্ত বাঁধনের চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের মন থেকে এই ইসলামের বাঁধন মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে। যেমন: দেশের প্রতিবন্ধন বা "জাতীয়তা"। অর্থাৎ তারা বলে যে মানুষের একটি পরিচয় হলো তার দেশ এবং শুধু তাই না, একটি দেশের সব অধিবাসীই সমান-তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন। এবং এই মতবাদের মূল কথা হলো, অন্য সব বন্ধন বা দায়িত্বের উপর স্থান পাবে জাতীয়তার বন্ধন এবং দেশের প্রতি দায়িত্ব। অথচ, ইসলামী শারীয়াহ মোতাবেক এই ধরনের বন্ধন সম্পূর্ণ অবৈধ।

কারণ মুসলিমের আনুগত্য কখনও একখন্ড ভৌগোলিক এলাকার প্রতি হতে পারে না। কারণ, যে কোন মুসলিমকেই একদিন হিজরত করতে হতে পারে। যে তার নিজের দেশকে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের (সা:) খুশির চেয়ে উপরে স্থান দেয়, তাকে হুশিয়ার করে দিয়ে আল্লাহ্‌ বলেছেন:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة/٢٤)

অর্থ: "বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয়– তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য; যার ক্ষতির আশঙ্কা কর, এবং

তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস; তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (সুরা তাওবাহ ৯: ২৪)

এই আয়াতে ٢٤ :التوبة] { وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ }) "....তোমাদের আবাসস্থল যাকে তোমরা পছন্দ করো....।" বলতে স্বদেশের প্রতি টানকেই বোঝানো হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم « أَنَا بَرِىءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

অর্থ: "জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: যেসব মুসলিম মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" (সুনানে আবু দাউদ ২৬৪৭; সুনানে তিরমিজি ১৬০৪)

এছাড়া জাতীয়তাবাদ একটি অঞ্চলের মুসলিম ও অমুসলিম উভয়কে সমান মনে করে, যেটা খুবই ভয়ংকর অপরাধ।

রাসূলুলাহ (সা:) বলেছেন, الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى "ইসলাম কর্তৃত্ব করে এবং এর উপর কেউ কর্তৃত্ব করতে পারে না।" (সহীহ বুখারী তরজমাতুল বাব; সুনানে বায়হাকী ১২৫১৬; সুনানে দারাকুতনী ৩০, আলবানী কর্তৃক হাদীসটি হাসান হিসেবে স্বীকৃত)

একইভাবে জাতীয়তাবাদ দাবী করে যে, একজন মুসলিম যদি অপর এক মুসলিমের মতো একই দেশে জন্মগ্রহণ না করে, তাহলে সে হলো ভিন্ন জাতি। এটাও ইসলাম বিরোধী বক্তব্য। কারণ, দুইজন মুসলিম ভাই-ভাই, তাদের দেশ যত দূরেই হোক না কেন।

জাহিলিয়াতের এসব বন্ধনের মাঝে জাতীয়তাবাদ ছাড়াও আছে গোত্রবাদ বা কৃওমিয়্যাহ অর্থাৎ নিজেকে কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা নির্দিষ্ট জাতের কিছু মানুষের সাথে সম্পর্কিত মনে করা। যারা এই ভ্রান্তির মাঝে আছে তারা এটাকে অন্য সব বন্ধনের উপরে স্থান দেয় এবং এই গোত্রের স্বার্থেই যুদ্ধ করে। এটা হলো ইসলাম পূর্ব যুগের জাহিলিয়াত যার ব্যাপারে রাসূলুলাহ বলেছেন:

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

অর্থ: "জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্ধকার পতাকাতলে (উদ্দেশ্যহীন গোষ্ঠিগত যুদ্ধে) নিহত হয় যে মানুষকে গোষ্ঠিয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিকে ডাকে বা গোষ্ঠিয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে তার মৃত্যু হলো জাহিলিয়াতের মৃত্যু।" (সহীহ মুসলিম ৪৮৯৮) এবং পূর্বের আয়াতে {وَعَشِيرَتُكُمْ} [التوبة: ٢٤] "... তোমার আত্মীয়স্বজন ..." বলতে এই গোত্রবাদের বাঁধনের কথাই বলা হয়েছে এবং আল্লাহ্ আমাদের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন নবীদের কথা যারা তাদের মুশরিক স্বজনদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থ: "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল– তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন কর। ...." (সুরা মুমতাহিনা ৬০: ৪)

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শারীয়াহ অনুযায়ী একমাত্র বাঁধন হলো ইসলামের বাঁধন এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের বাঁধন। এ ছাড়া অন্য কোন বাঁধনের কথা চিন্তাও করা যাবে না। সুতরাং ভালবাসা এবং শত্রুতা শুধু ঈমানের উপরই নির্ভর করে। "....যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনো।" কারো ব্যক্তিত্বের সাথে শত্রুতা নয় বরং তার আমলের সাথে শত্রুতা হবে আল্লাহর জন্য। যেমন প্রসিদ্ধ আছে: পাপকে ঘৃনা করো পাপীকে নয়। কেননা পাপী যখন তওবা করবে তখন সে

আমাদের ভাই হয়ে যাবে। হিন্দা এবং ওয়াহশী এর ঘটনাই এর জলন্ত প্রমান। ওয়াহশী রাসূলুল্লাহ (সা:) এর চাচা হামযাকে হত্যা করেছিলো হিন্দার নির্দেশে। আর হিন্দা তার কলিজা বের করে চিবিয়েছিলো। অথচ ইসলাম গ্রহনের পরে তাদের নামের সাথে যুক্ত হলো "রাযিআল্লাহু তায়ালা আনহু"।

জাহিলিয়াহ্র বন্ধনের মাঝে আরো আছে ভাষা, বর্ণ, বা সুযোগ সুবিধার ভিত্তিক বন্ধন। এগুলোর সবই নিষিদ্ধ, এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্র বাণী: ".... যে সম্পদ তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের ব্যবসা যার ক্ষতি তোমরা আশংকা কর....।" (সুরা আত-তাওবাহ ৯: ২৪)

এসব কোন বন্ধনই মুসলিমদের চিন্তায় আসতে পারে না, বিশেষত: এগুলো যখন ইসলামী শারীয়াহর বিরুদ্ধে যায়। এবং এইসব বন্ধনের ধারণা তৈরী করেছে কাফিররা যাতে তারা মুসলিমদের বিভক্ত করতে পারে এবং মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা তৈরি করে দিতে পারে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [آل عمران/١٠٠-١٠٥)

অর্থ: "যদি তোমরা তাদের এক দলের অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর আবার কাফিরে পরিণত করবে। কিরূপে তোমরা কুফরী করতে পার- যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলী তোমাদের নিকট পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল বিদ্যমান আছেন। এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বন করবে, সে সরল পথে পরিচালিত হবে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না। এবং তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশি দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হলে। তোমরা অগ্নীকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদের তা হতে উদ্ধার করেন; এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন। যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। তোমাদের মধ্যে এরূপ একদল হওয়া উচিত- যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম। তোমরা তাদের মতো হবে না, যাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ও নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।" (সুরা আল ইমরান ৩:১০০-১০৫)

এতক্ষণ যা যা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম হলো, মুসলিমদের বুঝতে হবে যে তাদের আনুগত্য, তাদের প্রচেষ্টা, তাদের সাহায্য- সহযোগিতা এই সবকিছুরই ভিত্তি হলো তাদের ঈমানের বাঁধন এবং এটা ছাড়া একজন মুসলিমের জন্য আর কোন বন্ধন নেই, কারণ অন্য সব বন্ধনই হলো জাহিলিয়াহ। সুতরাং অন্যসব বন্ধনের উপর ভিত্তি করে বন্ধুত্ব করা বা ঐসব বন্ধনের জন্য যুদ্ধ করা হারাম। এবং সবচেয়ে পূর্বে অবস্থানকারী মুসলিমও সবচেয়ে পশ্চিমে অবস্থানকারী মুসলিমের ভাই, তাদের গায়ের রং, তাদের ভাষা, তাদের গোত্র যতো ভিন্ন হোক না কেন। এবং এই ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো, দ্বীনের খাতিরে তাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই তার নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ফরয।

প্রশ্ন: দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর কি?

উত্তর: ইসলামের সংস্পর্শে বিদ্বেষ ও বিভেদের সকল শ্লোগান বন্ধ হয়ে যায়। বংশ, গোত্র ও আঞ্চলিক পার্থক্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট জাতীয়তা দুর্গন্ধময় লাশ হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। দেশ, মাটি, রক্ত ও মাংসের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে মানুষের দৃষ্টি উর্ধমূখী হয়। যেদিন থেকে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণতার গন্ডি ভেঙ্গে দিয়ে দিগন্ত রেখা পর্যন্ত প্রসারিত হয় সে দিনই মুসলিমদের আবাসভূমি নাম ধারণ করে। কারণ সেখানে ঈমানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি লাভ করে।

ইসলামের এ সুশীতল ছায়াতলে যারা বসবাস করেন, তাঁরাই এ দেশের নিরাপত্তা বিধান করেন। এ দেশের প্রতিরক্ষা ও ইসলামী শাসনাধীন এলাকার সীমানা সম্প্রাসারনের প্রচেষ্টায় যারা প্রাণত্যাগ করেন, তাঁরাই হন শহীদ। যাঁরাই ইসলামী আক্বিদার রত্নহার নিজেদের গলায় পরিধান করেন এবং ইসলামী শরীয়াতকে তাঁদের জীবনের প্রতিপালনীয় বিধান হিসেবে মেনে নেন, তাঁদের সকলেরই আশ্রয়স্থল হচ্ছে দারুল ইসলাম। এমন কি যারা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ না করেও ইসলামী শরীয়াতের শাসন ব্যবস্থা মেনে নেয় তারাও জিম্মি হিসেবে এ রাষ্ট্রের সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারে।

কিন্তু যে দেশে ইসলামী শাসনের পতাকা উত্তোলন করা হয়নি এবং যেখানে ইসলামী শরীয়াত বাস্তবায়িত নয়, সে দেশ মুসলিম ও জিম্মি উভয়ের জন্যেই দারুল **কুফর** /দারুল হরব। মুসলমান সর্বদায়ই দারুল হরবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। এ দারুল হরবের সাথে কোন প্রকারের স্বার্থে জড়িত থাকে, তবুও প্রয়োজনবোধে সে দেশের বিরূদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে মুসলিম কখনো পশ্চাদপদ হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা:) মক্কাবাসীদের বিরূদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। অথচ মক্কা ছিল তাঁর পবিত্র জন্মভূমি। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও স্ববংশের লোকেরা সেখানেই বসবাস করছিল। তিনি ও তাঁর প্রিয় সহচরগণের বাড়ী-ঘর ও ক্ষেত-খামার মক্কাতেই ছিল। মদীনা অভিমুখে হিজরাত করার সময় তাঁরা এসব বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে গিয়েছিলেন। তথাপি ইসলামের সামনে নতি স্বীকার করে

আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের শাসন মেনে না নেয়া পর্যন্ত মক্কার মত পবিত্র শহরও দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি।

এটাই হচ্ছে ইসলাম। মুখে কিছু শব্দ উচ্চারণ, বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান পালন অথবা বিশেষ কোন বংশে বা দেশে জন্ম গ্রহণের নাম ইসলাম নয়। এ আদর্শেরই নাম ইসলাম এবং এ আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রই দারুল ইসলাম। কোন দেশের মাটি, কোন বিশেষ গোত্র, কোন বিশেষ বংশে বা পরিবারের নাম ইসলাম বা দারুল ইসলাম নয়।

ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে যে, মুসলিম যে মাতৃভূমিকে ভালবাসবে এবং যার প্রতিরক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাববে- তা নিছক একখন্ড ভুমি নয়। যে জাতীয়তা মুসলিমের পরিচয় ঘোষণা করবে, তা কোন গভর্নমেন্ট প্রদত্ত সংজ্ঞা মুতাবিক গঠিত জাতি নয়। মুসলিমের আত্মীয়তা ও ঐক্যসূত্র রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে না। যে পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্যে মুসলিম জীবন দান করতেও গৌরববোধ করবে; তা কোন নির্দিষ্ট দেশের প্রতীক নয়। যে বিজয়ের জন্যে মুসলিম সর্বদা সচেষ্ট থাকবে এবং যা অর্জিত হলে মুসলিম আল্লাহর দরবারে মাথা নত করবে, তা নিছক সামরিক বিজয় নয় বরং তা হবে মহাসত্যের বিজয়। আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا [النصر/١-٣]

অর্থ: "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন তুমি জনগণকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। সে সময় নিজের রবের প্রশংসা ও গুণকীর্তন কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।" (সুরা নাসর ১১০ নং সূরা)

এ বিজয় শুধু ঈমানের পতাকা তলেই অর্জিত হয়। অপরাপর পতাকার বিদ্বেষাত্মক শ্লোগান এখানে ব্যবহৃত হয় না। আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও তাঁরই শরীয়াতের বাস্তবায়নের জন্যে এখানে জিহাদ অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নয়। উপরে যে দারুল ইসলামের

পরিচয় পেশ করা হয়েছে তারই প্রতিরক্ষার জন্যে জিহাদের প্রয়োজন, জন্মভূমি বা জাতির মর্যাদা রক্ষার মনোভাব নিয়ে নয়। বিজয়ের পর বিজয়ী সেনাবাহিনী শুধু গণিমতের সম্পদ হস্তগত করণের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে না।

পার্থিব খ্যাতি অর্জন বা বীরত্ব প্রদর্শনও এ বিজয়ের উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই মু'মিনের পরম কাম্য। এ জন্য, বিজয়ী বাহিনী তাসবীহ ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে পরম করুণাময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠে। দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ জিহাদের প্রেরণা জাগ্রত করে না। পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদির নিরাপত্তা বিধানও জিহাদের লক্ষ্য নয়। তবে দেশ, জাতি, পরিবার ও সন্তানদেরকে বাতিল আদর্শের আক্রমণ থেকে মুক্ত করা এবং তাদের দ্বীন ও ঈমানের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে জিহাদ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থ: "আবু মুসা আশআরী (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "এক ব্যক্তি গণিমতের জন্য লড়াই করে, অপর এক ব্যক্তি মর্যাদা লাভের জন্যে, কেউবা যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শণের জন্য। বলুন তো, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়েছে? উত্তরে তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করে, একমাত্র সে-ই আল্লাহর পথে লড়েছে।" (সহীহ বুখারী ২৮১০; সহীহ মুসলিম ৫০২৮)

শুধু আল্লাহর পথে লড়াই করার মাধ্যমেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা যেতে পারে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে লড়াই করে এ মর্যাদা হাসিল করা যায় না।

যে দেশ মুসলিমদের ঈমান-আকীদার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়, দ্বীনি আদেশ নিষেধ প্রতিপালনে বাধা দেয় এবং যে দেশে আল্লাহর শরীয়াত পরিত্যক্ত হয়েছে, সে দেশ দারুল হার্‌ব।

সে দেশে যদি মুসলিমদের আত্মীয়-স্বজন, পরিবার ও বংশের লোকজন বাস করে, সেখানে যদি মুসলিমদের ব্যবসা-বানিজ্য অথবা জায়গা-জমি থাকে এবং সে দেশের নিরাপত্তার সাথে যদি মুসলিমদের আর্থিক স্বার্থের প্রশ্নও জড়িত থাকে তখাপি তার দারুল হরবের চরিত্র পরিবর্তন করা যাবে না। পক্ষান্তরে যে দেশে মুসলিমদের ঈমান-আকীদা সর্বপ্রকার চাপমুক্ত ও তার প্রাধান্য স্বীকৃত এবং যে দেশে ইসলামী শরীয়াত বাস্তবে রূপ লাভ করে, সে দেশ দারুল ইসলাম আখ্যা লাভ করবে। সে দেশে মুসলিমগণ তাদের পরিবার-পরিজনসহ বসবাস না করুক, তাদের বংশ ও গোত্রের লোক সেখানে না থাকুক এবং সে দেশের সাথে মুসলিমদের ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত না থাকুক, তবুও সে দেশ দারুল ইসলাম।

যে দেশে ইসলামী আকীদার শাসন চলে, ইসলামই যে দেশে জীবন বিধানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং আল্লাহর শরীয়ত যে দেশে কার্যকর হয়, সে দেশই মুসলিমদের স্বদেশ। স্বদেশের এ অর্থই মানবতার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। অনুরূপভাবে আকীদা-বিশ্বাস এবং জীবন বিধানের ভিত্তিতেই ইসলামী জাতীয়তা গড়ে উঠে এবং মানুষের মনুষ্যত্বকেই সেখানে বিকশিত করে তোলা হয়।

প্রশ্ন: দারুল কুফর থেকে হিজরতের হুকুম কি, এব্যাপারে বিস্তারিত বিধান সমূহ কি কি?

উত্তর: যখন দ্বীনের ওপর ফিৎনার আশংকা থাকে তখন দ্বীন রক্ষা করে মুশরিকদের থেকে নিরাপদে হিজরত করা ওয়াজিব, যে হিজরত করতে সক্ষম। আর এটাই হল 'দারুল কুফর' থেকে 'দারুল ইসলাম' অথবা 'দারুল আমান' এ হিজরত করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم « أَنَا بَرِىءٌ مِــنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

অর্থ: "জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: যেসব মুসলিম মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" (সুনানে আবু দাউদ ২৬৪৭; সুনানে তিরমিজি ১৬০৪)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ فَــسَأَلْنَاهَا عَــنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

অর্থ: "আতা ইবনে আবি বারাহ (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাইদ ইবনে উমাইর আল লাইছিকে সাথে নিয়ে আয়েশা (রা:) এর সাথে দেখা করি। এরপর আমরা তাকে হিজরতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বললেন: আজ আর হিজরত নেই, একসময় মু'মিনগণের ভেতরে যে ব্যক্তির দ্বীনের ব্যাপারে পরিক্ষায় পরে যাওয়ার আশংকা করতো সে তার দ্বীন নিয়ে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূল (সা:) এর নিকট পালিয়ে আসতো। কিন্তু আজ আল্লাহ (সুব:) ইসলামকে বিজয় দান করেছেন, এখন সে যেখানে খুশী আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারে; তবে জিহাদ এবং এর নিয়্যত ব্যতীত (এর অবকাশ আছ)।" (সহীহ বুখারী ৩৯০০)

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, **لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّــارُ** "হিজরত বন্ধ হবে না যতদিন পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ চলবে।" (সুনানে নাসায়ী ৪১৮৩; মুসনাদে আহমাদ ২২৩২৪)

অন্য এলাকায় হিজরতের হুকুম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে কুদামাহ (রহিমাহুল্লাহ) "হিজরত সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলেন: আর এটি হলো 'দারুল কুফর' ত্যাগ করে 'দারুল ইসলামে' আসা"। আল্লাহ্ বলেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِــي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِــكَ مَــأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء/٩٧)

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা নিজেদের জীবনের প্রতি যুলুম করেছিল, ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করতে গিয়ে বলবে: তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম। তারা বলবে: আল্লাহ্‌র দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তন্মধ্যে হিজরত করতে? অতএব তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।" (সুরা নিসা ৪:৯৭)

মুহাজির তিন প্রকারের:

প্রথমত: যার ওপর হিজরত ওয়াজিব এবং সে এ ব্যাপারে সক্ষম। যখন সে তার দ্বীন প্রকাশ করতে পারে না বা যখন সে দ্বীনের হুকুম মানতে পারে না অথবা যখন সে কাফিরদের মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং এই ব্যক্তির ওপর হিজরত ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء/٩٧)

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা নিজেদের জীবনের প্রতি যুলুম করেছিল, ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণ করতে গিয়ে বলবে: তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম। তারা বলবে: আল্লাহ্র দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তন্মধ্যে হিজরত করতে? অতএব তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।" (সুরা নিসা ৪: ৯৭)

আর এটা সত্যিই একটি ভয়াবহ হুমকি, যা হিজরত এর আবশ্যকতা তুলে ধরে। এটা এই কারণেই যে, প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির জন্য 'দারুল কুফর' থেকে হিজরত করা অবশ্য করণীয়। আর হিজরত হলো এসব আবশ্যক প্রয়োজনসমূহের একটি, যা অন্যান্য হুকুমসমূহকে পরিপূর্ণতা দেয় এবং যা ছাড়া হুকুমসমূহ পালন করা সম্ভব নয়; সুতরাং এ বিষয়টিও ওয়াজিব।

দ্বিতীয়ত: যার ওপর হিজরত ওয়াজিব নয়। যে হিজরত করতে সক্ষম নয়- অসুস্থতার কারণে, অথবা সেখানে থাকতে বাধ্য হলে অথবা তার স্ত্রী সন্তানদের বা অনুরূপের (শারীরিক) দুর্বলতার কারণে। আল্লাহ্ (সুব:) বলেন:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

অর্থ: "কিন্তু পুরুষ নারী ও শিশুদের মধ্যে অসহায়গণ ব্যতীত। যারা কোন উপায় করতে পারে না বা কোন পথ প্রাপ্ত হয় না। ফলত: তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" (সুরা নিসা ৪:৯৮-৯৯)

আর এক্ষেত্রে হিজরতকে উত্তম বা সুপারিশমূলকও বলা যাবে না কারণ, এটি সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত: সেই ব্যক্তি যার জন্য এটি প্রশংসনীয় কিন্তু ওয়াজিব নয়। ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি হিজরত করতে সক্ষম আবার প্রকাশ্যে তার দ্বীন পালনেও সক্ষম। সুতরাং দারুল কুফরে তার বসবাসে ইতি টানা প্রশংসনীয় হবে যাতে সে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে সক্ষম হয় এবং মুসলিমদের সংখ্যা বাড়াতে পারে এবং তাদের সাহায্য করতে পারে। সেই সাথে কাফিরদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের কুকর্মের সাক্ষী হওয়া থেকেও রেহাই পায়। কিন্তু এটি তার ওয়াজিব নয় কারণ সে হিজরত না করেই সেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে সক্ষম।

নু'আইম আন নুহাম যখন হিজরত করতে চান তখন তার কওম বনু আদি তার কাছে এসে বলে, আমাদের সাথে থাকুন, আপনি আপনার দ্বীনের ওপর থাকবেন এবং তাদের থেকে আপনাকে রক্ষা করবো যারা আপনার দ্বীনের ওপর থাকবে না এবং তাদের থেকে আপনাকে রক্ষা করব যারা আপনার ক্ষতি করতে চায়। আমাদের জন্য দায়িত্বশীল থাকুন যেভাবে আপনি (বর্তমানে) আমাদের প্রতি দায়িত্বশীল আছেন।' আর তিনি বনু আদির ইয়াতিম ও বিধবাদের দেখাশোনা করতেন। সুতরাং তিনি কিছুদিন হিজরত থেকে বিরত থেকে পরবর্তী সময়ে হিজরত করেন। রাসূলুলাহ (সা:) তাকে বলেন: "আমার কওম আমার প্রতি যেরকম আচরণ করেছিল তোমার কওম তোমার প্রতি তারচেয়ে উত্তম আচরণ করেছে। আমার কওম আমাকে বহিষ্কার করে এবং আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল আর তোমার কওম তোমাকে রক্ষা করে এবং (ক্ষতি থেকে) বাঁচায়। তখন তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুলাহ! আপনার কওম তো আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য ও তার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের দিকে বহিষ্কার করেছে। আর আমার কওম আমাকে হিজরত ও আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে আটকে রেখেছে। অথবা এর কাছাকাছি কোন বক্তব্য।" (আল মুগনি ওয়াশ শারহ্ আল কাবীর) (জিহাদের মৌলিক নীতিমালা-আ: ক্বাদির ইবনে আ: আযিয)

প্রশ্ন: দারুল কুফর থেকে যতক্ষন হিজরত করতে না পারবে ততক্ষন একজন মুসলিমের দায়িত্ব কি?

উত্তর: দারুল কুফরে একজন ব্যক্তির বসবাসের অনুমতি নেই। এখান থেকে হিজরত করা তার জন্য ওয়াজিব। যতক্ষন এই পাপের স্থান থেকে হিজরত করতে না পারবে ততক্ষন করনীয় হচ্ছে:

ক. দাওয়াহর কাজ করা।

খ. অর্থ উপার্জন করে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। (মাসারী আল আসওয়াক -ইবনু আন্ নুহাস)

হিজরত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের লিখিত কিতাব 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ' এর 'হিজরত' অধ্যায়ে দেখুন।

দ্বীনের শীর্ষচুড়া

প্রশ্ন: দ্বীনের শীর্ষ চুড়া কি? এর হুকুম কি?

উত্তর: দ্বীনের শীর্ষ চূড়া হচ্ছে: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ... أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِه وَذُرْوَةِ سَنَامِه أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالْإِسْلَامُ فَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ وَأَمَّا عَمُودُهُ فَالصَّلَاةُ وَأَمَّا ذُرْوَةُ سَنَامِه فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه

অর্থ: "মুআজ বিন জাবাল বর্ণনা করেন, আমরা তাবুক হতে ফেরার পথে রাসূল (সা:) এর সাথে ছিলাম তিনি আমাকে বললেন,...তুমি যদি চাও আমি তোমাকে এই বিষয়ের (ইসলামের) মূল, স্তম্ভ এবং চূড়া সম্পর্কে বলতে পারি।" তিনি বলেন, "সব বিষয়ের প্রধান হল ইসলাম; এর খুঁটি হল সালাত এবং এর চূড়া হল জিহাদ।" (মুসনাদে আহমদ ২২০৬৮) আল্লাহ সুব: নির্দেশ দিয়েছেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [البقرة/٢١٦]

অর্থ: "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয়

পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তূত: আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জান না।" (সুরা বাকারা ২:২১৬)

ইমাম আব্দুল ক্বাদির ইবনে আ: আজিজ বলেন, জিহাদ একটি ফরযে কিফায়া ইবাদত, তবে ক্ষেত্রবিশেষে এটি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয হতে পারে।

ইবনে কুদামাহ বলেন: "তিনটি ক্ষেত্রে জিহাদ নির্দিষ্টভাবে (ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর) ফরয হয়:

প্রথমত: যখন দুইটি বাহিনী পরস্পর মিলিত হয় এবং মুখোমুখী অবস্থান করে।

দ্বিতীয়ত: কাফিররা কোন দেশ আক্রমন করলে ঐ দেশে অবস্থানকারী সকলের উপর জিহাদ ফরয।

তৃতীয়ত: ইমাম যদি সকলকে জিহাদের ডাক দেয় তবে সকলের জন্য এতে অংশ নেয়া বাধ্যতামূলক। (আল্ মুগনী ওয়াশ শারহ্ আল কাবীর / দশম খন্ড)

শাইখ আ: আযযাম আরও একটি পরিস্থিতিতে ফারদুল আইন বলেন, 'যদি কাফেররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে বন্দী করে ফেলে।' (মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা)

প্রশ্ন: ঈমান আনার পর সর্ব প্রথম ফারদ কি?

উত্তর: এই বিষয়ের উপর ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন, "প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, যার মাধ্যমে আগ্রাসী শত্রুদের (মুসলিমদের ভূমি থেকে) বের করে দেয়া হয়, এটি জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিহাদ। সর্বজন স্বীকৃত যে, দ্বীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে একটি আবশ্যক দায়িত্ব। ঈমান আনার পর প্রথম ফারদ দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রুদেরকে পার্থিব ও দ্বীনের উপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে কোন ওজর-আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই। যেমন: সরবরাহ অথবা পরিবহন বরং যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। আলেমগণ, আমাদের সহকর্মীগণ এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ের উপর একমত।"

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ

অর্থ: "উবাদা ইবনে সামেত (রা:) হতে বর্ণিত নবী (সা:) বলেছেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকটে বাইআত দিয়েছি: তাকে শুনতে ও মানতে হবে কঠিন এবং সহজ সময়ে ।" (সহীহ বুখারী ৭১৯৯)

তাই এই আবশ্যক দায়িত্বের একটি খুটি হচ্ছে জিহাদে বেরিয়ে পরতে হবে, যদিও আমাদের কঠিন অথবা সহজ সময় হয়। কিন্তু প্রতিরোধমূলক জিহাদের ক্ষেত্রে এই ফরদ কাজটির প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক গুনে বেড়ে যায়। দ্বীন এবং পবিত্র বিষয়গুলো আগ্রাসী শত্রুদের হতে রক্ষা করা হলো ফর্দ । এ ব্যাপারে সবাই একমত ।

(কিতাব আল-ইখতিয়ারাত আল-ইলমিয়্যাহ-ইবনে তাইমিয়্যাহ– আল-ফাতওয়া কুব্রা-৪/৬০৮)

প্রশ্ন: অন্তরে তাওহীদের ভিত্তি মজবুত হওয়ার জন্য করনীয় কি? তাওহীদ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে?

উত্তর: শায়খ আবদুল্লাহ আয্যাম (র:) বলেন, "যখন ময়দানে ছিলাম তখন আমি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত একজন মানুষের অন্তরে তাওহীদের ভিত্তি মজবুত হতে পারে না।"

এই হচ্ছে সেই তাওহীদ যার সম্পর্কে রাসূল (সা:) বলে গিয়েছেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমাকে পাঠানো হয়েছে তলোয়ার সহ, যাতে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় শরীক বিহীন অবস্থায় । আমার রিযিক নির্ধারণ করা হয়েছে আমার বর্শা নিচে। আর অপমান ও লাঞ্ছনা অবধারিত করা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধিতাকারীদের জন্য । যে যেই সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে

তাদেরই একজন ।" (মুসনাদে আহমদ ৫১১৪, আলবানী র. বলেছেন হাদীসটি সহীহ 'ইরওয়া আল-ঘালীল')

সুতরাং, দুনিয়ার বুকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তলোয়ার এর মাধ্যমে । শুধু আক্বীদা অথবা আমলের বই পড়ার মাধ্যমে নয় ।

প্রকৃতপক্ষে, রাসূল (সা:) আমাদেরকে সেই তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহর (সকল ইবাদতে আল্লাহ্‌র একত্ব অক্ষুণ্ন রাখার) শিক্ষা দিয়েছেন যার কারণে তিনি প্রেরিত হয়েছেন; যাতে এই তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয় । তিনিই শিখিয়েছেন যে, কোন বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে এটি তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হবার নয় ।

বরং এটি প্রতিষ্ঠিত হবে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে, জিহাদের ময়দানে কাফিরদের মোকাবেলার মাধ্যমে; তাগুতের মুখোমুখি হয়ে অত্যাচার সহ্য করার মাধ্যমে ও সর্বোপরী নফ্সের কুরবানী করার মাধ্যমে । যখনই কোন ব্যক্তি এই দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে তখনই এই দ্বীন তার অন্ত র্নিহিত সৌন্দর্য এবং নিগুঢ় তত্ত্ব সেই ব্যক্তির জন্য প্রকাশ করে দেয় । যে প্রতিদিন মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হয় সে কি কোন কিছুকে ভয় পেতে পারে আল্লাহ ছাড়া ।

সুতরাং তাওহীদ অন্তরে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে শিকড় গাড়তে পারে না জিহাদ করা ব্যতীত । (তাওহীদ আল আমালী, শাইখ আ: আযযম রহ.)

প্রশ্ন: শাসক যদি কুফরী করে এবং এতে অনড় থাকে, তার বিরুদ্ধে ঈমানদারদের কি করনীয়?

উত্তর: শাসক যদি কুফরী করে এবং এতে অনড় থাকে, তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করা আবশ্যক, এটি ফরযে আইন । আর অন্য সকল বিষয়ের উপর এটি প্রাধান্য পাবে । তার বিরূদ্ধে করনীয় গুলো হচ্ছে:

১) এই হুকুমটি ঐসব শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে শারীয়াহ ব্যতীত অন্য আইন প্রয়োগ করে ।

২) আর এই মুরতাদ শাসকের পক্ষে যদি কোন ব্যাখ্যা না থাকে; তাহলে তাকে সত্ত্বর অপসারণ করা অত্যাবশ্যক । আর তাকে বিচারের সম্মুখীন

করতে হবে, এতে যদি সে তাওবা করে তাহলে ছেড়ে দেয়া হবে অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে।

৩) আর যদি মুরতাদ শাসক একটি বাহিনীকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে; তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যক এবং তার পক্ষে যে যুদ্ধ করবে সেও তার মতই একজন কাফির।

৫) আর মুসলিমরা যদি এটি করতে অক্ষম হয় তাহলে অন্তত এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬) আর এসব মুরতাদ শাসক ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারদুল আইন, শুধুমাত্র তারাই অব্যাহতি পাবে যাদের পক্ষে শারীয়াহ সম্মত ওযর আছে।

৭) স্বভাবজাত অন্যান্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধের চেয়ে, এসকল মুরতাদ শাসকদের সাথে যুদ্ধ করা অগ্রাধিকার পাবে।

৮) আর এক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই যে, মুসলিম মুজাহিদদের একটি ভিন্ন রাষ্ট্র থাকতে হবে।

৯) অনেকে বলে থাকেন যে, কাফেরদের বাহিনীর মধ্যে নানা কারণে অনেক মুসলিম মিশে আছে; তাদেরকে পৃথক করতে হবে একথারও কোন ভিত্তি নেই। (জিহাদের মৌলিক নীতিমালা-আ: ক্বাদির ইবনে আ: আযিয)

জিহাদ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের লিখিত 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ' কিতাবটি পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়: বিস্তারিত সূচী

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলাম

প্রশ্ন: 'ইসলাম' কি?
প্রশ্ন: মুসলিম কে?
প্রশ্ন: ইসলাম অর্থ শান্তি কেন করা হয়ে থাকে?
প্রশ্ন: 'ইসলাম পরিপূর্ন দ্বীন' তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: 'ইসলামই একমাত্র গ্রহনযোগ্য দ্বীন, অন্য কোন দ্বীন গ্রহনযোগ্য নয়' তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: ইসলামের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নির্দেশ কি?
প্রশ্ন: যে ব্যক্তি ইসলামের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ মানবে না তাদের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?
প্রশ্ন: ইসলাম গ্রহণ না করে নেক আমল করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি?
প্রশ্ন: ইসলামের মূল উৎস কি?
প্রশ্ন: ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টি ও কি কি?
প্রশ্ন: হাদীসে জিবরাইল কি? সেখানে ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?
প্রশ্ন: কতক্ষন পর্যন্ত একজন ব্যক্তি তার জান-মালের নিরাপত্তা পাবে ।

আরকানুল ইসলাম

প্রশ্ন: ইসলামের কয়টি রুকন ও কি কি?
প্রশ্ন: শাহাদাতাইন কাকে বলে?
প্রশ্ন: ইসলামে শাহাদাতাইনের অবস্থান কি?
প্রশ্ন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদানের অর্থ কি?
প্রশ্ন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর স্বাক্ষ্য দানের দাবী কি?
প্রশ্ন: 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কথার সাক্ষ্যদানের অর্থ কি?
প্রশ্ন: 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কথার স্বাক্ষ্যদান কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে?
প্রশ্ন: সালাত কাকে বলে? কত ওয়াক্ত সালাত ফরয এবং ইকামাতে সালাত বলতে কি বুঝায়?

প্রশ্ন: সালাত ফরযের দালীল কি?
প্রশ্ন: কাদের উপর সালাত ফরয?
প্রশ্ন: সালাত বা নামায ত্যাগ কারীর বিধান কি?
প্রশ্ন: সালাতের শর্ত সমূহ কি কি?
প্রশ্ন: সালাতের সময় কি কি?
প্রশ্ন: সালাতের নিষিদ্ধ সময় সমূহ কখন?
প্রশ্ন: ফরয সালাতের রাকা'আতের সংখ্যা কত ও কি কি?
প্রশ্ন: জামা'আতে সালাত আদায় করার বিধান কি?
প্রশ্ন: বিদ'আতী ইমাম হলে তার পিছনে সালাত পড়ার ব্যাপারে বিধান কি?
প্রশ্ন: যাকাতের সংজ্ঞা কি?
প্রশ্ন: ইসলামে যাকাতের স্থান কি?
প্রশ্ন: যাকাতের বিধান কি?
প্রশ্ন: যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?
প্রশ্ন: যাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি? তার নিসাব ও যাকাতের পরিমান ইত্যাদি বর্ণনা করুন?
প্রশ্ন: যাকাত বন্টনের খাত সমূহ কি কি?
প্রশ্ন: যাকাতুল ফিত্বর কি এবং কেন?
প্রশ্ন: সিয়ামের সংজ্ঞা কি?
প্রশ্ন: রামাদান মাসের সিয়াম সাধনের বিধান কি?
প্রশ্ন: সিয়াম ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ কি কি?
প্রশ্ন: সিয়াম সাধনের আদাব সমূহ কি কি?
প্রশ্ন: সিয়াম বিনষ্ট কারী বিষয় সমূহ কি কি?
প্রশ্ন: সিয়ামের সাধারণ বিধান সমূহ কি কি?
প্রশ্ন: হজ্জের সংজ্ঞা কি?
প্রশ্ন: হজ্জের হুকুম কি?
প্রশ্ন: হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত কি কি?
প্রশ্ন: হজ্জ কত প্রকার ও কি কি?
প্রশ্ন: হজ্জের আর্কান বা রুক্ন সমূহ কি কি?
প্রশ্ন: হজ্জের ওয়াজিব সমূহ কি কি?

প্রশ্ন: হজ্জের সুন্নত সমূহ কি কি?
প্রশ্ন: কি কি কারণে হজ্জ ভেঙ্গে যায় এবং কি কি কারনে কাফফারা ওয়াজিব হয়?
প্রশ্ন: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ কি কি?
প্রশ্ন: ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ করা জায়েজ?

তৃতীয় অধ্যায়: ঈমান

প্রশ্ন: ঈমান কি?
প্রশ্ন: মুমিন কে?
প্রশ্ন: ঈমান কি বাড়ে কমে?
প্রশ্ন: ঈমানের আরাকান বা মৌলিক বিষয় কয়টি ও কি কি?
প্রশ্ন: ঈমানের শাখা কয়টি, এর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বনিম্ন শাখা কি?
প্রশ্ন: প্রকৃতপক্ষে কালিমা কয়টি, একে কি বলা হয়? আল্লাহ এই কালিমাকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
প্রশ্ন: কে ঈমানের স্বাদ লাভ করে?
প্রশ্ন: ঈমানের আলামত কি?
প্রশ্ন: কামেল ঈমানের আলামত কি?

আরকানুল ঈমান

প্রশ্ন: ঈমানের রুকন কয়টি ও কি কি?
প্রশ্ন: আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে কি বোঝায়? আল্লাহর প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?
প্রশ্ন: মানুষ আল্লাহর (সুব:) পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরুপনে অক্ষম বিষয়টির প্রমান কি?
প্রশ্ন: আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি?
প্রশ্ন: কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বর্ণিত আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ কি?
আল্লাহর (সুব:) ৯৯ টি সুন্দরতম নাম:

প্রশ্ন: আল্লাহ (সুব:) কোথায়?
প্রশ্ন: কুরআন-সুন্নাহতে যে এসেছে ‘আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’ তার মানে কি?
প্রশ্ন: আল্লাহর ইস্‌তিওয়া বা আরশে সমাসীন হওয়া গুনের প্রতি আমরা কিভাবে ঈমান আনব?
প্রশ্ন: আল্লাহ নিরাকার নন এই বিষয়টির প্রমান কি?
প্রশ্ন: দুনিয়াতে বসে আল্লাহকে দেখা সম্ভব কি?
প্রশ্ন: মালায়েকাদের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?
প্রশ্ন: সংক্ষিপ্ত ভাবে মালায়েকাদের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?
প্রশ্ন: মালায়েকারা কিসের তৈরী?
প্রশ্ন: মালায়েকাদের সংখ্যা কত?
প্রশ্ন: বিশেষ কিছু মালায়েকার নাম উল্লেখ করুন?
প্রশ্ন: মালায়েকাদের সিফাত বা গুন বৈশিষ্ট্য কি কি?
প্রশ্ন: মালায়েকাদের কর্মসমূহ কি কি?
প্রশ্ন: আমাদের প্রতি মালায়েকাদের কি অধিকার রয়েছে?
প্রশ্ন: মালায়েকাদের প্রতি ঈমান আনার সুফল কি?
প্রশ্ন: কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?
প্রশ্ন: কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার মূল কথা কি?
প্রশ্ন: এসব কিতাব নাযিলের প্রয়োজনীয়তা ও হিক্‌মাহ কি?
প্রশ্ন: কিতাব সমূহের প্রতি কিভাবে ঈমান আনয়ন করতে হবে?
প্রশ্ন: আল কুরআনের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?
প্রশ্ন: পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ থেকে কিভাবে সংবাদ গ্রহণ করতে হবে?
প্রশ্ন: কুরআন ও হাদীসে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ হয়েছে তা কি কি?
প্রশ্ন: রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার বিধান কি?
প্রশ্ন: নবী-রাসুলদের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?
প্রশ্ন: নবুওয়াতের হাকীকাত কি?
প্রশ্ন: নাবী-রাসূলদের কেন পাঠানো হয়েছে?

প্রশ্ন: রাসূলগণের দায়িত্ব সমূহ কি কি?
প্রশ্ন: ইসলাম সকল নাবীদের দ্বীন ছিল তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: রাসূলগণ মানুষ, তাঁরা "গায়েব" জানেন না তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: রাসূলগণ মা'সূম বা নিস্পাপ ছিলেন তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা কত এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা?
প্রশ্ন: নবীদের (আ:) মু'জিযাহ্ কি?
প্রশ্ন: রাসুল (সা:) এর নবুওয়াতের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?
প্রশ্ন: আমাদের নবী (সা:) কি মানুষ ছিলেন?
প্রশ্ন: আমাদের নবী (সা:) কিসের তৈরী ছিলেন? নূরের না মাটির তৈরী?
প্রশ্ন: আমাদের রাসুল (সা:) কি আলেমূল গায়েব ছিলেন?
প্রশ্ন: আমাদের রাসূল (সা:) কি সব জায়গায় হাজির নাজির?
মীলাদে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সম্মানে দাঁড়ানোর বিধান কি?
প্রশ্ন: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান বলতে কি বোঝায়?
প্রশ্ন: কিয়ামতের আলামত কয় প্রকার? আলামতগুলো কি কি?
প্রশ্ন: কিয়ামত দ্বারা কি বুঝায়?
প্রশ্ন: ফিৎনাতুল কবর বা কবরের পরিক্ষা কি?
প্রশ্ন: শিঙ্গায় ফুৎকার কি?
প্রশ্ন: পুনরুত্থান কি?
প্রশ্ন: হাশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও প্রতিফল কি?
প্রশ্ন: হাউজে কাউসার কি?
প্রশ্ন: শাফাআত কি? শাফায়াতের শর্ত কি?
প্রশ্ন: মিযান বা মানদন্ড কি?
প্রশ্ন: আস্ সিরাত বা পুল সিরাত কি?
প্রশ্ন: আল-কানত্বারাহ্ কি?
প্রশ্ন: জান্নাত ও জাহান্নাম এর ব্যাপারে আমাদের ঈমান কি?
প্রশ্ন: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার সুফল কি?

প্রশ্ন: কদরের (ভাগ্যের) সংজ্ঞা ও তার প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন: ভাগ্যের স্তর কয়টি ও কি কি?
প্রশ্ন: ভাগ্যের প্রকারভেদ কি কি?
প্রশ্ন: ভাগ্যের ব্যাপারে সালাফদের আকিদাহ বা বিশ্বাস কি?
প্রশ্ন: কাজ কয় প্রকার? বান্দাদের কর্ম সমূহ কি?
প্রশ্ন: আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দার কর্মের মাঝে সমঝতা কি?
প্রশ্ন: ভাগ্যের ব্যাপারে বান্দার করণীয় কি?
প্রশ্ন: ভাগ্য ও ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য কেন?
প্রশ্ন: হিদায়াত কয় প্রকার?
প্রশ্ন: কুরআনে বর্ণিত (আল্লাহর) ইরাদা কয় প্রকার ও কি কি?
প্রশ্ন: ভাগ্যের সাথে আসবাব এর প্রভাব কি এবং ভাগ্যের রহস্য কি?
প্রশ্ন: ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়ার মাস'আলা কি?
প্রশ্ন: আসবাব বা (মাধ্যম সমূহ) গ্রহণ করার ব্যাপারটি কিরূপ?
প্রশ্ন: ভাগ্যকে অস্বীকার কারীর বিধান কি?
প্রশ্ন: ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার ফলাফল কি?

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

প্রশ্ন: দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয় বলতে কি বোঝায়?
প্রশ্ন: দ্বীন বিধ্বংসী বিষয়গুলো কি কি?

চতুর্থ অধ্যায়: তাওহীদের মর্মকথা

প্রশ্ন: দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত দু'টি বিষয় কি কি?
প্রশ্ন: দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো দালীল প্রমানসহ আলোচনা করুন?
প্রশ্ন: দ্বীনের মূলনীতির অন্তর্গত এই বিষয়গুলো কিভাবে জানা গেল?

তাওহীদ

প্রশ্ন: তাওহীদ কি?
প্রশ্ন: তাওহীদ শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে?

প্রশ্ন: কালিমাতুত তাওহীদ তথা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর গুরুত্ব ও মর্যাদা কি?
প্রশ্ন: তাওহীদের উপকারিতা কি?
প্রশ্ন: তাওহীদ তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ফাযীলত কি?

তাওহীদের প্রকারভেদ

প্রশ্ন: তাওহীদ কয় প্রকার ও কি কি?
প্রশ্ন: ‘রব’ মানে কি?
প্রশ্ন: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলতে কি বোঝায়?
প্রশ্ন: তাওহীদ আল আছমা ওয়াস সিফাত বলতে কি বোঝায়?
তাওহীদ আল আছমা ওয়াস সিফাত এর প্রধান কয়েকটি শর্ত রয়েছে-
প্রশ্ন: আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় নিষিদ্ধ?
প্রশ্ন: তাওহীদ আল উলুহিয়্যাত বলতে কি বোঝায়?
প্রশ্ন: কেন শুধু আল্লাহকেই একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ হিসেবে গ্রহন করতে হবে?
প্রশ্ন: শুধুমাত্র তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাত ও আসমা ওয়াস সিফাতের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয় তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: নাবী-রাসুলরা কোন তাওহীদের দিকে নিজ নিজ জাতিকে আহ্বান করেছিলেন?

তাওহীদের শর্তাবলী

প্রশ্ন: শর্ত কাকে বলে?
প্রশ্ন: তাওহীদের শর্তাবলী পূরন করা কেন জরূরী?
প্রশ্ন: তাওহীদের শর্ত কয়টি ও কি কি?
প্রশ্ন: তাওহীদ সম্পর্কে কেন জানতে হবে? এ ব্যাপারে বর্তমানে অধিকাংশ লোকের কি অবস্থা?

তাওহীদের রুকন

প্রশ্ন: রুকন কাকে বলে? তাওহীদের রুকনের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন: তাওহীদের রুকন কয়টি ও কি কি? এবং তার প্রমাণ কি?

প্রশ্ন: তাগুত কি? তাগুতের সংজ্ঞা কি?
কুরআনের চারটি আয়াতে طَاغُوْتٌ (তাগুত) এর বৈশিষ্ট্য:
প্রশ্ন: প্রধান প্রধান ত্বাগুত কারা?
প্রশ্ন: আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসকরা কিভাবে ত্বাগুতের অন্তর্ভূক্ত?
প্রশ্ন: কিভাবে ‘কুফর বিত ত্বাগুত’ তথা ত্বাগুতকে বর্জন করতে হবে?
প্রশ্ন: ত্বাগুতকে অস্বীকার করা কেন অপরিহার্য?
প্রশ্ন: তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন ‘ঈমান বিল্লাহ’ বলতে কি বোঝায়?

পঞ্চম অধ্যায়: শিরক

প্রশ্ন: শিরক্ কি?
প্রশ্ন: শিরকের ভয়াবহতা কি?
প্রশ্ন: শিরক্ না করতে আমাদের প্রতি নির্দেশ কি?
প্রশ্ন: শিরকের ক্ষতিকর দিক ও বিপদসমূহ কি কি?
প্রশ্ন: শির্ক না করার ফযীলত কি?
প্রশ্ন: শিরকের কারনগুলো কি কি?
প্রশ্ন: সাধারন ও বিস্তৃত অর্থে শিরক্ কয় প্রকার ও কি কি?
প্রশ্ন: খাছ বা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক্ কয় প্রকার ও কি কি?
প্রশ্ন: শিরক আল আকবার বা বড় শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?
প্রশ্ন: শিরক্ আল আসগার বা ছোট শিরক কয় প্রকার ও কি কি? এ ব্যাপারে প্রচলিত শিরকগুলো কি কি?
প্রশ্ন: আশ্-শিরক্ আল খফী বা গোপন শিরক্ বলতে কি বোঝায়?

আর-রিয়া: গোপন শিরক্

প্রশ্ন: আর রিয়া কি?
প্রশ্ন: আমলের ক্ষেত্রে শিরকমুক্ত, বিশুদ্ধ নিয়্যাতের গুরুত্ব কি?
প্রশ্ন: রিয়ার ভয়াবহতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:)

আমাদেরকে কেমনভাবে সতর্ক করেছেন?
প্রশ্ন: রিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি?
প্রশ্ন: রিয়ার কারণ কি?
প্রশ্ন: রিয়ার ধরনগুলো কি কি?
প্রশ্ন: রিয়া থেকে বাঁচার উপায় কি?
প্রশ্ন: আস-সাদেকূন বা সত্যবাদী কারা?
প্রশ্ন: আরবাব কি?
প্রশ্ন: আলিহা কি?
প্রশ্ন: আনদাদ কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রচলিত কতিপয় শিরক্

প্রশ্ন: গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাংসদদেরকে মানা, নির্বাচনে ভোট দেয়া শিরক কেন?
প্রশ্ন: যাদুবিদ্যা শিরক এবং কুফরীর অন্তর্ভূক্ত কিভাবে?
প্রশ্ন: তাবিজ-কবজ ব্যবহার শিরকের অন্তর্ভূক্ত কিভাবে?
প্রশ্ন: বালা মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা (সূতা) ইত্যাদি পরিধান করা শিরক তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: শূভ-অশুভ লক্ষণ বা সংকেত গ্রহন শিরক কিভাবে?
প্রশ্ন: 'আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন' বলা শিরক কিভাবে?
প্রশ্ন: বাক্যের মধ্যে 'যদি' শব্দের ব্যবহার শিরকের দরজা খুলে দেয় কিভাবে?
প্রশ্ন: মিলাদে কি ধরনের শিরক প্রচলিত?
প্রশ্ন: পীর-দরবেশ, ওলী-আউলিয়া এবং কবরে শায়িতদের নিকট দোয়া-প্রার্থনা করা শিরক্ এ বিষয়টির প্রমান কি?
প্রশ্ন: কবর-মাযার-দরগায় দান বা ভোগ দেয়া শিরক্ তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: মাযারে, ওরসে পীর-ফকিরদের উদ্দেশ্যে যবেহ করা, দান করা শিরক, তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক তার প্রমান কি?

প্রশ্ন: নেককার ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লংঘন গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: বরকত হাসিলের জন্য গাছের নিকট ভোগ দেয়া কি শির্ক?
প্রশ্ন: আল্লাহ ব্যতীত বাপ-দাদা, মাতা, পীর-দরবেশ কিংবা অন্যকিছুর নামে কসম করা শিরক্ এর প্রমান কি?
প্রশ্ন: নবী (সা:) কে আল্লাহর নূরের তৈরী মনে করা শির্ক কেন? তিনি যে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: ওয়াসীলার নিষিদ্ধ এবং শিরকী দিকগুলো কি কি?
প্রশ্ন: তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা, এটি শিরক এবং কুফরী এর প্রমান কি?
প্রশ্ন: নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন আমাল করা শিরক তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: "আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান" এ ধারনাটি বাতিল এবং শির্ক বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন?
প্রশ্ন: আল্লাহ (সুব:) তো নিরাকার, তিনি আরশে সমাসীন হন কিভাবে?
প্রশ্ন: আল্লাহর যে অজানা আকার তথা চেহারা, হাত, পা, চোখ, আঙ্গুল আছে তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: ভাগ্য গননা শির্ক কিভাবে?
প্রশ্ন: রাশিচক্র সম্বন্ধে ইসলামের রায় কি?

গনতন্ত্র: একটি বাতিল দ্বীন এবং এ ব্যাপারে সংশয় সমূহের জবাব

প্রশ্ন: গনতন্ত্রের অর্থ এবং সংজ্ঞা কি?
প্রশ্ন: গনতন্ত্রের শিরকী এবং কুফরী দিকসমূহ কি ?
প্রশ্ন: গনতন্ত্র ইসলামিক শুরার মত এই যুক্তিতে যারা এতে অংশগ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?
প্রশ্ন: মিশরের তৎকালীন রাজসভায় একজন মন্ত্রী হিসেবে ইফসুফ (আ:) এর যোগদানকে যারা অপব্যাখ্যা করে

গনতন্ত্রে যোগদানের দলীল হিসেবে গ্রহণ করে তাদের
এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?
প্রশ্ন: দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের
পক্ষ অবলম্বন করার নীতিতে যারা গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের
দলীল গ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?
প্রশ্ন: ''ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা'' এই নীতি
গনতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ভূল কিভাবে?
প্রশ্ন: "আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল"
এই ভিত্তিতে যারা বলে আমরা ভাল নিয়্যাতে গনতন্ত্রে
অংশগ্রহণ করি তাদের এ কথা বাতিল কিভাবে?
প্রশ্ন: ''ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজের
নিষেধ করার'' নামে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ বাতিল কিভাবে?
প্রশ্ন: "নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি"
এই যুক্তিতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ ভ্রান্ত কিভাবে?
প্রশ্ন: "জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য" মানুষ
কিভাবে এর অপপ্রয়োগ করে গনতন্ত্রে
অংশগ্রহনের ব্যাপারে?
প্রশ্ন: গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের
ব্যাপারে রায় কি? অজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাল নিয়্যাতে যে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ
করে তাদেরকে তাকফীর করার পূর্বে করনীয় কি?
প্রশ্ন: ইসলাম ও গনতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্যগুলো কি কি?

সপ্তম অধ্যায়: মিল্লাতে ইবরাহীম

প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীম কি? মিল্লাতে ইবিরাহীমের
মূলকথা কি?
প্রশ্ন: যারা বলে, "আমাদের পথ ও মিল্লাত হলো
মুহাম্মাদ (সা:) এর পথ। আর ইব্রাহীম (আ:) এর
মিল্লাত বা শরীয়া তো এর পূর্বের শরীয়া। আর যারা
পূর্বে এসেছে তাদের শরীয়া তো আমাদের জন্য নয়।"
তাদের এ অভিযোগকে কিভাবে খন্ডন করা হবে?

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে শত্রুতা, ঘৃণা করল না
এবং তাদের থেকে দূরে থাকল না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব
পরিহার করল না তার ইসলাম ঠিক থাকবে কি?
প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরনে দ্বীন প্রকাশের স্বরূপ কি?
আমাদের প্রতি এ ব্যাপারে হুকুম কি?
প্রশ্ন: নাবী মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর সাহাবারা মক্কায় দূর্বল
অবস্থাতেও মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরন করেছেন
এর দৃষ্টান্ত কি?
প্রশ্ন: ত্বাগুতদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে দাওয়াতী
কাজে হিকমাত বা নম্রতার নামে কালক্ষেপন জায়েজ কি?
প্রশ্ন: মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষনা দেয়ার পূর্বে
আমরা কি করব? ঐ অবস্থায় তাদের প্রতি ভালবাসা
রাখা জায়েজ কি?
প্রশ্ন: মুসা (আ:) কিভাবে ফিরাউন ও তার গোত্রকে দাওয়াহ দিয়েছিলেন?
প্রশ্ন: কোন পর্যায়ে মুশরিকদের সাথে এমনকি যদিও তারা
আত্মীয় হয় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষনা দেয়া হবে?
প্রশ্ন: আবু তালিবের শ্রেণীর মুশরিকদের সাথে কিরূপ
আচরন হবে? এই শ্রেণীর মুশরিকদের কাছে কি নিজে
থেকে সাহায্য চাওয়া যাবে?
প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীমের পথে কি ধরনের পরীক্ষার
সম্মুখীন হতে হয়?
প্রশ্ন: আল্লাহর রীতি মুতাবিক কারা এই যমীনে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষিত
হন?
প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরন যদিও অনেক কঠিন
কিন্তু এর শেষ ফলাফল কি?
প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরনে সবচেয়ে উত্তম
ঈমানদারের দৃষ্টান্ত কি? সে কিভাবে বাতিলের সাথে
মোকাবিলা করবে?
প্রশ্ন: এ পথে কম প্রভাবশালী ঈমানদার কি করবে,
যে দূর্বলতার কারনে মুশরিকদের সাথে শত্রুতার প্রকাশ

করতে পারছে না?
প্রশ্ন: পরিবার-পরিজনের দ্বীন ঠিক রাখার কাজ যাকে আটকে রেখেছে আবার সে ঐ স্থানে দ্বীনকে প্রকাশও করতে পারছে না, ঐ কম প্রভাবশালী ঈমানদারের জন্য তার দ্বীনকে ঠিক রাখার জন্য কি করণীয়?
প্রশ্ন: মিল্লাতে ইববরাহীম এবং সিক্রেসী গ্রহণ এই দু'য়ের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়তা কোথায় প্রযোজ্য?
প্রশ্ন: যে সমস্ত লোকেরা বলে: "নিশ্চয় মিল্লাতে ইবরাহীমের এ পথ (প্রকাশ্য ঘোষণার পথ) দাওয়াতকে ধ্বংস করে ও দ্রুত করুণ পরিণতি ডেকে আনে।"
তাদের এ কথার জবাব কি?
প্রশ্ন: যে ব্যক্তি সতর্কতার নামে গোপনে বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে কাফেরদের সমর্থন করে ইসলামে তার অবস্থান কোথায়?
প্রশ্ন: আল-ইক্বরাহ বা জবরদস্তি পরিস্থিতি কি?
যে অবস্থায় অন্তর ঠিক রেখে বাহ্যিক কুফরী কথা বলা বৈধ? তার জন্য শর্ত কি?
প্রশ্ন: জবরদস্তি পরিস্থিতিতেও কোন ভূমিকা নেয়া উত্তম?
জবরদস্তি পরিস্থিতিতেও যারা নতি স্বীকার করেন নি এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত বর্ননা করুন?
প্রশ্ন: হাতিব ইবনে বালতাআ' (রা:) এর মক্কায় কাফিরদের চিঠি লিখে সতর্ক করা কি কারনে কুফরী বলে গন্য হয় নি?
আমাদের সময়ে এরূপ কাজ কেউ করলে তার সাথে আমাদের কি আচরন হবে?
প্রশ্ন: মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে দায়ীদের কে সরিয়ে নিতে ত্বাগুত কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়?

অষ্টম অধ্যায়: আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ

প্রশ্ন: আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ কি?

প্রশ্ন: আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় অংশ তার প্রমান কি?
প্রশ্ন: আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ-তে বিশ্বাসের মর্যাদা কি?
প্রশ্ন: 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র দাবী সমূহ কি কি?

কাফেরদের শত্রুতার ধরন

প্রশ্ন: মু'মিদের সাথে কাফিরদের শত্রুতার ধরন কি?

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের বিধান

প্রশ্ন: কফিরদের সাথে ভয়ের ওজর দেখিয়ে বন্ধুত্বের ব্যাপারে বিধান কি?
প্রশ্ন: মুক্বরাহ কে?
প্রশ্ন: ভয়ে বা দুনিয়ার স্বার্থে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে দালীল প্রমান কি?
প্রশ্ন: বিল ইক্বরাহ-র পরিস্থিতিতেও অন্য মুসলিমের ক্ষতি করা জায়েয কিনা?
প্রশ্ন: মুওয়ালাত এবং তাওয়াল্লী কি?
প্রশ্ন: মুওয়ালাত এবং তাওয়াল্লী এর মধ্যে পার্থক্য কি?
এই দু'টি জিনিসকে কিভাবে আলাদা করা হবে?
প্রশ্ন: কাফেরদের সাথে মু'আমালাত বা আচার-ব্যবহার কয় প্রকার?
প্রশ্ন: কাফেরদের সাথে ব্যবসা ও ভ্রমন করার ব্যাপারে বিধান কি?
প্রশ্ন: তাগুতের ইবাদতকারী কাফির-মুশরিকদের সাথে আমাদের আচরণনীতি কি?
প্রশ্ন: কাফিরদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন প্রমাণ করে এমন নিদর্শনগুলো কি কি, যা থেকে অবশ্যই দূরে থাকা কর্তব্য?

কাফেরদের অনুকরণ

প্রশ্ন: একজন লোক কতক্ষন পর্যন্ত নিজেকে মুসলিম দাবী করতে পারে না?
প্রশ্ন: কাফেরদের অনুকরন এর ব্যাপারে আমাদের প্রতি কিরূপ সতর্কতা রয়েছে?

নবম অধ্যায়: কুফর ও তার প্রকারভেদ

তাকফীর

তাওহীদের সংশয় নিরসন

দশম অধ্যায়: নিফাক্ব ও মুনাফিক্ব

একাদশ অধ্যায়: সুন্নাত ও বিদআত

দ্বাদশ অধ্যায়: কবিরাহ গুনাহ

ত্রয়োদশ অধ্যায়: বাতিল ফিরকাসমূহ

চতুর্দশ অধ্যায়: ইসলামী আক্বীদার কতিপয় গুরুত্বপূর্ন দিক

ইসলাম আমাদের জাতীয়তা!

দ্বীনের শীর্ষচুড়া

যেসব কিতাব থেকে সংকলিত-

❖ আল-কুরআনুল কারীম ।
❖ কুতুবুল আহাদীস ।
❖ কুতুবুত্ তাফাসীর ।
❖ আক্বীদাতুত তাহাবিয়্যাহ - ইমাম আবু জাফর তাহাবী রহ.
❖ আক্বীদাতুল ওয়াসেতিয়্যাহ- শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহ.
❖ কিতাবুত তাওহীদ- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.)
❖ আদ্ দালাইল ফি মুওয়ালাত আহলি আল ইশরাক- ইমাম সুলাইমান ইবন্ আবদিল্লাহ রহ.
❖ মিল্লাতি ইবরাহীম- শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল মাক্বদিসী (হাফিযাহুল্লাহ)
❖ this is our Aqeedah- শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল মাক্বদিসী (হাফিযাহুল্লাহ)
❖ Statement of Ibn Abbas (RA)- শাইখ আলী আত্ তামিমি (হাফিযাহুল্লাহ)
❖ আত তিবয়ান ফি কুফরি মিন আ'নাল আমরিকা- শাইখ নাসির বিন হামাদ আল ফাহাদ (হাফি.)
❖ The Doubts Regarding the Ruling of Democracy In Islam –আত্ তিবয়ান পাবলিকেশন্স
❖ Democracy A Religion- শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল মাক্বদিসী (হাফিযাহুল্লাহ)
❖ আরকানুল ঈমান ওয়াল ইসলাম- রিসার্স, মাদীনা ইউনিভার্সিটি
❖ সালাসাতুল উসুল ওয়া আদিল্লাতুহা- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ.
❖ What Every Muslim Mus: Know- মুহাম্মদ বিন সুলায়মান আত তামিমী রহ.
❖ Ar Riyaat the Hidden Shirk- আবু আম্মার ইয়াসার আল কাযী
❖ এছাড়াও আত্ তিবয়ান পাবলিকেশন্স এবং অন্যান্য অনেক কিতাব থেকে

একটি আবেদন

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

'মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা' একটি খালেস দ্বীনি প্রতিষ্ঠান । মারকাজ তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের সহীহ আক্বিদাহ ও মানহাজ প্রচার-প্রসারসহ বহুমূখী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে । মাদরাসা-মসজিদ পরিচালনা করা, বই-পুস্তক রচনা করা, বিষয় ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা, সিডি-ভিসিডি, মেমোরী কার্ড ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করা সহ বহু কাজে মারকাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে । মারকাজের এই বহুমূখী কাজে আপনার সার্বিক সাহায্য-সহযোগীতা ও দু'আ একান্তভাবে কাম্য ।

আপনি মারকাজের জন্য

মারকাজ সকলের জন্য